বোখারী শরীফ

(বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা)

দ্বিতীয় খণ্ড

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)
প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল জামেয়া কোরআনিয়ার
ফয়েজ ও বরকতে

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব
প্রাক্তন মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ,
বর্ত্তমান শায়খুল-হাদীছ জামেয়া মোহাম্মদিয়া মোহাম্মদ পুর, ঢাকা
কর্ত্তৃক অনুদিত।

হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ
৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শায়খুল-ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ)-এর

—একটি আশার বাস্তব রূপ—

আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শোকর যে, ১৯৫৭ সালের শেষ দিকে বোখারী শরীফের বাংলা তরজমা প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করে। ধর্ম পিপাসু পাঠক সমাজে যেরূপ দ্রুত গতিতে উহার প্রসার লাভ হয় এবং যেরূপ ব্যাপকভাবে উহা বাংলার মোসলমান ভাইদের নিকট সমাদৃত হয় তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও দীর্ঘ দিন যাবৎ উহার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। ইহা দ্বারাই অপরিসীম জনপ্রিয়তার কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়।

এতদ্ভিন্ন সর্বোপরি বিস্ময়ের বিষয় হইল—আমার ন্যায় বিদ্যা-বুদ্ধিহীন, জ্ঞানশূন্য অযোগ্য লোকের হাতে উহার সঙ্কলন কার্য্য সমাধা হওয়া। আমার বাংলা ভাষা শিক্ষার শেষ সীমা শুধুমাত্র গ্রাম্য মসজিদের প্রভাতী মুন্সিয়ানা মক্তবে কলা পাতার শ্রেণী পর্য্যন্ত। এই শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের পক্ষে বোখারী শরীফের ন্যায় মহান কিতাবের বিষয়বস্তু সমূহকে বাংলা ভাষায় শুধু রূপদান করাই একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। অতএব যাহারা আমার ভাষার যোগ্যতা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল রহিয়াছেন তাঁহাদের জন্য আর বিস্ময়ের সীমা থাকে নাই।

এইরূপে চতুর্দিক হইতেই কিছু কিছু বিস্ময়ের ঝড় ও আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে। এইসব বিস্ময়কর বিষয়সমূহ আমি লক্ষ্য করি নাই এমন নহে, কিন্তু আমি তাহাতে মোটেই বিস্মিত হই নাই, বরং এই সবের অন্তরালে সীমাহীন রহমতের অতল সমুদ্রে তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে পারে এমন একটি বস্তুর প্রতিক্রিয়াকে আমি নিবিড়ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম।

বিগত ১৯৪৪ সনের ঘটনা—আমি স্বদেশ হইতে সুবিজ্ঞ ওস্তাদগণের অধ্যাপনায় ছেহাহ্-ছেত্তা তথা আরবী বিদ্যালয় সমূহের সর্বশেষ ক্লাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় কেবলমাত্র ছেহাহ্-ছেত্তা হাদীছসমূহ বিশেষরূপে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে দেশ হইতে বাহির হই। তখনও আমি শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী রহমতুল্লাহ আলাইহের দর্শন লাভ করিয়াছিলাম না। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও জ্ঞান-সূর্য্যের কিরণ সমূহ যাহা তাঁহার গ্রন্থাবলীর পাতায় পাতায় বিরাজমান ছিল এবং তাঁহার অতুলনীয়

মনোমুগ্ধকর গুণাবলীর প্রতিভা যাহা পাক-ভারত বরং বিশ্ব-আলেম সমাজকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; এই সবের আকর্ষণে আমি তাঁহার প্রতি ছুটিয়া যাইবার আকাঙ্খায় ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলি। অতঃপর যখন তাহার দেওবন্দস্থিত বাস ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দর্শন লাভের সৌভাগ্য আমার হইল তখন আমার অন্তরের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

তারপর তথা হইতে আমি বোম্বাইর নিকটস্থিত সুরাত জিলার অন্তর্গত 'ডাভেল' নামক স্থানে অবস্থিত সুবিখ্যাত মাদ্রাসায় পৌছিলাম। মনে বড় আশা যে, শায়খুল-ইসলাম (রঃ)-এর নিকট বোখারী শরীফ অধ্যয়নের সৌভাগ্য লাভ করিব, কারণ তিনি সেই মাদ্রাসায় এই মহান কিতাবখানার অধ্যাপক। কিন্তু আল্লার কুদরতের শান যে, অবলীলাক্রমে আমার সে আশা পূরণে নানারূপ বাধা-বিপত্তি ও দীর্ঘ-সূত্রিতার সৃষ্টি হইতে লাগিল যাহা কিছুতেই শেষ হইতে ছিল না। এমনকি সেই দীর্ঘ-সূত্রিতার কারণে তথা হইতে ফিরিয়া আসার দুশ্চিন্তা আসিতে লাগিল। প্রায় দীর্ঘ চার মাস কাল এইরূপে আশা-নিরাশার তরঙ্গ দোলায় হাবুডুবু খাইতেছিলাম। কিন্তু আল্লার শোকর যে, এরই মধ্যে নানাপ্রকার শুভ স্বপ্ন আমার ঐসব দুশ্চিন্তার লাঘব করিয়া আমাকে স্বীয় আশা-আকাঙ্খা হইতে পদস্খলনে প্রবলরূপে বাধা প্রদান করিতেছিল।

একটি স্বপ্ন ত আমার শুভ ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট সুসংবাদ বহনে আশ্চর্য্যজনক ভাবে বাস্তবায়িত হইয়া আমাকে সান্ত্বনা দিল। যাহার বিবরণ এই—

দেওবন্দ মাদ্রাসার হাদীছ শিক্ষক মাওলানা ছৈয়্যদ আছগর হোসাইন (রঃ) যিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ ওলীউল্লাহ বুজুর্গ ছিলেন। মোজাদ্দেদে-জমান মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) এবং শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ (রঃ) শ্রেণীর ওলী-উল্লাহগণের সময়ে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র মুরব্বী শ্রেণীর ওলীউল্লাহ বুজুর্গ গণ্য করা হইত। আমার দেশীয় ওস্তাদগণের এবং দেওবন্দী সমস্ত আলেমগণের তিনি ওস্তাদ ছিলেন। তাঁহাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোচনায় আমি নরাধমেরও তাঁহাকে দেখার পূর্ব হইতেই তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও মহব্বৎ ছিল। তিনি ওলামাদের মুখে হযরত মিঞা সাহেব বলিয়া পরিচিত ছিলেন। দেশ হইতে "ডাভেল" যাওয়ার পথে কিছু দিন আমি থানাভবন খানকায় ছিলাম; তখন মাওলানা থানভী রহমতুল্লাহে আলাইহের ওফাত হইয়াছে অল্প কিছুদিন পূর্বে। খানকায় অনেক অনেক বুজুর্গেরই গমনাগমণ; হযরত মিঞা সাহেবও তথায় তশরীফ আনিয়াছেন। এই সর্বপ্রথম আমি তাঁহার দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিলাম। খানকার মসজিদে তিনি নামায পড়িতেছিলেন আমি তাঁহাকে পাখার বাতাস দেওয়ারও সুযোগ পাইয়াছিলাম। খানকায় অবস্থানরত "তুরশাহ" নামক এক মজযুব বুজুর্গ আমার হাত হইতে পাখা ছিনাইতে চাহিলে হযরত মিঞা সাহেব তাঁহাকে বাধা দিলেন এবং পাখা করার সৌভাগ্য আমার জন্যই থাকার আদেশ করিলেন।

"ডাভেল" মাদ্রাসায় পৌঁছিয়া শায়খুল-ইসলাম (রঃ)কে পাইবার আশা-নিরাশার টানা-হেঁচরায় জীবনের সর্বাধিক ব্যাকুলতায় কাল কাটিতেছিলাম। তখন একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখি, আমি ডাভেল যাত্রার পথে এক মসজিদে উপস্থিত হইয়াছি এবং হাতের সুটকেস সম্মুখে রাখিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িয়াছি। নামাযান্তে মসজিদের এক প্রান্তে কিছু লোক জামায়েত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ঐ স্থানে কি? এক ব্যক্তি বলিল, ঐ স্থানে হযরত মিঞা সাহেব আছেন। আমি সুটকেসটা ফেলিয়াই তথায় যাইয়া বসিলাম। মজলিস শেষ হওয়ার পর আসিয়া দেখি, আমার সুটকেসটা চুরি হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যাইয়া হযরত মিঞা সাহেবকে বলিলাম, আমি ডাভেল যাইতেছি; আপনার মজলিসে বসিয়াছিলাম; আমার সুটকেসটা চুরি হইয়া গেল; ডাভেল যাত্রা অশুভ মনে হয়। হযরত মিঞা সাহেব স্বপ্নে যে উত্তর দিয়াছিলেন আজও উহার শব্দ আমার কাণে ধ্বনিত মনে হয়। তিনি বলিলেন جاؤ نتیجہ اچھا ہوگا "যাও; শেষ ফল ভাল হইবে।"

এই শুভ স্বপ্নের আলিঙ্গনে আশার প্রাবল্য নিরাশাকে পরাস্ত করার উপক্রম; এরই মধ্যে একদিন দেখি, ডাভেল মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ছুটিয়া চলিয়াছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ডাভেল গ্রাম সংলগ্ন "সিম্‌লক" গ্রামে হযরত মিঞা সাহেব আসিয়াছেন। আজ আমি নিদ্রায় নহি, বাস্তব দেখিতেছি। আমিও ছুটিলাম; হযরত মিঞা সাহেবের মজলিসে যাইয়া বসিলাম। কিছু সময় পর লোকজন চলিয়া যাইতে লাগিল; সর্বশেষ মাদ্রাসার মোহতামেম সাহেব এবং আমার পালা; তখন তথায় অন্য কেহ নাই। মোহতামেম সাহেব হযরত মিঞা সাহেবের খেদমতে আমার প্রতি ইশারা করিয়া অভিযোগ পূর্বক বলিলেন, হযরত এই ছেলেটি মাওলানা জফর আহমদ সাহেবের ছাত্র, আমাদের মাদ্রাসায় আসিয়াছে; সে চলিয়া যাইতে চায়; তাহাকে একটু নছিহত করুন। হযরত মিঞা সাহেব মাওলানা জফর আহমদ সাহেবের প্রসংশা করতঃ আমার প্রতি স্নিগ্ধ তাকাইয়া বলিলেন, جاؤ مت اچھا ہوگا যাইও না; ভাল হইবে।

স্বপ্ন আর বাস্তবের এই অপূর্ব মিল; আমি ইহাতে অভিভূত হইয়া আশার আনন্দে ডাভেল মাদ্রাসায় স্থিরপদ হইয়া রহিলাম।

আমার আশার প্রভাত উদীয়মান হইতে দেখা যাইতে লাগিল। শায়খুল ইসলাম (রঃ) তথায় তশরীফ আনিলেন। মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দ আমরা সকলেই আনন্দে আত্মহারা। আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিলাম এবং সকলে মোছাফাহা করিলাম। সকলের মধ্যে তিনি আমাকে ঠাহর করিতে পারিলেন না, কিন্তু আমার পরম সৌভাগ্য যে, পূর্বে অনেক চিঠিপত্র লেখার দরুন নরাধমের নামটা তাঁহার মনে গাথা ছিল। রাত্রিবেলা অন্যান্য ছাত্রদের নিকট তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—আজিজুল হক নামের তালেব-এলম

এখানে আছে কি? সকলেই বলিল—জী হাঁ। (তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হওয়ার সংবাদ আমাকে দেওয়া হইল। শায়খুল-ইসলামের মুখে আমার নাম! আমার আনন্দের সীমা রহিল না। আমি তাহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। স্নেহভরে তিনি আমার প্রতি তাকাইলেন। তখন হইতেই তাঁহার আন্তরিক স্নেহ আমাকে সৌভাগ্যশালী করিল।

সেই জীবনে শায়খুল-ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইহে বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি স্নেহপূর্ণ বাক্য আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন। বাক্যগুলির প্রতিটি অক্ষর আমার অন্তরে খচিত রহিয়াছে। উহার প্রতিটি অক্ষর কিরূপে বাস্তবে রূপায়িত হইতে দেখিয়াছি তাহা পাঠকবৃন্দের সম্মুখে তুলিয়া ধরার জন্যই উল্লিখিত ইতিহাস সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছি। একদা তিনি আমাকে বলিলেন—

"بہت اچھا ہوا کہ تم اس سال میرے پاس پڑھنے آئے ہو میں اس سے پہلے غالبا دس دفعہ بخاری شریف پڑھا چکا ہوں میرا خیال ہے کہ پچھلے تمام سالوں کا مجموعہ میں اس سال پڑھاؤنگا اور شاید یہی میرا اخری پڑھانا ہے"

অর্থ—"এই বৎসর আমার নিকট অধ্যয়নে তোমার আগমন অত্যন্ত শুভ ও সময়োচিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে আমি অন্ততঃ আরও দশবার বোখারী শরীফ পড়াইয়াছি। আমার ইচ্ছা—বিগত দশ বৎসরের সমুদয় অভিজ্ঞতার সমষ্টি আমি এই বৎসর শিক্ষাদান করিব। মনে হয়, ইহাই আমার শিক্ষাদানের শেষ বৎসর।

ফার্সী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে— قلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید "আল্লার প্রিয় বান্দাগণ যাহা বলিয়া থাকেন তাহা যেন চাক্ষুস দেখিয়াই বলিয়া থাকেন।"

শায়খুল-ইসলাম (রঃ) সম্ভাব্যাকারে যে কথাটি প্রকাশ করিলেন যে, "মনে হয়—ইহাই আমার শিক্ষাদানের শেষ বৎসর" তাঁহার উক্তিটি যেন নির্দ্ধারিত সত্যের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যাহা অক্ষরে অক্ষরে রূপায়িত হইয়াছে।

আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শোকর—তিনি ঐ বৎসর বিশেষ যত্নের সহিত বোখারী শরীফের অধ্যাপনা শেষ করিলেন। অতঃপর বৎসর শেষে মাদ্রাসা বন্ধ হইলে তিনি দেওবন্দস্থিত স্বীয় বাস-ভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রহিলাম, এমনকি আমাকে তিনি অতি যত্ন ও আদরের সহিত স্বীয় বাস-ভবনেই রাখিলেন। আমি প্রায় এক বৎসর তাঁহার স্নেহ মমতার সাহচর্য্যে থাকিলাম। অধ্যাপনার সময় তাঁহার বর্ণিত তথ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও অমূল্য বর্ণনা সমূহ যাহা আমি পাণ্ডুলিপি করিয়া রাখিয়াছিলাম উহার পুনর্লিখন কার্য্য করিতেছিলাম এবং তাঁহার সংশোধনও গ্রহণ করিতেছিলাম। ইতিমধ্যেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, যেই রোগে তিনি দীর্ঘ

এগার মাস রোগ শয্যায় শায়িত রহিলেন। এই দিকে সমগ্র দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঝড় বহিতে লাগিল। মোসলেম সমাজে নেতৃস্থানীয় লোকগণ তাঁহাকে রোগ শয্যায় অবসর দিলেন না। ধীরে ধীরে তিনি মোসলেম সমাজের রাজনৈতিক জীবন-মরণ সমস্যার একমাত্র সমাধান পাকিস্তান আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার সংগ্রামে জড়িত হইয়া পড়িলেন এবং জাতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনে সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী অগ্রদূতগণের অন্যতম প্রধানরূপে তিনি কার্য্য চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। অতএব দীর্ঘ এগার মাস কাল পর তিনি রোগমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গোটা জীবন রাজনৈতিক যুদ্ধে মোসলেম জাতিকে রক্ষা করার কার্য্যে উৎসর্গ হইয়া গেল। পাকিস্তান কায়েম হইল, তিনি পাকিস্তানের সর্বপ্রথম সার্বভৌম পরিষদের প্রধানতম সদস্য মনোনীত হইলেন।

এইরূপে তাঁহার জীবন-সমুদ্রের গতি অধ্যাপনার দিক ছাড়িয়া অন্য দিকে প্রবাহিত হইতে বাধ্য হইল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতে অবকাশ পাইলেন না। ঐ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় তিনি ভাওয়ালপুর সফর করিলেন। তথায় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া চিরতরে এই জ্যোতির্ময় সূর্য্য ১৯৪৯ সনে অস্তমিত হইয়া গেল।

১৯৪৪ সনে তিনি যে বলিয়াছিলেন, "মনে হয়—এই বৎসরের অধ্যাপনাই আমার শেষ অধ্যাপনা।" তাঁহার সেই ধারণাই বাস্তবে রূপায়িত হইল—

قلندر هرچه گوید دیده گوید "আল্লার অলিগণ যাহা কিছু বলিয়া থাকেন তাহা যেন চাক্ষুশ দেখিয়াই বলিয়া থাকেন"। বাস্তবিকই ১৯৪৪ সনের পর তাঁহার অধ্যাপনার যুগ আর ফিরিয়া আসে নাই।

১৯৪৪ সনে তিনি এই নরাধমকে লক্ষ্য করিয়া আরও একটি কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথাটিই এখানে বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন—

امید ہے تمہارے ذریعہ سے بنگال میں میری کچھ باتیں پھیلے گی

"আমি আশা করি আমার বর্ণিত কিছু বিষয়বস্তু বাংলাদেশে তোমার দ্বারা প্রসার লাভ করিবে।" দীর্ঘ ১৪ বৎসর পূর্বে ১৯৪৪ সনে শায়খুল-ইসলাম রহমতুল্লাহে আলাইহে উল্লিখিত উক্তিটি আমার কানে এখনও ধ্বনিত মনে হয়। ১৯৫৭—৫৮ সন হইতে বোখারী শরীফের বাংলা তরজমা বাংলার মোসলমান ভাইবোনদের হস্তে সমাদৃত হওয়া আরম্ভ করিলে পর শায়খুল-ইসলাম রহমতুল্লাহে আলাইহের উল্লিখিত উক্তিটির বাস্তবরূপ আমার চোখে ভাসিয়া উঠিল।

বোখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীছে-কুদসীতে বর্ণিত আছে—আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন, "কোন বান্দা যখন আমার প্রিয় হইয়া যায় তখন সে আমার নিকট যাহাই প্রত্যাশা করে আমি তাহাই তাহাকে দান করিয়া থাকি।"

রসুল ও নবীগণ মানবের হেদায়েতের প্রতি কিরূপ লালায়িত থাকেন কোরআন শরীফের একাধিক আয়াতে উহার আভাস পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলেন—لعلك باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين "মক্কার ধুরন্ধর কাফেররা ঈমান আনিতেছে না সেই অনুতাপে আপনি নিজেকে হালাক করিয়া দিবেন মনে হয়।" রসুল ও নবীর নায়েব—আল্লার ওলী ও খাটী আলেমগণ সাধারণতঃ সেই প্রকৃতিরই হইয়া থাকেন।

শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহে আলাইহের অন্তরে বাংলার মোসলেম সমাজের প্রতি আকৃষ্টতার উদয় হইল, কিন্তু তিনি বাংলাভাষী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার মনের এই আকর্ষণের অছিলায় আমি নরাধমের অদৃষ্ট-নক্ষত্র চমকিয়া উঠিল।

শায়খুল-ইসলাম (রঃ) আল্লাহ তায়ালার দরবারে কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন, এখানে উহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নেহাত মামুলী ও স্বাভাবিক ভাবে যে উক্তিটি করিয়াছিলেন আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান তাঁহার সেই উক্তি নিষ্ফল ও প্রতিক্রিয়াহীন যাইতে দিলেন না। বরং তাঁহার সেই উক্তি ও আশাকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া তুলিবার বাস্তব ব্যবস্থা ও অছিলা সৃষ্টি করিলেন। কি আশ্চর্যজনক ব্যবস্থা! আমার ন্যায় অযোগ্য নরাধম যাহার বাংলা ভাষা শিক্ষার শেষ সীমা ও বিদ্যার দৌড় সম্বন্ধে পুর্বেই ব্যক্ত হইয়াছে; এতদসত্ত্বেও এই অযোগ্য নরাধমকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অপার করুণা বলে এতটুকু তৌফিক দান করিলেন যে, নিতান্ত মামুলী সাধারণভাবে হইলেও বাঙ্গালা ভাষী মুসলিম ভাইবোনদের বোধগম্য বাংলা ভাষার মাধ্যমে মহান কিতাব বোখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ পেশ করিতে সক্ষম হইলাম। (সমস্ত প্রসংসা আল্লাহ তায়ালার।)

মান-মর্যাদার ভাষা বলিতে আমার অনুবাদে মোটেই নাই, কিন্তু আমার ন্যায় অযোগ্য, বাংলা ভাষায় দখলহীন ব্যক্তির পক্ষে বোখারী শরীফের মত মহান কিতাবকে বাংলা ভাষায় রূপ দানই নিঃসন্দেহে এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

এতদ্ব্যতীত বোখারী শরীফের অনুবাদ বাংলায় মুসলিম ভাই-বোনদের নিকট যেরূপ সমাদৃত হইয়াছে এবং যে প্রকার বিদ্যুৎ গতিতে ইহার প্রসার লাভ ঘটিয়াছে তাহাও কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু এই সবই সম্ভবপর এবং সহজ-সাধ্য হইয়াছে এই কারণে যে, এই সবের মূলে ছিল বিগত ১৯৪৪ সালে শায়খুল-ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইহের আশা-আকাঙ্খা মূলক বাক্যের রূপায়ণ। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে—

ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره

অর্থাৎ "আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি আছেন যাহারা (নিজ উক্তিতে) কোন কথা বলিয়া ফেলিলে আল্লাহ তায়ালা তাহা অবশ্যই পূরণ করেন।"

শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহে যে সেইরূপ বান্দাদের একজন, বোখারী শরীফের বাংলা তরজমার ঘটনাবলী উহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণ।

প্রত্যেক পাঠক পাঠিকা সমীপে আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইহের পবিত্র আত্মার প্রতি ছাওয়াব-রেছানী এবং দোয়া করিয়া তাঁহার হক আদায় করিতে সচেষ্ট হন; প্রত্যেক পাঠকেরই তিনি ওস্তাদ।

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি অনুরোধ স্মরণ করাইয়া দিব যে আমার পিতা মরহুম হাজী এরশাদ আলীকে দোয়ার সময় ভুলিবেন না। তাঁহার অছিলা ও আপ্রাণ চেষ্টা এবং খালেছ নিয়তের বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপনাদের খাদেম হওয়ার তৌফিক দান করিয়াছেন। আখেরাতের দৌলত ও সৌভাগ্য লাভের অছিলা—দোয়া ইত্যাদি লাভ করার সুযোগ দেখিলেই মরহুম মাতা-পিতার কথা আমার মনে জাগিয়া উঠে এবং মনে চায় সেইরূপ সুযোগের সম্পূর্ণটুকুই মরহুম মাতা-পিতার জন্য উৎসর্গ করি। বোখারী শরীফ বাংলা তর্জমার পাঠক পাঠিকাগণের প্রাণে আমি নরাধমের প্রতি স্নেহ-মমতার উদয় হইবে বলিয়া আমি আশা পোষণ করি, তাই তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা, প্রত্যেকেই আমার মরহুম মাতা-পিতার রুহের প্রতি ছওয়াব-রেছানী ও দোয়া করিবেন।

হে আল্লাহ! আমি নরাধমের এই নগণ্য খেদমতটুকু কবুল কর, ইহার দ্বারা মোসলেম সমাজকে উপকৃত কর এবং ইহাকে আমার ও আমার মরহুম মাতা-পিতার মাগফেরাতের অছিলা বানাইয়া দাও। আমীন—আমীন—আমীন।

——✻——

সূচী-পত্র

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

আরম্ভ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ● وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى جَمِيْعِ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগার। দরূদ এবং সালাম সমস্ত

الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ● خُصُوْصًا عَلٰى سَيِّدِهِمْ وَاَفْضَلِهِمْ نَبِيِّنَا

নবী ও রসুলগণের প্রতি বিশেষতঃ নবী ও রসুলগণের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি—যিনি আমাদের নবী এবং

خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ● وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ●

সর্বশেষ নবী—তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও সমস্ত ছাহাবীগণের প্রতি

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ●

এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহাদের যত খাঁটী ও পূর্ণ অনুসারী হইবেন— তাঁহাদের প্রতি।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ●

আয় আল্লাহ! আমাদিগকে সেই অনুসারী ও দলভুক্ত বানাইবেন নিজ কৃপাবলে, হে দয়াময় সর্বাধিক দয়ালু!

اٰمِيْن ! اٰمِيْن !! اٰمِيْن !!!

আমীন! আমীন!! আমীন!!!

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

নবম অধ্যায়

যাকাত

নামায যেমন ইসলামের একটি স্তম্ভ ও অপরিহার্য্য ফরজ, যাকাতও তদ্রূপ ইসলামের একটি স্তম্ভ ও ফরজ। আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের বহু আয়াতে ফরমাইয়াছেন— اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ "তোমরা নামায কায়েম কর অর্থাৎ উহাকে অতি উত্তমরূপে আদায় কর এবং যাকাত দান কর।"

যাকাতও নামাযের ন্যায় হিজরতের পূর্বেই ফরজরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ডে ৬নং হাদীছের মধ্যে এই দাবীর প্রমাণ রহিয়াছে। আবু সুফিয়ানের বর্ণনার মধ্যে ছিল— يَاْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ অর্থাৎ ঐ নবী হওয়ার দাবীদার ব্যক্তি "আমাদিগকে নামায ও যাকাতের আদেশ করিয়া থাকেন।" আবু সুফিয়ান হিজরতের পূর্বের অবস্থাই বর্ণনা করিতেছিলেন।

৭২৮। হাদীছঃ— قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن

اِنَّكَ سَتَاْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَاِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ اِلٰى اَنْ يَّشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْالَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْالَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْالَكَ بِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهٗ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

অর্থ:—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোয়াজ (রাঃ)কে ইয়ামান দেশে (শাসনকর্তারূপে) পাঠাইতেছিলেন; তখন তিনি তাঁহাকে (তাঁহার কার্য্যধারার উৎকৃষ্ট পন্থা শিক্ষাদান পূর্বক কতকগুলি উপদেশ ও সতর্ক-বাণী দান করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি এমন এক দেশে চলিয়াছ যে দেশবাসী কেতাবধারী কাফের—ইহুদী-নাছারা; (তাহাদিগকে সহজ উপায়ে দীন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিতে) প্রথমে তাহাদিগকে ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি অর্থাৎ তৌহীদ ও রেছালাতের বিশ্বাসকে দৃঢ় করার প্রতি আহ্বান জানাইবে, তথা কলেমা—لا اله الا الله محمد رسول الله "একমাত্র আল্লাহই মাবুদ, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) আল্লার বাণীবাহক সাচ্চা রসুল" এই স্বীকারোক্তির প্রতি আহ্বান জানাইবে। যদি তাহারা ইহা শীরোধার্য্য করিয়া মানিয়া লয় তবে (তাহারা মোসলমান জামায়াত ভুক্ত হইল।) তৎপর তাহাদিগকে এই শিক্ষা দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা (সকল মোসলমানের ন্যায়) তাহাদের উপরও প্রতি দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করিয়াছেন। যদি তাহারা ইহা গ্রহন করিয়া লয়, তবে তাহাদিগকে জানাইবে যে, আল্লাহ তায়ালা (সকল মোসলমানদের ন্যায়) তাহাদের উপরও মালের যাকাত ফরজ করিয়াছেন; যাহা তাহাদের (ধনীদের) হইতে উসুল করিয়া গরীবদিগকে দান করা হইবে।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোয়াজ (রাঃ)কে এইরূপ সতর্কও করিয়া দিলেন যে, তাহারা যাকাত দানে স্বীকৃত হইলে খবরদার! কখনও তাহাদের ধন-সম্পত্তির মধ্য হইতে ভাল ভালগুলি বাছিয়া লইও না।

তিনি আরও সতর্ক করিয়া দিলেন যে, (খবরদার! কাহারও প্রতি কোনরূপ জুলুম বা অন্যায়-অত্যাচার করিয়া) মজলুমের বদ দোয়ার ভাগী হইও না। কারণ, মজলুমের (আ···হ্ ও) বদ-দোয়া বিনা বাধায় সরাসরি আল্লার দরবারে তৎক্ষণাৎ পৌঁছিয়া যায়। (সাধারণতঃ ট্যাক্স আদায়কারীগণ জুলুম করিয়া থাকে; সেই জুলুমের কারণেই রাষ্ট্রের এবং জাতির পতন আসে; উহার প্রতিরোধের জন্যই এই সতর্কবাণী।)

৭২৯। হাদীছ:— ان رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم

اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِىْ الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَالَهٗ مَالَهٗ وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَبٌ مَالَهٗ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ

وَتُؤْتِىْ الزَّكٰوةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ۔

অর্থ :—আবু আইউব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন*—(একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ছফরে উষ্ট্রে আরোহিত ছিলেন।) এক ব্যক্তি (জনতার ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া হযরতের উষ্ট্রের লাগাম ধরিয়া বসিল এবং) আরজ করিল, আপনি আমাকে এমন আমল বা কর্ম বলিয়া দেন যাহা করিলে আমি (দোযখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে এবং) বেহেশত লাভ করিতে পারি। ঐ ব্যক্তির কার্য্যক্রমে সকলেই বিরক্তি প্রকাশে বলিতে লাগিল, তাহার কি হইয়াছে? তাহার কি হইয়াছে? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, তোমরা কি বুঝিবে—তাহার কি হইয়াছে? সে ত অতি প্রয়োজনীয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ নিয়া আসিয়াছে। (এই বলিয়া হযরত আকাশের প্রতি তাকাইলেন, অতঃপর প্রশ্নকারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিষয়টি অতি বড়। আমি উত্তর দিতেছি; তুমি মনোযোগের সহিত শুন এবং উপলব্ধি কর।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে চারিটি বিষয় বলিয়া দিলেন।) (১) এক আল্লার এবাদৎ করিবে, কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে তাঁহার (এবাদতের মধ্যে তাঁহার কার্য্যাবলীর মধ্যে বা গুণাবলীর মধ্যে) শরীক বা অংশীদার করিবে না। (২) নামায কায়েম করিবে। (৩) যাকাত আদায় করিবে। (৪) আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং তাহাদের হক রক্ষা করিয়া চলিবে। (এই বলিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এখন আমার উটের লাগাম ছাড়িয়া দাও।)

ব্যাখ্যা :—"আল্লার এবাদৎ করিবে" অর্থাৎ এক আল্লার বন্দেগী করিবে, একমাত্র তাঁহারই গোলামী অবলম্বন করিবে, সর্বদা সর্বাবস্থায় তাঁহার আদেশ-নিষেধসমুহ জীবনের প্রতি স্তরে প্রতিফলিত করিয়া তাঁহার বাধ্যগতরূপে চলিবে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, মানুষের পারলৌকিক পরিত্রাণ দুই স্তরের কার্য্যের উপর নির্ভর করে। প্রথমটি হইল আকিদা অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস ও মুখের বাচনিক আনুগত্য ও স্বীকৃতির স্তর, যাহাকে "ঈমান" বলা হয়; ইহা পরিত্রাণের মূল ভিত্তি। দ্বিতীয়টি হইল আমল বা কর্ম ও জীবন-যাপন পদ্ধতির স্তর। প্রথম স্তরের বিষয়সমুহের বিস্তারিত বিবরণ ঈমানের অধ্যায়ে এবং মোটামুটি বিবরণ ৬৪নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। মোমেন ও মোসলমান মাত্রই এই প্রথম স্তরের বিষয়সমুহের সম্পর্কধারী হইতে হয়; অতঃপর তাহার দ্বিতীয় স্তরে আজীবন বিরামহীন সাধনা করিয়া চলিতে হয়।

আলোচ্য হাদীছে প্রশ্নকারী ব্যক্তির অবস্থা দৃষ্টে প্রথম স্তরের বিষয়বস্তু বর্ণনা করা অনাবশ্যক, কারণ তিনি ইতিপূর্বেই ঈমানের দৌলত হাছিল করিয়াছেন। তাই হযরত (দঃ) এখানে শুধুমাত্র দ্বিতীয় স্তরের কার্য্যাবলী বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাও অতি সংক্ষিপ্তরূপে।

---

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয়বস্তু সমুহ বিভিন্ন রেওয়ায়েতে রহিয়াছে। (ফতহুলবারী দ্রষ্টব্য)

প্রথমতঃ জীবনের প্রতিটি স্তর ও পদক্ষেপকে প্রতি মুহূর্তে সংযত রাখার সুদূর প্রসারী এবং সুগভীর ও বিস্তির্ণ ক্রিয়াবিশিষ্ট একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য বলিলেন যে, কর্ম জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ও প্রতি মুহূর্তে নিজকে এক আল্লার দাস ও গোলামরূপে পরিচালিত করিবে। কোন ব্যক্তি বা শক্তি বা স্বীয় নকছের খাহেস ও প্রবৃত্তির দাসত্ব ও গোলামী করতঃ তাহার বাধ্যতায় চলিয়া বা তাহার পূজা করিয়া আল্লার শরীক সাব্যস্তকারী হইবে না।

অতঃপর নামায, যাকাত আত্মীয়তা রক্ষা এই তিনটি বিষয়কে এক এক প্রকার বিশেষ সতর্ককরণ উদ্দেশ্যে উল্লেখ করিয়াছেন: তাহা এই যে, আল্লার দাসত্ব ও গোলামী শুধু নিয়্যত-এরাদা ও উদ্দেশ্যের পর্য্যায়ে করিলে চলিবে না। অর্থাৎ আল্লার দাসত্ব এইরূপে করিলে চলিবে না যে, কর্ম ও কর্মপন্থা এবং আদর্শ স্বীয় মনগড়ারূপে স্থির করিয়া উহাকে আল্লার দাসত্বের এরাদা ও উদ্দেশ্যযুক্ত করিয়া দিবে—এই পন্থা মোটেই চলিবে না, বরং এরাদা, উদ্দেশ্য, কর্ম এবং কর্মপন্থা ও আদর্শ সর্ব পর্য্যায়েই আল্লার দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং স্বীয় কিতাবে ও স্বীয় প্রতিনিধি বা রসুল মারফত মানবের জন্য আল্লার দাসত্বের প্রতীক স্বরূপ যে সব কার্য্যক্রম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং কর্মপন্থা বাতলাইয়া দিয়াছেন এবং মানব জীবনের জন্য স্বীয় রসুলের মারফৎ যে সব আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন, আল্লার দাসত্বের উদ্দেশ্যে সেই সব কার্য্যক্রমগুলিকে ঐ কর্মপন্থার মাধ্যমে পূর্ণরূপে আদায় করিয়া স্বীয় জীবনকে ঐ আদর্শে পরিচালিত করিতে হইবে; ইহাই হইল প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লার দাসত্ব বা আল্লার এবাদত। ঐ সমস্ত কার্য্যাবলী ও কর্মপন্থা এবং আদর্শ বিভিন্ন বিভাগীয়। কারণ মানুষের জীবন-সম্বন্ধ বিভিন্ন স্তরের; যেমন—পারিবারিক ও সামাজিক এবং ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত বিভাগের মধ্যে আবার দৈহিক-আধ্যাত্মিক এবং আর্থিক-আধ্যাত্মিক। ইহা ছাড়া আরও বহু বিভাগ আছে, কিন্তু এই তিনটি বিভাগ প্রত্যেক মানুষের জীবনেই প্রতি মুহূর্তে উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বিভাগে আবার বিভিন্ন কার্য্যাবলী আছে। এইখানে উদাহরণ স্বরূপ এক একটি উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন ব্যক্তিগত জীবনের দৈহিক-আধ্যাত্মিক পর্য্যায়ের কার্য্যক্রমের মধ্যে নামায। এই পর্য্যায়ের কার্য্যক্রম আরও আছে, যেমন রোযা, জেকের ইত্যাদি। কিন্তু উহাদের মধ্যে নামাযই প্রধান এবং প্রত্যহ বার বার উহা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঁচবার নামায পড়িবে স্বভাবতঃ সে রোযা, ইত্যাদিও পালন করিবে। তাই এই বিভাগের মধ্যে নামাযই উল্লেখযোগ্য। এইরূপে ব্যক্তিগত জীবনের আর্থিক-আধ্যাত্মিক পর্য্যায়ের কার্য্যক্রমের মধ্যে যাকাতকে উল্লেখ করিয়াছেন এবং পারিবারিক ও সামাজিক পর্য্যায়ের কার্য্যক্রমে আত্মীয়বর্গের হক রক্ষা করার আদর্শ উল্লেখ করিয়াছেন।

মূলকথা এই যে, প্রশ্নের উত্তরে পূর্ণ শরীয়ত বর্ণনা করা কখনও সমীচীন বা সংগত নহে, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) এখানে চারটি বিষয়ের মাধ্যমে পূর্ণ শরীয়তের প্রতিই ইঙ্গিত

দিয়াছেন এবং অতি সুন্দররূপে ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রথমতঃ অতি সংক্ষেপে এমন একটি বাক্য বলিয়াছেন যাহার প্রভাব জীবনের প্রতিটি স্তর ও পদক্ষেপকে প্রতি মুহূর্তে সংযত রাখিবে। অতঃপর একটি বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আল্লার দাসত্ব করার একমাত্র অর্থ ও নিয়ম এই যে, তাঁহারই নির্দেশিত কার্য্যাবলী তাঁহারই নির্দ্ধারিত পন্থায় তাঁহারই দাসত্বের উদ্দেশ্যে করিয়া যাইবে এবং তাঁহারই বর্ণিত আদর্শে নিজেকে পরিচালিত করিবে। এসবের সমষ্টির নামই হইল ইসলাম বা শরীয়ত এবং এখানে যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ঐ শরীয়ত বা ইসলামের বিস্তীর্ণ কার্য্য-বিভাগ সমূহের এক একটি উদাহরণ মাত্র। অতএব বেহেশত লাভের আকাঙ্খাপূরণ মাত্র উল্লিখিত তিনটি কার্য্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা অজ্ঞতা বই আর কিছুই নহে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—অধুনা কোন কোন লোককে অজ্ঞতা বা ভ্রান্তধারণা বশতঃ এরূপ উক্তি করিতে শুনা যায় যে, তৌহীদ—একত্ববাদ এবং এক আল্লার উপাসনা মানবের নাজাত ও পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট। হযরত মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর ঈমান আনার কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। কেহ কেহ আরও পরিষ্কার সুরে বলিয়া ফেলে যে, পরকালে পরিত্রাণ বা ভাল কর্মের ভাল ফল পাইবার জন্য ইসলাম ধর্মের কোনই বাধ্য-বাধকতা নাই, বরং যে কোন ধর্মে বা অবস্থায় থাকিয়া আল্লার উপাসনা আরাধনা করিলে পরকালে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে এবং ভাল কাজ করিলে বেহেশত লাভ করা যাইবে।

মোসলমান ভাইগণ! সাবধান ও সতর্ক থাকিবেন—এইরূপ মতবাদ ও বিশ্বাস পোষণ স্পষ্ট কুফুরী। এইরূপ মতবাদ পোষণকারী নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি এবং হাজার এবাদত-বন্দেগী করিলেও তাহার জীবনের সমস্ত নেক আমল ঐ একটি মাত্র ভুল মতবাদের দরুন ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, যেরূপ স্তুপীকৃত ছন ও খড়-কুটা একটি মাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া যায়। ফলে তাহার চিরজাহান্নামী নরকবাসী হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

বিধর্মী অমোসলেম কাফেররা অবশ্য ঐরূপ আকিদাধারী হইয়া থাকে, নতুবা কাফের থাকিবে কেন? কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, কোরআন ও হাদীছের প্রতি বিশ্বাসী মোসলমান হওয়ার দাবীদার কোন কোন মানুষও ঐরূপ উক্তি করিয়া ফেলে। সেজন্য মোসলমানদের সাবধান ও সতর্ক থাকা কর্তব্য।

এ বিষয়ে যুক্তির দিক দিয়া সংক্ষেপে এতটুকু বলা যথেষ্ট যে, চৌদ্দশত বৎসরকাল হইতে স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত আছে যে, কোরআন শরীফ আল্লার কালাম তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেরিত আল্লার বাণী কিতাব ও ফরমান এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমগ্র বিশ্বের প্রতি প্রেরিত আল্লার রসূল ও প্রতিনিধি। বিশ্বের বুকে আল্লার প্রেরিত ও নিয়োজিত এই মহান ব্যক্তি ও মহাবাণীর আবির্ভাবকালে

বিশ্ববাসীর প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ—বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক, ধার্মিক-অধার্মিক, সবল-দুর্বল, বড়-ছোট, রাজা-প্রজা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কায়দা কৌশলে উক্ত দাবীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার চেষ্টাই করিয়াছে, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী আছে, কেহই উহাকে বানচাল করিতে সক্ষম হয় নাই। উক্ত দাবীদ্বয়ের প্রামাণ্যতা অটুট ও অক্ষুন্ন রাখার যথেষ্ট প্রমাণ সর্বদার জন্যও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত থাকিবে। মোসলেম সমাজ ঐ দাবীদ্বয়ে সর্বপ্রকার তর্কের প্রতিউত্তর দানে সর্বদা প্রস্তুত ; সুতরাং উল্লেখিত বিষয় ও দাবীদ্বয় স্থিরীকৃত ও অবধারিত।

অতঃপর ইহাও অতি সুস্পষ্ট যে, কাহাকেও স্বীয় মনীব স্বীকার করিয়া তাঁহার ফরমান ও প্রতিনিধিকে অস্বীকার করিলে সেই মনীবের সন্তুষ্টিভাজন হওয়া এবং তাঁহার নিকট পুরস্কৃত হওয়াকে কোন যুক্তিই সমর্থন করে না।

যুক্তির দিক দিয়া আর অধিক কিছু না বলিয়া মুসলমান সমাজকে সতর্ক রাখার জন্য তাহাদের প্রাণ-বস্তু কোরআন ও ছহীহ্ হাদীছের আলোতে নিম্নলিখিত কতিপয় মোটামুটি বিষয় প্রমাণিত করা হইতেছে। যদ্দারা পূর্বোল্লিখিত ভ্রষ্টতাপূর্ণ মতবাদের অসাড়তা উজ্জ্বলাকারে প্রতীয়মান হইবে।

(১) কাফের ব্যক্তির জন্য কস্মিনকালেও পরকালের মুক্তি ও পরিত্রাণ নাই। কাফের হওয়ার অপরাধ ও পাপে সে অনন্তকাল আজাব ভোগ করিবে।

(২) যে ব্যক্তিই হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর ঈমান না আনিবে সে অনিবার্য্যতঃ কাফের পরিগণিত হইবে এবং অনন্তকালের জন্য নরকবাসী হইয়া আজাব ভোগ করিবে।

(৩) যে কোন ব্যক্তি কোরআন শরীফের উপর ঈমান না আনিবে সে কাফের হইবে এবং চিরকাল দোযখের আজাব ভোগ করিবে।

(৪) একমাত্র মোমেনের জন্যই পরকালের মুক্তি ও পরিত্রাণ এবং একমাত্র ইসলাম ধর্মই আল্লাহ তায়ালার নিকট মনোনীত এবং পছন্দনীয় ও গ্রহণীয় ধর্ম ; অন্য কোন ধর্মই আল্লার নিকট গ্রহণীয় নহে।

(৫) মোমেন বা মুসলমান পরিগণিত হওয়ার জন্য রসুল ও কোরআন উভয়ের প্রতি, বরং আরও কতিপয় বস্তুর প্রতি ঈমান ও স্বীকারোক্তি আবশ্যক।

(৬) যে কোন নেক আমল তথা ভাল কর্ম আল্লার নিকট গ্রহণীয় অর্থাৎ পরকালে বেহেশতের নেয়ামত-লাভ ও পরিত্রাণের সূত্র হওয়ার জন্য ঐ আমলকারী ব্যক্তির মোমেন মোসলমান হওয়া আবশ্যক।

(৭) কাফের ব্যক্তির ভাল কর্ম পরকালীন মুক্তির ব্যাপারে একেবারেই নিস্ফল প্রতিপন্ন হইবে। এমনকি ছওয়াব ও পূণ্যের উদ্দেশ্যে যত ধন-দৌলতই খরচ করুক পরকালের মুক্তি ও পরিত্রাণে সে উহার কোনই সুফল পাইবে না।

এইসব সত্য ও তথ্য স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা মুক্তিদাতা ও প্রতিফল দানের মালিক আল্লাহ তায়ালার নির্দ্ধারিত আইনের সুস্পষ্ট ধারা। এই ধারাসমূহ কোরআন শরীফের বহু সংখ্যক আয়াত ও অনেক অনেক হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ প্রত্যেকটি ধারার সহিত কতিপয় প্রমাণ উল্লেখ করা হইবে।

১। কাফেররা চিরজাহান্নামী তাহাদের পরিত্রাণ ও মুক্তি নাই :

(১) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا. لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ.

অর্থ :—নিশ্চয় জানিও, যাহারা মৃত্যু পর্য্যন্ত কাফের রহিয়াছে তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ থাকিবে এবং সমস্ত ফেরেশতা ও সমস্ত লোকদের পক্ষ হইতেও অভিশাপের পাত্র তাহারা হইবে। সেই অভিশাপের (আজাবের) মধ্যে তাহারা চিরকাল থাকিবে ; মুহূর্তের জন্যও তাহাদের আজাব বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হইবে না এবং তাহাদিগকে একটুও অবকাশ দেওয়া হইবে না। (২ পাঃ ৩ রুঃ)

(২) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ. هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

অর্থ :—যাহারা কাফের তাহাদের বন্ধু হয় শয়তান ; শয়তানের দল তাহাদিগকে (ঈমানের) আলো হইতে (কুফুরীর) অন্ধকারের দিকে নিয়া যায় ; তাহারা নরকবাসী ; চিরকাল তাহারা সেই নরকেই থাকিবে। (৩পাঃ ২ রুঃ)

(৩) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ.

অর্থ :—কাফেরদের ধন-জন তাহাদিগকে আল্লার আজাব হইতে বাচাইবার জন্য বিন্দুমাত্র সাহায্য করিতে পারিবে না এবং তাহারা দোজখের জ্বালানী হইয়া থাকিবে। (৩ পাঃ ১০ রুঃ)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ (৪)
ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.

অর্থ:--যাহারা কাফের এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যু হইয়াছে তাহাদের এক একজন জগৎভর্তি স্বর্ণও যদি মুক্তি পাইবার জন্য আল্লার রাস্তায় খরচ করে তাহাও গ্রহণ করা হইবে না। তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তাহাদের জন্য কোন সহায়তাকারী থাকিবে না। (৩ পা: ১৭ রু:)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا (৫)
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

অর্থ:--নিশ্চয় যাহারা কাফের তাহাদের ধন-জন আল্লার আজাব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে বিন্দুমাত্র সাহায্য করিবে না এবং তাহারা নরকবাসী হইবে, তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। (৪ পা: ৩ রু:)।

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا. (৬)
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

অর্থ:—নিশ্চয় যাহারা ঈমানের পরিবর্তে কুফুরী অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের (লক্ষ-কোটি কাফেরী-শেরেকী) কার্য্য-কলাপে আল্লার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবে না, পরন্তু তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (৪ পা: ৯ রু:)

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ. (৭)
ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ. وَبِئْسَ الْمِهَادُ.

অর্থ:---শহরে-বন্দরে কাফেরদিগকে (জাকজমকের সহিত) চলাফেরা করিতে দেখিয়া ধোকা খাইও না; ইহা অতি সল্পকালীন সুখ, অতঃপর তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান হইবে জাহান্নাম, উহা অতি কষ্টের বাসস্থান। (৪ পা: ১১ রু:)

(৮) وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.

অর্থ:—আমি কাফেরদের জন্য ভীষণ অপমানজনক শাস্তি ও আজাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। (৫ পাঃ ৩ রুঃ)

(৯) اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۔

অর্থ:—আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদের জন্য ভীষণ অপমানজনক শাস্তি ও আজাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। (৫ পাঃ ১২ রুঃ)

(১০) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ۔

اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۔

অর্থ:—যাহারা কুফরীর ন্যায় অন্যায় করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদের জন্য ক্ষমাকারী হইবেন না এবং জাহান্নামের পথ ব্যতীত অন্য পথ তাহাদিগকে দিবেন না। জাহান্নামের মধ্যেই তাহারা চিরকাল অনন্তকাল থাকিবে। (৬ পাঃ ৩ রুঃ)

(১১) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ

لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۔

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۔

অর্থ:—কাফের ব্যক্তিরা যদি সমস্ত জগৎবাসী ধন-সম্পত্তির দ্বিগুণের মালিকও হয় এবং উহা খরচ করিয়া পরকালের আজাব হইতে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে তাহাদের সেই চেষ্টাও বৃথা হইবে। তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। তাহারা দোযখ হইতে বাহির হওয়ার জন্য লালায়িত থাকিবে, কিন্তু কিছুতেই বাহির হইতে পারিবে না। তাহাদের জন্য এমন আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে যাহার সমাপ্তি নাই। (৬ পাঃ ১০ রুঃ)

(১২) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ۔

অর্থ:—যাহারা কাফের তাহাদিগকে জাহান্নামের দিকে হাকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। (৯ পাঃ ১৮ রুঃ)

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ ۔ (১৩)

অর্থ :—কাফেররা জাহান্নামের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবে। (১০ পা: ১৩ রু:)

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۔ (১৪)

অর্থ :—আমি কাফেরদিগকে সল্পকালের জন্য ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুযোগ-সুবিধা দান করিব, অতঃপর তাহাদিগকে ভীষণ কষ্টদায়ক আজাবের মধ্যে পতিত হইতে বাধ্য করিব। (২১পা: ১২রু:)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۔ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ (১৫)

مِّنْ عَذَابِهَا ۔ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ۔

অর্থ :—কাফেরদের জন্য জাহান্নামের অগ্নি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। তথায় তাহাদিগকে মরিতে দেওয়া হইবে না—মৃত্যুকে অনুমতি দেওয়া হইবে না তাহাদেরে স্পর্শ করিতে, সুতরাং মৃত্যু তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং জাহান্নামের আজাব তাহাদের উপর বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হইবে না। প্রত্যেক কাফেরকেই আমি এইরূপ প্রতিফল দান করিব। (২২ পা: ১৬ রু:)

وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ (১৬)

অর্থ :—কাফেরদের প্রতি তোমার প্রভু প্রবর্তিত বিশেষ নির্দেশ (Ruling) ইহাই যে, তাহারা নরকবাসী। (২৪ পা: ৬ রু:)

وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ (১৭)

অর্থ :—কাফেরদের জন্য ভীষণ আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (২৫ পা: ৪রু:)

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيٰتِكُمُ (১৮)

الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ

فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ۔

অর্থ :—কাফেরদিগকে দোযখের সন্নিকটে দাঁড় করাইয়া বলা হইবে, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে বহু উৎকৃষ্ট বস্তু সমূহের মজা উড়াইয়াছ এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ

করিয়াছ। এখন তোমাদিগকে প্রতিফল স্বরূপ অপমানজনক আজাব ভোগ করিতে হইবে যেহেতু তোমরা দুনিয়াতে অনধিকাররূপে অহংকারে মত্ত হইয়া (সত্য ধর্ম হইতে) ঘাড় মোড়াইয়াছিলে এবং (আমার নির্দ্ধারিত) সীমা লঙ্ঘন করিতেছিলে। (২৬ পাঃ ২ রুঃ)

(১৯) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ

الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ـ

অর্থ:—যাহারা কাফের তাহারা (হয়ত দুনিয়াতে কিছু) সুখ ভোগ করিবে এবং চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় পানাহার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, কিন্তু শেষ ঠিকানা ও বাসস্থানরূপে দোযখই তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত। (২৬ পাঃ ৬ রুঃ)

(২০) اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ـ

অর্থ:—কাফেরদের জন্য আমি অসংখ্য শিকল, গলাবদ্ধ এবং প্রজ্জলিত ভীষণ অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। (২৯ পাঃ ১৯ রুঃ)

২। রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর উপর ঈমান না আনিলে?

(১) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا

وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ـ

অর্থ:—যাহারা আল্লার নাফরমানী করিবে এবং আল্লার রসুলের নাফরমানী করিবে এবং আল্লার নির্দ্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করিবে আল্লাহ তাহাদিগকে জাহান্নামে দাখেল করিবেন। তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে এবং তাহাদের জন্য ভীষণ অপমানজনক শাস্তি ও আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (৪ পাঃ ১৩ রুঃ)

(২) وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ

الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ـ

অর্থ:—যে ব্যক্তি রসুলের বরখেলাফ চলিবে—হেদায়েতের পথ তাহার সম্মুখে উজ্জল হওয়ার পরে, অর্থাৎ মোমেনদের পথ ভিন্ন অন্য কোন পথ অবলম্বন করিবে। (পরীক্ষা ক্ষেত্র দুনিয়াতে) আমি তাহার জন্য তাহার অবলম্বিত পথে বাধার সৃষ্টি করিব না, কিন্তু (ফল ভোগের সময় পরকালে) তাহাকে জাহান্নামে পৌঁছাইব। (৫ পাঃ ১৪ রুঃ)

আয়াতটি কত স্পষ্ট ও বিস্তারিত।

(৩) وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا۔

অর্থ:—যাহারা আল্লার সঙ্গে কুফরী করিবে, তাঁহার ফেরেশতাদের সম্বন্ধে কুফরী করিবে, তাঁহার কিতাবসমূহ সম্বন্ধে কুফরী করিবে, তাঁহার রসুলগণ সম্বন্ধে কুফরী করিবে পরকালের দিন সম্বন্ধে কুফরী করিবে নিশ্চয় তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া সত্য পথ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। (৫ পাঃ ১৭ রুঃ)

(৪) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ

وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ

ذٰلِكَ سَبِيْلًا۔ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا۔ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا۔

অর্থ:—যাহারা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলগণের সঙ্গে কুফরী করে এবং চায় যে, আল্লার মধ্যে এবং তাঁহার রসুলগণের মধ্যে (ঈমানের ব্যাপারে) পার্থক্য প্রবর্তন করে এবং এইরূপ উক্তি করে যে, আমরা কতেকের উপর (যেমন আল্লার উপর) ঈমান রাখি এবং কতেকের উপর (যেমন, রসুলের উপর) ঈমান রাখি না এবং এইরূপে (কাটছাট করিয়া কতেক বাদ দিয়া কতেক রাখিয়া) মাঝামাঝি রাস্তা অবলম্বন করার অভিপ্রায় রাখে তাহারা নিঃসন্দেহে কাফের। এই সব কাফেরদের জন্য আমি এমন আজাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি যেই আজাবে তাহারা চিরকাল লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে থাকিবে। (৬ পারা ১ রুকু)

(৫) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ۔

وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ……

অর্থ:—হে মানব! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার পক্ষ হইতে সত্য (ধর্ম) নিয়া তাঁহার রসুল তথা তাঁহার প্রতিনিধি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়াছেন। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, তোমরা (সেই রসুলকে এবং তিনি যে সত্য ধর্ম নিয়া আসিয়াছেন উহাকে) মানিয়া ও

গ্রহণ করিয়া লও। তাহাতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। আর যদি তোমরা তাঁহাকে অমান্য ও অগ্রাহ্য কর তবে তাহা হইবে কুফরী। কুফরী করিলে স্মরণ রাখিও, (আল্লার শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই। কারণ,) জমিন-আসমানের মালিক আল্লাহ; এবং আল্লাহ সব কিছু জানেন। (কে কোথায়, কবে কুফরী করিয়াছে সব তিনি অবগত। অবশ্য হয়ত শাস্তি-বিধান যখন তখন করেন না বা অন্য কাহারও মতামত অনুযায়ী করেন না; যেহেতু তিনি) সর্বাদিক বুদ্ধিমান (তাই অন্যের প্রভাবে তিনি শাস্তি-বিধান করেন না। তিনি যে নিয়ম ও সময় নির্দ্ধারিত রাখিয়াছেন সেই অনুসারে শাস্তি দিবেন।) (৬ পারা ৩ রুকু)

(৬) وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۔ ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ

وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ۔

অর্থ:—যে ব্যক্তি আল্লার বরখেলাফ চলিবে এবং আল্লার রসুলের বরখেলাফ চলিবে (তাহার জন্য) আল্লাহ ভীষণ শাস্তিদাতা। (শাস্তি ভোগে বাধ্য করার সময় তিরস্কার স্বরূপ ঐ শ্রেণীর লোকদেরে বলা হইবে,) এই শাস্তি ভোগ করিতে থাক এবং জানিয়া রাখ, (তোমাদের ন্যায়) কাফেরদের জন্য দোযখের আজাবই নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (৯ পাঃ ১৬ রুঃ)

(৭) اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا

অর্থ:—তাহারা কি জানে না যে, যে কেহই আল্লার বরখেলাফ চলিবে এবং তাঁহার রসুলের বরখেলাফ চলিবে তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, অনন্তকাল সে সেই জাহান্নামের আগুনে থাকিবে। (১০ পাঃ ১৭ রুঃ)

(৮) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ۔

অর্থ:—ঐ দিনকে স্মরণ কর, যে দিন অত্যাচারী কাফের স্বীয় কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইয়া নিজের হাত কামড়াইতে থাকিবে এবং বলিবে, আ…হ! যদি আমি রসুলের সঙ্গে থাকার পথ অবলম্বন করিতাম! (১৯ পাঃ ১ রুঃ)

(৯) اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۔ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۔

لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۔ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ

اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ۔

অর্থ:—আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদের প্রতি অভিশাপের ঘোষণা জারী করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য ভীষণ প্রজ্জলিত অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা চিরকাল অনন্তকাল উহার মধ্যে থাকিবে। সেখানে তাহারা কোন পক্ষ সমর্থনকারী বা সাহায্যকারী পাইবে না। যে দিন দোযখের মধ্যে তাহাদের চতুষ্পার্শ্ব অগ্নি দগ্ধ করা হইবে, সে দিন তাহারা অনুতপ্ত হইয়া বলিবে, আ হ! যদি আমরা আল্লার ফরমাবরদারী-বশ্যতা স্বীকার করিতাম এবং রসুলের ফরমাবরদারী করিতাম! (২২ পা: ৫ রুঃ)

إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ـ (১০)

অর্থ:—যুগে যুগে কাফেরদের অবস্থা একই রূপ হইয়াছে—তাহারা সকলেই রসুলের সত্যতা অস্বীকার করিয়াছিল, ফলে তাহাদের উপর আজাব ও শাস্তি প্রবর্তিত হইয়াছে। (২৩ পা: ১০ রুঃ)

(১১) وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ـ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ
أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيٰتِ
رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ـ قَالُوا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ
الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِينَ ـ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا ـ فَبِئْسَ
مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ـ

অর্থ:—কাফেরদিগকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকাইয়া নেওয়া হইবে। তাহারা জাহান্নামের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে পর উহার দরওয়াজা খোলা হইবে এবং জাহান্নামের কার্য্যপরিচালকগণ তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিবেন, তোমাদের নিকট তোমাদেরই স্বজাতি (মানুষ) রসুলরূপে আসিয়াছিলেন না কি? তাঁহারা তোমাদিগকে তোমাদের প্রভুর (কিতাবের) আয়াত সমূহ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন না কি? এবং তোমাদের সম্মুখে এই দিনটি উপস্থিত হইবে বলিয়া তোমাদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন না কি? তাহারা উত্তর করিবে—হাঁ, আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আল্লার আজাবের আইন (আমাদের ন্যায় বদ-নছীব) কাফেরদের উপর প্রয়োগ হওয়ার ছিল তাহা হইয়াছে।

অতঃপর তাহাদের প্রতি আদেশ জারী হইবে যে, দোযখের ফটক সমূহে প্রবেশ কর, তোমাদের দোযখেই থাকিতে হইবে। (রসুলের প্রচারিত সত্য ধর্ম হইতে) অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী অহংকারীদের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান; জাহান্নাম অত্যন্ত খারাপ এবং কষ্টের স্থান। (২৪ পাঃ ৫ রুঃ)

(১২) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۔

وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۔

অর্থ—যে ব্যক্তি আল্লার ফরমাবরদারী করিবে, আল্লার রসুলের ফরমাবরদারী করিবে আল্লাহ তাহাকে জান্নাতে পৌঁছাইবেন, সেখানে আরামের জন্য নদী ও নহর সমূহ প্রবাহিত থাকিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঐ ফরমাবরদারী হইতে বিরত থাকিবে তাহাকে আল্লাহ তায়ালা কষ্টদায়ক আজাব দিবেন। (২৬ পাঃ ১০ রুঃ)

(১৩) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا

অর্থঃ—যাহারা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিবে এবং তাঁহার রসুলের নাফরমানী করিবে তাহাদের জন্য জাহান্নামের অগ্নি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, সেখানে তাহারা চিরকাল অনন্তকাল থাকিবে। (২৯ পাঃ ১২ রুঃ)

* মোসলেম শরীফের ৮৬ পৃষ্ঠায় একটি হাদীছ আছে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যেই আল্লার হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার যুগের বিশ্বমানবের যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত এমনকি ইহুদ ও নাছারা (যাহারা আল্লাহ-প্রেরিত ধর্ম আল্লার রসুল ও কিতাবের অনুসারী বলিয়া দাবী করিয়া থাকে) তাহাদের মধ্যে হইতেও যে কোন ব্যক্তি আমার আবির্ভাবের সংবাদ অবগত হইয়া আমার আনীত দীন ও ধর্মের প্রতি ঈমান না আনিয়া মৃত্যুবরণ করিবে সে অনিবার্য্যরূপে দোযখী হইবে।

৩। পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান না আনিলে?

(১) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

অর্থঃ—যাহারা আল্লার (কোরআনের) আয়াতসমূহকে স্বীকার না করিবে তাহাদের জন্য ভীষণ আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (৩ পাঃ ৯ রুঃ)

(২) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ

بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ۔

অর্থ :—যাহারা (কোরআনের) আয়াতসমূহকে স্বীকার করিবে না অচিরেই আমি তাহাদিগকে দোযখের আগুনে ঢুকাইব। যতবার তাহাদের চর্ম দগ্ধ হইয়া পাকিয়া যাইবে—পাকিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার পরিবর্তে নূতন চামড়া আমি বদলাইয়া দিব। এইরূপ এই জন্য করা হইবে, যাহাতে তাহারা আজাবের কষ্ট ভালরূপে ভুগিতে থাকে। (৫ পাঃ ৫ রুঃ)

(৩) وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ـ

অর্থ :—আল্লাহ্ (পবিত্র কোরআনে) যাহা কিছু অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা বিচার-বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিবে তাহারা নিশ্চিতরূপে কাফের। (৬ পাঃ ১১ রুঃ)

(৪) فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ـ سَنَجْزِى الَّذِيْنَ

يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ـ

অর্থ :—যাহারা আল্লার (কোরআনের) আয়াতসমূহকে স্বীকার করে না এবং উহা হইতে ফিরিয়া থাকে তাহাদের চেয়ে বড় অন্যায়কারী আর কেহ নাই, তাহাদের চেয়ে বড় জালেম আর কেহ নাই। যাহারা আমার (কোরআনের) আয়াত সমূহ হইতে ফিরিয়া থাকিবে তাহাদিগকে আমি তাহাদের এই ফিরিয়া থাকার দরুণ প্রতিফল স্বরূপ কঠিন আজাব ভোগাইব। (৮ পাঃ ৭ রুঃ)

(৫) وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ

অর্থ :—যে কোন দলের লোক কোরআনকে না মানিবে তাহাদের জন্য দোযখ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (১২ পাঃ ২ রুঃ)

(৬) اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অর্থ :—যাহারা আল্লার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান না আনিবে এবং উহাকে স্বীকার না করিবে আল্লাহ্ তাহাদিগকে হেদায়েত দান করিবেন না, অর্থাৎ অনিবার্য্যতঃ তাহারা পথ-ভ্রষ্ট থাকিয়া যাইবে এবং তাহাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি ও আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (১৪ পাঃ ২০ রুঃ)

(৭) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْٓ

اُذُنَيْهِ وَقْرًا ـ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

অর্থ :—যখন তাহাকে আমার কোরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনান হয় তখন সে উহা গ্রহণ না করিয়া উহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্বক এইরূপ পাশ কাটিয়া চলিয়া যায় যেন সে উহা শুনেই নাই, যেন তাহার কানের মধ্যে ডাট পুরিয়া রাখা হইয়াছে। (এই ধরণের লোক যাহারা) তাহাদিগকে ভীষণ কষ্টদায়ক আজাবের সংবাদ শুনাইয়া দিন। (২১ পাঃ ১০ রুঃ)

(৮) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ـ

"যাহারা স্বীয় প্রভুর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিবে তাহাদের জন্য ঘৃণিত ও ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে।" (২২ পাঃ ৭ রুঃ)

(৯) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ

অর্থ :—যাহারা আমার কোরআনের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে এবং উহাকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহারা দোযখী। (২৭ পাঃ ১৮ রুঃ)

(১০) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

অর্থ :—যাহারা আমার (কোরআনের) আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে এবং উহাকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহারা দোযখী হইবে, চিরকাল তাহারা দোযখে থাকিবে। (২৮ পাঃ ১৫ রুঃ)

বিশেষ লক্ষ্যণীয় : প্রথম শিরোনাম—"কাফেররা চিরজাহান্নামী তাহাদের পরিত্রাণ ও মুক্তি নাই" ইহার প্রমাণে ২০টি আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, দ্বিতীয় শিরোনামের ১৩টি আয়াত, তৃতীয় শিরোনামের ৯টি আয়াত এবং চতুর্থ শিরোনামের ২নং আয়াতও প্রথম শিরোনামের বিষয়বস্তুর সুস্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং "কাফেররা চিরজাহান্নামী তাহাদের নাজাত ও মুক্তি নাই" এই সত্যের পক্ষে মোট ৪৩টি আয়াত পবিত্র কোরআন শরীফে বিদ্যমান আছে।

৪। মোমেনদের জন্যই মুক্তি—একমাত্র ইসলাম ধর্ম্ই আল্লার নিকট গ্রহণীয়।

(১) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

অর্থ :—যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক কাজ করিয়াছে একমাত্র তাহারাই বেহেশতবাসী, তাহারা চিরকাল সেখানে থাকিবে। (১ পাঃ ৯ রুঃ)

(২) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ - وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ -

অর্থ :—যাহারা কাফের তাহাদের জন্য ভীষণ আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমলসমূহ সম্পাদন করিয়াছে একমাত্র তাহাদের জন্যই রহিয়াছে ক্ষমা এবং অতি বড় পুরস্কার। (২২ পাঃ ১৩ রুঃ)

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ - (৩)

"ইহা নিশ্চিত যে, আল্লার নিকট গ্রহণীয় ধর্ম একমাত্র ইসলাম।" (৩ পাঃ ১০ রুঃ)

(৪) وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ - وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ

مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

অর্থ :—যে কোন ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন—ধর্ম অবলম্বন করিবে তাহার সেই অবলম্বিত ধর্ম কস্মিনকালেও গ্রহণীয় হইবে না এবং সে পরকালে সর্বহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। (৩ পাঃ ১৭ রুঃ)

বোখারী শরীফ ৪৩১ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস উল্লেখ আছে—বেলাল (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশক্রমে ঢোল-শোহরতের সহিত এই ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন যে, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا نَفْسٌ مُّسْلِمَةٌ

"ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মোসলমান হইয়াছে—কেবলমাত্র সেই মোসলমান ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহই বেহেশতে যাইতে পারিবে না।"

মোসলেম শরীফে ৫৪ পৃষ্ঠায় একটি হাদীছ আছে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا

অর্থ :—যে আল্লার হাতে আমার জান তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, মোমেন না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা বেহেশতে যাইতে পারিবে না।

৫। মোমেন ও মোসলমান হওয়ার জন্য কি কি আবশ্যক?

(১) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ

الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

অর্থঃ—হে ঈমানের দাবীদারগণ! তোমাদিগকে ঈমান আনিতে হইবে আল্লার প্রতি, আল্লার রসুলের প্রতি এবং ঐ কেতাবের প্রতি যে কেতাব আল্লাহ স্বীয় রসুলের উপর নাযেল করিয়াছেন। (৫ পাঃ ১৭ রুঃ)

(২) اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ ... فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ

وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۔

অর্থঃ যাহারা রসুলে-উম্মীর প্রতি ঈমান আনিবে এবং তাঁহার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিবে এবং তাঁহার সহযোগিতা করিবে এবং ঐ আলোর অনুসরণ করিবে যে, আলো তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে; একমাত্র তাহারাই মুক্তি এবং জীবনের সফলতা লাভ করিবে (আলো অর্থাৎ কোরআন)। (৯ পাঃ ৯ রুঃ)

আলোচ্য ৫নং বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ বোখারী শরীফ ১ম খণ্ডে ৪৬ নং হাদীছে বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীছের মধ্যে স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিব্রাঈল ফেরেশতা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ঈমান ও ইসলামের বিবরণ দান করিয়াছেন। উক্ত হাদীছকে হাদীছে-জিব্রাঈল বলা হয়। বোখারী শরীফ মোসলেম শরীফ প্রত্যেক কিতাবেই ঐ হাদীছখানা বর্ণিত আছে।

৬। যে কোন আমল আল্লার নিকট গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ

অর্থঃ—যে কোন ব্যক্তি যে কোন ভাল কাজ—নেক আমল করিবে, যদি সে মোমেন হয় তবেই তাহার সেই সৎ কার্য্যগুলি গ্রহণযোগ্য হইবে এবং তাহার সে সাধনা বৃথা যাইবে না এবং আমি তাহা লিখিয়া রাখিব। (১৭ পাঃ ৭ রুঃ)

৭। কাফের ব্যক্তির ভাল কর্ম আখেরাতে নিস্ফল হইবে।

(১) مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ

حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

অর্থঃ—কাফেরগণ (পুণ্য ও পরকালের ভাল প্রতিদানের আশায়) ইহকালীন জীবনে যাহা কিছু দান-খয়রাত করিয়া থাকে (তাহাদের কাফের হওয়ার দরুণ ঐ দান-খয়রাত পরকালে নিস্ফল ও বরবাদ প্রতিপন্ন হওয়ার ব্যাপারে) উহার অবস্থা ঐ ফসলে পরিপূর্ণ

জমীনের ন্যায় যাহার মালিক কাফের এবং ঐ জমীনের **উপর** ভীষণ হীমবায়ু প্রবাহিত হওয়ায় বরফ জমিয়া সমুদয় ফসল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। (কাফেরদের দান-খয়রাতের এই পরিণতি সংক্রান্তে) আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি অন্যায় বা জুলুম করেন নাই, বরং তাহারাই নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছে---নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করিয়াছে। (৪ পাঃ ৩ রুঃ)

পাঠকবর্গ! কি উজ্জল দৃষ্টান্ত! ফসলে পরিপূর্ণ জমীনের সমুদয় ফসল বরফ-বায়ুর দরুণ নষ্ট হইয়া যায়; উহা হইতে একটি দানাও লাভ করার সুযোগ পাওয়া যায় না। তদ্রূপ কাফের ব্যক্তির সমুদয় দান-খয়রাত তাহার কাফের হওয়ার দরুণ নষ্ট ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইবে।

দৃষ্টান্তের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত ফসলের জমীর মালিক কাফের উল্লেখ করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু মোসলমানগণ আপদে-বিপদে ছওয়াব ও পুণ্য লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং কোন মোসলমান ব্যক্তির জমীর ফসল নষ্ট হইলে দুনিয়ার দিক দিয়া যদিও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই ফসল জন্মাইতে তাহার শ্রম ও তাহার চেষ্টাসমূহ নিষ্ফল হয়, কিন্তু পরকালে সে এই ক্ষতির প্রতিদানে ছওয়াব লাভ করিবে। পক্ষান্তরে কোন কাফের ব্যক্তির জমীর ফসল নষ্ট হইয়া গেলে সে ঐরূপ প্রতিদানের উপযুক্ত নয় বলিয়া ঐ ফসল জন্মাইতে তাহার যত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহার সমুদয় পরিশ্রম ও চেষ্টা সর্বদিক দিয়াই বৃথা ও নিষ্ফল হইয়া যায়---দুনিয়া ও আখেরাত উভয় দিক দিয়া। অতএব, কাফেরদের দান-খয়রাত পরকালে সম্পূর্ণরূপে বৃথা নিষ্ফল প্রতিপন্ন হওয়া বুঝাইবার জন্য উল্লিখিত দৃষ্টান্তে জমির মালিক কাফের বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা কাফেরদের দান-খয়রাত বৃথা ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন করিয়া স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—"(তাহাদের দান-খয়রাত বৃথা ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি কোন অন্যায় করেন নাই, বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করিয়াছে।" (যেহেতু তাহারা দান-খয়রাত ইত্যাদি আমল আল্লার নিকট গ্রহণীয় হওয়ার অন্যতম শর্ত ঈমান অবলম্বন করে নাই।)

(২) وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ -

অর্থ:---যে ব্যক্তি ঈমানকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করিবে তাহার সমুদয় আমল ও নেক কার্য্য বরবাদ হইয়া যাইবে এবং সে পরকালে সর্বহারা ক্ষতিগ্রস্তদের শ্রেণীভুক্ত হইবে। (৬ পাঃ ৫ রুঃ)

(৩) مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي
يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ -

অর্থ :—যাহারা স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারকে অস্বীকার করিয়া কাফের হইয়াছে তাহাদের সমুদয় আমল এবং সৎকাজ সমূহের অবস্থা এইরূপ, যেমন—কতগুলি ছাই-ভস্ম যাহার উপর প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। (এমতাবস্থায় যেরূপ ঐ ছাই-ভস্মের অণু-পরমাণুগুলি কোথাও কাহারও হাতে আসিতে পারে না, তদ্রূপ) কাফের স্বীয় কৃতকর্মের সুফল লাভ করার কোন সুযোগই পাইবে না। (১৩ পাঃ ১৫ রুঃ)

(৪) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً

অর্থ :—কাফেরদের কৃতকর্মসমূহ মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়; যাহাকে তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি দূর হইতে পানি মনে করে, কিন্তু দৌড়িয়া সেখানে উপস্থিত হইলে তখন উপলব্ধি করিতে পারে যে, ইহা পানি নয় যাহা পান করিয়া সে প্রাণ রক্ষা করিবে, বরং ইহা সেই মরুভূমির ভীষণ উত্তাপ—যাহা তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়। (তদ্রূপ কাফের ব্যক্তি এই জগতে অনেক কার্য্য এরূপ করিয়া থাকে যাহাকে সে নিজের জন্য পরকালে সুফল প্রদায়ক মনে করে, কিন্তু পরকালে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইয়া সে দেখিতে পাইবে যে, উহা তাহার জন্য কোন প্রকার সুফল প্রদায়কই নয়, বরং সেই কঠিন সময়ে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত তথা চির-আজাবের সম্মুখীন হইবে।) (১৮ পাঃ ১১ রুঃ)

(৫) وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا

অর্থ :—আল্লাহ বলেন— (কাফেররা যাহা কিছু আমল তথা ভাল কর্ম করে উহা আমার নিকট গ্রহণীয় নয় বলিয়া) আমি তাহাদের আমল বা ভাল কর্মসমূহকে ধুলা-বালুর অণু-কণার ন্যায় বিলীন করিয়া দিব—ধর্তব্যের আওতা হইতে বাদ দিয়া দিব; (উহার উপর প্রতিফল দানের প্রশ্নই উঠিবে না।) (১৯ পাঃ ১ রুঃ)

(৬) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ـ

অর্থ :—(কাফেরদের আজাব ও দুর্দশা এই জন্য হইবে যে,) তাহারা ঐ কেতাবকে অগ্রাহ্য করিয়াছে যে কেতাব আল্লাহ তায়ালা নাযেল করিয়াছেন; সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সমুদয় আমল এবং সৎ কার্যাবলীকে নিষ্ফল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। (২৬পাঃ ৫রুঃ)

পাঠকবর্গ! উল্লিখিত দীর্ঘ আলোচনায় কোরআনের বহু আয়াত ও বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত দেখিতে পাইলেন যে, পরকালের মুক্তি ও পরিত্রাণের জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং কোরআনের প্রতি ঈমান অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক। বরং আল্লার কোরআন ও রসুলের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আরও কতিপয় বস্তুর প্রতিও ঈমান আবশ্যক। বস্তুতঃ রসুলের হাদীছ ও আল্লার কোরআন ইহাই ইসলাম; এই ইসলাম ব্যতিরেকে পরিত্রাণ নাই।

● কোরআন ও হাদীছের কোন কোন স্থানে ঈমান ও ইসলাম সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আসিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে অন্য বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে ঈমানের কথা উল্লেখ হইয়াছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থানে ঈমানের বিষয়বস্তুগুলিকে সামগ্রিকভাবে উল্লেখ না করিয়া শুধু ঈমান বা ঈমানের শুধু মূল জিনিষ উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐরূপ কোন আয়াত বা হাদীছের বাক্য দেখিয়া কোন কোন লোক ধোকায় পড়িয়াছে যে, একমাত্র আল্লার প্রতি ঈমান থাকিলেই দোযখ হইতে মুক্তি লাভ হইবে—যদিও রসুল ও কোরআন ইত্যাদির প্রতি ঈমান না থাকে। যেমন কোরআনের ১ম ছিপারায় একটি আয়াত আছে—

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۔

এই আয়াতটি দ্বারা এমন অনেকে ধোকা খাইয়া থাকে, যাহারা নিজকে তফছীরকার-রূপে প্রকাশ করে, অথচ তাহারা অভিজ্ঞ শিক্ষকের মাধ্যমে কোরআনের শিক্ষা লাভ করে নাই। বরং অভিধান বা অনুবাদ দেখিয়া এবং শব্দার্থের অনুবাদের সাহায্যে তফছীরকার সাজিয়াছে। ফলে তাহারা ঐ মানুষ-মারা ডাক্তারের ন্যায় তফছীরকার হইয়াছে—যে ডাক্তার অভিজ্ঞ ডাক্তার-শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ না করিয়া শুধু অভিধান ও অনুবাদের সাহায্যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে নামিয়াছে। এরূপ কার্য্যের কুফল যে কি মারাত্মক তাহা অতি সুস্পষ্ট। আর এক শ্রেণীর তফছীরকার আছে যাহারা সাত অন্ধ কর্তৃক হাতীর আকার নির্ণয়ের ন্যায় মুক্তি ও পরিত্রাণের মূল শর্ত ঈমানকে শুধুমাত্র এইরূপ সংক্ষিপ্ত দুই চারিটি আয়াত দ্বারাই বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ সব অগণিত আয়াত ও হাদীছসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে না, যে সবের দ্বারা ঈমান রত্নের বিস্তারিত বিবরণ উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

মোসলমান সমাজের ঈমান রক্ষার্থে উক্ত আয়াতটির বিস্তারিত বিবরণ সহ তফছীর করা হইতেছে। যে তফছীর শুধু আজই নয়, বরং শত শত বৎসর পূর্ব হইতে বহু বহু তফছীর-কারগণের তফছীর-কেতাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথমে ভূমিকা স্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লউন।

এই আয়াতটি মদীনায় নাযেল হইয়াছে। অর্থাৎ ইসলামের দীর্ঘ তের বৎসর অতিবাহিত হইবার পরে—যখন মোসলমানগণ একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন তখন নাযেল হইয়াছিল। তখন মদীনা শরীফে ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরাই শিক্ষা-দীক্ষায় অধিকতর উন্নত ছিল। পবিত্র কোরআনেরই বর্ণনায় দেখা যায়, ইহুদীদের এবং নাছারা-খৃষ্টানদের এই আকিদা এবং দাবী ছিল যে, আমরা (ইহুদী-নাছারাগণ) নবীর বংশ, তাই আমরা আল্লার অতি আদরণীয় এবং প্রিয়পাত্র। এই আকিদা সূত্রে তাহারা এই দাবীও করিত যে,

আমরা কোন অবস্থাতেই দোযখে যাইব না। যদিই বা একান্ত যাইতে হয় তবে মাত্র অল্প কয়েক দিন সেখানে থাকিতে হইবে; তৎপর আমরা বেহেশত পাইব।

উল্লিখিত আকিদা ও দাবীর দ্বারা স্পষ্টতঃই আভাস পাওয়া যায় যে, তাহারা যেন আল্লাহ তায়ালার সংগে ঔরস বা মীরাস জাতীয় সম্বন্ধের ন্যায় কোন সম্বন্ধের মালিকানায় বিশ্বাসী। এমনকি তাহারা নিজকে "أبناء الله—আবনাউল্লাহ" আল্লার সন্তান-সন্ততি বলিয়া আখ্যায়িত করিত। এই বিশ্বাসের কুফল এই ফলিয়াছিল যে, ইহুদীবাদের ও নাছরাণীবাদের সমাপ্তি এবং হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নবুওয়াত অকাট্য ও স্পষ্ট প্রমাণে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাহারা বুক ফুলাইয়া তাঁহার বিরোধীতা করিতে প্রয়াস পাইত এবং তাঁহার আনীত দীনকে গ্রহণ না করার বিষময় ফলের আইনগত শাস্তির ঘোষণা যখন দেওয়া হইত, তখন উহার প্রতিবাদে তাহারা নির্ভীক চিত্তে উল্লিখিত দাবী ও আকিদা প্রকাশ করিয়া থাকিত। লক্ষ্য করুন—ঐ ভুল ধারণা ও মিথ্যা আকিদার ফলাফল কত মারাত্মক ছিল! তাই ইহুদীদের এবং নাছারাদের ঐ দাবীর অসারতা প্রকাশার্থে আল্লাহ তায়ালা মুক্তি ও পরিত্রাণের ব্যাপারে স্বীয় নীতি উল্লেখ করতঃ এই আয়াতখানা নাযেল করেন এবং এরূপ ব্যাপক আকারের ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করেন, যাহাতে বিশ্বের সকল ব্যক্তি ও সকল সম্প্রদায়ের মুখ বন্ধ করিতে এই নীতিই যথেষ্ট হয়। কেহই যেন আর ঐ ইহুদীবাদের বা নাছরাণীবাদের ন্যায় শুধু জন্মগত, বংশগত, বর্ণগত, ভাষাগত বা দলগত ভরসায় বসিয়া না থাকে, বরং প্রত্যেকেই যেন তাহার নাজাত এবং সাফল্য নিজের ঈমান ও আমলের উপর নির্ভরশীল বলিয়া উপলব্ধি করে।

এই আয়াতে বর্ণিত নীতিটি হইল এই যে, কোন সম্প্রদায়-বিশেষের সঙ্গেই আল্লাহ তায়ালার এমন কোন সম্বন্ধ নাই যাহার ভিত্তিতে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া দেওয়া হইবে, বরং মুক্তির জন্য দুইটি গুণ অর্জনের আবশ্যক। একটি হইল ঈমান, দ্বিতীয়টি হইল আমলে-ছালেহ বা সৎকাজ। এই দুইটি গুণের উপরই নির্ভর করে মানুষের মুক্তি এবং জীবনের সাফল্য। অবশ্য যে যুগে এই গুণদ্বয় যে সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে, মুক্তিও সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু মুক্তির এই সীমাবদ্ধতা এই জন্য কখনও হইবে না যে, ঐ সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ সম্বন্ধ আল্লার সঙ্গে আছে---যেমন ইহুদী ও নাছারাগণ ধারণা জন্মাইয়া রাখিয়াছে। বরং এই জন্য হইবে যে, মুক্তির শর্তদ্বয় এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।

এই বর্ণনা হইতে একটি বিষয় ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবেন যে, কোরআন-হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত ইসলাম ধর্মের অতি আবশ্যকীয় এই আকিদা যে—একমাত্র ইসলাম ধর্মের মধ্যে তথা হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এবং কোরআনকে মানিয়া চলার মধ্যেই মুক্তি ও পরিত্রাণ লাভ হইতে পারে, অন্য কোন পথে ও মতে মুক্তি পাওয়া

পাইবে না। এই আকিদা এবং পূর্বোল্লিখিত ইহুদীদের আকিদার মধ্যে বিরাট ব্যবধান ও পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য এই যে, ইহুদীগণ বিশেষ সম্বন্ধের ভিত্তিতে অর্থাৎ বংশের ভিত্তিতে এবং দলভুক্তির ভিত্তিতে মুক্তির আশা ও আকিদা রাখে এবং এই কারণেই অকাট্যরূপে ইহুদীয় ধর্মমতের যুগের পরিসমাপ্তি প্রমাণিত হওয়ার পরেও তাহারা সত্য ইসলাম ধর্মকে উপেক্ষা করিয়া নিজেদের ইহুদী নামের এবং বংশের জোর দেখাইয়া মুক্তির দাবী করিতে দ্বিধাবোধ করে না। পক্ষান্তরে মোসলমানগণের আকিদার মূল হইতেছে এই যে, মুক্তির শর্ত ও ভিত্তি হইল ঈমান ও (গ্রহণীয়) আমলে ছালেহ; কোন বংশ, সম্প্রদায় বা দল নহে। অবশ্য সেই শর্ত এই যুগে অর্থাৎ মোহাম্মদ (দঃ)-এর আবির্ভাব হইতে কেয়ামত পর্য্যন্ত মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক আনীত ও প্রচারিত দীনে-ইসলামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; সে জন্য কেয়ামত পর্য্যন্ত মুক্তিও এই ধর্মেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। এই উভয় সীমাবদ্ধতার প্রমাণ পূর্বালোচিত সাতটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

অতঃপর আরও একটি জরুরী বিষয় জানিয়া রাখিতে হইবে যে, মুক্তি ও পরিত্রাণের মূল শর্ত ঈমানের বিস্তারিত বিবরণ যাহা কোরআন ও হাদীছের দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে তাহা এই যে, আল্লাহ, আল্লার রসূল, আল্লার কেতাব, আল্লার ফেরেশতা এবং পরকাল ও তকদীরের উপর ঈমান স্থাপন করিতে হইবে। যেমন পূর্বালোচিত সাতটি বিষয়ের ২, ৩ ও ৪নং বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কোরআন-হাদীছের কোন কোন স্থানে ঐ ঈমান সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লিখিত হইয়াছে। এরূপ হওয়া অতি স্বাভাবিক, কারণ কোন একটি প্রশস্ত বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইলে উহা কোন কোন স্থানে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে। তাই সৎ-নিয়্যত ও বুদ্ধিমান লোকের কাজ হইবে মুক্তির ব্যাপারে কোরআন-হাদীছের সমুদয় বিবরণকে সম্মুখে রাখিয়া তৎপর মুক্তির পথ নির্দ্ধারণ করা। পূর্বালোচিত ৫৬টি আয়াত ও ৫ খানা হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত সাতটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা করুন, তবেই মুক্তির পূর্ণাঙ্গ পথ নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন। আর যদি ঐ বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীছের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শুধু সংক্ষিপ্ত বর্ণনার আয়াতসমূহের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মুক্তির পথ নির্দ্ধারিত করিতে চেষ্টা করেন, তবে আপনি হাতীর আকার নির্ণয়কারী সাত অন্ধের ন্যায় হাস্যাস্পদ একজন অন্ধরূপে পরিগণিত হইবেন এবং গোমরাহীর তিমিরময় গর্তে নিপতিত হইয়া স্বীয় মুক্তির পথ হারাইয়া বসিবেন।

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

আমাদের কর্তব্য—সত্য কথা পৌঁছাইয়া দেওয়া।

আলোচ্য আয়াতের সরল অর্থ ঃ

মোমেন অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়, ইহুদী সম্প্রদায়, নাছারানী সম্প্রদায় এবং ছাবেয়ী সম্প্রদায় (ইত্যাদি--বিশ্বব্যাপী মানব সমাজের মধ্য হইতে) যাহারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি (খাঁটিভাবে) ঈমান স্থাপনকারী এবং সৎ কার্য্যাদি অনুষ্ঠানকারী সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাদের জন্য স্বীয় পালনকর্তার নিকট প্রতিদান রহিয়াছে এবং তাহারা পরকালে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকিবে।

এই আয়াতে ঈমানের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয় নাই, বরং উহার বিষয়বস্তু সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে মাত্র। কারণ এইস্থানে বর্ণনার আসল বিষয়বস্তু ঈমানের বিস্তৃত বিবরণ নহে, বরং এইস্থানের আসল বিষয়বস্তু হইয়াছে ফের্কা-বন্দির এবং দলীয় নাম জারীর ভুল ধারণাকে সংশোধন করা। অবশ্য কোরআন ও হাদীছের সমুদয় বিবরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এই সংক্ষেপের মধ্য হইতেই ঈমান সম্বন্ধীয় সব কিছু ফুটিয়া উঠিবে। প্রধানতঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ঈমান রাখা; ইহা আল্লার প্রতি ঈমান রাখার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিশেষতঃ এই কারণে যে, রসুল আল্লারই প্রতিনিধি। বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ডে ৪৮নং হাদীছেও ইহার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে— উক্ত হাদীছের চতুর্থ পাদটীকা দ্রষ্টব্য। তদ্রূপ কোরআনের প্রতি ঈমানও আল্লার প্রতি ঈমানেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কারণ কোরআন শরীফ আল্লারই ফরমান ও বাণী। অতঃপর ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানও এই সঙ্গে জড়িত। কারণ আল্লার বাণী কোরআন তাঁহার প্রতিনিধি রসুলের নিকট ফেরেশতার মারফতেই পৌঁছিয়াছে। তকদীরের প্রতি ঈমানও আল্লার উপর ঈমানেরই অংশ। প্রথম খণ্ডে ৪৬নং হাদীছের বিশেষ দ্রষ্টব্যে প্রতিপন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার দুইটি গুণ বা ছেফতের সমষ্টি হইতেই তকদীর নামক বিষয়ের উৎপত্তি, সুতরাং ঐ ছেফতের উপর ঈমান রাখা আল্লার উপর ঈমান রাখারই অন্তর্ভুক্ত।

সারকথা এই যে, মুক্তির মূল শর্ত ঈমানের ছয়টি বিষয়বস্তুর প্রথমটি অর্থাৎ "আল্লার প্রতি ঈমান" এর মধ্যেই আরো চারিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। (১) রসুলের প্রতি ঈমান (২) কোরআনের প্রতি ঈমান (৩) ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান (৪) তকদীরের প্রতি ঈমান। এই সবের বিস্তারিত বর্ণনা এবং উহা ঈমানের অঙ্গ হওয়া কোরআন-হাদীছের বহু স্থানে উল্লেখ হইয়াছে; অবশ্য সংক্ষেপ করার জন্য কোন কোন স্থানে ঐ কতিপয় বস্তুর সমষ্টির উপর একটি শিরোনামার ন্যায় আল্লার প্রতি ঈমানকে উল্লেখ করা হইয়াছে--যেহেতু অন্য চারিটি উহার অন্তর্ভুক্ত। কুচক্রিরা এই সংক্ষিপ্ততার সুযোগ গ্রহণ করিয়া লোকদিগকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করে।

তাহারা এই আয়াতে আরও একটি প্রতারণার ফন্দি এইরূপে গ্রহণ করে যে, একমাত্র মোসলমানগণের জন্য মুক্তি সীমাবদ্ধ হইলে ইহুদী, নাছারা ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বরাবরে الذين امنوا "যাহারা মোমেন হইয়াছে" বলিয়া মোসলমান সম্প্রদায়কে কেন উল্লেখ করা হইল ?* এই প্রশ্নের মীমাংসা পূর্ব্ববর্তী তফছীরকারকগণ সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কুচক্রিগণ সেই পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম কোথায় ? তাহাদের বিদ্যার সীমা অভিধান বা অনুবাদ।

উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, এখানে মোমেন তথা মোসলেম সম্প্রদায়ের উল্লেখ করার মধ্যে অতি বড় দুইটি তথ্যপূর্ণ বিষয় ও উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। প্রথম এই যে, ان الذين امنوا "যাহারা মোমেন" ইহার উদ্দেশ্য হইল—যাহারা মোমেন হওয়ার দাবী করিতেছে। এই মোমেন হওয়ার দাবীদার সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি মোনাফেক ছিল এবং সব যুগেই এরূপ থাকে। মোনাফেকের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। তাহারা প্রকাশ্যে মোমেন ও মোসলেম দলভুক্ত হইলেও ইহুদ-নাছারাদের ন্যায় চিরতরে মুক্তি হইতে বঞ্চিত। তাই ইহুদ-নাছারাদের ন্যায় মোমেন নামধারী মোনাফেকগণকেও সতর্ক করা আবশ্যক যে, খাটিভাবে ঈমান আনিয়া আমলে-ছালেহ করিলে মুক্তি পাইতে পারিবে নতুবা নহে। মোনাফেকগণ কোনও ভিন্ন সম্প্রদায়রূপে নির্দিষ্ট থাকে না, বরং বাহ্যতঃ মোমেন সম্প্রদায়রূপেই পরিচিত হইয়া থাকে, তাই ইহুদ-নাছারাদের বরাবরে সতর্কবাণীর আওতাভুক্ত করিয়া মোমেন সম্প্রদায়কেও উল্লেখ করা নিতান্ত সমুচিতই হইয়াছে। বন্ধুত্ব ভিত্তিক সতর্কবাণীর মধ্যে বন্ধুদের উল্লেখ বাহ্যতঃ আবশ্যক মনে না হইলেও বস্তুতঃ এই জন্য উহার আবশ্যক রহিয়াছে যে, বন্ধুত্বের মুখোসধারীরা ইহার দ্বারা সতর্ক হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় তথ্যটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। তাহা এই যে, এই আয়াত নাযেল হওয়াকালে মোমেন-মোসলমানগণ একটি বিশেষ সম্প্রদায়রূপে পরিচিত ছিলেন। বস্তুতঃ এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই মুক্তি ও পরিত্রাণ সীমাবদ্ধ বটে, কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতা একমাত্র এই ভিত্তিতে যে, মুক্তি ও পরিত্রাণের মুল শর্ত ঈমান এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহুদীদের ন্যায় এরূপ ধারণা যে, আল্লার সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ সম্বন্ধ ও সম্পর্ক রহিয়াছে

---

* এই প্রশ্নের উত্তর দ্বারা আরও একটি বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যাইবে যে—ইহুদী, নাছারা, ইত্যাদি সম্প্রদায় সমূহের সঙ্গে الذين امنوا "যাহারা ঈমান আনিয়াছে" বলিয়া মোমেন সম্প্রদায়কে উল্লেখ করা হইল—অথচ এখানে এই কথার উপর বাক্য শেষ করা হইয়াছে যে, যে কেহ ঈমান ও আমলে-ছালেহ করিবে সে-ই মুক্তি পাইবে। এই ঘোষণা ইহুদী, নাছারা, ইত্যাদি ঈমানহীন সম্প্রদায়গণের প্রতি প্রবর্তিত করা বোধগম্য, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে যাহারা ঈমানদার তাহাদের প্রতি এই ঘোষণা কেন ?

তাহার ভিত্তিতে তাহারা মুক্তির হকদার তাহা কখনও নহে। পরন্তু ঐরূপ ইহুদীবাদের মূল উচ্ছেদের জন্যই এখানে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নীতি ও মুক্তির আইন ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং এই নীতি ও আইন সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য বিধায় ইহুদীদের সঙ্গে সেই যুগের অন্যান্য সম্প্রদায় সমূহকেও উল্লেখ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় এখানে মোমেন বা মোসলেম নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করাও আবশ্যক। কারণ এই সম্প্রদায়ও আল্লাহ তায়ালার ঐ নীতি ও আইনের বহির্ভূত নহে। মোমেন ও মোসলেম সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি ইহুদীদের ন্যায় ধারণা জন্মাইলে সেই ব্যক্তিও বিকৃত গণ্য হইবে এবং সেও নিঃসন্দেহে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে।* অবশ্য ইহাও স্মরণ রাখিবে যে, ইহুদীবাদ ভিন্ন কথা এবং মুক্তির শর্ত মোমেন মোসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রমাণিত হওয়ায় মুক্তি ও পরিত্রাণ তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়া ভিন্ন কথা। এবং ইহাও অতি স্পষ্ট যে, নীতি বা আইন কখনও সীমাবদ্ধাকারে ঘোষিত হয় না বটে, কিন্তু উহার ফলাফল বাস্তব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধরূপেই অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। যেমন কোন বাদশাহ স্বীয় নীতি ও আইন এইরূপে ঘোষণা করে যে—শত্রু-মিত্র যে-ই আমার খাটী অনুগত হইবে আমি তাহাকে পুরস্কৃত করিব। লক্ষ্য করুন, এই ঘোষণা যাহা একমাত্র শত্রুর বিরুদ্ধেই ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু এখানে মিত্রের উল্লেখ কতইনা সুন্দর হইয়াছে! আলোচ্য আয়াতকে এই দৃষ্টিতে বুঝিবার চেষ্টা করুন।

উল্লিখিত বিবরণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতের সারমর্ম এই—"যাহার মধ্যে খাটী ঈমান ও আমলে-ছালেহ গুণদ্বয় পাওয়া যাইবে, সে-ই মুক্তি পাইবে; চাই সে প্রথম হইতেই মোমেন সম্প্রদায়ভুক্ত আছে বা ইহুদ, নাছারা, হনুদ, বৌদ্ধ ইত্যাদি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল; সকলেই খাটী ঈমান ও আমলে-ছালেহ-এর ভিত্তিতে মুক্তি লাভ করিবে।"

৭৩০। হাদীছ :— اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهٗ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهٖ

---

* যেরূপ হাদীছে বর্ণিত আছে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় ফুফু ছফিয়্যা (রাঃ)কে এবং স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রাঃ)কে প্রকাশ্যরূপে ভিন্ন ভিন্ন ডাকিয়া ঘোষণা দিয়াছেন—

انقذى نفسك من النار لا اغنى عنك من الله شيئا

দোযখ হইতে নিজকে রক্ষা করার ব্যবস্থা তোমার নিজেকেই করিতে হইবে; আমি তোমাকে আল্লার আজাব হইতে রক্ষা করায় কোন সাহায্য করিতে পারিব না। অর্থাৎ তুমি নিজে রক্ষা পাওয়ার মূল ব্যবস্থা ঈমান ও আমল অবলম্বন না করিলে শুধু আমি আল্লার রসূলের সম্বন্ধ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান ইহাই যে, ঈমান না হইলে কোন সম্বন্ধই মুক্তির জন্য ফলপ্রসূ হইবে না। পক্ষান্তরে ইহুদী-নাছারাগণ নবীর সঙ্গে বংশ-সম্পর্কের দ্বারা নাজাত বা মুক্তির দাবীদার ছিল।

شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا.

অর্থঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা একজন গ্রাম্য লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল—আপনি আমাকে এমন আমল ও কর্ম বাতলাইয়া দিন যাহা অবলম্বন করিলে আমি বেহেশত লাভ করিতে পারি। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উত্তরে বলিলেন এক আল্লার এবাদত ও গোলামী করিবে, কোন বস্তুকেই তাঁহার শরীক ও অংশীদার করিবে না এবং নামায ভালরূপে আদায় করিবে যাহা ইসলাম ধর্মের একটি বিশিষ্ট ফরজ এবং যাকাত আদায় করিবে, উহাও একটি বিশিষ্ট ফরজ এবং রমজান মাসের রোযা রাখিবে। ঐ ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, যে আল্লার হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লার শপথ করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি, আমি এইসব কার্য্যগুলি সমাধা করিতে কোনরূপ বেশ-কম করিব না। অর্থাৎ আদেশ পালন করিতে ব্যতিক্রম করিব না এবং তাহা অতিক্রমও করিব না; ত্রুটিহীনরূপে ঐ কার্য্যগুলি নিস্পন্ন করিতে থাকিব। এই বলিয়া যখন সে চলিয়া যাইতেছিল তখন নবী (দঃ) উপস্থিত লোকদেরে বলিলেন, কাহারও বেহেশতী মানুষ দেখিবার খাহেশ থাকিলে এই ব্যক্তিকে দেখিতে পারে।

৭৩১। **হাদীছঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহজগৎ ত্যাগ করার পর যখন আবু বকর (রাঃ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন এবং আরববাসীদের কয়েকটি দল (ইসলাম বা ইসলামের কোন কোন বিধানের) বিরোধিতায় মাতিয়া উঠিল। (তন্মধ্যে একটি দল এরূপও ছিল যাহারা আল্লাহ ও আল্লার রসুলের প্রতি ঠিক ঠিকরূপেই ঈমানদার ছিল এবং ইসলামের সমুদয় বিধি-নিষেধের প্রতি অনুগত ছিল, কিন্তু একটি মাত্র বিধান অর্থাৎ যাকাত আদায় করা ইসলামের বিধানরূপে মান্য করিতে তাহারা অস্বীকার করিল। আবু বকর (রাঃ) তখন গভীর রাজনীতিবিদের সুষ্ঠ পরিচালনাশক্তির ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন যে, ঐসব বিদ্রোহী ও বিরোধীদের প্রতি সৈন্য পরিচালনার প্রস্তুতি করিতে লাগিলেন। এমনকি যে দলটি সর্বাঙ্গীন ইসলামের প্রতি অনুগত ছিল শুধু যাকাতের বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করিত, তাহাদের বিরুদ্ধেও অভিযান চালাইতে উদ্যত হইলেন।) তখন ওমর (রাঃ) (তাঁহাকে এই অভিযান হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে) বলিলেন, আপনি ঐ লোকদের প্রতি কিরূপে অভিযান চালাইবেন (যাহারা যাকাতকে ইসলামের বিধানরূপে না মানিলেও আল্লার প্রতি, আল্লার

রসূলের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখে? অথচ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার প্রতি আল্লার আদেশ এই যে, আমি যেন জগদ্বাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাই—যাবৎ না তাহারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু"—কলেমা-তাইয়্যেবার অনুগত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি উহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইবে সে ব্যক্তি স্বীয় জান-মালের নিরাপত্তার অধিকারী হইয়া যাইবে। (তাহার কোন প্রকার ক্ষতি সাধনে উদ্যত হওয়া কখনও ইসলাম অনুমোদন করিবে না।) অবশ্য ইসলামের বিধান মতেই যদি সে কখনও শাস্তির উপযোগী সাব্যস্ত হইয়া পড়ে তখন তাহার উপর সেই বিধান প্রয়োগ করা হইবে। হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, ইসলামের মুলবস্তু কলেমা-তাইয়্যেবার প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ ও বাহ্যিক স্বীকৃতির দ্বারা সে নিরাপত্তা লাভ করিতে পারিবে। তাহার আন্তরিক অবস্থার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ তায়ালার নিকট হইবে। ওমরের এই উক্তির প্রতিউত্তরে আবু বকর (রাঃ) তেজোদৃপ্ত ভাষায় ঘোষণা করিলেন, আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় আমি তাহাদের প্রতি সংগ্রাম চালাইব—যাহারা নামায এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করিবে। (অর্থাৎ যাকাতকেও নামাযের ন্যায় ইসলামের অপরিহার্য্য ফরজ অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে,) এমনকি যদি তাহারা সামান্য একটি বকরীর বাচ্চা বা একগাছি দড়ি যাহা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট যাকাতরূপে আদায় করিত, এখন যদি উহা আদায় করিতে অস্বীকার করে তবে খোদার কসম—তাহাদের বিরুদ্ধে আমি নিশ্চয় যুদ্ধ চালনা করিব।

ওমর (রাঃ) বলেন, আবু বকরের দৃঢ়তা দেখিয়া আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, ইহা তাঁহার সুচিন্তিত ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত। তখন আমিও (গভীরভাবে চিন্তা করিয়া) বুঝিতে পারিলাম যে, ইহাই বিশুদ্ধ ও বাস্তব পন্থা।

ব্যাখ্যা ঃ—আবু বকর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবিক পক্ষে বিচক্ষণতাপূর্ণ ও অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। কারণ, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহজগৎ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী শক্তিসমূহ মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে মোসলমানদের বিন্দুমাত্র দুর্বলতার আভাস অনুভূত হইলে শত্রু পক্ষের মনোবল উত্তলাইয়া উঠিত এবং উহার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হইত। এতদ্ব্যতীত শরীয়তের মছআলাও ইহাই যে, ইসলামের কোন সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধে কোন দল ও শক্তির আবির্ভাব হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া মোসলমানদের রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য—ফরজ।

ওমর (রাঃ) এখানে যে হাদীছটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন ঐ হাদীছটি এখানে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ হইয়াছে। পূর্ণ হাদীছটি আবু বকর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত ও কার্য্যধারার অনুকূলে স্পষ্ট প্রমাণ। বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ডে ২২ নম্বরে ঐ হাদীছখানাই বিস্তারিত উল্লেখ হইয়াছে। সেখানে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু (তৌহীদ বা একত্ববাদ)-এর সঙ্গে "মোহাম্মাদুর

রসুলুল্লাহ"-এর স্বীকৃতি এবং নামায ও যাকাত আদায়ের উল্লেখ স্পষ্টতঃই রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই বিষয়টি মোসলেম শরীফে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আকারেও বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيُؤْمِنُوْا بِىْ وَبِمَا جِئْتُ بِهٖ

অর্থাৎ..... "যাবৎ না তাহারা আল্লার একত্ববাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতি এবং (আল্লার তরফ হইতে) যেসব আদেশ-নিষেধাবলী আমি নিয়া আসিয়াছি ঐ সবের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঈমান আনিবে" তাবৎ সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আদেশ বলবৎ থাকিবে।

যাকাত আদায়ের অঙ্গীকার গ্রহণ

নবী (দঃ) ঈমানের অঙ্গীকার লওয়ার ন্যায় নামায পূর্ণাঙ্গ আদায় ও জারী করার এবং যাকাত আদায় করারও অঙ্গীকার বিশেষভাবে লইতেন (৫১নং হাঃ)।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ

"অমোসলেমরা যদি শেরেকী-কুফরী বর্জন পূর্বক ঈমানের দীক্ষা গ্রহণ করে এবং নামায পূর্ণাঙ্গ আদায় ও জারী করে, যাকাত আদায় করে তবে তাহারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই পরিগণিত হইবে।" (১০ পাঃ ৮ রুঃ)

উক্ত আয়াতের পূর্ব রুকুতে এইরূপ আরও একটি আয়াত রহিয়াছে (যাহার উদ্ধৃতি প্রথম খণ্ড ২২নং হাদীছ পরিচ্ছেদে আছে) সেই আয়াতে বলা হইয়াছে, যদি অমোসলেমরা ঈমানের দীক্ষা গ্রহণ, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করে তবে তাহাদিগকে জান-মাল ইত্যাদির সর্বপ্রকার নিরাপত্তা দান কর।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মে দেখা যায়, মোসলমান দলভুক্ত ও মোসলমানদের ধর্মীয় ভাই পরিগণিত হওয়ার জন্য এবং মোসলমানরূপে জান-মালের নিরাপত্তার অধিকারী হওয়ার জন্য আভ্যন্তরীণ ঈমানের সঙ্গে বাহিক আমলরূপে নামাযের প্রয়োজনীয়তার ন্যায়ই যাকাত আদায়ের প্রয়োজনও রহিয়াছে। যাকাত ফরজ হওয়া অস্বীকার করিলে সে মোসলমান দলভুক্ত গণ্য হইবে না এবং যাকাত আদায়ে অসম্মত হইলে সে জান-মালের নিরাপত্তা হইতে বঞ্চিত হইবে।

যাকাত না দেওয়ার গোনাহ ও শাস্তি

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ

وَظُهُورُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ -

অর্থঃ—যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য* পুঁজি করিয়া রাখে এবং উহা আল্লার রাস্তায় খরচ করে না, তাহাদিগকে ভীষণ কষ্টদায়ক আজাবের সংবাদ জানাইয়া দিন। (এই আজাব তাহাদের উপর ঐ দিনই হইবে) যেদিন ঐ স্বর্ণ-রৌপ্যগুলি জাহান্নামের অগ্নিতে আগুণতুল্য উত্তপ্ত করিয়া উহা দ্বারা তাহাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠ দাগান হইবে** (এবং তিরস্কার করিয়া বলা হইবে) ইহা ঐসব ধনরাশি যাহা তোমরা নিজ সম্পদ ও উপভোগের বস্তুরূপে পুঁজি করিয়া রাখিয়াছিলে; (উহার যাকাত পর্য্যন্ত আদায় কর নাই এই ভয়ে যে, কম হইয়া যাইবে।) এখন ঐসব ধন পুঁজি করিয়া রাখার শাস্তি ভোগ কর। (১০ পাঃ ১১ রুঃ)

ব্যাখ্যাঃ—মোসলেম শরীফের বর্ণনায় এই হাদীছের বিষয়বস্তু এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে সমস্ত স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক ঐ স্বর্ণ-রৌপ্যের (মধ্যে আল্লার) হক্ক তথা যাকাত আদায় করিবে না তাহাদের শাস্তির জন্য কেয়ামতের দিন ঐ স্বর্ণ-রৌপ্যকে জাহান্নামের অগ্নি দ্বারা বড় চাদর ও পাতরূপে তৈরী করিয়া উহাকে জাহান্নামের আগুনে অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহার দ্বারা ঐ মালিকের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠ দাগান হইবে। বার বার উহাকে গরম করিয়া দাগান হইতে থাকিবে। তাহার এই শাস্তি দোযখে যাইবার পূর্বেই—কেয়ামতের দিন তথা হিসাব-নিকাশের ঐ দিনে হইবে, যে দিনটি পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান দীর্ঘ হইবে। অতঃপর যখন সকলের হিসাব-নিকাশ ও ফয়ছালা শেষ হইয়া যাইবে তখন ঐ ব্যক্তিকে হয়ত বেহেশতের পথের সুযোগ দেওয়া হইবে। (যদি তাহার এই শাস্তি ভোগে ঐ গোনাহের সমাপ্তি হয় এবং সে অন্য গোনাহের দরুণ দোযখী না হয়।) অথবা দোযখের প্রতি হাঁকানো হইবে।

---

* স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়া অন্যান্য মালামালের যাকাত না দিলে উহার জন্যও আলোচ্য শ্রেণীর আজাব এইরূপে হইতে পারে যে, উক্ত মালামালের মূল্য পরিমাণের স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা এই প্রণালীতে আজাব দেওয়া হইবে। অবশ্য পশুপালের যাকাত না দিলে সেক্ষেত্রে পশুপালের দ্বারা ভিন্ন প্রণালীতে আজাব দেওয়ার উল্লেখ সম্মুখের হাদীছে রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ধন-সম্পদের যাকাত না দেওয়ার আজাব ভয়ানক বিষাক্ত অজগরের দ্বারা দেওয়াও ৭৩৪ নং হাদীছে বয়ান রহিয়াছে।

** যাকাত দানে বিরত কৃপণ ব্যক্তির এই শাস্তি অত্যন্ত সমীচীন। কারণ কোন গরীব মিস্কীন সাহায্য প্রার্থনাকারী তাহার সম্মুখে আসিলেই বিরক্তিভরে তাহার কপালের চামড়া কুঞ্চিত হইয়া যাইত। অতঃপর আরও বিরক্ত হইয়া পার্শ্ব ফিরিয়া উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিত। অতঃপর আরও বিরক্ত হইয়া রাগান্বিত অবস্থায় তাহার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক অন্য দিকে চলিয়া যাইত। তাই শাস্তি দানে এই তিনটি অঙ্গের বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য।

৭৩২। হাদীছঃ— سمع ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ
إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى
خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا
قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا
قَدْ بَلَّغْتُ وَيَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ
لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ ـ

অর্থ ও ব্যাখ্যা—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাতদানে বিরত থাকার শাস্তি বর্ণনা করিলে পর জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রসুলাল্লাহ! উষ্ট্রের যাকাত দান না করিলে তখন কি অবস্থা হইবে? নবী (দঃ) এই প্রশ্নের উত্তরে) ফরমাইয়াছেন, উষ্ট্রপালের উপর আল্লাহ তায়ালার যে হক আছে সেই হক আদায় করা না হইলে ঐ উষ্ট্রের মালিককে কেয়ামতের দিন হাশরের বিশাল ময়দানে শোয়ানো হইবে। তৎপর ঐ উষ্ট্রগুলি এমন অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হইবে যে, উহার প্রত্যেকটি উষ্ট্র দুনিয়ায় থাকাকালীন সর্বাপেক্ষা অধিক মোটা তাজা ছিল (এবং ঐ উষ্ট্রগুলির একটিও, এমনকি একটি বাচ্চাও বাদ থাকিবে না, সবগুলিই উপস্থিত হইবে।) এবং সারি বাঁধিয়া ঐ মালিককে পদদলিত ও পিষ্ট করিতে থাকিবে এবং (কামড়াইতে থাকিবে)। (অতঃপর গরু-ছাগলের বিষয়েও জিজ্ঞাসা করা হইল। উত্তরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐরূপই ফরমাইলেন যে, গরু) ছাগলের উপর আল্লার যে হক আছে সেই হক আদায় করা না হইলে উহার মালিককে কেয়ামতের দিন এক বিশাল ময়দানে শোয়ানো হইবে এবং ঐ গরু-ছাগল পালের সবগুলি অতি মোটা তাজারূপে উপস্থিত হইবে, (প্রত্যেকটি বক্রতাবিহীন ধারাল শিংযুক্ত হইবে) এবং ঐ মালিককে পিষ্ট ও পদদলিত করিতে থাকিবে এবং শিং দ্বারা ভীষণ আঘাত করিতে থাকিবে।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন যে, এসব পশুপালের উপর আল্লাহ তায়ালার যে সমস্ত হক আছে তাহার মধ্যে একটি হক ইহাও যে, (গরীব-দুঃস্থদিগকে প্রচলিত দেশ-প্রথানুযায়ী প্রাপ্য সাহায্যের সুযোগ দানার্থে) পশুপালকে পানি পানের জন্য

যেখানে একত্রিত করা হয় সেখানেই দুগ্ধ দোহন করিবে (এবং গরীবদিগকে কিছু কিছু দুগ্ধ দান করিবে)।

এই বাক্যটির ব্যাখ্যা এই যে, আরব দেশে সচ্ছল ব্যক্তিগণ পশুপাল রাখিত। ঐ পশুপাল ময়দানে পাহাড়ে চরিয়া বেড়াইত। সে দেশে যেখানে-সেখানে পানি পাওয়ার উপায় নাই। কোন কোন স্থানে পানির ব্যবস্থা থাকে এবং চতুর্দিকের পশুপাল সেখানেই জমা হয়। এইভাবে এক একটি পানির স্থানে বহু পশুপালের ভীড় জমে এবং সেখানে গরীব দুঃখী অনাথ এতিমগণও চতুর্দিক হইতে আসিয়া ভীড় জমাইতে থাকে। তাহাদের আশা এই থাকে যে, এখানে বহু পশুপাল একত্রিত হইবে, তাই প্রত্যেকটি হইতে একটু-আধটু দুধ পাইলেই গরীবের একটি অছিলা হইয়া যাইবে। পশুপালের যে সমস্ত মালিক উদার প্রকৃতির তাহারা বিশেষভাবে স্বীয় পশুপালের দুগ্ধ দোহনের ব্যবস্থা ঐ পানির স্থানেই করিয়া থাকিত, যেন গরীব দুঃস্থগণ ঐ সুযোগ হইতে বঞ্চিত না হয়। পক্ষান্তরে কৃপণ প্রকৃতির মালিকরা উহার বিপরীত—ঐ স্থানে দুগ্ধ দোহন হইতে বিরত থাকিতে সচেষ্ট হইত, যাহাতে দুঃখীদের দ্বারা বিব্রত হইতে না হয়।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই বাক্যটির দ্বারা সেই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং পশুপালের মালিকগণকে সতর্ক করিয়াছেন যে, যাকাত দান করা ত ফরজ আছেই; তদতিরিক্ত গরীব-দুঃখীকে সাহায্য পৌঁছাইবার উল্লিখিত আকারের রীতিও রক্ষা করিয়া চলা আবশ্যক।

ইসলাম যে কিরূপ জন-দরদী ও গরীব-কাঙ্গালের স্বার্থ সংরক্ষক নীতি সমূহের সমষ্টি, আলোচ্য বাক্যটি উহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আলোচ্য বাক্যে বর্ণিত অনুশাসনের মূলনীতিটি এই যে, গরীব-কাঙ্গালগণের জন্য শরীয়ত যে হক ফরজরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, যেমন যাকাত-ফেৎরা উহা ছাড়াও শরীয়তি আইনের বাধ্য বাধকতা ব্যতীত দেশ-প্রথা ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গরীব-কাঙ্গালগণ ধনাঢ্যদের ধন হইতে যে সব সাহায্য, সহায়তা ও সুযোগ পাইয়া থাকে, ইসলাম ঐ সমস্ত সাহায্য ও সুযোগকে কায়েম রাখার পক্ষপাতী, শুধু পক্ষপাতীই নহে বরং ঐ সমস্ত গরীব-তোষণ, কাঙ্গাল-পোষণ রীতি ও প্রথাসমূহকে রক্ষা করিয়া চলার উপর কড়াকড়ি আরোপ করিয়া থাকে। যেমন প্রথম খণ্ড "ঈমানের শাখা প্রশাখা" পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত একটি দীর্ঘ আয়াতের মধ্যে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন "হিত ও মঙ্গল কামনা" পরিচ্ছেদেও এই বিষয়ে আরও আলোকপাত করা হইয়াছে।

ইসলাম ধন-দৌলতের ব্যাপারে উদারতা এবং ইনসাফ দ্বারা উভয় পক্ষের সীমা রক্ষা করিয়াছে। গরীব কাঙ্গালের সহায়তায় বহুমুখী ব্যবস্থা কায়েম করার নীতি গ্রহণ করিয়াছে

এবং মালিকের মালিকানাকেও স্বীকৃতি দিয়াছে। ঐ রূপ নীতি সমূহই ইসলামের মধ্যপন্থী হওয়ার তথা ছেরাতুল-মোস্তাকীমের স্বরূপ।

পশুপালের যাকাত না দেওয়ার উল্লিখিত শাস্তি দোযখে যাইবার পূর্বে কেয়ামত তথা হিসাব-নিকাশের দিন হাশরের ময়দানেই হইতে থাকিবে। মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

হাশর-মাঠে হিসাব-নিকাশ ও বিচার পর্বের জন্য যে দিনটির অনুষ্ঠান হইবে সেই দিনটি পঞ্চাশ হাজার কিম্বা এক হাজার বৎসর পরিমাণ দীর্ঘ হইবে বলিয়া পবিত্র কোরআনেই উল্লেখ রহিয়াছে। যাকাত না দেওয়ায় সেই দীর্ঘ দিনের আজাবের বর্ণনাই এই হাদীছে রহিয়াছে; দোযখের শাস্তি ইহার পরে।

পশুপালের যাকাত না দেওয়ার গোনাহের দরুণ ঐ পশুপাল দ্বারাই শাস্তি প্রাপ্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে হাশরের ময়দানে উষ্ট্র, গরু, ছাগল ইত্যাদি দ্বারা অন্য কারণে শাস্তির বর্ণনার একটি হাদীছের প্রতিও এখানে বোখারী (রঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন। সেই হাদীছটি মূল গ্রন্থের ৪৩২ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। উহার বিবরণ এই—

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা গণীমতের মালে খেয়ানত করার শাস্তি বর্ণনা করিয়া বিশেষ ভাষণ দান পূর্বক বলিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে সতর্ক থাকিও—কেহ যেন এই অবস্থার সম্মুখীন না হও যে, কেয়ামতের দিন ঘাড়ের উপর ছাগল চড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে বা ঘোড়া চড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে—এই অবস্থায় কেহ আমার নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইলে আমি তাহাকে এই বলিয়া তাড়াইয়া দিব যে, আমি এখন কোন সাহায্যই করিতে পারিব না, আমি দুনিয়ার জীবনে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম।

"কিম্বা ঘাড়ের উপর উট সওয়ার হইয়া চীৎকার করিতে থাকে, আমার নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইলে আমি ঐরূপেই তাড়াইয়া দিব। অথবা অন্য কোন মাল ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসে, এমতাবস্থায় আমার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলে আমি ঐ বলিয়া তাড়াইয়া দিব। কিম্বা ঘাড়ের উপর কাপড় উড়িতে থাকে এমতাবস্থায় আমার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেও ঐরূপে তাড়াইয়া দিব।

ব্যাখ্যা ঃ—কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের দ্বারা বিজিত মালকে গণীমতের মাল বলা হয়। উহার চার পঞ্চমাংশ জেহাদে অংশ গ্রহণকারী সৈনিকগণের হক, আমীর কর্তৃক উহা তাহাদের মধ্যে বন্টন হইবার পর তাহারা নিজ নিজ অংশের মালিক সাব্যস্ত হইবে। আমীর কর্তৃক বন্টনের পূর্বে উহা হইতে কেহ কোন বস্তু গোপনে হস্তগত করিলে তাহাই গণীমতের মালে খেয়ানত গণ্য হইবে। সেই খেয়ানতের শাস্তিই উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণ আমানতে খেয়ানত এবং স্বীয় অংশীদারের হক খেয়ানত করার

পরিণতি ইহার সঙ্গে তুলনা করিয়া উপলব্ধি করা অতি সহজ। কারণ, এইসব খেয়ানত গণীমতের মালে খেয়ানত অপেক্ষা অধিক জঘণ্য; কারণ, গণীমতের মালে ত অনির্দ্ধারিত হইলেও নিজের অংশ থাকে। তদ্রূপ অন্যের হক গোপনে আত্মসাৎ করা আরও অধিক জঘণ্য।

মছআলাহ ঃ—গরু, ছাগল, উষ্ট্র ইত্যাদি পশুপালের উপর যাকাত ফরজ হয়, কিন্তু এই বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ শর্ত আছে, যাহার বিস্তারিত বিবরণ ফেকার কেতাবে বর্ণিত আছে। সাধারণতঃ আমাদের বাংলাদেশে ঐসব শর্ত বিরল।

৭৩৩। হাদীছ ঃ—আবু যর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম; নবী (দঃ) তখন কাবা শরীফ গৃহের ছায়ায় বসিয়াছিলেন। নবী (দঃ) বলিতেছিলেন, কাবার মালিকের কসম—তাহারাই অধিক বিপদগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কাবার মালিকের কসম—তাহারাই অধিক বিপদগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আবু যর (রাঃ) বলেন, আমি আতঙ্কিত হইলাম যে নবী (দঃ) আমার কোন খারাব অবস্থা দেখিয়াছেন কি? আমি বসিয়া পড়িলাম। নবী (দঃ) ঐ কথাই বার বার বলিতেছিলেন। আমি আর চুপ থাকিতে পারিলাম না; আল্লাহ তায়ালাই জানেন, কিরূপ ভাবনা-চিন্তা আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। আমি বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ, ঐ লোক কাহারা? নবী (দঃ) বলিলেন, যাহাদের ধন-দৌলত বেশী; (তাহারাই কেয়ামতের দিন অধিক বিপদগ্রস্ত হইবে।) অবশ্য তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা সৎকার্য্যসমূহে ধন খরচ করিতে থাকে ডানে, বামে এবং সম্মুখ দিকে (তাহারা বিপদগ্রস্ত হইবে না।) (৯৮২ পৃঃ)

নবী (দঃ) আরও বলিলেন, কসম ঐ আল্লার যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, যিনি ভিন্ন কোন মাবুদ নাই—যে কোন মানুষ তাহার উটের দল বা গরুর দল কিম্বা ছাগলের দল রহিয়াছে এবং সে ঐ সম্পদের উপর আল্লার যে হক আছে তাহা আদায় করে না; কেয়ামতের দিন (হাশরের মাঠে) সেই উট বা গরু অথবা ছাগলগুলি সর্বাধিক বড় ও মোটা-তাজারূপে উপস্থিত করা হইবে। ঐগুলি সারিবদ্ধরূপে সেই ব্যক্তিকে পদদলিত করিয়া পিষ্ট করিতে এবং শিং দ্বারা আঘাত করিতে থাকিবে। সারির শেষ মাথা যাইতে না যাইতেই উহার প্রথম মাথা ঘুরিয়া পুনঃ আসিয়া যাইবে। (এইভাবে ঐ পশুগুলি দ্বারা হাশরের মাঠে সেই ব্যক্তি আজাব ভোগ করিতে থাকিবে—) সমস্ত লোকদের হিসাব-নিকাশ ও বিচার পর্ব শেষ করা পর্য্যন্ত। (তারপর তাহার হিসাব ও বিচারের পর তাহার জন্য বেহেশত বা দোযখ যাহা হয় সাব্যস্ত হইবে।) ১৯৬ পৃঃ

৭৩৪। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهٗ

مُثِّلَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ - ثُمَّ تَلَا

لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الْاٰيَةَ

অর্থঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তায়ালা ধন-দৌলত দান করিয়াছেন, কিন্তু সে উহার যাকাত আদায় করে না; কেয়ামতের দিন তাহার ঐ ধন-দৌলতকে বিকট আকারের অতি বিষাক্ত অজগররূপে রূপান্তরিত করা হইবে, যাহার মুখের উভয় পার্শ্বে বিষ দাঁত থাকিবে। ঐ অজগরটিকে কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির গলার গলাবন্ধরূপে পরাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর ঐ অজগরটি উভয় চিবুক দ্বারা পূর্ণ মুখে ঐ ব্যক্তিকে কামড় দিয়া বিষোদগার করিতে থাকিবে এবং বলিবে, "আমি তোমারই ধন-সম্পদ, আমি তোমারই রক্ষিত পুঁজি।"

হযরত রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই বক্তব্যের পর ইহার সমর্থনে কোরআন শরীফের নিম্ন আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন—

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ - سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ -

অর্থঃ—যাহারা আল্লাহ্ তায়ালারই দয়ায় দেওয়া ধন-সম্পদে কৃপণতা করে তাহারা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, তাহাদের এই কৃপণতা বা এই ধন-সম্পদ তাহাদের জন্য হিতকর ও মঙ্গলজনক হইবে। বরং ইহা তাহাদের জন্য অতি জঘন্য ও বিষময় ফলদায়ক হইবে। অচিরেই কেয়ামতের দিন এই কৃপণতার ধন-সম্পদকে তাহার গলার গলাবন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। (তোমরা কেন কৃপণতা কর? অথচ—) বিশ্বের সব কিছু আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতাধীনে থাকিয়া যাইবে (তুমি রিক্ত হস্তে চলিয়া যাইবে, সঙ্গে কিছুই নিতে পারিবে না)। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতিটি কর্মের খোঁজ রাখেন। (৪ পাঃ ৯ রুঃ)

৭৩৫। হাদীছঃ—তাবেয়ী আহ্নাফ-ইবনে-কায়েস (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি (পবিত্র মদীনায় মসজিদের মধ্যে কোরায়েশ বংশীয় কয়েকজন লোকের মজলিসে বসিলাম। এমন সময় অতি সাধারণ বেশধারী একজন লোক মজলিসের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং সালাম করিলেন। তিনি বলিলেন—"যাহারা ধন-দৌলত পুঁজি করিয়া রাখে তাহাদিগকে

এই সংবাদ জানাইয়া দাও যে, তাহাদের প্রত্যেককে পরকালে এই শাস্তি দান করা হইবে যে, এক খণ্ড পাথর জাহান্নামের অগ্নিতে ভীষণ উত্তপ্ত করিয়া উহাকে বুকের উপর স্তনস্থলে* রাখা হইবে; সেই পাথর খণ্ড বুকের হাড্ডি-মাংস ইত্যাদি ভস্ম করতঃ সব কিছু ভেদ করিয়া পিঠের দিকে বাহির হইয়া আসিবে। পুনরায় পিঠের দিকে রাখা হইবে এবং ঐরূপে ভেদ করিয়া বুকের দিকে বাহির হইয়া আসিবে।"

এই বলিয়া ঐ লোকটি সে স্থান হইতে দূরে সরিয়া মসজিদের একটি থামের নিকটবর্তী যাইয়া বসিলেন, আমিও তাঁহার নিকটে যাইয়া বসিলাম। আমি কিন্তু অখনও তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত নহি। (লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবু-জর গেফারী (রাঃ)। তখন আমি বিশেষভাবে তাঁহার সন্নিকটবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি বর্ণনা করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে যাহা শুনিয়াছি কেবলমাত্র তাহাই বর্ণনা করিয়াছি।) আমি বলিলাম, আপনার বক্তব্যের প্রতি উপস্থিত লোকদিগকে বিশেষ সন্তুষ্ট মনে হইল না। তিনি বলিলেন, এই সকল ব্যক্তিরা নির্বোধ। (অতঃপর এই প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা করিলেন যে, একদা) আমার মাহবুব নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিয়াছিলেন, হে আবু-জর! তুমি ওহোদ পাহাড় দেখিতেছ কি? আমি আরজ করিলাম, হাঁ—দেখিতেছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আমার নিকট হইলে তাহাও আমি আমার জন্য জমা রাখিব না, উহার সম্পূর্ণ (আল্লার রাস্তার) দান করিয়া দিব, শুধু মাত্র তিনটি মুদ্রা রক্ষিত রাখিব—(একটি পরিবারবর্গের খরচের জন্য, একটি ঋণ পরিশোধের জন্য, একটি গোলাম আজাদ করার জন্য)।

(আবু-জর (রাঃ) বলিলেন,) **এ সমস্ত** ব্যক্তিরা জ্ঞান-শূন্য বুদ্ধিহীন; এরা টাকা জমা করিতেছে। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত আমি কখনও তাহাদের ধনের প্রত্যাশী হইব না (তাই আমি তাহাদের অসন্তোষে ভীত নহি) এবং তাহাদের নিকট আমি ধর্ম বিষয়ও শিখিতে যাইব না। (কেননা আমি স্বয়ং রসুলুল্লার নিকট হইতে ধর্মজ্ঞান অর্জন করিয়াছি।)

ব্যাখ্যাঃ—আবু-জর গেফারী (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। তিনি দুনিয়ার ধন-দৌলতের প্রতি অতিশয় বিরাগী ও বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন, এমনকি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উম্মতের মধ্যে উক্ত গুণের প্রতীক রূপে আবু-জর গেফারীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আবু-জর (রাঃ) সাধারণ প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-সম্পত্তির পুঁজিপতি হওয়া নাজায়েয বলিতেন; পূর্বালোচ্য আয়াত ও হাদীছসমূহকে সরাসরি অর্থের উপরই

---

* এই বরাবরই অন্তর বা হৃদয় অবস্থিত। এই শাস্তির জন্য উক্ত স্থানটির বিশেষত্ব অতি সমীচীন; কারণ যাকাত না দেওয়া ও দান-খয়রাত না করার মূল হেতু ধন-দৌলতের মোহ, এবং উহা এই অন্তরেই জড়ানো থাকে।

পরিচালিত করিতেন যে, অতিরিক্ত ধন-দৌলতের পুঁজিপতি প্রত্যেকেই শাস্তির উপযুক্ত সাব্যস্ত হইবে। তিনি তাঁহার এই মতের প্রতি অতিশয় দৃঢ়, অবিচল ও অটল ছিলেন। এমনকি তিনি সকলকে স্বীয় মতের অনুসারী করার চেষ্টায় সক্রিয় থাকিতেন, যদ্দরুণ সময় সময় বিতর্কের সৃষ্টি হইত। এতদ্দৃষ্টে খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরামর্শে তিনি স্বীয় বাসস্থান দামেশক, তৎপর মদীনা শহর ত্যাগ পূর্বক স্বেচ্ছায় মদীনার দূরে "রাবাযা" নামক জনশূন্য স্থানে বসবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত সেখানেই অবস্থান করিয়া দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, খলীফার আদেশ মান্য করা ফরয; তাঁহার পরামর্শ ছিল, আমি যেন শহরতলীতে বাস করি। কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় উহার উর্দ্ধে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়াছি।

কিন্তু শরীয়তে আবু-জর (রাঃ)-এর মতামতের ন্যায় কড়াকড়ি আরোপ না করিয়া এই বিধান বলবৎ করা হইয়াছে যে, যাকাত দান করিয়া অবশিষ্ট-অংশ প্রয়োজনাতিরিক্ত হইলেও উহা জমা রাখা জায়েয। পূর্বোল্লিখিত আয়াত ও হাদীছে বর্ণিত শাস্তি ঐ পুঁজিপতিদের প্রতি প্রযোজ্য যাহারা যাকাত ইত্যাদি আদায় না করিবে। এই বিষয়টির ব্যাখ্যা করিয়াই ইমাম বোখারী (রঃ) পরবর্তী পরিচ্ছেদটি উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন যে, যাকাত ভিন্ন গরীব-কাঙ্গালদিগকে আরও বহুমুখী সাহায্য দানের নির্দেশ শরীয়তে বলবৎ রহিয়াছে, ইতিপূর্বে উহার কিছু ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ঐসব সাহায্য দানের প্রতি সক্রিয় থাকাও ধনাঢ্যদের কর্তব্য। তদুপরি সদা-সর্বদা দুঃখী-দরিদ্র, গরীব-কাঙ্গালের সাহায্যে অকাতরে ধন লুটাইতে থাকাও শরীয়তের দৃষ্টিতে অতি প্রশংসনীয়। এই বিষয়টির ব্যাখ্যায়ও ইমাম বোখারী (রঃ) একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, সৎকার্য্যে ধন দান করাতে অগ্রণী হওয়া চাই, এবং ৬৪নং হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

যে ধন-সম্পদের যাকাত দেওয়া হইবে উহা কঠোর শাস্তির ধন-সম্পদের শ্রেণীভুক্ত নহে

৭৩৬। হাদীছঃ— খালেদ ইবনে আসলাম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে ভ্রমণরত ছিলাম। এক গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কোরআন শরীফের যেই আয়াতে এরূপ বলা হইয়াছে যে, "যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য পুঁজি করিয়া রাখিবে এবং উহা আল্লার রাস্তার খরচ করিবে না তাহাদিগকে উহার দ্বারা দাগান হইবে" এই আয়াতের মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, উহার উদ্দেশ্য এই যে—যে ব্যক্তি ধন-দৌলত পুঁজি করিয়া রাখিবে এবং উহার যাকাত আদায় না করিবে তাহার জন্য ভীষণ শাস্তি; শরীয়ত কর্তৃক যাকাতের নিয়ম বলবৎ হওয়ার পর যাকাতকে ধন-দৌলদের পবিত্রকারক তথা উহার সঞ্চয় বৈধকারক গণ্য করা হইয়াছে।

৭৩৭। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে ওয়াহব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি "রাবাজাহ্" এলাকা দিয়া যাইতেছিলাম। তথায় আবু-জর গেফারী (রাঃ)কে দেখিতে পাইলাম। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কারণে আপনি এই এলাকায় বসবাস অবলম্বন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি ত সিরিয়ায় থাকিতাম! সেখানে (তথাকার শাসনকর্তা) মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং আমার মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়; আমি তথায় এই আয়াত পড়িয়া বেড়াইতাম—

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

মোয়াবিয়া (রাঃ) বলিতেন, এই আয়াত ইহুদ-নাছারা পাদ্রীদের (হারাম পন্থায় ধন সঞ্চয়ের) ব্যাপারে নাযেল হইয়াছিল। আর আমি বলিতাম, মোসলমানদের ধন সঞ্চয়ের ব্যাপারেও এই আয়াত প্রযোজ্য। আমাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের দরুণ বিতর্কও বাধিয়া থাকিত। মোয়াবিয়া (রাঃ) আমার প্রতি অভিযোগ রূপে বিষয়টি খলীফা ওসমানের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। সেমতে আমার মদীনায় চলিয়া আসিবার জন্য খলীফা ওসমান (রাঃ) আমাকে লিখিলেন। আমি মদীনায় চলিয়া আসিলাম। মদীনায় আমার নিকট লোকদের ভিড় হইতে লাগিল, তাহারা যেন পূর্বে আর আমাকে দেখে নাই। খলীফা ওসমান (রাঃ)কে আমি এই অবস্থা জানাইলাম; তিনি বলিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলে শহর হইতে সরিয়া নিকটবর্তী শহর-তলীতে অবস্থান করিতে পারেন। (আমি বলিলাম, আমাকে রাবাজায় বসবাসের অনুমতি দিন। পূর্ব হইতেই তথায় আবু-জর গেফারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর যাতায়াত ছিল। ওসমান (রাঃ) অনুমতি দিলেন। ফতহুলবারী ৩—২১২।) এই ঘটনাই আমাকে এই এলাকার বাসিন্দা বানাইয়াছে। একটি হাবশী গোলামকেও আমার উপর খলীফা নির্বাচিত করা হইলে আমি তাঁহার কথা মানিয়া চলিব এবং তাঁহার আদেশের অনুসরণ করিব।

ব্যাখ্যা ঃ—মূল ঘটনা সম্পর্কে কতিপয় জরুরী তথ্য—

● রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিরোধানের পর অনেক ছাহাবীর পক্ষেই রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাড়া মদীনায় বসবাস অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল; তাঁহারা বিভিন্ন এলাকায় চলিয়া গিয়াছিলেন। বেলাল (রাঃ)কে শত চেষ্টা করিয়াও মদিনায় রাখা যায় নাই, তিনি সিরিয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন। আবু-জর গেফারী (রাঃ)ও তদ্রূপ সিরিয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন।

● আবু-জর গেফারী (রাঃ) একজন বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-জীবনকে ভালবাসিতেন। নবী (দঃ) তাহার সম্পর্কে বলিয়াছেন—ابوذر مسيح هذه الامة আবু-জর এই উম্মতের সন্ন্যাসী। কোন কোন

বস্তু ও অবস্থা ব্যক্তিগতরূপে স্থানে স্থানে উত্তম ও ভালই পরিগণিত হয়, কিন্তু ঐ বস্তু ও অবস্থাই ব্যাপক আকারে হওয়া অনুমোদিত হয় না। বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-জীবন তদ্রূপই। আবু-জর গেফারী (রাঃ) ছাহাবীর জন্য হযরত (দঃ) উহাকে প্রশংসারূপেই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ব্যাপক আকারে এবং সাধারণ নীতিরূপে উহার সম্পসারণকে হযরত (দঃ) মোটেই অনুমোদন করেন নাই। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—لا رهبانية في الاسلام—বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-জীবন ইসলামের নীতি নহে।

আবু-জর গেফারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জীবনের উপর বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-স্বভাবের অত্যধিক প্রাবল্য ছিল, তাই স্বাভাবিক ভাবেই তিনি সর্বত্র এই অবস্থাকেই দেখিতে চাহিতেন। এমনকি এই অবস্থার সমর্থনে তিনি পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটিও ব্যবহার করিতেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

"যাহারা স্বর্ণ-চান্দি (তথা ধন-দৌলত) জমা করিয়া রাখে এবং উহাকে আল্লার নির্দ্ধারিত পথে খরচ করে না তাহাদিগকে ভীষণ যাতনাদায়ক আজাবের সংবাদ শুনাইয়া দাও।" এই আয়াতে আজাবের সাবধানবাণী রহিয়াছে; যেই শ্রেণীর লোকদের জন্য এই সাবধানবাণী তাহাদের সম্পর্কে আয়াতে স্পষ্টরূপে দুইটি ক্রিয়াপদ উল্লেখ আছে—একটি হইল, "য়্যাক্‌নেযুনা" অর্থাৎ ধন-দৌলত জমা করিয়া রাখে। অপরটি হইল, "লা-য়ুন্‌ফেকুনাহা ফী ছাবীলিল্লাহ্" অর্থাৎ আল্লার নির্দ্ধারিত পথে তথা আল্লার প্রবর্তিত বিধান ক্ষেত্রে খরচ করে না। আবু-জর গেফারী (রাঃ) স্বীয় বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-স্বভাবের অনুকূলে উক্ত আয়াতকে দাঁড় করাইবার জন্য উল্লেখিত দ্বিতীয় ক্রিয়াপদটির উদ্দেশ্য ব্যাপক আকারের সাব্যস্ত করিতেন—যে, সঞ্চিত ধন আল্লার রাস্তায় ব্যয় তথা সম্পূর্ণ দান-খয়রাত করিয়া না দিলে উহা আজাব ভোগের কারণ হইবে। অপর দিকে আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ছাহাবীগণ আয়াতে উল্লেখিত উভয় ক্রিয়াপদের ব্যাখ্যা এই করিতেন যে, যাহারা ধন জমা করিয়া রাখে এবং আল্লার বিধান ক্ষেত্রে খরচ করে না তাহাদের জন্য আজাবের সাবধানবাণী। সুতরাং ধন জমা রাখিলেই আজাব হইবে না, বরং আল্লার বিধান ক্ষেত্রে খরচ করা ব্যাতিরেকে জমা রাখিলে আজাব হইবে। এতদ্ভিন্ন এই আয়াত সম্পর্কে আর একটি বাহ্যিক সাধারণ দৃষ্টির বিষয়ও ছিল যাহা মোয়াবিয়া (রাঃ) বলিয়াছিলেন যে, ইহুদ-নাছারা পাদ্রীদের হারাম উপায়ে ধন সঞ্চয়ের বয়ান প্রসঙ্গে এই আয়াত বর্ণিত রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনে এই আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও ইহা প্রমাণ করে।

আবু-জর গেফারী (রাঃ) যাহা বলিতেন, উহা আয়াতের প্রকৃত ও বাস্তব তফছীর ছিল না, বরং তাঁহার ভাবাবেগের সামঞ্জস্যে আয়াতের মর্ম চয়ন করা ছিল মাত্র। নতুবা যদি কোন অবস্থাতেই ধন জমা রাখার বৈধতা না থাকা এই আয়াতের মর্ম হয় তবে এই আয়াত পবিত্র কোরআনেরই অসংখ্য আয়াতে বর্ণিত যাকাতের বিধান, হজ্জের বিধান ও মীরাছ বা পরিত্যক্ত ধন উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টনের বিধান ইত্যাদির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ, ধন জমা না থাকিলে যাকাত কিসের হইবে? হজ্জ কাহার উপর ফরজ হইবে? মিরাছ বন্টন কিসের উপর হইবে?

আবু-জর গেফারী (রাঃ) স্বীয় ভাবাবেগে অননুমোদিত ধনধারীদের সহিতও বিতর্ক করিতে থাকিতেন, স্থানে স্থানে কঠোরতাও প্রয়োগ করিতেন। তিনি প্রবীণতম ছাহাবী ছিলেন; সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তাই তাঁহার বিতর্ক ও কঠোরতায় অনেকের সম্মুখে জটিলতার সৃষ্টি হইত। ঐরূপ ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই মোয়াবিয়া (রাঃ) খলীফা ওসমানের নিকট সমুদয় ব্যাপার লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন খলীফা তথা রাষ্ট্রপ্রধান সকলের উপরে মুরব্বী।

● মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরোধ ও বিতর্ক শুধু এই একটি আয়াতের ব্যাপারেই ছিল না। আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্বভাবে অনাড়ম্বরতার সহিত সরলতাও ছিল। হিজরী ২৫সনে এক ইহুদী বাচ্চা আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকরূপে মোসলমানদের দলভুক্ত হইয়া মোসলেম জাতীর মূলে কুঠারাঘাত হানার জন্য একটি ষড়যন্ত্রকারী দল সৃষ্টি করিয়াছিল; যে দলটি ইতিহাসে খারেজী দল নামে পরিচিত—যাহাদের ষড়যন্ত্রের বিরাট ইতিহাস সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে। সেই দলটির অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিলেন মোয়াবিয়া (রাঃ)। সেই ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রী দলের লোকেরা আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সরলতার সুযোগ লইয়া তাঁহাকে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে অতি সহজেই উত্তেজিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। কারণ, মোয়াবিয়া (রাঃ) তৎকালীন বৃহত্তম প্রতিবেশী শত্রু রোমানদের সীমান্ত দেশ সিরিয়ার গভর্ণর ছিলেন; সেই শত্রুকে প্রভাবান্বিত রাখার জন্য তিনি শাসন পরিচালনায় এবং নিজের উপরও আড়ম্বর ও জাক-জমকের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এই ব্যবস্থা খলীফা ওমর (রাঃ)-এর সময় হইতেই ছিল; মোয়াবিয়া (রাঃ) খলীফা ওমর কর্তৃকই সিরিয়ার গভর্ণর নিয়োজিত ছিলেন। খলীফা ওমর তাঁহার এই ব্যবস্থার জন্য কৈফিয়তও তলব করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যকে বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখিয়া ওমর (রাঃ) তাঁহাকে তাঁহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আড়ম্বর ও জাক-জমকের ব্যবস্থা বৈরাগ্যাভিলাষী সন্ন্যাসী-স্বভাবপূর্ণ আবু-জর

গেফারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। এতদিন পেছনে খোচানেওয়ালা কেহ ছিল না, তাই সেই দিকে তাঁহার লক্ষ্যপাত হয় নাই। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের ষড়যন্ত্রকারী দলের খোচানিতে তাঁহার চক্ষু জাগ্রত হইতেই মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিপুল সংখ্যক দোষ তাঁহার দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার উপর অভিযোগের পর অভিযোগ আনিতে লাগিলেন। সেই সব অভিযোগ তাঁহার সন্ন্যাস-স্বভাবের দৃষ্টিতে মোটেই অবাস্তব ছিল না। আবার মোয়াবিয়া (রাঃ)ও তাঁহার শাসনপ্রজ্ঞার দৃষ্টিতে ঐ সব ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য ছিলেন, যদ্দরুণ খলীফা ওমরের স্থায় কঠোর ব্যক্তিও ঐ ব্যাপারে তাঁহাকে অভিযোগমুক্ত রাখিয়াছিলেন। মোয়াবিয়া (রাঃ)ও আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; তাঁহার অভিযোগসমূহের দ্বারা জটিলতা সৃষ্টির আশংকায় তিনি সর্বময় ব্যাপার খলীফা ওসমান (রাঃ)কে লিখিয়াছিলেন এবং খলীফার পরামর্শ অনুযায়ী বিশেষ সম্মান ও উপঢৌকন ইত্যাদির সহিত আবু-জর গেফারী রাজিয়াল্লাহু আনহুর মদীনায় পৌঁছার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

● মদীনায় পৌঁছিবার পর আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট লোকদের খুবই ভিড় হইতে লাগিল। কারণ, তিনি পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে এমন কথা বলিতেছিলেন যাহার সমর্থনে অন্য আর কোন ছাহাবীই ছিলেন না। লোকদের ভীড় করার তিনি নিজেই উত্যক্ত হইয়া খলীফা ওসমানের নিকট বিরক্তি প্রকাশ করতঃ ঐ অবস্থার আলোচনা করিয়াছিলেন। তখনও খলীফা তাঁহাকে মদীনা ত্যাগের কোন আদেশ মোটেই দেন নাই, বরং আবু-জর (রাঃ)কে তাঁহার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর পূর্বক তাঁহার বিরক্তিকর অবস্থার অবসানের জন্য পরামর্শ দান-স্বরূপ বলিয়া ছিলেন, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে মদীনার শহর হইতে সিরিয়ার নিকটবর্তী কোন স্থানে বসবাস করিতে পারেন। তাঁহার নিজস্ব মনোভাবরূপে এই পরামর্শ দানকালেও খলীফা ওসমান (রাঃ) আবু-জর (রাঃ)কে মদীনার সংলগ্ন নিকটবর্তী শহরতলীর কোন স্থানে থাকিবার অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আবু-জর (রাঃ) নিজেই উহার বিপরীত অভিপ্রায় নিজের সুবিধার্থে পেশ করিলেন। মদীনা শহর হইতে মক্কার পথে প্রায় ৪০।৫০ মাইল দূরে "রাবাযা" নামক একটি স্থান ছিল; পূর্ব হইতেই তথায় আবু-জর গেফারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর যাতায়াত ছিল। তিনি সেইখানে বসবাস করা পছন্দ করিলেন; ইহা খলীফা ওসমানের অভিপ্রায়ের পরিপন্থি ছিল বিধায় আবু-জর (রাঃ) খলীফার নিকট উহার অনুমতি চাহিলেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) আবু-জর (রাঃ)কে তাঁহার নিজের পছন্দের উপর রাখা ভাল মনে করিয়া অনুমতি দিলেন। সেমতে আবু-জর (রাঃ) মদীনা হইতে রাবাযায় চলিয়া গেলেন। বাকি জীবনটুকু সেই এলাকায়ই কাটাইয়া তথায়ই চিরনিদ্রা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মাজার এখনও তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

● মোসলেম জাতির চিরশত্রু আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের ষড়যন্ত্রকারী দল আবু-জর গেফারী (রাঃ)কে সম্মুখে রাখিয়া মোসলমানদের জাতীয় ঐক্যে আঘাত করার কুচেষ্টা অনেকই করিয়াছিল। কিন্তু আবু-জর (রাঃ) সরল হইলেও মোসলেম জাতির ঐক্যে ফাটল সৃষ্টির বিষময় ফল ভালভাবেই উপলব্ধি করিতেন। তাই তিনি তাহাদের সেই প্রস্তাবে তাহাদের মুখ কালা করিয়া তাহাদেরে সম্পূর্ণ নিরাশ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের ষড়যন্ত্রকারী দলটির তৎকালীন কেন্দ্র ছিল "কুফা" অঞ্চলে।

প্রসিদ্ধ ইতিহাস-গ্রন্থ তবকাতে-ইবনে সাআদে বর্ণিত আছে—কুফা অঞ্চলের কতিপয় লোক রাবাযা এলাকায় আসিয়া আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহারা তাঁহাকে বলিল, এই লোকটা (অর্থাৎ খলীফা ওসমান) আপনার সহিত কত কত অসৌজন্য ব্যবহার করিয়াছে! আপনি আমাদের পতাকাবাহী হইয়া দাঁড়ান, আমরা আপনাকে কেন্দ্র করিয়া ঐ লোকটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। উত্তরে আবু-জর (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, খলীফা ওসমান (রাঃ) যদি আমাকে দেশান্তরিত করিয়া দুনিয়ার শেষ প্রান্তেও পাঠাইয়া দেন তবুও আমি তাঁহার আজ্ঞাবহ ও অনুগত থাকিব (ফতহুলবারী, ৩—২১২)। বোখারী শরীফের মূল আলোচ্য হাদীছেও সর্ব শেষ বাক্যে আবু-জর (রাঃ) অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত সেই শুভ মতবাদ ও সেনোশী আদর্শের উক্তিই করিয়াছেন।

বর্তমান যুগে পরের ধন ছিনাইবার মতবাদধারীরা আবু-জর গেফারী (রাঃ)কে নিয়া খুব টানা হেঁছড়া করে, কিন্তু ঐ শ্রেণীর লোক তাঁহার উল্লিখিত আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না। এতদ্ভিন্ন ঐ লোকেরা পরের ধন ছিনাইবার জন্য ত আবু-জর (রাঃ)কে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের দুষ্ট দলের ন্যায় সম্মুখে পতাকাবাহীরূপে দেখাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু আবু-জর গেফারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিজের জীবনের উপর যেই বৈরাগ্য ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ছিল ঐ লোকদের ব্যক্তিগত জীবনে উহার লেশমাত্র নাই।

আবু-জর (রাঃ) নিজে এত অধিক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, মৃত্যু সময় তাঁহার নিকট কাফনের ব্যবস্থাও ছিল না। মৃত্যুশয্যায় তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতেছিলেন। মুমূর্ষ অবস্থায় স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাঁদ কেন? তিনি বলিলেন, কাঁদি এই জন্য যে, আপনি ইহজগৎ ত্যাগ করিলে আপনাকে কাফন দেওয়ার কি ব্যবস্থা করিব? আবু-জর (রাঃ) স্ত্রীকে বলিলেন, সেই চিন্তা তুমি করিবে না। আমার মৃত্যু হইয়া গেল তুমি পর্বত শিখরে দাঁড়াইয়া সজোরে বলিও—الا ان اباذر قد مات হায়! আবু-জরের মৃত্যু হইয়া গিয়াছে!!

অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার প্রতীক্ষমান মুহূর্ত আসিয়া গেল। অছিয়ত অনুযায়ী তাঁহার স্ত্রী পর্বতশিখরে দাঁড়াইয়া ঐ ধ্বনি দিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) সহ এক দল লোক ঐ পথে যাইতেছিলেন, তাঁহাদের কর্ণে ঐ ধ্বনি পৌঁছিল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাসস্থানে উপস্থিত

হইলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) নিজের পাগড়ী দ্বারা তাঁহার কাফন দিলেন। এই ছিল আবু-জর গেফারীর ব্যক্তিগত জীবনে বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-স্বভাবের রূপ। আর তাঁহার জীবনের এইরূপের মূলে যাহা ছিল তাহা ছিল খোদাভীরুতার অদমনীয় অগ্নি—যাহার আভাস নিম্নের হাদীছে পাওয়া যায়।

আবু-জর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কসম খোদার—(মৃত্যুর পর মানুষ যেসব অবস্থার সম্মুখীন হইবে) যদি তোমরা উহা জানিতে, যেরূপ আমি জানি তবে নিশ্চয় তোমরা সারা জীবন হাসিতে কম, কাঁদিতে বেশী এবং বিবি লইয়া আরামের বিছানায় সুখভোগ করিতে না; নিশ্চয়ই তোমরা ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া মাঠে-ময়দানে চলিয়া যাইতে। আল্লার নিকট চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতে। আবু-জর (রাঃ) এই হাদীছ বর্ণনা করিয়া আবেগপূর্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বলিতেন—يا ليتني كنت شجرة تعضد হায়…! কতই না ভাল হইত যদি আমি একটা গাছরূপে দুনিয়াতে জন্ম নিতাম যাহা কাটিয়া ফেলা হয়!! অর্থাৎ আখেরাতের হিসাব-নিকাশ মানুষের জন্য। অতএব তাহার সম্মুখেই সঙ্কট; গাছ-বৃক্ষ লতা-পাতারূপে দুনিয়ায় জন্ম নিলে কোন ভয় বা সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইত না। উহা কাটিয়া ফেলা হইত; তাহার উপরই উহার সমাপ্তি ঘটিত; হিসাব-নিকাশের বালাই তাহার সম্মুখে আসিত না। (মেশকাত শরীফ ৪৫৭)

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করুন—এই শ্রেণীর সন্ন্যাস-স্বভাব ও দুনিয়ার সব কিছু হইতে সম্পূর্ণ অনাসক্ত সরল মানুষের ভাবাবেগ লইয়া ছিনিমিনি খেলা সঙ্গত হইবে কি? এবং যেই স্বভাব ও অনাসক্তির প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার ঐ ভাবাবেগ সৃষ্টি হইয়াছিল সেই স্বভাব ও অনাসক্তিকে আয়ত্ব করা ব্যতিরেকে ঐ মানুষটির শুধু ভাবাবেগের উক্তি লইয়া মাঠে নামিয়া পড়া ছল-চাতুরী বৈ আর কি হইবে?

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আলোচ্য পরিচ্ছেদে এই সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া ইমাম বোখারী (রাঃ) প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতের সাবধানবাণী ও আজাবের সংবাদ ঐ লোকদের জন্য যাহারা আল্লাহ তায়ালার বিধান ক্ষেত্রে খরচ করা ব্যতিরেকে ধন জমা করে। ইহাই সমস্ত ছাহাবীগণের মত। একমাত্র আবু-জর গেফারী (রাঃ) তাঁহার বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-স্বভাবের প্রভাবে উহার ব্যতিক্রম বলিতেন, উহা ইসলামের বিধান ও নীতি নহে। অবশ্য আল্লার বিধানগত মাল খরচের ক্ষেত্র দুই প্রকার—এক প্রকার নির্দ্ধারিত যেমন, যাকাত। দ্বিতীয় প্রকার অনির্দ্ধারিত, যাহার প্রতি ইঙ্গিত দানে ইমাম বোখারী (রঃ) পরবর্তী পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন—উহা বিশেষ লক্ষণীয়।

——(০)——

মালের উপর যে সব হক আছে সেই সব হক আদায়ের ক্ষেত্রে মাল খরচ করা

পূর্বেই বলা হইয়াছে স্বীয় ধন হইতে দান করার ব্যাপারে আল্লার বিধানগত ক্ষেত্র দুই প্রকার—নির্দ্ধারিত, যেমন যাকাত; আর এক হইল অনির্দ্ধারিত। আলোচ্য পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় তথা মাল দানে আল্লার বিধানগত অনির্দ্ধারিত ক্ষেত্র আলোচনাই উদ্দেশ্য। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের দুইটি আয়াত বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

(১) وَلٰكِنَّ الْبِرَّ .... وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى

وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ ...... وَاٰتَى الزَّكٰوةَ......

ইসলাম ও ঈমানের চাহিদা বা দাবী এবং কর্তব্যাবলীর বর্ণনায় ইহা একটি বিশেষ আয়াত। আয়াতটির পূর্ণ তফছীর প্রথম খণ্ডে ঈমানের অধ্যায়ে "ঈমানের শাখা-প্রশাখা পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে শুধু একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ইসলামের কর্তব্যরূপে প্রথম দিকে বলা হইয়াছে—"ধনের মহব্বৎ স্বভাবতঃ অন্তরে গ্রথিত থাকা সত্ত্বেও ধন দান করিবে আত্মীয়দেরকে, এতীমদিগকে, দরিদ্রদিগকে, নিঃসম্বল পথিককে এবং ভিক্ষুককে, আর দাসত্বে আবদ্ধ মানুষকে মুক্ত করিতে। তারপর শেষের দিকে আর এক কর্তব্যরূপে বলা হইয়াছে—যাকাত আদায় করিবে।" এই বর্ণনায় ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, ধন দানে প্রথমোক্ত কর্তব্যটি যাকাত নামের নির্দ্ধারিত কর্তব্য হইতে পৃথক কর্তব্য। এই তথ্যটি এই আয়াতের বরাত দানে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিজী শরীফের এক হাদীছে আছে—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় ধনীদের মালের উপর যাকাত ভিন্ন অন্য হকও রহিয়াছে। নবী (দঃ) তাঁহার এই উক্তির প্রমাণে আলোচ্য আয়াতটি তেলাওয়াত করিয়াছেন।

(২) وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ (২৭ পাঃ ১৮ রুঃ)

ঠিক এই শব্দাবলীর মাধ্যমেই ২৯ পারা ৭ রুকুতেও একখানা আয়াত রহিয়াছে। উভয় স্থানেই আল্লাহ তায়ালা কোন্ শ্রেণীর লোক বেহেশত লাভ করিবে উহার বর্ণনা দানে বিভিন্ন গুণাবলীর মধ্যে এই গুণটিও উল্লেখ করিয়াছেন—"তাহাদের ধনের মধ্যে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের হক রহিয়াছে—সেই লক্ষ্য তাহারা রাখে।"

প্রথম আয়াতটির মর্ম বর্ণনায় রসুলের মুখেই "হক" শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে—যাহা মালের উপর যাকাত ভিন্ন প্রবর্তিত; দ্বিতীয় আয়াতেও আল্লার কালামেই "হক" শব্দ ব্যবহৃত আছে। ধনীদের মালের উপর সেই হকের আলোচনায়ই বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদটি

বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হক্কের ক্ষেত্র প্রথম আয়াতে ছয়টি উল্লেখ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে উহা হইতেই দুইটির উল্লেখ হইয়াছে—ভিক্ষুক এবং বঞ্চিত; বঞ্চিত বলিতে প্রথম আয়াতে উল্লেখ্য দরিদ্রই উদ্দেশ্য। এই ক্ষেত্র সমূহে মাল দান করার দুইটি পর্য্যায় আছে—একটি হইল মোস্তাহাব তথা অধিক ছওয়াব লাভ ও আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রশংসণীয় পর্য্যায়। এই পর্য্যায়ে সর্বদা দান-খয়রাত করার প্রতি ইসলামে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্য্যায় হইল ফরজ তথা শরীয়ত কর্তৃক বাধ্যতামূলক। এই পর্য্যায়টি বিশেষ অবস্থায় প্রযোয্য। যথা—কেহ অনাহারে বা অভাবের দরুন কিম্বা অন্য কোন এমন কারণে যাহার প্রতিকার টাকা-পয়সা দ্বারা হইতে পারে মৃত্যুর সম্মুখীন হইলে সে ক্ষেত্রে সামর্থবান ব্যক্তির উপর ফরজ হইবে তাহার প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করা। এমনকি দেশে এরূপ অবস্থা ব্যাপক আকার ধারণ করিলে উহার প্রতিকারের জন্য সুশৃঙ্খলপে ধনধারীদের উপর প্রয়োজন পরিমাণ কর আরোপের বিধানও ইসলামের আছে। অবশ্য এক্ষেত্রে শরীয়তের অন্য দুইটি বিষয় বিশেষরূপে পালণীয়।

প্রথম :—দেশের জলজ, বনজ ও খনিজ ইত্যাদি সমুদয় প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে ইসলামী বিধানে গরীব কাঙ্গালের জন্য এক বড় অংশ রক্ষিত ও নির্দ্ধারিত আছে; তদুপরি রাষ্ট্রিয় বিভিন্ন আয় ও অধিকারে গরীব-কাঙ্গালের জন্য অংশ রক্ষিত আছে। প্রথমতঃ দেশের দারিদ্র দূরীকরণে এবং উহার প্রতিরোধে ঐ সব নির্দ্ধারিত অংশ সমূহ নিয়মিত উহার পাত্র সমূহে ব্যয়িত হইতে থাকিবে। আর দেশের সকল সামর্থবান হইতে নিয়মিত যাকাত এবং খামারের মালিকদের হইতে নিয়মিত ওশর উহার পাত্র সমূহে ব্যয়িত হইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন জাতীয় ধনভাণ্ডার বাইতুল-মালকে ইসলামী বিধান মতে জনগণের অভাব মোচনে নিয়মিত চালু রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয় :—বেকারদিগকে কাজ করিতে এবং রোজগারীদেরকে তাহাদের আয় অপচয় ও অপব্যয় হইতে রক্ষা করিতে বাধ্য করিতে হইবে।

দেশের সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় আয় রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রী মণ্ডলী এবং হোমরা-চোমরাদের বড় বড় বেতন-ভাতা, গাড়ী-বাড়ী, বিভিন্ন এলাউন্সে ও ভোগ-বিলাসে খরচ করা হইবে, দেশের বাজেটে গরীব-কাঙ্গালের কোন খাত থাকিবে না—আর দেশের অভাব মোচনের জন্য বৈধ ধনধারীদের ধন কাড়িয়া আনা হইবে—ইসলাম এই নীতি সমর্থন করে না। তদ্রূপ কার্য্যক্ষম ব্যক্তি কাজ না করিয়া কিম্বা স্বীয় উপার্জন মদ-তাড়ি, সিনেমা-থিয়েটার ইত্যাদি পথে ব্যয় করিয়া বঞ্চিত সাজিবে; আর তাহাদের অভাব মোচনে বৈধরূপে ধন সঞ্চয়কারীদের ধন ছিনাইয়া আনা হইবে—ইহাও ইসলাম সমর্থন করে না।

——(*)——

খ্যাতি অর্জন ও লোক-দেখানো উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করার পরিণতি

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَايُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ. فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا. لَايَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا. وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ.

অর্থ—হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় দান-খয়রাতকে বিনষ্ট করিও না—উপকার গ্রহণকারীকে কষ্ট দিয়া বা তাহার উপর কটাক্ষ পূর্বক উপকার করার বুলি আওড়াইয়া; ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে রিয়া—খ্যাতি অর্জন বা লোক দেখানো উদ্দেশ্যে দান করিয়া থাকে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানও রাখে না। (তদ্রূপ তাহার দান-খয়রাত বিনষ্ট হইয়া পরকালে নিশ্চিহ্ন ও অস্তিত্বহীন হইয়া যায়।) তাহার দান-খয়রাতের অবস্থা এরূপ যেমন—একটি মসৃণ পাথরের উপর কিছু ধুলা-বালু জমিয়াছে, অতঃপর উহার উপর প্রবল বারিপাত হইয়া ঐ পাথরটিকে পরিষ্কারভাবে ধৌত করিয়া দিয়াছে। (এ ক্ষেত্রে যেরূপ ঐ পাথরের উপর ধুলা-বালুর নাম নিশানও বাকি থাকিতে পারে না যাহার উপর কোন উদ্ভিদ জন্মিতে পারে—তদ্রূপ পরকালে ঐ ব্যক্তির দান-খয়রাতেরও কোন নাম-নিশানা থাকিবে না যাহার উপর সে ছওয়াব লাভ করিতে পারে, তাই) ঐ ব্যক্তি স্বীয় কৃত দান খয়রাতের ফলাফল কিছুই লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। যাহারা আল্লার নীতি ও নির্দেশকে অস্বীকার করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে (বেহেশতের) পথ দান করিবেন না। (৩ পাঃ ৪ রুঃ)

এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, চারিটি কারণে দান-খয়রত নিষ্ফল ও বিনষ্ট হয়। যথা—(১) যাহাকে দান করা হইয়াছে তাহার প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করতঃ তাহাকে কষ্ট দেওয়া। (২) যাহাকে দান করা হইয়াছে তাহার উপর কটাক্ষ করতঃ দান করার ও উপকার করার বুলি আওড়ান—খোঁটা দেওয়া। (৩) রিয়া—খ্যাতি অর্জন করা বা লোক দেখানো উদ্দেশ্যে দান করা। (৪) দান-খয়রাতকারী ব্যক্তি ঈমানহীন কাফের হওয়া।

হারাম মালের দান-খয়রাত আল্লার নিকট গ্রহণীয় নয়

একমাত্র হালাল উপায়ে অর্জিত ধন-দৌলতের দান-খয়রাত আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণীয় হইয়া থাকে। কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন—

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى ـ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ

অর্থ—যাচ্ঞাকারীকে মিষ্ট ভাষায় ফিরাইয়া দেওয়া এবং তাহার উৎপীড়নে ক্ষমা প্রদর্শন করা ঐরূপ দান-খয়রাত হইতে উত্তম, যদ্বারা কাহাকেও কষ্ট দেওয়া এবং মর্মাহত করা হয়। আল্লাহ কাহারও প্রত্যাশী নহেন (তবুও মানুষকে শুধু তাহাদের নিজ স্বার্থেই দান-খয়রাতের প্রতি আহ্বান করিয়া থাকেন) এবং তিনি অতি সহিষ্ণু; (তাই তিনি অনেক সময় স্বীয় বিরুদ্ধাচরণকারীকে তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করেন না (৩ পাঃ ৩ রুঃ)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ـ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ـ
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ
اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ـ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

অর্থ—সুদে অর্জিত মালকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করিয়া দিয়া থাকেন। আর দান খয়রাতকে আল্লাহ তায়ালা বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন—অর্থাৎ পরকালে উহার প্রতিদান দান করিবেন এবং সেই প্রতিফল সম পরিমাণ হইবে না, বহুগুণ বেশী হইবে। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপাচারীকে পছন্দ করেন না। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক কাজ করিয়াছে বিশেষতঃ নামায উত্তমরূপে আদায় করিয়াছে, যাকাত দান করিয়াছে তাহাদের জন্য প্রতিফল নির্দিষ্ট রহিয়াছে তাহাদের পালনকর্তার নিকট এবং তাহারা কোন আশঙ্কার সম্মুখীন হইবে না এবং চিন্তিত হইবে না। (৩ পাঃ ৬ রুঃ)

এই আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, সুদে অর্জিত ধনের দান-খয়রাত গ্রহণীয় নহে। কারণ সুদ ধ্বংসের সম্মুখীন, আর দান-খয়রাত আল্লাহ তায়ালার নিকট রক্ষণাবেক্ষণের বস্তু। তদ্রূপ কোন প্রকার হারাম মালের দান-খয়রাতই গ্রহণীয় নহে।

১৩৮। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ

وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهٖ
كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهٗ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে অর্জিত একটি খুরমা তুল্য বস্তু দান করিবে; স্মরণ রাখিও, আল্লাহ তায়ালা একমাত্র হালালকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার ঐ দানকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া দানকারীকে প্রতিফল দানের নিমিত্ত উহাকে অতি যত্নের সহিত লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকেন। যেরূপ তোমাদের মধ্যে ঘোড়ার মালিক স্বীয় ঘোড়ার বাচ্চাকে সযত্নে প্রতিপালন করিয়া থাকে। এমনকি (প্রতিপালনের দ্বারা) ঐ সামান্য দানের ফলাফল পাহাড় সমতুল্য হইয়া যাইবে।

দান-খয়রাতের প্রতি অগ্রণী হওয়া চাই; এক সময় দান গ্রহণকারী লুপ্ত হইয়া যাইবে

৭৩৯। হাদীছঃ— حارثة بن وهب رضى الله عنه قال سمعت
النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَاِنَّهٗ يَاْتِىْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِى
الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهٖ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَّقْبَلُهَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْجِئْتَ بِهَا بِالْاَمْسِ
لَقَبِلْتُهَا فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِىْ بِهَا -

অর্থ—হারেছ ইবনে ওহাব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যথাসাধ্য তোমরা দান-খয়রাতের প্রতি অগ্রণী হও; তোমাদের সম্মুখে এমন এক সময় আসিবে যখন এক একজন দাতা স্বীয় দানের বস্তু লইয়া ঘোরা-ফেরা করিতে থাকিবে, কিন্তু উহা গ্রহণকারী পাইবে না। কাহাকেও গ্রহণ করার অনুরোধ করিলে সে উত্তর করিবে, গতকাল এই দান আমি গ্রহণ করিতাম; অদ্য ইহার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই।

৭৪০। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه
قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ
فَيَفِيْضَ حَتّٰى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَّقْبَلُ صَدَقَتَهٗ وَحَتّٰى يَعْرِضَهٗ فَيَقُوْلَ الَّذِىْ
يَعْرِضُهٗ عَلَيْهِ لَا اَرَبَ لِىْ -

অর্থ---আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে---নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের তথা মহাপ্রলয়ের পূর্বক্ষণে নিশ্চয় এই অবস্থা হইবে যে, তোমাদের নিকট ধন-দৌলতের আধিক্য হইয়া যাইবে। এমন কি ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ চিন্তিত হইবে যে, তাহাদের দান গ্রহণকারী কে হইবে? কাহাকেও দানের অনুরোধ করিলে সে বলিবে, আমার প্রয়োজন নাই।

৭৪১। হাদীছঃ---আ'দী ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। দুই ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে একজন দারিদ্রের অভিযোগ করিল, অপর ব্যক্তি (জান, মাল ও মহিলাদের মান-ইজ্জৎ সম্পর্কে) রাস্তা নিরাপদ না হওয়ার অভিযোগ জানাইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, রাস্তা নিরাপদ না হওয়ার ক্লেশ সত্বরই দূরীভূত হইবে। অল্প দিনের মধ্যেই (ইসলামের শাসন ও প্রভাব বিস্তারের দ্বারা) দেখিতে পাইবে---মদীনা হইতে সুদুর মক্কা নগরী পর্য্যন্ত বণিক দল নিরাপদে ভ্রমণ করিয়া যাইবে, পথের নিরাপত্তার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গোপন খবর সরবরাহকারী প্রহরী স্বরূপ কোন ব্যবস্থারও প্রয়োজন হইবে না। (আরও দেখিতে পাইবে, (ইরাকের কুফা এলাকার) হীরা শহর হইতে (কম-বেশ ১০০০ মাইল) একজন মহিলা একা ভ্রমণ করতঃ মক্কায় আসিয়া হজ্জ সমাপন করিয়া যাইবে---আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও ভয় তাহার করিতে হইবে না।)

দরিদ্রতার বিষয়ে স্মরণ রাখিও যে, কেয়ামত আসিবে না এই অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত যে, এক এক ব্যক্তি স্বর্ণ-রৌপ্য মুঠ ভরিয়া লইয়া দান-খয়রাত করার জন্য ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করিবে, উহা গ্রহণকারী পাইবে না।

(আদী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নিজ চোখে দেখিয়াছি, "হীরা" শহর হইতে একটি মহিলা মক্কায় আসিয়া হজ্জ সমাপন করিয়া গিয়াছে---আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও ভয় তাহার করিতে হয় নাই। তোমাদের সম্মুখ জীবনে নবীজীর ভবিষ্যৎবাণী---স্বর্ণ-রৌপ্য মুঠ ভরিয়া লইয়া ঘোরাফেরা করাও অচিরেই দেখিতে পাইবে। (১০০ হিজরীতে---খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজের আমলে বাস্তবিকই উহা দেখা গিয়াছে।)

× আর একটি বিষয় ভালরূপে জানিয়া রাখিও, তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হইবে এবং দোভাষী বা উকিলের মারফৎ নয়, বরং সরাসরি

× রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উত্তরের সারমর্ম এই যে, ধন-দৌলত অস্থায়ী বস্তু এবং ধন-দৌলত সংশ্লিষ্ট সুখ-দুঃখও অস্থায়ী। তাই এসবের সমাধানে মগ্ন হওয়া অপেক্ষা আখেরাতের নাজাত, কামিয়াবী ও সুখ-শান্তির জন্য অধিক সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যেই রসুলুল্লাহ (দঃ) এখানে আখেরাতের জীবনের একটি অবস্থাকে বিশেষরূপে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে এবং সরাসরি প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হইতে হইবে। আখেরাতের আজাব হইতে রক্ষা পাওয়ার একটি বিশেষ সম্বল হইল দান-খয়রাত।

আল্লাহ তায়ালার প্রশ্ন সমূহের উত্তর তোমার নিজেরই দিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা প্রশ্ন করিবেন, আমি তোমাকে ধন-দৌলত দিয়াছিলাম নয় কি? প্রত্যেকেই উত্তর দিবে, হাঁ—নিশ্চয় নিশ্চয় দিয়াছিলেন। অতঃপর প্রশ্ন করিবেন, আমি তোমার প্রতি রসুল পাঠাইয়াছিলাম নয় কি? প্রত্যেকেই উত্তর দিবে—হাঁ। ঐ সময় ডানে বামে তাকাইয়া দোযখের আগুন ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। (ঐরূপ কঠিন সময়কে স্মরণ করিয়া) প্রত্যেকের আশু কর্তব্য—(সাধ্যানুযায়ী দান-খয়রাত করিয়া) দোযখ হইতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করিয়া যাওয়া; একটি খুরমার অংশমাত্র দান করার সামর্থ থাকিলে তাহাও করিবে। কোন কিছু দানের সামর্থ না থাকিলে, অন্ততঃ উপকারজনক কথা বলিয়া ঐরূপ ছওয়াব হাসিল করিবে। (যেমন—উপদেশমূলক কথা, বিবাদ মিটানোর কথা ইত্যাদি)

৭৪২। হাদীছ:— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ اَحَدًا يَاْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ اَرْبَعُوْنَ اِمْرَأَةً يَلُذْنَ بِهٖ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ ـ

অর্থ—আবু মুছা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মানুষের সম্মুখে এমন এক সময় উপস্থিত হইবে যখন এক একজন লোক স্বর্ণের বোঝা লইয়া দান-খয়রাত করার জন্য ছুটাছুটি করিবে, কিন্তু উহা গ্রহণকারী খুঁজিয়া পাইবে না। এবং পুরুষের সংখ্যা লোপ পাইয়া নারীর সংখ্যা এত অধিক হইবে যে, এক একটি পুরুষের ভরণ-পোষণে চল্লিশ জন নারী আশ্রিতা হইবে।

ব্যাখ্যা:— উল্লিখিত হাদীছ সমূহে দান-খয়রাত গ্রহণকারী পাওয়া যাইবে না বলিয়া যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, উহা কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে বাস্তবায়িত হইবে এবং ধন-দৌলতের আধিক্যের ভবিষ্যদ্বাণীও তখনই প্রকাশিত হইবে। অন্তিম শয্যায় মুমূর্ষু ব্যক্তি যেরূপ মৃত্যুর পূর্বক্ষণে স্বীয় জীবনী শক্তির সর্বশেষ অবশিষ্টাংশটুকুর সর্বস্ব একযোগে প্রকাশ করিয়া দেয়, যদ্দরুন ঐ ব্যক্তিকে মুহূর্তের জন্য সুস্থবৎ দেখা যায়, কিন্তু বস্তুতঃ উহাই তাহার অবলুপ্তির সর্বশেষ নিদর্শন। কারণ, জীবনী শক্তির কণামাত্রও তখন আর তাহার দেহাভ্যন্তরে অবশিষ্ট নাই, সে উহার সবটুকুই বাহির করিয়া দিয়াছে। তদ্রূপ ভূমণ্ডলও তাহার অন্তিম সময় স্বীয় বক্ষে প্রোথিত স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, জহরৎ ইত্যাদি খনিজ ধন-দৌলত এবং উদ্ভিদ উৎপাদনের শক্তি ও ক্ষমতার সমগ্র অবশিষ্টাংশটুকু একযোগে প্রকাশ ও বাহির করিয়া দিবে। যাহার ফলে উদগীর্ণ বস্তুর ন্যায় স্বর্ণ রৌপ্যের পাহাড় উদ্ভাসিত

হইয়া উঠিবে। ভূমির উর্বরা শক্তির প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভিদের এত উন্নতি ও প্রাচুর্য্য হইবে যে, এক একটি আনার চল্লিশজনের আহারের জন্য যথেষ্ট হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। (এই সবের বিবরণ ইন্‌শা-আল্লাহ্ তায়ালা ষষ্ঠ খণ্ডে বর্ণিত হইবে।) এমতাবস্থায় কে দান-খয়রাতের প্রত্যাশী হইবে? এতদ্ব্যতীত তখন বিশ্বমানব ভয়-ভীতি ও বিভীষিকাবস্থায় জর্জরিত থাকিবে। তেমন অবস্থায় ধন-দৌলতের স্পৃহা থাকিবে না—ইহার পূর্বে দান-খয়রাতই প্রশংসনীয়।

দান-খয়রাত অল্প হইলেও নিয়্যত খালেছ হইলে উহার প্রতিফল অনেক বেশী

আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন—

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ. فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

অর্থ—যাহারা স্বীয় ধন-দৌলত দান করিয়া থাকে আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং নিজকে নেক কার্য্যে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্যে, তাহাদের দানকৃত বস্তুর অবস্থা ঐ বাগিচার ন্যায় যে বাগিচা পাহাড়ি অঞ্চলের কোন উঁচু টিলার উপর অবস্থিত, (যাহার উর্বরাশক্তি অত্যন্ত বেশী হয়) এবং উহার উপর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারিপাত হইয়াছে, ফলে উহার উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ঘটনাক্রমে কোন সময় যদি উহার উপর প্রবল বারিপাত না হইয়া অল্প বৃষ্টিও হয় তবুও উহাতে যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে, (যেহেতু ঐরূপ জমি অতিশয় উর্বরা)। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের সমুদয় কর্মের খোঁজ রাখেন। (৩ পাঃ ৪ রুঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—আয়াতের তাৎপর্য্য এই যে, খালেছ নিয়্যতে আল্লার রাস্তায় দান-খয়রাত উল্লিখিত জমি তুল্য। তাই খালেছ নিয়্যতে অধিক পরিমাণে আল্লার রাস্তায় দান করিলে অত্যধিক প্রতিফল লাভে কোন সন্দেহই নাই। আর অল্প পরিমাণ দান খালেছ নিয়্যতে করিলে উহাতেও যথেষ্ট প্রতিফল লাভ হইবে, যেরূপ উর্বরা জমিতে বৃষ্টি কম হইলেও ফসল যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

৭৪৩। হাদীছ ঃ—আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন দান-খয়রাতের বিশেষ ছওয়াব ও ফজিলত বর্ণিত আয়াত সমূহ নাজেল হইল, তখন আমরা দান-খয়রাতের প্রবল আগ্রহে মাতিয়া উঠিলাম। এমনকি, বোঝা বহন ইত্যাদি গায়ে খাটা পারিশ্রমিক দ্বারা দান-খয়রাতের সুযোগ লাভে সচেষ্ট হইলাম। (আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) নামক

ধনী ব্যবসায়ী) এক ছাহাবী একদা অনেক মাল খয়রাত করিলেন। মোনাফেকরা দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিল, সে লোক-দেখানো উদ্দেশ্যে দান করিতেছে। (আবু আকীল (রাঃ) নামক) আর এক ছাহাবী (বোঝা উঠাইয়া সেই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পারিশ্রমিক দ্বারা) প্রায় চারি সের খাদ্যবস্তু খয়রাত করিলেন। তখন মোনাফেকরা এরূপ বিদ্রূপোক্তি করিল যে, আল্লাহ তায়ালা তোমার এই অল্প পরিমাণ দানের প্রত্যাশী নহেন।

মোনাফেকদের ঐরূপ কু-উক্তির নিন্দায় এই আয়াতটি নাজেল হইল—

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ - سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

অর্থাৎ—উহারা মোনাফেক, যাহারা ঐসব মোমেনগণের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে, যাহারা মনের খাহেশ ও উৎসাহে সন্তুষ্টচিত্তে (অধিক মাল) দান-খয়রাত করিয়া থাকে এবং ঐ মোমেনগণের প্রতিও কটাক্ষ করে যাহারা অতি কষ্টে অর্জিত (অল্প পরিমাণ) পারিশ্রমিক হইতে অধিক কিছু দান করিতে সক্ষম না হওয়ায় ঐ অল্প পরিমাণ দান-খয়রাত করিয়া থাকে; দুরাচার মোনাফেকরা তাহাদের প্রতি বিদ্রূপোক্তি করিয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালা ঐসব দুরাচারদিগকে তাহাদের এই কু-কর্মের প্রতিফল ভোগে বাধ্য করিবেন এবং তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। (১০ পাঃ ১৬ রুঃ)

৭৪৪। হাদীছঃ—আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় ছাহাবীদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহিত করিলে সে উৎসাহে মাতিয়া উঠিত; এমনকি হাটে বাজারে যাইয়া মোট বোহন ইত্যাদি পরিশ্রমের কাজ করিয়া সামান্য কিছু উপার্জন করিয়া আনিত (এবং উহা দান করিত। সেই যমানায় সাধারণতঃ ছাহাবীদের জমা করা ধন-দৌলত ছিল না।) আজ এক একজন মোসলমান লক্ষপতি। (কিন্তু দান-খয়রাতের সেই আগ্রহ ও উৎসাহের শিথিলতা পরিলক্ষিত হইতেছে।)

৭৪৫। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একটি ভিখারিণী দরিদ্রা নারী আমার ঘরে আসিল, তাহার সঙ্গে তাহার দুইটি শিশু কন্যাও ছিল। আমি তাহাকে একটি মাত্র খুরমার অধিক আর কিছুই দিতে পারিলাম না। ঐ খুরমাটি পাইয়া সে নিজে উহার একটু অংশও খাইল না, কন্যাদ্বয়কে দিয়া দিল; অতঃপর সে চলিয়া গেল। এমতাবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার গৃহে তশরীফ আনিলেন। আমি তাঁহাকে ঐ ঘটনা শুনাইলাম। নবী (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি মেয়েদের ভরণ-পোষণ জোটানোর জন্য কষ্ট সহ্য করিয়া যাইবে ঐ ব্যক্তির জন্য সেই মেয়েগণ দোযখ হইতে পরিত্রাণের অবলম্বন হইবে।

ধনের প্রতি আকর্ষণ ও প্রয়োজন থাকাবস্থায় দান করা অধিক প্রশংসনীয়

অর্থাৎ—অনেক সময় মানুষ এমন অবস্থায় পতিত হয় যে, তখন দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু হইতে সে বিচ্ছেদ ও বিদায় অতি সন্নিকটে দেখিতে থাকে। এমতাবস্থায় কোন বস্তুর প্রয়োজন বা কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণ তাহার অন্তরে স্থান পায় না। তেমন অবস্থায় দান-খয়রাত করিলেও ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে না বটে, কিন্তু এরূপ অবস্থার পূর্বেই দান-খয়রাত করা অধিক প্রশংসনীয়, উহার কারণ অতি সুস্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ - وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

অর্থ—তোমরা আমারই প্রদত্ত ধন হইতে আমার রাস্তায় দান কর মৃত্যু উপস্থিত হইবার পূর্বে। নতুবা মৃত্যু উপস্থিত হইলে পর তখন অনুতপ্ত হইয়া এক একজন এই উক্তি করিবে, হে পরয়ারদেগার! কেন আমাকে আরও কিঞ্চিৎ সময় ও সুযোগ দান করিলেন না, তবেই ত আমি দান-খয়রাত করিতাম এবং নেক কাজ করিয়া নেক লোকদের দলভুক্ত হইতাম? স্মরণ রাখিও—কোন প্রাণীর মৃত্যু-সময় উপস্থিত হইলে পর তাহাকে আর (বাঁচিয়া থাকিবার জন্য) এক মুহূর্ত সময়ও দান করা হইবে না। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমুদয় কৃত কর্মের খোঁজ রাখেন (২৮ পাঃ ১৪ রুকু)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ -

অর্থ—হে মোমেনগণ! আমার দেওয়া ধন হইতে আমার রাস্তায় খরচ কর ঐ দিন আসিবার পূর্বে যে দিন কোন প্রকার খরিদ-বিক্রী তথা ব্যবসায়ের সুযোগ থাকিবে না এবং শুধু বন্ধুত্ব না সুপারিশ কার্য্যকরী হইবে না। (৩ পাঃ ২ রুঃ)

৭৪৬। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপ দান-

খয়রাতের ছওয়াব বেশী হয়? নবী (দঃ) বলিলেন, এমন অবস্থায় দান খয়রাত করা যখন তুমি সুস্থ সবল আছ, ধনের প্রতি তোমার আকর্ষণ বিদ্যমান আছে, দরিদ্র অভাবগ্রস্ত হওয়ার ভয়-ভীতিও আছে এবং তুমি ধনাঢ্য থাকার প্রতি লালায়িত আছ—এইরূপ অবস্থায় দান করার ছওয়াব বেশী।

দান-খয়রাত করিতে এরূপ বিলম্ব করিও না যে, যখন তোমার শেষ নিঃশ্বাস কণ্ঠনালী পর্যন্ত আসিয়া গিয়াছে, তখন তুমি (দরিদ্র-মিছকীনদের নাম লইয়া) বলিতে থাক, অমুককে এত দিলাম, অমুককে এত দিলাম। অথচ তুমি যে অবস্থায় পৌছিয়াছ সে অবস্থায় স্বীয় ধন-দৌলতের উপর হইতে তোমার কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়া উহার উপর উত্তরাধিকারিগণের স্বত্ব স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। (এমতাবস্থায় তুমি সমুদয় ধন দান করিয়া ফেলিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না)।

মছআলাহ ঃ—মানুষ মৃত্যুশয্যায় পতিত হইলে পর তাহার সত্ত্বাধিকার ও কর্তৃত্ব স্বীয় ধন-সম্পত্তির মাত্র এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়,বাকি দুই তৃতীয়াংশের সঙ্গে উত্তরা-ধিকারিগণের স্বত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যায়। উল্লিখিত হাদীছে এই বিষয়ই উল্লেখ আছে।

৭৪৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এক বিবি তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, (আপনি যদি আমাদের পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান তবে) আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়ায় আমাদের মধ্য হইতে অগ্রগামিনী কে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহার হস্ত অধিক লম্বা সে-ই আমার সহিত মিলনে অগ্রগামিনী হইবে। এতদশ্রবনে বিবিগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাত কঞ্চি দ্বারা মাপিলেন। দেখা গেল, ছওদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার হস্ত সর্বাধিক লম্বা। (তখন সকলেই ভাবিলেন, তিনিই সর্বাগ্রে মিলন লাভে সৌভাগ্যবতী হইবেন), কিন্তু পরে আমরা বুঝিতে পারিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বাক্যে—"যাহার হস্ত অধিক লম্বা" এর উদ্দেশ্য ছিল অধিক দানশীলতা। কারণ হযরতের ইহজগত ত্যাগের পর বিবিগণের মধ্য হইতে যিনি সর্বাগ্রে হযরতের মিলন লাভ (অর্থাৎ মৃত্যু বরণ) করেন তিনি হইলেন যয়নব (রাঃ); অথচ যয়নব (রাঃ) বিবিগণের মধ্যে খর্বকায় ছিলেন, তাঁহার হস্তও খাটছিল। কিন্তু তিনি সর্বাধিক দানশীলা ছিলেন। (তিনি নানাবিধ হস্ত কার্যের দ্বারা উপার্জন করিয়া তাহা দান-খয়রাত করিতে অভ্যস্তা ছিলেন। দান-খয়রাতের প্রতি তাঁহার ন্যায় অনুরাগিণী আর কেহই ছিলেন না)।

প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করা

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -

অর্থ—যাহারা স্বীয় ধন (আল্লার রাস্তায়) দান করিয়া থাকে রাত্রিকালে এবং দিনের বেলায়, গোপনে এবং প্রকাশ্যে, তাহাদের জন্য তাহাদের (কর্মের) পুরস্কার তাহাদের পরওয়ারদেগারের নিকট নির্দ্ধারিত রহিয়াছে এবং তাহারা কোন ভয়ের সম্মুখীন হইবে না এবং দুশ্চিন্তারও সম্মুখীন হইবে না। (৩ পাঃ ৬রুঃ)

গোপনে দান-খয়রাত করা

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ - وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ - وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ -

অর্থ—যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর তবে তাহা অত্যন্ত ভাল কাজ, আর যদি গোপনভাবে গরীব দুঃস্থকে দান কর তবে তাহা অধিক উত্তম এবং দান-খয়রাত তোমাদের গোনাহের বিলুপ্তি সাধন করিবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমুদয় কৃতকর্মের খবর রাখেন। (৩ পাঃ ৭ রুঃ)

এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) প্রথম খণ্ডে অনূদিত ৪০০নং হাদীছখানার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

অজ্ঞাতসারে অনুপযুক্ত পাত্রে দান করিলে ?

৭৪৮। **হাদীছ** ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি ঘটনা বর্ণনা করিলেন—এক ব্যক্তি একদা রাত্রিবেলায় এই পণ করিল যে, এই রাত্রে আমি কিছু দান-খয়রাত করিব। এই পণ করিয়া সে দানের বস্তু লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল এবং একজনকে দান করিল। ঘটনাক্রমে ঐ দানগ্রহণকারী একজন চোর ছিল। ভোর হইলে পর সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল রাত্রিবেলায় এক চোরকে খয়রাত দান করা হইয়াছে। ঐ দানকারী ব্যক্তি ইহা জানিতে পারিয়া আল্লার প্রশংসা ও শোকরিয়া আদায় করিল (যে, এরচেয়ে অধিক জঘন্য পাত্রে তাহার দান প্রদত্ত হয় নাই)। পরদিন রাত্রে পুনরায় সে ঐরূপ পণ করিল এবং দানের বস্তু লইয়া বাহির হইল। আজ তাহার দান একটি পতিতা নারীর হাতে পড়িল। ভোর হইলে পর সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, অদ্য রাত্রে এক অসতী পতিতা নারীকে খয়রাত দান করা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি এই ঘটনা জানিতে পারিয়া আল্লার প্রশংসা ও শোকরিয়া আদায় করিল (যে, এরচেয়ে অধিক জঘন্য পাত্রে তাহার দান প্রদত্ত হয় নাই)। পরদিন রাত্রে আবার সে ঐরূপ পণ করিয়া দানের বস্তু লইয়া বাহির হইল। আজ তাহার

দান এক ধনাঢ্য ব্যক্তির হাতে পড়িল (যে দান-খয়রাতের যোগ্য পাত্র নহে)। ভোর হইলে লোকের মধ্যে এই কথাবলি হইতে লাগিল যে, অদ্য রাত্রে এক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে খয়রাত দান করা হইয়াছে। এইবার ঐ দানকারী ব্যক্তি ঘটনা জানিতে পারিয়া এই উক্তি করিল যে, হে আল্লাহ! আমার দান চোরের হস্তে, অসতী নারীর হস্তে এবং দানের অযোগ্য ধনাঢ্য ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হইয়াছে—সর্বাবস্থায়ই তোমার প্রশংসা ও শোকর যে, তুমি আমাকে তৌফিক দান করিয়াছ। (কিন্তু সে ভাবিল, তাহার দান যোগ্য ও শুদ্ধ পাত্রে প্রদত্ত না হওয়ায় তাহার দান নিষ্ফল হইয়াছে।) স্বপ্নের মধ্যে কেহ আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দান পূর্বক বলিয়া গেল, স্মরণ রাখিও! তোমার যে দান চোরের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে (তাহা আল্লার দরবারে কবুল হইয়াছে, কারণ) উহা দ্বারা এই সুফল ফলিতে পারে যে, ঐ চোর এই ধন পাইয়া চুরি পরিত্যাগ করতঃ সাধু হইয়া যাইতে পারে। তদ্রূপ যে দান পতিতার হাতে প্রদত্ত হইয়াছে (তাহাও কবুল হইয়াছে, কারণ) উহার এই সুফল ফলিতে পারে যে, ঐ পতিতা এই ধনের অছিলায় স্বীয় পতিতাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া সৎ হইয়া যাইতে পারে। অতঃপর যে দান ধনাঢ্য ব্যক্তির হস্তে পড়িয়াছে (উহাও কবুল হইয়াছে, কারণ) উহার দ্বারা এই সুফল ফলিতে পারে যে, ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি দান করার অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা লাভ করিয়া সে স্বীয় ধন আল্লার রাস্তায় খরচ করায় অভ্যস্ত হইতে পারে।

অজ্ঞাতসারে স্বীয় পুত্রকে দান-খয়রাত করিলে

৭৪৯। **হাদীছ** ঃ—ইয়াযীদ (রাঃ) নামক ছাহাবীর পুত্র মাআ'ন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং আমার পিতা ও পিতামহ আমরা সকলে একত্রেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হস্তে ইসলাম গ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলাম। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং আমার বিবাহ প্রস্তাব দান করিয়াছিলেন এবং বিবাহ পড়াইয়াছিলেন। (অর্থাৎ হযরতের সঙ্গে আমাদের প্রগাঢ় সম্পর্ক ছিল;) একদা আমি তাঁহার খেদমতে নালিশ করিলাম যে, আমার পিতা কতগুলি স্বর্ণ-মুদ্রা খয়রাত করার নিয়্যতে (যোগ্য পাত্রে উহা দান করার জন্য) মসজিদের মধ্যে এক ব্যক্তির নিকট রাখিয়া আসিলেন। ঐ ব্যক্তি আমার পরিচয় জানিত না এবং আমিও এই মুদ্রাগুলি আমার পিতা কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়া জ্ঞাত ছিলাম না। আমি নিঃস্ব গরীব ছিলাম; নিজস্ব কোন সম্পদ আমার ছিল না, তাই ঐ ব্যক্তি ঐ স্বর্ণ-মুদ্রাগুলি আমাকে দান করিলেন, আমিও উহা গ্রহণ করিলাম। আমার পিতা এই ঘটনা জানিতে পারিয়া আমাকে বলিলেন, এই মুদ্রা তোমাকে দান করার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। (অর্থাৎ আমার নিয়্যতের পরিপন্থী হওয়ায় ইহা ফিরাইয়া দিতে হইবে।) আমি উহা ফেরৎ দিতে রাজি না হইয়া রসুলুল্লাহ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করিলাম। হযরত (দঃ) আমার পিতাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি যে, দান করার নিয়্যত করিয়াছ তাহার ছওয়াব পুরাপুরিই লাভ করিবে (যদিও অজ্ঞাতসারে উহা তোমারই পুত্রের হস্তগত হইয়াছে) এবং আমাকে বলিলেন, তুমি যাহা লইয়াছ তুমি উহার মালিক সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছ।

নছীহত ও শিক্ষা ঃ—যাকাত, ফেৎরা ইত্যাদি ফরয ওয়াজেব দান অবশ্যই শরীয়ত কর্তৃক নির্দ্ধারিত পাত্রে দিতে হয়। যাকাত গ্রহণের অযোগ্য পাত্র যেমন—নেছাব পরিমাণ মালের মালিক বা স্বীয় সন্তান-সন্ততি বা পিতা-মাতা ইত্যাদিকে যাকাত, ফেৎরা দিলে আদায় হইবে না। আলোচ্য হাদীছের দান যাকাত ছিল না, নফল ছদকা ছিল, নফল ছদকা নিজের গরীব সন্তানকে দেওয়া যায়।

স্বীয় প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু হইতে দান করিবে

শরীয়ত অনুমোদিত দান-খয়রাত উহাই যদ্দরুণ নিজে কাঙ্গাল হইতে না হয় বা কোন ওয়াজেব হক আদায় করিতে ব্যাঘাত না ঘটে। দান-খয়রাত করিয়া নিজে ভিখারী হওয়া বা স্বীয় পরিবারবর্গকে ভিখারী করা শরীয়ত বিরোধী কাজ। তদ্রূপ ঋণ পরিশোধ না করিয়া খয়রাত করা, দান করা ইত্যাদি শরীয়ত বিরোধী। এমনকি, কোন ব্যক্তি ঋণে পূর্ণ পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িলে অর্থাৎ তাহার সম্পূর্ণ সম্পত্তির সমান ঋণ থাকিলে মহাজনদের অভিপ্রায় অনুসারে শাসন পরিচালক কাজী ঐ ব্যক্তির উপর দান-খয়রাত ইত্যাদি হস্তান্তর কার্য্যে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তন করিবেন। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির দান-খয়রাত ইত্যাদি প্রযোজ্য গণ্য হইবে না, বরং মহাজনের হক রক্ষার্থে এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক কৃত দান-খয়রাতের বস্তু ফেরত লওয়া হইবে। কারণ, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করিবে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার প্রতি ধ্বংস হওয়ার বদ-দোয়া করিয়াছেন।

আলোচ্য বিষয়ের দলীল এই—কা'আব ইবনে মালেক (রাঃ) ছাহাবী এক ঘটনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন যে, আমি স্বীয় গোনাহ হইতে তওবা করার সঙ্গে ইহাও করিতে চাই যে, আমার সমুদয় ধন-সম্পত্তি আল্লার রাস্তায় দান করিয়া দিব। রসুলুল্লাহ (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, সমুদয় ধন দান না করিয়া কিছু সম্পত্তি নিজের জন্যও রাখ, ইহাই তোমার জন্য উত্তম ও শ্রেয়ঃ পন্থা। তখন তিনি তাহাই করিলেন।

কোন ব্যক্তি যদি (নিজের এবং পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণে) আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কোল ও ভরসা স্থাপন করায় শীর্ষস্থানের অধিকারী হয় এবং তাহার ধৈর্য্যগুণ অত্যন্ত দৃঢ় ও প্রবল হয় তবে এরূপ ব্যক্তিবিশেষের জন্য এই প্রকার দান-খয়রাত করা জায়েয আছে যে, নিজের খাবার ব্যবস্থা না রাখিয়া গরীবের প্রতি লক্ষ্য করতঃ সর্বস্ব দান করিয়া দেয়। একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আহবানে সাড়া দিয়া আবু বকর (রাঃ) এইরূপ করিয়াছিলেন। (যথাস্থানে এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হইবে)।

৭৫০। হাদীছ :— قال ابو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, উত্তম দান-খয়রাত উহা যাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু হইতে করা হইয়া থাকে। স্বীয় ধন প্রথমে উহাদের জন্য ব্যয় কর যাহাদের ভরণ-পোষণ তোমার জিম্মায় রহিয়াছে।

৭৫১। হাদীছ :— عن حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ ـ

অর্থ—হাকিম ইবনে হেযাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, উপরের (অর্থাৎ দানকারী) হস্ত নীচের (অর্থাৎ গ্রহণকারী) হস্ত অপেক্ষা উত্তম। অর্থাৎ তুমি দানকারী হইবার চেষ্টা কর; দান গ্রহণকারী হইও না। স্বীয় ধন প্রথমে উহাদের প্রতি ব্যয় কর যাহাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার তোমার উপর ন্যস্ত। উত্তম দান-খয়রাত উহা—যাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু হইতে করা হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি ভিক্ষা করা এবং নিম্ন হস্ত তথা দান গ্রহণকারী হওয়া এড়াইয়া চলায় সচেষ্ট হইবে, আল্লাহ তাহাকে সাহায্য করিবেন যেন সে ঐসব মলিনতা হইতে পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে।

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি প্রত্যাশা পরিহার করায় সচেষ্ট হইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অপ্রত্যাশী থাকার ব্যাপারে সহায়তা করিবেন।

৭৫২। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়াইয়া দান-খয়রাত করা ও ভিক্ষা না করার আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, উপরের হাত দানকারীর হাত এবং নীচের হাত ভিক্ষুকের হাত।

দান করিয়া খোঁটা দেওয়ার পরিণতি

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

অর্থ—যাহারা আল্লার সন্তুষ্টি লাভে তাহাদের মাল (দান করায়) ব্যয় করে তারপর সেই দানের উপর খোঁটা না দেয় এবং উৎপীড়ন না করে তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট প্রতিদান রহিয়াছে এবং আখেরাতে তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না। এবং চিন্তারও কারণ থাকিবে না—(৩ পাঃ ৪ রুঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রমাণ হয় যে, কাহাকেও দান করিয়া তাহাকে খোঁটা দেওয়া হইলে বা উৎপীড়ন করা হইলে সেই দানের কোন ফল আল্লাহ তায়ালার নিকট পাওয়া যাইবে না।

এই মর্মে আরও একখানা আয়াত ৩ পারা ৪ রুকু হইতে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

দান-খয়রাতের জন্য সুপারিশ করা

৭৫৩। হাদীছ ঃ—আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কোন ভিক্ষুক বা অভাবগ্রস্ত প্রয়োজনপ্রার্থী ব্যক্তি আসিলে তিনি উপস্থিত লোকদেরকে আদেশ করিতেন, তোমরা এই ব্যক্তির অভাব মোচনের জন্য আমার নিকট সুপারিশ ও অনুরোধ কর, ফলে তোমরাও ছওয়াব লাভ করিবে। অবশ্য আল্লাহ তালায়া আমাকে যেরূপ তৌফিক দান করিবেন (সর্বাবস্থায়—তোমাদের সুপারিশ ব্যতিরেকেও) আমার মুখে ঐরূপের উত্তরই বাহির হইবে। (কিন্তু তোমরা স্বীয় কার্য্যের ছওয়াব লাভ করিবে।)

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সর্বদা এরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকিতেন যদ্বারা তাঁহার উম্মতগণ অতি সহজে পূণ্য ও ছওয়াব হাসিল করিতে পারে। উল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত শিক্ষাটি ঐরূপ একটি ছওয়াব হাসিলের অন্যতম উপায়। কত সুন্দর উপায়। একজন লোক মনস্থ করিয়াছে দশটি টাকা এক ভিক্ষুককে দান করিবেন এমতাবস্থায়ও যদি কেহ সুপারিশকারী হয় এবং সুপারিশের পরেও সে দশ টাকাই দান করে, এ স্থলে ঐ সুপারিশের দ্বারা কোন অতিরিক্ত ফলোদয় না হওয়া সত্ত্বেও সুপারিশকারী ছওয়াবের ভাগী হইবে। এমনকি, কোন স্থলে দানকারী স্বীয় দান হইতে বিরত থাকিলেও সেস্থলে সুপারিশকারী ছওয়াব লাভ করিবে। ইসলামের বিধান এই যে, নেক কাজের প্রতি আহ্বানেও ছওয়াব লাভ হয়। উল্লিখিত হাদীছের শিক্ষানুযায়ী একটি দানের অছিলায় অনেক লোক ছওয়াব লাভে সক্ষম হইবে।

৭৫৪। হাদীছ ঃ—আছমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিলে তিনি আমাকে বলিলেন, তোমার ধনের থলিয়া গরীব-দুঃখী হইতে বাঁধিয়া রাখিও না, নতুবা আল্লাহ তায়ালাও স্বীয়-ধন-ভাণ্ডার তোমার জন্য বন্ধ করিয়া দিবেন। আল্লার রাস্তায় খরচ করা বন্ধ করিও না এবং কড়া ক্রান্তি হিসাব করিও না। (—হিসাব অপেক্ষা বেশী দাও।) নতুবা আল্লাহ তায়ালাও তোমার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিবেন। যথাসাধ্য আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ কর।

অমুসলিম থাকা অবস্থায় কৃত দান-খয়রাত

৭৫৫। **হাদীছ** ঃ—হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)! আমরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ছওয়াব ও পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে যে সব দান-খয়রাত ইত্যাদি করিয়া থাকিতাম, আমরা কি উহার ছওয়াবের অধিকারী হইব? তদুত্তরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, اسلمت على ما سلف من خير "ইসলামের প্রতিক্রিয়া পূর্ববর্তী ভাল কার্য্য সমূহের উপর প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।"

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লাহ তায়ালার অপার রহমত ও অসীম করুণা যে, কোন ব্যক্তি জীবনের এক বড় অংশ তাঁহার বিদ্রোহীরূপে কাটাইবার পর যখন সে তাঁহার প্রতি ফিরিয়া আসে—তথা ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তাহার জন্য ইসলামের দুইটি দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হইয়া থাকে—(১) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সে যে সকল আল্লাহদ্রোহীতা ও গোনাহের কাজ করিয়াছে ইসলামের বদৌলতে সে সবই মাফ হইয়া যাইবে—الاسلام يهدم ما كان قبله "ইসলাম পূর্ববর্তী গোনাহ সমূহের বিলুপ্তি সাধন করে।" (২) এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে বহু প্রমাণাদির দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, দান-খয়রাত ইত্যাদি যে কোন নেক ও ভাল কাজ আল্লাহ তায়ালার দরবারে গ্রহণীয় হইবার এবং উহার ছওয়াব ও সুফল পাইবার জন্য প্রথম শর্তই হইল ঈমান। ঈমানহীন ব্যক্তির কোন ভাল কাজই গ্রহণীয় নহে। অমুসলিম ব্যক্তি দান-খয়রাত ইত্যাদি ভাল কাজ যতই করিয়া থাকুক, এ শর্তানুসারে সবই নিস্ফল প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পূর্বকৃত ঐসব নিস্ফল ভাল কাজসমূহ সজীব, সতেজ ও সফল হইয়া উঠিবে এবং সে উহার ছওয়াব ও প্রতিদানের অধিকারী হইবে। উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য্য ইহাই।

দান-খয়রাত কার্য্য পরিচালকের ছওয়াব

মালিকের অনুমতি ও আদেশানুযায়ী দান-খয়রাত কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালক ব্যক্তিও ছওয়াবের অধিকারী হইয়া থাকে।

৭৫৬। **হাদীছ** ঃ— عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا

غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—কোন স্ত্রী যদি স্বীয় স্বামীর খাদ্য সামগ্রী হইতে স্বামীর অনিষ্ট ও ক্ষতিসাধন ব্যতিরেকে দান-খয়রাত করে তবে স্বামী যেরূপে মালিকানা স্বত্বে ছওয়াবের অধিকারী তদ্রূপ

স্ত্রীও দান কার্য পরিচালিকারূপে ছওয়াবের অধিকারিণী হইবে। এমনকি, কোষাধ্যক্ষ পর্য্যন্ত ঐ দানের ছওয়াব লাভ করিবে।

ব্যাখ্যা:— অনেক স্থলে দেখা যায়, প্রকৃত মালিক দান-খয়রাতের আদেশ বা অনুমতি দিয়া থাকে, কিন্তু কোষাধ্যক্ষ ম্যানেজার বা কার্য্য পরিচালকগণ স্বীয় কৃপণাত্মক প্রবৃত্তি বা অন্য কোন অজুহাতের দরুণ উহাতে বিরক্তি অনুভব করিয়া থাকে, ফলে সেস্থলে দান-খয়রাত কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে। অতএব, যদি তাহারা ঐ কু-প্রবৃত্তি মুক্ত হইয়া মালিকের ন্যায় উদারতার সহিত দান-খয়রাত কার্য্য পরিচালনা করে তবে তাহারাও ছওয়াব লাভ করিবে।

৭৫৭। হাদীছ:— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْاَمِيْنُ الَّذِىْ يُعْطِى

مَا اُمِرَ بِهٖ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهٖ نَفْسُهٗ فَيَدْفَعُهٗ اِلَى الَّذِىْ اُمِرَ لَهٗ

بِهٖ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ ۔

অর্থ—আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে আমানতদার মুসলমান কোষাধ্যক্ষ স্বীয় মনীবের আদেশানুযায়ী উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রফুল্লতার সহিত আদেশকৃত পাত্রে আদেশকৃত পরিমাণ পুরোপুরিরূপে দান-খয়রাত কার্য্য পরিচালনা করে, সেই কোষাধ্যক্ষও একজন বিশেষ দানশীলরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বামীর ধন দান করা

৭৫৮। হাদীছ:— عن عائشة رضى الله تعالى عنها

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَطْعَمَتِ الْمَرْئَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا اَجْرُهَا وَلَهٗ مِثْلُهٗ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَهٗ بِمَا اكْتَسَبَ

وَلَهَا بِمَا اَنْفَقَتْ ۔

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন কোন স্ত্রী স্বীয় স্বামীর ঘর হইতে গরীব-দুঃখীকে অন্ন দান (বা অর্থ দান) করে, অনিষ্ট ও ক্ষতি সাধন পর্য্যায়ে নহে, তখন সে স্ত্রী স্বীয় দান-কার্য্যের ছওয়াবের অধিকারীণী হয় এবং স্বামীও স্বীয় অর্জিত অন্ন বা ধন খরচ হওয়ার ছওয়াব লাভ করে। এমনকি, সেই ধনের কোষাধ্যক্ষও ছওয়াব লাভ করে।

দান-খয়রাতের সুফল

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ

وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ـ

অর্থ—যে ব্যক্তি দান-খয়রাতকারী হইয়াছে, (আমার) ভয়-ভক্তি অর্জন করিয়াছে এবং ভাল বস্তু (দীন-ইসলাম)কে সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে, আমি অচিরেই তাহার জন্য (দীন-দুনিয়ার) উন্নতি ও সুযোগ সুবিধার পথ সুগম ও সহজ-সাধ্য করিয়া দিব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতাবলম্বী হইয়াছে (আমার) ভয়-ভক্তির আওতা বহির্ভূত হইয়াছে এবং ভাল বস্তু (দীন-ইসলাম)কে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে, অচিরেই আমি তাহার জন্য (দীন-দুনিয়ার) অবনতি ও কষ্ট ক্লেশের পথ সুগম করিয়া দিব। (৩০ পাঃ ছুরা আল্-লাইল)

৭৫৯। হাদীছ ঃ— عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ

اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানবের জাগতিক জীবনের প্রতিটি দিনে দুইজন ফেরেশতা ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা এক প্রকার বিশেষ দোয়া করেন। একজন বলেন—"হে আল্লাহ! তোমার রাস্তায় দানকারীকে উত্তম বিনিময় দান কর।" অপরজন বলেন—"হে আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস নির্ধারিত কর।"

দানশীল ও কৃপণ ব্যক্তিদ্বয়ের বিশেষ দৃষ্টান্ত

৭৬০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তিদ্বয়ের দৃষ্টান্ত এরূপ—যেমন দুই ব্যক্তি তাহাদের প্রত্যেকের গায়ে কড়া-বিশিষ্ট লোহার জামা, যাহা তাহাদের গর্দান ও গলা হইতে সীনা ও বক্ষস্থল পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। (যেরূপ পাঞ্জাবী, পিরহান গায়ে দেওয়ার প্রাথমিক অবস্থায় হয়।) অতঃপর এক ব্যক্তির অবস্থা এরূপ যে, তাহার জামার কড়াগুলি আবশ্যক মত শিথিল ও ঢিলা হইতে থাকায় জামাটি প্রশস্ততর হইয়া সঠিকরূপে তাহার পূর্ণ শরীরকে আবৃত করিয়া লইয়াছে। এমনকি হাতের দিকে নখগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং পায়ের দিকে মাটি পর্যন্ত বাড়িয়া পড়িয়াছে। (ইহা হইল দানশীল ব্যক্তির দৃষ্টান্ত।) তাহার

দানশীলতার স্বভাব তাহার হস্তকে সম্প্রসারিত করে; সে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে দান-খয়রাতের প্রতি অধিক অগ্রণী হইতে থাকে।)

অপর ব্যক্তির অবস্থা এই যে, তাহার জামার কড়াগুলি কঠিন শক্ত ও সঙ্কীর্ণ হইতে থাকায় তাহার জামা তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া চাপিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে সে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিতে পারিতেছে না এবং তাহার জামাও প্রশস্ত হইতেছে না। (ইহা হইল—কৃপণ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত; সে কোন সময় খুশী-অখুশী ইচ্ছা-অনিচ্ছায় দান করার প্রতি একটু অগ্রসর হইতে চাহিলেও তাহার কৃপণাত্মক প্রবৃত্তি তাহাকে অগ্রণী হইতে দেয় না, বরং তাহার হাত পা চাপিয়া রাখে।)

স্বীয় ধন হইতে উত্তম জিনিষ দান করা চাই

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۔ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۔

অর্থ—হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় অর্জিত হালাল মাল হইতে এবং জায়গা-জমিতে যাহা কিছু আমি তোমাদের জন্য উৎপাদন করি উহা হইতে উত্তম জিনিস (আমার রাস্তায়) ব্যয় কর। ঐ সব মাল-সম্পদ হইতে নিকৃষ্ট বস্তুকে দান-খয়রাতের জন্য বাছিয়া লইও না। (বড়ই অনুতাপের বিষয় হইবে যে, তুমি নিকৃষ্ট বস্তুকে আল্লার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করিতে বাছিয়া লও) অথচ ঐরূপ বস্তু কেহ তোমাকে অর্পণ করিলে তুমি তাহা কস্মিনকালেও বিনা দ্বিধায় খুশী মনে গ্রহণ করিবে না; যা নেহায়েত অনিচ্ছাকৃতভাবে। স্মরণ রাখিও—আল্লাহ তায়ালা কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন এবং তিনি সমস্ত প্রশংসার অধিকারী মহাপ্রভু। (৩ পারা, ৫ রুকু)

দান খয়রাত প্রত্যেক মোসলমানের কর্তব্য। ধনের সামর্থ না থাকিলে অন্য উপায়ে উপকার করিবে

৭৬১। হাদীছঃ— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة فقالوا يا نبى

اللّٰهِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهٖ فَيَنْفَعُ نَفْسَهٗ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ

قَالَ يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفِ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوْفِ

وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا لَهٗ صَدَقَةٌ ـ

অর্থ—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দান-খয়রাত করা প্রত্যেক মোসলমানের কর্তব্য। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, হে আল্লার নবী! যাহার সামর্থ্য নাই সে ব্যক্তি কি করিবে? নবী (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, শারীরিক পরিশ্রম করিবে এবং সেই পারিশ্রমিক দ্বারা নিজেও উপকৃত হইবে এবং দান-খয়রাতও করিবে। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, যদি সেরূপ কোন সুযোগ না পায়? নবী (দঃ) বলিলেন, কষ্ট-ক্লেশে পতিত বিপদগ্রস্ত অসহায়কে সহায়তা করিবে। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, যদি সেরূপ ক্ষমতা, শক্তি এবং সুযোগও না পায়? নবী (দঃ) বলিলেন, সৎ ও ভাল কাজ (নিজেও) করিবে (অপরকেও উহার প্রতি আহ্বান জানাইবে, অসৎ কার্য্যে বাধা দান করিবে) এবং (ততটুকু ক্ষমতা না থাকিলে নিজে) মন্দ ও অসৎ কার্য্য হইতে সংযমী হইবে, ইহাই তাহার জন্য দান গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা :—মানুষ প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালার শত শত নেয়ামত উপভোগ করিতেছে, তাই আল্লার বন্দাদের উপকার করা তাহার উপর অবশ্য কর্তব্য। এক হাদীছে বর্ণিত আছে—"তুমি জগদ্বাসীদের প্রতি সদয় হও, সর্বক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রতি সদয় হইবেন।"

অন্যের উপকার করার বিভিন্ন শ্রেণী আছে যথা—টাকা পয়সা দান করা। কাহারও কোন কার্য্য উদ্ধার পূর্বক তাহার কষ্টের লাঘব করিয়া দেওয়া। নিজে সৎপথ অবলম্বন করতঃ অন্যকে সৎপথের প্রতি আহ্বান করা। অসৎ কার্য্যে বাধা প্রদান করা। এমনকি সর্বশেষ পর্য্যায়ের পরোপকার হইল—অসৎ কার্য্য হইতে নিজে বিরত থাকা ও সংযমী হওয়া। কারণ, তাহাতে অন্য সকল তাহার পক্ষ হইতে সর্ব প্রকারের অনিষ্টতা হইতে রক্ষা পাইবে।

কি পরিমাণ মালে যাকাত ফরজ হয়

৭৬২। হাদীছ :— ابو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِّنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ـ

অর্থ—আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, উট পাঁচটির কম হইলে উহার উপর যাকাত ফরজ হইবে না এবং (কাহারও নিকট অন্য কোন মাল না থাকিয়া শুধু মাত্র রৌপ্য থাকিলে) পাঁচ উকিয়া অর্থাৎ দুই শত দেরহাম (সিকি পরিমাণের সামান্য উর্দ্ধের রৌপ্য মুদ্রা) পরিমিত রৌপ্যের কম হইলে উহাতে যাকাত ফরজ হইবে না এবং পাঁচ অছক (প্রতি অছক ছয় মনের উর্দ্ধে)-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যে ছদকা—ওশোর* (দশমাংশ বা তদ্-অর্দ্ধ) দান করা ফরজ হইবে না।

যে কোন বস্তু দ্বারা যাকাত আদায় করা

মোয়া'জ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ামন দেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ইয়ামনবাসীকে এই নির্দেশ দিলেন যে, তোমাদের উৎপন্ন দ্রব্য—যব, চীনা ইত্যাদির যাকাতরূপে দেয় অংশের পরিবর্তে তোমরা জামা, চাদর ইত্যাদি কাপড় দান কর। ইহা তোমাদের জন্য সহজ সাধ্য (কারণ তৎকালে সে দেশে বস্ত্র শিল্পের আধিক্য ছিল) এবং (এই সব জিনিষ যাকাত গ্রহণকারী) মদীনাবাসী—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের জন্যও অধিক উপযোগী। (কারণ মদীনা কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় তথায় কাপড়ের অভাব ছিল।)

যাকাতের ব্যাপারে অপকৌশল অবলম্বন করিবে না

৭৬৩। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা আবু বকর (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক নির্দ্ধারিত যাকাতের যে সনদ-পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন উহাতে ইহাও ছিল যে—যাকাতের ভয়ে ভিন্ন ভিন্ন মালকে একত্রিত করিবে না এবং একত্রিত মালকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে না।

ব্যাখ্যাঃ— যাকাত এড়াইবার জন্য কোন প্রকার অপকৌশলের আশ্রয় লওয়া অত্যন্ত জঘন্য ও গর্হিত কার্য্য। যথা—দুই ভ্রাতা প্রত্যেকের নিকট চল্লিশটি করিয়া বকরী আছে, উভয় ভ্রাতা ভিন্ন ভিন্ন; এমতাবস্থায় দুই ভাই-এর উপর যাকাত দুইটি বকরী আসিবে। বকরীর যাকাতে এই বিধান আছে যে, চল্লিশ হইতে এক শত বিশ পর্য্যন্ত একটি বকরীই আসে; উক্ত ভ্রাতাদ্বয় এই বিধানের সুযোগ গ্রহণার্থে উভয়ের চল্লিশ চল্লিশটি বকরী একত্রে আশিটি একত্রিতভাবে দেখায় যেন উহাতে দুইটির স্থলে একটি বকরী যাকাত হয়। কিম্বা কাহারও নিকট এই পরিমাণ টাকা আছে, যাহার উপর যাকাত ফরজ হইবে; উহা এড়াইবার জন্য কিছু টাকা বে-নামারূপে অন্যকে দিয়া রাখিল যেন নেছাব পূর্ণ না হয় এবং যাকাত ফরজ না হয়—এরূপ কোন অপকৌশলে যাকাত এড়াইতে পারিবে না।

---

* কৃষি ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাতের ন্যায় আল্লার রাস্তায় দান করার বিধান শরীয়তে আছে—উহাকে ওশোর বলে।

বিভিন্ন বস্তুর যে পরিমাণের উপর যাকাত ফরজ হয়

৭৬৪। হাদীছঃ—প্রথম খলীফা আমীরুল-মোমেনীন আবু বকর (রাঃ) আনাছ (রাঃ)কে বাহরাইন দেশের শাসনকর্তারূপে প্রেরণ করাকালে তাঁহাকে যাকাত বিষয়ে নিম্নরূপ একটি সনদ-পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন—*

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক স্বীয় রসুলের প্রতি নির্দেশিত এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক বিশ্ব মোসলেমের উপর নির্দ্ধারিত যাকাতের হার ও বিধান নিম্নরূপ। মোসলমানগণ এই নির্দেশ অনুযায়ী যাকাত দানে বাধ্য থাকিবে এবং এই হারের অধিক দাবী করা হইলে সেই দাবী অগ্রাহ্য হইবে।

উটের যাকাত+ ঃ

(পাঁচ হইতে) চব্বিশটা পর্য্যন্ত উটের যাকাত বকরী দ্বারা আদায় করা হইবে—প্রতি পাঁচটি উটে একটি বকরী দিতে হইবে।

পঁচিশ হইতে পয়ত্রিশটি উটের জন্য পূর্ণ এক বৎসর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হইবে।

ছয়ত্রিশ হইতে পয়তাল্লিশ পর্য্যন্ত পূর্ণ দুই বৎসরের একটি মাদী উট দিবে হইবে।

ছয়চল্লিশ হইতে ষাট পর্য্যন্ত পূর্ণ তিন বৎসরের একটি মাদী উট দিতে হইবে।

একষট্টি হইতে পচাত্তর পর্য্যন্ত চার বৎসরের একটি মাদী উট দিতে হইবে।

ছিয়াত্তর হইতে নব্বই পর্য্যন্ত দুই বৎসরের দুইটি মাদী উট দিতে হইবে।

অতঃপর প্রতি চল্লিশটিতে একটি দুই বৎসরের এবং প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি তিন বৎসরের এক একটি হারে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

শুধুমাত্র চারিটি উট থাকিলে উহার কোন যাকাত দিতে হইবে না, হাঁ—পাঁচটি পুরা হইলে পর উহাতে একটি বকরী যাকাত দিতে হইবে।

বকরীর যাকাত ঃ

দলবদ্ধ ভাবে মাঠে-জঙ্গলে চরিয়া বেড়ায় এরূপ বকরীর জন্য চল্লিশ হইতে একশত বিশ পর্য্যন্ত একটি (এক বৎসর বয়েসর) বকরী দিতে হইবে।

---

* সনদ-পত্রের অংশগুলি ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন, সমস্ত অংশগুলি একত্র করিয়া এক স্থানে অনুবাদ করা হইয়াছে।

+ উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি পালিত পশুপালের উপর যাকাত ফরজ হইবার জন্য কতিপয় শর্ত আছে। সেই সব শর্ত আমাদের দেশে সাধারণতঃ বিরল। অবশ্য পশুপাল যদি ব্যবসায়ের জন্য হয়, তবে উহার যাকাতের নিয়ম অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্যের ন্যায় মুল্য হিসাবে হইবে।

অতঃপর দুইশত পর্য্যন্ত দুইটি বকরী দিতে হইবে। তিনশত হইলে তিনটি বকরী দিতে হইবে। অতঃপর প্রতি শতে একটি করিয়া বৰ্দ্ধিত হইবে। চল্লিশ হইতে একটি কম হইলে উহার উপর যাকাত ফরজ হইবে না, মালিক ইচ্ছা করিলে কিছু দান করিবে।

রৌপ্যের যাকাত ঃ

রূপা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হারে যাকাত দিতে হইবে। কিন্তু (যাকাতের অন্য কোন দ্রব্য না থাকিয়া শুধুমাত্র রৌপ্য থাকিলে দুইশত দেরহাম (তথা ৫২॥ তোলা) হইতে মাত্র এক কম—একশত নিরানব্বই দেরহাম ওজনের হইলেও উহাতে যাকাত ফরজ হইবে না। অবশ্য মালিক ইচ্ছা করিলে কিছু দান করিবে।

কোন ব্যক্তির উপর এক বৎসর বয়সের একটি মাদী উট যাকাতরূপে ফরজ হইয়াছে. (অর্থাৎ তাহার নিকট পঁচিশটি উট আছে) কিন্তু ঐরূপ উট তাহার নিকট নাই, বরং তাহার দুই বৎসর বয়সের একটি মাদী উট আছে, এমতবস্থায় ঐ দুই বৎসর বয়সের উটটি তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে, কিন্তু বিশ দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) বা দুইটি বকরী তাহাকে ফেরত দিতে হইবে। কিন্তু দুই বৎসর বয়সের উটটি মাদী না হইয়া নর হইলে উহাকে গ্রহণ করা হইবে এবং কিছুই ফেরত দেওয়া হইবে না। (কারণ নর উটের মূল্য মাদী উট অপেক্ষা কম। তাই নরের বড় এবং মাদীর ছোট সমান গণ্য হইবে।) এইরূপে তিন বৎসর বয়সের স্থলে চার বৎসর বয়সের থাকিলে তদ্রূপই করা হইবে এবং যদি ইহার বিপরীত হয় অর্থাৎ বড়র স্থলে ছোট থাকে তবে ছোটই গ্রহণ করা হইবে এবং উহার সঙ্গে বিশ দেরহাম বা দুইটি বকরীও ওয়াসিল করা হইবে।

মালিক কর্তৃক যাকাতের পরিমাণ কম করার উদ্দেশ্যে বা যাকাত আদায়কারী কর্তৃক যাকাতের পরিমাণ বেশী করার উদ্দেশ্যে (হিসাবের মধ্যে কোন প্রকার হের-ফের বা হিলা-বাহানা) সংযোগ বা বিভক্তি-করণ জায়েয হইবে না।

যদি দুইজনের এজমালী মাল হইতে যাকাত ওয়াসিল করা হইয়া থাকে, তবে উহা প্রত্যেকের অংশ অনুযায়ী হইবে। সেই হিসাব অনুসারে একে অন্যের নিকট কিছু পাওনা হইলে পরস্পর উহা আদায় ওয়াসিল করিয়া লইবে।

যাকাতের জন্য নর ও বৃদ্ধা বা কোন প্রকার দোষত্রুটিযুক্ত পশু গ্রহণ করা হইবে না, অবশ্য—যদি যাকাত ওয়াসিলকারী ঘটনাস্থলে বাস্তব দৃষ্টিতে উহাকেই গ্রহণ করা উত্তম মনে করে, তবে সে তাহা করিতে পারিবে।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু বকর (রাঃ) উল্লিখিত সনদ-পত্রটি লিখিয়া নিম্নে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সীলমোহর আংটি দ্বারা ছাপ দিয়া দিলেন। যাহার উপর "মোহাম্মদ, রসুল, আল্লাহ" শব্দ কয়টি খচিত ছিল।

আত্মীয়বর্গকে খয়রাত যাকাত দান করা

৭৬৫। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর স্ত্রী যয়নব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মসজিদে ছিলাম, তখন শুনিতে পাইলাম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নারীদিগকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—স্বীয় অলংকারাদি দিয়া হইলেও তোমরা দান-খয়রাত কর। যয়নব (রাঃ) (হস্ত শিল্পীনী ছিলেন—যদ্দারা তিনি কিছু ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ উপার্জন করিতেন। তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহার কতিপয় এতিম অসহায় ভাগিনা-ভাগিনী ছিল এবং তাঁহার স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদও রিক্তহস্ত ছিলেন। তাই তিনি স্বীয় ব্যক্তিগত ধন) স্বীয় স্বামী আবদুল্লাহ (রাঃ) ও পোষ্য এতিমগণের জন্য খরচ করিয়া থাকিতেন। যয়নব (রাঃ) মসজিদে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্ত আদেশ শুনিয়া পরে স্বীয় স্বামীকে বলিলেন, আপনি হযরতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন যে, আমি আপনার এবং আমার লালন-পালনাধীন এতিমগণের জন্য যে ব্যয় বহন করিয়া থাকি উহা কি আমার প্রতি দান-খয়রাত করার আদেশ পালনে যথেষ্ট হইবে? আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, তুমি নিজেই যাইয়া হযরতের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। যয়নব (রাঃ) বলেন, সেমতে আমি হযরতের গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। তাঁহার গৃহে ফটকের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মদীনাবাসীনী একজন নারী সেখানে দাঁড়াইয়া আছে; সেও আমার ঐ জিজ্ঞাস্য বিষয়টিই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে। আমরা ফটকের নিকট অপেক্ষারত ছিলাম, এমন সময় আমাদের নিকট দিয়া বেলাল (রাঃ) যাইতেছিলেন। আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, আপনি আমাদের এই বিষয়টি হযরতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন, কিন্তু আমাদের নাম বলিবেন না! বেলাল (রাঃ) হযরতের নিকট পূর্ণ বিষয় ব্যক্ত করিলে পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মূল জিজ্ঞাসাকারিণীদ্বয় কাহারা? বেলাল বলিলেন, যয়নব। হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন যয়নব—আবদুল্লার স্ত্রী যয়নব? বেলাল (রাঃ) উত্তর করিলেন—হাঁ। তখন নবী (দঃ) মূল প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, হাঁ—স্বীয় স্বামী ও এতিমগণের প্রতি ব্যয় করাও দান-খয়রাতের আদেশ পালনের ব্যাপারে যথেষ্ট হইবে, বরং এইরূপ ব্যয়ে দ্বিগুণ ছওয়াব হইবে। (১৯৮ পৃঃ)

৭৬৬। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু তালহা (রাঃ) মদীনাবাসী ছাহাবীগণের মধ্যে সর্বাধিক বিত্তশালী ছিলেন। তাঁহার সর্বোত্তম সম্পত্তি ছিল "বাইরুহা" নামক খেজুর বাগানটি। ঐ বাগানটি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সময় সময় ঐ বাগানে তশরীফ লইয়া যাইতেন এবং উহার কুপের সুস্বাদু মিঠা পানি পান করিয়া থাকিতেন।*

---

* বর্তমানে ঐস্থানে বাগান নাই; দালান-কোঠায় পরিপূর্ণ, কিন্তু কুপটি উত্তম অবস্থায়ই রহিয়াছে। বহুবার উহার পানি পানের সৌভাগ্য আল্লাহ তায়ালা আমাকে দান করিয়াছেন।

আনাছ (রাঃ) বলেন, যখন কোরআন শরীফের এই আয়াত নাজেল হইল— لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون অর্থাৎ—"তোমরা পূর্ণ ছওয়াব লাভ করিতে পারিবে না, যাবৎ তোমাদের স্বীয় পছন্দনীয় ভালবাসার বস্তু আল্লার সন্তুষ্টি লাভে ব্যয় না কর।" আবু তালহা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়াছেন, ভালবাসার বস্তু দান না করিলে পূর্ণ ছওয়াব লাভ হইবে না। আমার সর্বাধিক বালবাসার সম্পত্তি এই "বাইরুহা" বাগানটি। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমি বাগানটি দান করিয়া দিলাম। আমি উহার প্রতিদান ও প্রতিফল একমাত্র আল্লাহ তায়ালার নিকটেই লাভ করিবার আকাঙ্খা রাখি। (এখন ঐ বাগানটিকে আপনি আল্লাহ তায়ালার মর্জি ও খুশী অনুযায়ী ব্যয় করুন।) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন, বেশ বেশ; উহাত অতিশয় লাভজনক সম্পত্তি। আমি তোমার কথা শুনিয়াছি। আমার অভিমত এই যে, তুমি উহাকে আপন আত্মীয়বর্গের মধ্যে ব্যয় কর। আবু তালহা (রাঃ) বলিলেন, তাহাই করিব। সেমতে তিনি ঐ বাগানটিকে তাঁহার চাচার বংশধর এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন।

৭৬৭। হাদীছঃ—ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্ত্রী যয়নব (পুনরায়) একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহদ্বারে আসিয়া প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) কে জ্ঞাত করা হইল যে, যয়নব ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিতেছে রসুলুল্লাহ (রঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন যয়নব? বলা হইল সে ইবনে মসউদের স্ত্রী। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আসিতে বল। সে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, হে আল্লার নবী। আপনি অদ্য (পুনরায়) দান-খয়রাত করার আদেশ করিয়াছেন। আমার নিকটে কিছু অলংকার আছে—আমি উহা দান করার ইচ্ছা করিয়াছি। আমার স্বামী ইবনে মসউদ রিক্তহস্ত মানুষ। স্বামী বলিতেছেন, তিনি এবং তাঁহার সন্তানগণ আমার দানের অগ্রাধিকারী। (তাঁহার এই দাবী বস্তুতঃ সঠিক কি—না, তাহা ভালরূপে উপলব্ধি করার জন্য আমি আপনার খেদমতে পুনরায় আসিয়াছি।) তদুত্তরে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইবনে মসউদ ঠিকই বলিয়াছে। তোমার স্বামী ও সন্তানগণ তোমার দানের সর্বাগ্রে হকদার।

৭৬৮। হাদীছঃ—উম্মে ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম—আমারই পূর্ব স্বামী আবু ছালামার পক্ষে আমার যে সন্তানগণ আছে, তাহারাও আমারই সন্তান; তাহাদের জন্য যদি আমি কিছু ব্যয় করি, তাহাতে কি আমার ছওয়াব হইবে? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহাদের জন্য ব্যয় কর; তাহাদের জন্য যাহা কিছু ব্যয় করিবে উহার পূর্ণ ছওয়াব তুমি লাভ করিবে।

মছআলাহ ঃ—স্বীয় অভাবগ্রস্ত সন্তান-সন্ততি তথা ছেলে-মেয়ে ও তাহাদের বংশ এবং স্বীয় পিতা-মাতা ও তাঁহাদের পিতা-মাতা পূর্বপুরুষ—নিজের এই দুই ধারার কাহাকেও যাকাত ফেৎরা ইত্যাদি ফরজ এবং ওয়াজেব দান হইতে দেওয়া হইলে উহা আদায় হইবে না, কিন্তু নফলরূপে দান করিলে পূর্ণ, বরং দ্বিগুণ ছওয়াব পাওয়া যাইবে। স্বামী স্ত্রীকে নিজের যাকাত-ফেৎরা দিলে তাহাও আদায় হইবে না। স্ত্রী স্বামীকে দিতে পারে কি না—মতভেদ আছে; ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, দিতে পারে না; ইমাম আবু ইউসুফ ও মোহাম্মদ (রঃ) বলেন, দিতে পারে—দিলে আদায় হইয়া যাইবে। (শামী ২—৮৭)

ঘোড়া এবং ক্রীতদাসের যাকাত ফরজ নয়

৭৬৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মোসলমানের উপর তাহার ক্রীতদাস ও ঘোড়ার যাকাত ফরজ হয় না। (১৯৭ পৃঃ)

যে ধন-দৌলত হইতে দান করা না হয় উহা অশুভ

৭৭০। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হইলেন এবং আমরা তাঁহার সম্মুখে জমায়েত হইয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন, আমার ইহকাল ত্যাগ করার পর তোমাদের জন্য আমি যে বস্তুকে বিশেষরূপে ভয় ও আশংকার কারণ মনে করি তাহা হইল—দুনিয়া তথা ধন-দৌলতের আধিক্য ও জাকজমক; যাহা তোমাদের উপর বিস্তৃত ও প্রসারিত হইবে। এক ব্যক্তি আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! (ধন-দৌলত ত) ভাল জিনিষ (তাহা) কিরূপে মন্দের (তথা আশংকা ও ভয়ের) কারণ হইতে পারে? নবী (দঃ) কোন উত্তর না দিয়া নীরব রহিলেন। কেহ কেহ প্রশ্নকারী ব্যক্তির প্রতি তিরস্কার করিয়া বলিল, তুমি কেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার উপর কথা বলিলে? তিনি ত তোমার কথার কোনই উত্তর দিলেন না! অতঃপর আমরা অনুভব করিলাম, হযরতের প্রতি অহী নাযেল হইতেছে। তৎপর তিনি ঘর্ম মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? হযরত (দঃ) উক্ত প্রশ্নকে প্রশংসার যোগ্য গণ্য করিলেন, এবং বলিলেন,ভাল জিনিষ (স্বভাবতঃ) মন্দের কারণ হয় না সত্য, কিন্তু একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য কর। বসন্তকালের জীবনী শক্তিবাহী মলয় বায়ু ও তদসহ বৃষ্টিপাতের দ্বারা যে নূতন ঘাস-পাতা জন্মিয়া থাকে, উহা পশুপালের জন্য (কতই না ভাল ও উত্তম বস্তু। কিন্তু কোন পশু যদি উহাকে সুস্বাদু পাইয়া কেবল খাইতেই থাকে, নিয়মানুবর্তিতার ধার না ধারে, তবে ঐ উত্তম, ভাল ও সুস্বাদু বস্তুই সেই পশুর জন্য) পেট ফাপিয়া মৃত্যু বা মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী হওয়ার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য যে পশু নিয়ম মাফিক সবুজ ঘাস খায় এবং যখন পেট ভরিয়া আসে তখন সে পশুপালের স্বভাবগত অভ্যাস অনুযায়ী সূর্যমুখী হইয়া বসে এবং (Ruminant)

রোমন্থন—চর্বিতচর্বণ করিয়া জাবর কাটিয়া ভক্ষিত বস্তুসমূহ হজম করতঃ মলমূত্র ত্যাগ করে। অতঃপর পুনরায় ঐ ঘাস খাওয়া আরম্ভ করে; (সেই অবস্থায় ঐ পশুর জন্য ঘাস-পাতা কোন ক্ষতি ও অনিষ্টের কারণ হয় না।) স্মরণ রাখিও! ধন-দৌলত অতিশয় লোভনীয় এবং চিত্তাকর্ষক বস্তু। যে মোসলমান ব্যক্তি এতিম, মিছকিন, অসহায় পথিককে দান করায় অভ্যস্ত তাহার জন্য ঐ ধন-দৌলত অতি উত্তম সহায়ক ও সাথী। কিন্তু (প্রথম প্রকারের পশুর ন্যায়) যে ব্যক্তি উহা অবৈধ অনিয়মিতরূপে হাসিল করিবে ও পুঁজি করিতে থাকিবে, তাহার ভাগ্যে তৃপ্তিলাভ জুটিবে না; (ইহকালের শান্তি হইতে সে বঞ্চিত হইবে।) এবং পরকালে এই ধন-দৌলতই তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইবে। (১৯৮ পৃঃ)

৭৭১। **হাদীছঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যাকাত ওয়াসিল করার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন। সেই ব্যক্তি হযরতের নিকট অভিযোগ জানাইল যে, ইবনে জমীল নামক ব্যক্তি যাকাত দেয় নাই। এবং খালেদ (রাঃ) এবং আব্বাছ (রাঃ) ও দেন নাই। (ইবনে জমিল মোসলমান দলভুক্ত হইবার পূর্বে দরিদ্র ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিশেষ চেষ্টায় সে বাহ্যিকরূপে ইসলাম কবুল করে এবং আল্লাহ তায়ালা বাহ্যিক ইসলাম গ্রহণের অছিলায় তাহাকে ধন-দৌলতের মালিক বানান, কিন্তু সে ছিল মোনাফেক। তাই সে যাকাত দিতে গড়িমসি করে।) হযরত (দঃ) (তাহার এই আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া) বলিলেন, ইবনে জমীল কর্তৃক যাকাত না দেওয়ার কারণ এই যে, সে পূর্বে দরিদ্র ছিল, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলের অছিলায় তাহাকে ধনাঢ্য বানাইয়াছেন, (তাই সে এখন আল্লাহ ও আল্লার রসুলের আদেশকৃত যাকাত দিতে চায় না। অর্থাৎ তাহার নিমকহারামী ব্যতীত যাকাত না দেওয়ার অন্য কোন কারণ নাই)।

খালেদ (রাঃ)-এর বিষয়ে বলিলেন, তোমরাই (হয়ত কোন) অন্যায় করিয়া থাকিবে, নতুবা খালেদ ত স্বীয় ব্যবহার্য অস্ত্র-শস্ত্র পর্যন্ত আল্লার রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করিয়া রাখিয়াছে। আব্বাছ (রাঃ)-এর বিষয়ে বলিলেন, তিনি আমার মুরুব্বী—চাচা; (তাঁহার ব্যাপারে চিন্তা নাই। এমনকি স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার যাকাতের জিম্মা লইয়া লইলেন এবং বস্তুতঃ তিনি তাঁহার যাকাত অগ্রিম আদায় করিয়া দিয়াছিলেন।)

ভিক্ষাবৃত্তি হইতে বিরত থাকা

৭৭২। **হাদীছঃ**—আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা কয়েকজন মদীনাবাসী ছাহাবী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে দান করিলেন। তাহারা পুনরায় সাহায্য চাহিলে রসুলুল্লাহ (দঃ) এবারও দান করিলেন। এমন কি, তাহার নিকট যাহা কিছু ছিল বারংবার দান করিয়া তাহা সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। এইবার তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য

করিয়া বলিলেন, আমার নিকট টাকা-পয়সা কিছু থাকিলে তাহা তোমাদিগকে না দিয়া আমি নিজের নিকট কখনও জমা রাখি না; (অর্থাৎ বারংবার এরূপ করার কোন প্রয়োজন হয় না।) স্মরণ রাখিও—যে ব্যক্তি যাচ্ঞা ও ভিক্ষাবৃত্তি হইতে বিরত থাকায় সচেষ্ট হইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উহা হইতে নিবৃত্ত থাকার সুযোগ ও তৌফিক দান করিবেন। যে ব্যক্তি কাহারও মুখাপেক্ষী না হইবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পরমুখাপেক্ষীতা হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন। যে ব্যক্তি কষ্টে-ক্লেশে আপদে-বিপদে দুঃখ-যাতনায় ধৈর্য্যধারণে সচেষ্ট হইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ধৈর্য্যাবলম্বনে সাহায্য করিবেন। ধৈর্য্যের ন্যায় প্রশস্ত ও উত্তম নেয়ামত দুনিয়াতে আর কিছুই নাই।

৭৭৩। **হাদীছ:—** عن ابی هریرة ان رسول الله صلی الله علیه وسلم

قَالَ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِهٖ لَاَنْ یَّاْخُذَ اَحَدُکُمْ حَبْلَهٗ فَیَحْتَطِبَ عَلٰی ظَهْرِهٖ

خَیْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ یَّاْتِیَ رَجُلًا فَیَسْاَلَهٗ اَعْطَاهُ اَوْ مَنَعَهٗ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের জন্য অন্যের নিকট হাত পাতা অপেক্ষা দড়ি লইয়া জঙ্গলে যাওয়া এবং তথা হইতে কাঁধে করিয়া জ্বালানী কাষ্ঠ বহন করতঃ উহা দ্বারা উপার্জন করা অতি উত্তম। অন্যের নিকট হাত পাতিলে সে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে। (এই অপমান বরণ করা উচিৎ নয়।)

৭৭৪। **হাদীছ:—** عن الزبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه

عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاَنْ یَّاْخُذَ اَحَدُکُمْ حَبْلَهٗ فَیَاْتِیَ بِحُزْمَةِ

حَطَبٍ عَلٰی ظَهْرِهٖ فَیَبِیْعَهَا فَیَکُفَّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهٗ خَیْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ یَّسْاَلَ

النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْ مَنَعُوْهُ

অর্থ—যোবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দড়ি লইয়া জঙ্গল হইতে জ্বালানী কাষ্ঠ কাঁধে বহন করিয়া আনা এবং উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের অছিলায় আল্লার সাহায্যে স্বীয় মান-ইজ্জত রক্ষা করা মানুষের নিকট হাত পাতা অপেক্ষা অনেক উত্তম। কারণ মানুষের নিকট হাত পাতিয়া হয়ত কিছু পাইতেও পারে, আবার নাও পাইতে পারে (কিন্তু অপমান অনিবার্য্য)।

৭৭৫। হাদীছ ঃ— হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সাহায্য চাহিলাম; তিনি আমাকে দান করিলেন। পুনরায় চাহিলাম; পুনরায় দান করিলেন। আবার চাহিলাম; আবার দান করিলেন এবং বলিলেন, হে হাকীম! স্মরণ রাখিও, ধন-দৌলত অতিশয় লোভনীয় ও চিত্তাকর্ষক বস্তু! লিপ্সা ও কৃত্রিম ক্ষুধা মুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি উহা আহরণ করিবে সে-ই উহাতে বরকত (সৌভাগ্য অল্পে তুষ্টি ও অল্পে প্রাচুর্য) লাভ করিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি লিপ্সা ও কৃত্রিম ক্ষুধার বশীভূত হইয়া উহা আহরণে লিপ্ত হইবে, সেই ধনের দ্বারা তাহার ভাগ্যে বরকত লাভ জুটিবে না। তাহার অবস্থা এই হইবে যে, খাইতেছে, কিন্তু তৃপ্তি ও তুষ্টি লাভ হইতেছে না। স্মরণ রাখিও! উপরের হাত (অর্থাৎ দানকারী) নীচের হাত (অর্থাৎ গ্রহণকারী) অপেক্ষা উত্তম।

হাকীম (রাঃ) বলেন, এতচ্ছ্রবণে আমি আরজ করিলাম, ইয়া রস্থলাল্লাহ! আমি ঐ মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি যিনি আপনাকে সত্য ধর্মবাহক রূপে প্রেরণ করিয়াছেন—অতঃপর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি কাহারও নিকট কিছু চাহিব না। (আমার হাত কাহারও হাতের নিচে আসিবে না।)

হাকীম (রাঃ) স্বীয় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞার উপর এরূপ দৃঢ় থাকিলেন যে, আবু বকর (রাঃ) খলীফা হইয়া বায়তুল-মাল হইতে তাঁহার প্রাপ্য অংশ লইবার খবর দিলেন; তিনি উহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) খলীফা হইয়া পুনরায় তাঁহাকে উহা গ্রহণের অনুরোধ জানাইলেন, তিনি এবারও গ্রহণে সম্মত হইলেন না। এমনকি, ওমর (রাঃ) সর্বসাধারণকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, হে মুসলমানগণ! আমি হাকীম (রাঃ)কে বায়তুল-মাল হইতে তাহার প্রাপ্য অংশ পৌঁছাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তিনি উহা গ্রহণে সম্মত হন নাই।

রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবর্তমানেও হাকীম (রাঃ) এইরূপে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্য্যন্ত স্বীয় প্রতিজ্ঞা ও সংকল্পে অটল থাকিয়া ইহজগত ত্যাগ করিলেন।

লিপ্সা ও যাচ্ঞা ব্যতিরেকে বৈধরূপে কোন কিছু হাসিল হইলে তাহা গ্রহণ করিবে

৭৭৬। হাদীছ ঃ—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন কোন সময় এরূপ হইত যে, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে কিছু দান করিতেন; আমি আরজ করিতাম, ইহা এমন ব্যক্তিকে দান করুন যাহার প্রয়োজন আমার অপেক্ষা অধিক। তখন রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—ইহা গ্রহণ কর। ধন-সম্পদ যখন লিপ্সা, প্রত্যাশা এবং প্রার্থী হওয়া ব্যতিরেকে কোন শুদ্ধ সূত্রে লাভ হয়, তখন উহা গ্রহণ কর এবং নিজকে এরূপ অভ্যস্ত কর যে, কোন ক্ষেত্রে ধন-সম্পদের কোন সুযোগ হাত-ছাড়া হইয়া গেলে যেন বিচলিত ও অস্থির হইয়া উহার পিছনে ছুটাছুটি না কর।

ধন সম্পদ বাড়াইবার জন্য ভিক্ষা করার পরিণতি

৭৭৭। হাদীছঃ— قال عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَاْتِىَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَيْسَ فِىْ وَجْهِهٖ مُزْعَةُ لَحْمٍ وَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُوْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْاُذُنِ فَبَيْنَمَاهُمْ كَذٰلِكَ اسْتَغَاثُوْا بِاٰدَمَ ثُمَّ بِمُوْسٰى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْفَعُ لِيُقْضٰى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِىْ حَتّٰى يَاْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا۔

অর্থঃ—আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষ যাচ্ঞা ও ভিক্ষাবৃত্তিতে অভ্যস্ত হইয়া যাচ্ঞা ও ভিক্ষা করিতে থাকে (যদ্দারা দুনিয়াতে তাহার মান-ইজ্জৎ বিনষ্ট হয় এবং মর্য্যাদশূন্য সম্ভ্রমহীন হইয়া পড়ে। ইহারই প্রতিক্রিয়া পরজগতেও তাহার উপর পরিলক্ষিত হইবে।) কেয়ামত দিবসে যখন সে উপস্থিত হইবে তখন তাহার মুখমণ্ডলের হাড়গুলি উন্মুক্ত অবস্থায় দেখা যাইবে; উহার উপর গোশত কিম্বা চর্মের আবরণ থাকিবে না।

অতঃপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (কেয়ামতের দিনের ভীষণ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থারও কিঞ্চিৎ বর্ণনা দান পূর্বক বলিলেন, সে দিন সূর্য্য তাহার বর্তমান অবস্থান অপেক্ষা অতি নিকটবর্তী হইবে। (যদ্দরুণ অত্যধিক উত্তাপে মানুষের শরীর হইতে ঘামের স্রোত বহিবে।) এমনকি, এক এক ব্যক্তির অর্দ্ধ কান পর্য্যন্তও ঘামের স্রোতে ডুবিয়া যাইবে এবং মানুষ অধীর ও অস্থির হইয়া আদম (আঃ), মুছা (আঃ) প্রমুখ নবীগণের প্রতি ছুটাছুটি করিবে। অবশেষে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সমবেত হইবে। তিনি অগ্রসর হইয়া হিসাব-নিকাশ আরম্ভের জন্য) আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করিবেন। (তাঁহার সুপারিশে হিসাব আরম্ভ হইলে) আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিশ্বের সকল মানব-মণ্ডলীর প্রশংসা অর্জনের গৌরব তাঁহাকে আল্লাহ তায়ালা দান করিবেন।

কেমন মিসকীনকে দান করিবে?

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ

الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ - تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا -

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ -

অর্থ :— দান-খয়রাতের উপযুক্ত পাত্র ঐ গরীব দরিদ্রগণ যাহারা আল্লার দীনের খেদমতে আবদ্ধ রহিয়াছে; (যদ্দরুণ) তাহারা (জীবিকা অর্জনে) কোথাও যাইতে পারে না। তাহারা কাহারও নিকট হাত পাতে না বলিয়া অজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে ধনাঢ্য মনে করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা ধনাঢ্য নহে, বড়ই দরিদ্র। (এমনকি,) তোমরা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিলে তাহাদের চেহারার অবস্থা দেখিয়া তাহাদের অভাব অনুভব করিতে পারিবে। তাহারা (স্বীয় অবস্থার উপর ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকে ;) হঠকারী হইয়া কাহারও নিকট হাত বিছায় না। তোমরা যাহা কিছু ধন ব্যয় করিবে উহা আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় জানিবেন। (৩ পাঃ ৫ রুঃ)

৭৭৮। হাদীছ :— عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ الْاُكْلَةُ

وَالْاُكْلَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِىْ لَيْسَ لَهٗ غِنًى وَيَسْتَحْيِىْ -

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি বস্তুতঃ মিসকীন নয় যে এক-দুই লোক্‌মা (গ্রাস) পাইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যাহার অভাব আছে, কিন্তু মানুষের নিকট হাত পাতায় লজ্জা বোধ করিয়া উহা হইতে বিরত থাকে।

৭৭৯। হাদীছ :— قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلٰثًا قِيْلَ

وَقَالَ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ

অর্থ :—মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমি বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা তিনটি বিষয়কে অত্যধিক নাপছন্দ করেন। (১) অতিরিক্ত এবং ভিত্তিহীন কথা বলা বা অযথা তর্ক-বিতর্ক করা। (২) ধন-সম্পদ অপব্যয় ও বিনষ্ট করা (৩) অনাবশ্যক প্রশ্নের অবতারণা করা বা (অভাবের তাড়নায় হইলেও প্রয়োজন হইতে) অতিরিক্ত যাচ্ঞা করা।

৭৮০। হাদীছ :— عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِىْ لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهٖ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ۔

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি মিসকীন নহে যে এক-দুই লোকমা বা এক-দুইটি খুরমার জন্য লোকদের নিকট ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যাহার অভাব আছে, কিন্তু তাহা প্রকাশ পায় না, যাহাতে তাহাকে দান-খয়রাত করা যাইতে পারে। নিজেও লোকদের নিকট ভিক্ষা চাহিতে দাঁড়ায় না।

৭৮১। হাদীছ :— عن ابى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم

لَاَنْ يَأْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهٗ ثُمَّ يَغْدُوَ اِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ فَيَبِيْعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ يَّسْأَلَ النَّاسَ۔

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দড়ি লইয়া পাহাড় হইতে জ্বালানী কাষ্ঠের বোঝা বহন করিয়া আনিয়া উহা বিক্রয়লব্ধ উপার্জন হইতে নিজে খাওয়া এবং অন্যকে দান করা লোকদের নিকট ভিক্ষা চাওয়া অপেক্ষা অনেক বেশী উত্তম।

ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত

ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য ফল-ফুলাদি, শাক-সব্জি, তরিতরকারী, খাদ্য-শস্য ইত্যাদি—সবের উপরও যাকাত আছে। উহাকে পরিভাষায় "ওশর" বলা হয়। "ওশর" অর্থ দশমাংশ। ঐ সকল বস্তুর উপর যাকাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে দশমাংশ হারে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, তাই উহাকে "ওশর" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

"ওশর" ফরজ হওয়ার জন্য বিভিন্ন শর্ত আছে এবং উহাতে ইমামগণের মতভেদও রহিয়াছে। মোহাক্কেক আলেম হইতে বিস্তারিত বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক।

কাহারও ক্ষেতে শস্য উৎপন্ন হইলে বা বাগানে ফল জন্মিলে উৎপন্নের দশমাংশ যাকাতরূপে বাইতুল মাল—জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে দিতে হইবে। কিন্তু উহা আদায় ওয়াসিল করা হইবে, উৎপন্ন দ্রব্য কাটিয়া আনার পর। তাই এই স্থলে দুইটি সমস্যা দেখা দেয়— প্রথম এই যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন মালিক উৎপন্নের কিছু অংশ লুকাইয়া

ফেলিতে পারে। দ্বিতীয় এই যে, ফল-ফুলাদি পরিপূর্ণ রূপে পাকিবার পূর্বেও মালিকগণের খাওয়ার প্রয়োজন হয়। অথচ যাকাত হয় পূর্ণ উৎপন্নের এবং ঐ সময় ফল পাকিলে সম্পূর্ণ এক সঙ্গে কাটা হইবে।

অতএব, শরীয়তের বিধান এই যে, সরকারের পক্ষ হইতে পরিমাণ নির্ধারণে ও অনুমান কার্যে অভিজ্ঞতাপূর্ণ লোকদিগকে নিয়োগ করা হইবে। ঐ সমস্ত লোকেরা প্রত্যেক ক্ষেত ও বাগানে যাইয়া প্রাথমিক অবস্থায়ই পরিমাণ ও অনুমান করিয়া আসিবে যে, কোন্ ক্ষেতে বা বাগানে কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইতে বা ফল-ফুলাদি জন্মিতে পারে। এই পন্থায় ঐ সমসমস্যাদ্বয়ের সমাধান হইয়া যাইবে। ইহাতে মালিকের প্রাণে ভয়ের চাপ থাকিবে এবং মালিকগণ সম্পূর্ণ উৎপন্ন কাটিয়া আনিবার পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে যাহা কিছু খাইবে তাহারও একটি হিসাব থাকিবে। অবশ্য মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ উৎপন্নজাত দ্রব্য স্বভাবতঃই নষ্ট হইয়া থাকে উহার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্যও শরীয়তে বিধান আছে

উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ পূর্বাহ্নে অনুমান করা *

৭৮২। হাদীছঃ—আবু হোমাইদ সায়েদী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তবুকের জেহাদে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে ওয়াদিল-কোরা নামক স্থানে পৌঁছিয়া আমরা এক বৃদ্ধার একটি খেজুরের বাগান দেখিতে পাইলাম। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সঙ্গীগণকে বলিলেন, তোমরা এই বাগানটির উৎপন্নের অনুমান কর। রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজেও অনুমান লাগাইলেন যে, দশ অছক (প্রায় ৬০ মণ) হইবে এবং বৃদ্ধাকে বলিলেন, খেজুর কাটা হইলে হিসাব স্মরণ রাখিও। অতঃপর যখন আমরা তবুক নামক স্থানে পৌঁছিলাম, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, অদ্য রাত্রে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইবে। কেহ যেন রাত্রে বাহির না হয় এবং যাহার সহিত উষ্ট্র আছে সে যেন উহাকে ভালরূপে বাঁধিয়া রাখে। আমরা নিজ নিজ উষ্ট্র বাঁধিয়া রাখিলাম। সত্যই রাত্রিকালে প্রবলবেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইল। এক ব্যক্তি বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল তাহাকে উড়াইয়া নিয়া বহুদূরে এক পাহাড়ের উপর নিক্ষেপ করিল। (আমরা সে স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিলাম, কিন্তু শত্রুপক্ষ উপস্থিত না হওয়ায় কোনরূপ যুদ্ধ হইল না।) অবশ্য নিকটবর্তী "আইলা" নামক একটি এলাকার শাসনকর্তা (মোসলমানদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া) জিযিয়া কর দানে রাজী হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিল। হযরত (দঃ) তাহাদের দেশ তাহাদের

---

* পূর্বাহ্নেই কোন উৎপন্নের পরিমাণ করা সাধারণ দৃষ্টিতে গায়েবের খবর বলার ন্যায় দেখা যায়, অথচ যাকাতের ব্যাপারে শরীয়ত উহার পরামর্শ দিয়াছে। ইমাম বোখারী (রঃ) হযরতের ঘটনা দ্বারা উহার বৈধতা প্রমাণ করিলেন যে, ইহা বস্তুতঃ গায়েবের খবর নহে, বরং অবস্থা দৃষ্টে পরিণামের ধারণা ও অনুমাণ করা মাত্র।

স্বায়ত্ব শাসনে থাকার সনদ লিখিয়া দিলেন। হযরতের প্রসিদ্ধ যানবাহন "বাগালা-বায়জা" (শ্বেত বর্ণের খচ্চর) এবং হযরতের অঙ্গ পোশাক পরিচ্ছেদ তাহারা উপঢৌকন স্বরূপ পেশ করিল।

তবুক হইতে মদীনায় ফিরিবার পথে সেই ওয়াদিল-কোরা নামক স্থানে পৌঁছিয়া ঐ বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার বাগানে কি পরিমাণ খেজুর হইয়াছে? সে বলিল, দশ অছক। ইহা সঠিকরূপে ঐ পরিমাণই ছিল যাহার অনুমান পূর্বেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লাগাইয়াছিলেন।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি দ্রুত মদীনায় পৌঁছিব, অন্য কাহারও সেরূপ ইচ্ছা থাকিলে আমার সঙ্গে চলিতে পার। নিকটবর্তী পথ হইতে যখন মদীনা দৃষ্টিগোচর হইল তখন হযরত (দঃ) স্নেহভরে বলিয়া উঠিলেন—ঐ যে "তাবাহ" (মদীনার অপর নাম) এবং ওহুদ পাহাড় দেখিয়া বলিলেন, এই স্নেহময় পাহাড়টি আমাদিগকে ভালবাসে আমরাও উহাকে ভালবাসি।

অতঃপর বলিলেন, আমি তোমাদিগকে মদীনাবাসী বিভিন্ন গোত্রের মর্যাদা জ্ঞাত করিব। আমরাও ইহাতে আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, সর্বোত্তম গোত্র "বনু-নাজ্জার" গোত্র, অতঃপর "বনু-আবু-আশহাল" অতঃপর "বনুল-হারেছ" গোত্র, অতঃপর "বনু-সায়েদাহ্" গোত্র। অতঃপর বলিলেন, মদীনাবাসী প্রত্যেকটি গোত্রই উত্তম।

উৎপন্ন দ্রব্যে যাকাতের পরিমাণ

৭৮৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে সমস্ত জমি বৃষ্টিপাতে, নদী-নালা বা প্রাকৃতিক আর্দ্রতা ও রসের সাহায্যে শস্যোৎপাদন করিয়া থাকে উহার উৎপন্ন দ্রব্যে দশমাংশ যাকাতরূপে দান করিতে হইবে। আর যে সমস্ত জমি ব্যয় সাপেক্ষ সেচ প্রণালীর সাহায্যে শস্যোৎপাদন করিয়া থাকে উহার উৎপন্ন দ্রব্যের কুড়ি ভাগের এক ভাগ দান করিতে হইবে।

শস্য, ফল ইত্যাদি কাটার সময় যাকাত আদায় করিবে

৭৮৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খেজুর কাটার মৌসুম উপস্থিত হইলে লোকজন নিজ নিজ যাকাত-পরিমিত খেজুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট লইয়া আসিত। ঐ সময় তাঁহার নিকট খেজুরের স্তুপ লাগিয়া যাইত। শিশু হাসান হোসাইন রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুমা ঐ খেজুর নাড়াচাড়া করিয়া খেলা করিতেন। একদা তাঁহাদের একজন একটি খেজুর হঠাৎ মুখে দিয়া ফেলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহা দেখা মাত্র তৎক্ষণাৎ খেজুরটি তাঁহার মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, তুমি জাননা যে, মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) বংশধররা ছদকার বস্তু খাইতে পারে না?

স্বীয় দানকৃত বস্তু পুনরায় ক্রয় করা

৭৮৫। হাদীছঃ—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার একটী ঘোড়া এক ব্যক্তিকে আল্লার ওয়াস্তে দান করিলাম। ঐ ব্যক্তি ঘোড়াটিকে ভালরূপে যত্ন করিত না। একদা দেখিতে পাইলাম, ঘোড়াটি বিক্রি করিবার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে। তখন আমি উহাকে ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু আমার মনে এই ধারণা জাগিল যে, সে আমার দানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমার নিকট ইহার প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যের প্রার্থী হইবে। তাই আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, (এমতাবস্থায়) তুমি উহা ক্রয় করিও না এবং স্বীয় দানকৃত বস্তু ফেরত লইও না। (অর্থাৎ দানকারীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে পরিমাণ মূল্য কম লওয়া হইবে সেই পরিমাণের অংশ যেন দান করার পর পুনরায় ফেরত লওয়া হইল।) যদি সে উহা তোমার নিকট একটি মাত্র রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করিতে রাজি হয়, তবুও উহা গ্রহণ করিও না। কারণ দানকৃত বস্তু ফিরাইয়া লওয়া এরূপ ঘৃণ্য ও ঘৃণিত কার্য, যেরূপ কেহ স্বীয় বমি পুনঃ ভক্ষণ করে।*

নছিহত আল্লাহ ঃ—অন্যের দানকৃত বস্তু দান গ্রহণকারী হইতে ক্রয় করা নির্দ্বিধায় জায়েয।

দানকৃত বস্তু উপযুক্ত গ্রহণকারীর মালিকানায় যাওয়ার পর সাধারণ মালের ন্যায় বিবেচিত হইবে।

অর্থাৎ—যেমন কোন "গরীবকে" যাকাত, ফেৎরা বা দান-খয়রাত ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে, যাহা সরাসরিরূপে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি বা সৈয়দ বংশীয় ব্যক্তি গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু ঐ গরীব ঐ মালের মালিক সাব্যস্ত হওয়ার পর ঐ মাল অন্যান্য সাধারণ মালের ন্যায় গণ্য হইবে। যদি সে ঐ মালকেই কোন ধনাঢ্য বা সৈয়দ বংশীয় ব্যক্তির প্রতি দান করে তবে উহা জায়েয হইবে।

৭৮৬। হাদীছঃ—উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন খাবার কিছু আছে কি? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আপনি ছদকার মাল হইতে নুছাইবা (রাঃ)কে যে একটি বকরী দিয়াছিলেন, নুছাইবা ঐ বকরীর কিছু গোশ্‌ত হাদিয়ারূপে আমাদের ঘরে পাঠাইয়াছে, সেই গোশ্‌ত আছে, (কিন্তু আপনি ত ছদকার বস্তু ব্যবহার করেন না;) অন্য আর কিছুই নাই। নবী (দঃ) বলিলেন, (বকরীটি প্রথম অবস্থায় ছদকার মাল ছিল

---

* উল্লিখিত হাদীছের বিবরণের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, স্বীয় দানকৃত বস্তু যদি উহা ঠিক মূল্য হইতে কমে দিবার আশঙ্কা না হয় এবং উহাতে গরীবেরই সাহায্য হয় তবে উহা ক্রয় করাতে কোন দোষ হইবে না।

কিন্তু বুছাইবাহ দরিদ্রা নারী, তাহাকে যখন ঐ বকরীটি দান করা হইয়াছে তখন উহা) উপযুক্ত স্থানে (দেওয়া হইয়াছে ; উহা বুছাইবার মালিকানায়) যাওয়ার পর সাধারণ মালে পরিণত হইয়াছে। (উহা ছদকার মাল থাকে নাই ; অতএব, এখন সকলের জন্য সমভাবে উহা হালাল পরিগণিত হইবে)।

৭৮৭। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে কিছু গোশত উপস্থিত করা হইল যাহা বরীরা (রাঃ)কে ছদকা স্বরূপ দান করা হইয়াছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এই গোশত যখন বরীরাকে দেওয়া হইয়াছিল তখন ছদকা ছিল। কিন্তু যখন বরীরা (উহার মালিক সাব্যস্ত হইয়া) আমাদিগকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়াছে তখন ইহা হাদিয়ারূপেই গণ্য হইবে।

সরকার ধনীদের যাকাত বাধ্যতামূলক উসুল করিয়া গরীবদেরকে পৌঁছাইবে—গরীব যথায়ই থাকুক

অর্থাৎ সরকারের অধিকার ও কর্তব্য রহিয়াছে ধনীদের হইতে যাকাত উসুল করার, সঙ্গে সঙ্গে সরকারের উপর দায়িত্বও রহিয়াছে—সেই যাকাত গরীবদেরকে তাহাদের স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া, গরীব যথায়ই অবস্থান করুক। এমনকি যে এলাকায় যাকাত সংগ্রহ করা হইয়াছে তথায় গরীবের অবস্থান না থাকিলে যথায় অভাবী গরীব পাওয়া যাইবে সরকার কর্তৃক তথায় গরীবকে যাকাতের মাল পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

মছআলাহঃ—প্রত্যেক অঞ্চলের যাকাত সর্বপ্রথম ঐ অঞ্চলের অভাবীদের অভাব মোচনেই ব্যয় করিতে হইবে ; কোন কোন ইমামের মজহাবে এরূপ করাই ওয়াজেব—ইহার ব্যতিক্রম করা জায়েয নহে ; ইমাম আবু হানীফার মজহাবে উহার ব্যতিক্রম করা মকরূহ। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের যাকাত অন্য অঞ্চলে প্রেরণ করিতে কোন দোষ নাই—(১) যাকাতদাতার আত্মীয় গরীব অন্য অঞ্চলে থাকিলে তাহার জন্য এই ব্যক্তির যাকাত প্রেরণ করা যায়। (২) কোন অঞ্চলে অভাব অধিক হইলে, অন্য অঞ্চল হইতে তথায় যাকাত প্রেরণ করা যায়। (৩) এল্‌ম শিক্ষার্থী এবং অভাবগ্রস্ত আলেম ও অভাবগ্রস্ত নেক লোকদের জন্য এক অঞ্চলের যাকাত অন্য অঞ্চলে প্রদান করা যায়। (শামী, ২—৯৩)

ছদকা-খয়রাত দানকারীর জন্য দোয়া করা

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

"লোকদের মাল হইতে ছদকা—যাকাত গ্রহণ করুন যদ্দারা তাহাদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সাধন হইবে আর তাহাদের জন্য দোয়া করুন।"

৭৮৮। হাদীছঃ—আবু-আওফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কেহ যাকাত, ছদকা-খয়রাত লইয়া আসিলে তিনি তাহার জন্য দোয়া করিতেন। একদা আমার পিতা আবু-আওফা ছদকা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, হযরত (দঃ) তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য দোয়া করিলেন—হে আল্লাহ! আবু-আওফার পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযেল কর।

কতিপয় বস্তুর উপর বাইতুল-মালের হক

সমুদ্র হইতে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক বস্তু যেমন—মতি, আম্বর ইত্যাদি সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ আছে। কোন কোন ইমাম বলেন, ঐরূপ প্রাপ্তদ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মাল—জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে দান করিতে হইবে। কোন কোন ইমামের মত এই যে, সামুদ্রিক দ্রব্যের উপর ঐরূপ দান বাধ্যতামূলক নহে।

মাটি খননে ভূগর্ভে প্রাচীনকালের প্রোথিত ধন-দৌলত হস্তগত হইলে উহার পঞ্চমাংশ বাইতুল-মালে দান করিতে হইবে; ইহা সর্বসম্মত বিধান।

ভূগর্ভস্থিত প্রাকৃতিক খনিজ দ্রব্যাদি হস্তগত হইলে উহা সম্পর্কে সামুদ্রিক দ্রব্যের ন্যায় ইমামগণের মতভেদ আছে।

"মধু" সম্পর্কে অধিকাংশ ইমামগণের মতে উহার কোন অংশ দান করা বাধ্যতামূলক নহে, কোন কোন ইমামের মতে উহার দশমাংশ বাইতুল-মালকে দিতে হইবে।

যাকাত ইত্যাদি ওয়াসিলকারীদের হইতে সরকার কর্তৃক কড়া হিসাব লওয়া আবশ্যক

৭৮৯। হাদীছঃ—আবু হোমাইদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম "আসাদ" গোত্রের এক ব্যক্তিকে এক এলাকায় যাকাত ইত্যাদি ওয়াসিলের জন্য নিয়োগ করিলেন। ঐ ব্যক্তি স্বীয় কার্য্য হইতে ফিরিয়া আসার পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ হিসাব লইলেন। হিসাব দান কালে সে বলিল, এই পরিমাণ মাল সরকারী বিভাগের ওয়াসিল হইয়াছে এবং এই পরিমাণ মাল ব্যক্তিগতরূপে উপঢৌকন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। এতচ্ছ্রবণে রসুলুল্লাহ (দঃ) রাগান্বিত হইয়া তাহাকে ধমকাইলেন এবং বলিলেন, তুমি তোমার বাড়ী বসিয়া থাকিলে কি কেহ তোমাকে উপঢৌকন দিতে আসিত? (অর্থাৎ এই সব উপঢৌকন সরকারী পদের প্রভাবেই তোমাকে দেওয়া হইয়াছে) সুতরাং ইহা সরকারী তহবিলে জমা হইবে; ইহা তুমি পাইতে পার না। এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে এই বিষয়ে সতর্ক করার জন্য নামায বাদ মসজিদের মিম্বরে উঠিয়া তেজোদৃপ্ত ভাষায় ভাষণ দানে বলিলেন—আমরা রাষ্ট্রিয় কার্য্যে লোকদিগকে নিয়োগ করিয়া থাকি। পরিতাপের বিষয়

যে, কোন কোন ব্যক্তি কার্য্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হিসাব দিয়া থাকে যে, এই পরিমাণ মাল সরকারী বিভাগের এবং এই পরিমাণ মাল আমার ব্যক্তিগত উপঢৌকন। সে নিজের বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে কি কেহ তাহাকে উপঢৌকন দিয়া থাকিত ?

আমি ঐ আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি যাহার মুষ্টির ভিতরে আমার (মোহাম্মদের) প্রাণ—তোমাদের যে কেহ এইরূপ খেয়ানত ও অসাধু উপায় অবলম্বন পূর্বক (জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের) কোন বস্তু আত্মসাৎ করিবে, কেয়ামতের দিন ঐ বস্তু তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে। এমনকি, ঐ বস্তু কোন জন্তু হইলে উহা তাহার ঘাড়ের উপর চাপিয়া চীৎকার করিতে থাকিবে। ভাষণ শেষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় হাত উপরের দিকে এতদূর উত্তোলন করিলেন যে, তাহার বগল পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল এবং বলিলেন, হে আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থাক—আমি উম্মতকে ভালরূপে বুঝাইয়া ব্যক্ত করিয়া দিলাম।

ঘটনা বর্ণনাকারী আবু হোমাইদ (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভাষণ শ্রবণকারীদের মধ্যে যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) রহিয়াছেন ; কাহারও ইচ্ছা হইলে এই হাদীছ তাঁহার নিকটে যাইয়া শুনিতে পারে।

যাকাতের বস্তু চিহ্নিত করা যেন অপাত্রে ব্যয় না হয়

৭৯০। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আবু তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সদ্য প্রসূত শিশু ছেলে আবদুল্লাহকে লইয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম ; হযরতের মুখের চিবান খেজুর সর্বপ্রথম তাহার মুখে দিয়া বরকত হাসিল করার উদ্দেশ্যে। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যাকাত-ছদকা রূপে সংগৃহীত বাইতুল-মালের উটসমূহকে চিহ্নিত করিতেছেন।

ছদকায়ে-ফেৎর

আতা (রঃ) ও ইবনে ছীরীন (রঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ীগণ বলিয়াছেন, ছদকায়ে-ফেৎর আদায় করা ফরজ। হানফী ফেকার কেতাবে ওয়াজেব লেখা হয় ; ওয়াজেব কার্য্যতঃ ফরজই বটে, উভয়ের মধ্যে শুধু সূক্ষ্ম মর্মগত সামান্য পার্থক্য আছে।

৭৯১। হাদীছঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه ان

رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا

مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ

الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَبِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ

অর্থ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছদকায়ে-ফেৎর নিম্নরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন—এক ছা' (প্রায় চার সের) খেজুর বা যব প্রত্যেক মোসলমান ব্যক্তি আজাদ বা ক্রীতদাস, পুরুষ বা নারী, বড় বা ছোট এর পক্ষ হইতে। এবং আদেশ করিয়াছেন, উহা যেন লোকদের ঈদুল-ফেতরের নামাযে যাইবার পূর্বেই আদায় করা হয়।

৭৯২। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় ঈদের দিন ছদকায়ে-ফেৎর এই পরিমাণে আদায় করিতাম—এক ছা' খাদ্যবস্তু কিম্বা এক ছা' খেজুর কিম্বা এক ছা' যব কিম্বা এক ছা' কিশমিশ। আমাদের তথা মদীনায় খাদ্য-বস্তু তখন যব, কিশমিশ, পনির এবং খেজুরই ছিল।

মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর যমানায় যখন সিরিয়া দেশে গম আমদানী হইল তখন তিনি বলিলেন, উল্লিখিত বস্তুসমূহের এক ছা'-এর স্থলে উহার অর্ধ পরিমাণ গম-ই আমি যথেষ্ট মনে করি।

ব্যাখ্যা ঃ— জব, খেজুর ও কিশমিশ দ্বারা ফেৎরা পূর্ণ এক ছা' পরিমাণের দিতে হয়। গমের দ্বারা ইমাম আবু হানিফার মতে অর্ধ ছা' যথেষ্ট, কিন্তু অন্যান্য ইমামগণ গম হইলেও পূর্ণ এক ছা' দিতে বলেন। অত্র চার প্রকার বস্তু ছাড়া অন্য বস্তু দ্বারাও ফেৎরা আদায় করা যায়। কিন্তু উহার কোন পরিমাণ নির্দ্ধারিত নাই, বরং এই চার প্রকার বস্তুর নির্দ্ধারিত পরিমাণের মূল্য হিসাবে উহা দিতে হইবে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় মদীনায় খাদ্য-বস্তু কি ছিল তাহা উপরোল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমাদের খাদ্য-বস্তু ছিল—যব, কিশমিশ পনির এবং খেজুর। গমের অস্তিত্ব প্রায় না থাকার ন্যায় অতি বিরল ছিল। তাই অন্যান্য খাদ্য বস্তুর দ্বারা যে পরিমাণ ফেৎরা দিতে হয় অর্থাৎ এক ছা' সাধারণতঃ ফেৎরার পরিমাণ তাহাই প্রসিদ্ধ ছিল। মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালে যখন গমের প্রাচুর্য্য দেখা দিল তখন গমের পরিমাণ অর্দ্ধ ছা' হওয়ার মছআলাহও প্রসার লাভ করিল। শুধু একা মোয়াবিয়া (রাঃ)-ই নহেন, বরং বহু ছাহাবী এই মছআলার সমর্থক হইলেন। কারণ, গমের দ্বারা অর্দ্ধ ছা' পরিমাণ নির্দ্ধারণ—এই মছআলাহ শুধু কেয়াছ, যুক্তি বা মূল্যের হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, বরং এই বিষয়ে একাধিক হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ফতহুল-মোলহেম নামক (মোসলেম শরীফের শরাহ) কিতাবে বিদ্যমান আছে।

মছআলাহ ঃ— ঈদের নামাযের পূর্বেই ফেৎরা আদায় করিয়া দেওয়া উচিৎ, অন্ততঃ ভিন্ন করিয়া রাখিবেই। যদি কেহ তাহা না করে, অন্ততঃ ঐ দিনের মধ্যে আদায় করিবে এবং উহা আদায় না করা পর্য্যন্ত নিজের জিম্মায় ওয়াজেব থাকিয়া যাইবে। অতএব যথাসম্ভব উহা আদায় করিতেই হইবে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● দান-খয়রাত ডান হাতে দেওয়া চাই (১৯১ পৃঃ)। অর্থাৎ দানকারী ব্যক্তির কর্তব্য দানকৃত ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ব্যবহার না করা এবং তাহাকে হেয় মনে না করা; এই সব কার্য্যে দানের ছওয়াব বিনষ্ট হয়, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দান বিফলও হইয়া যায়। ● স্বীয় ভৃত্য বা অধীনস্থের মাধ্যমে দান-খয়রাত ইত্যাদি দেওয়া (১৭২ পৃষ্ঠা ৭০১, ৭০২ হাদীছ)। অর্থাৎ দানকৃত ব্যক্তিকে হেয় মনে করিয়া নয় বা তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশে নয়, বরং প্রয়োজনে বা স্বাভাবিকভাবে দান-খয়রাত করায় ঐরূপ মাধ্যমের ব্যবহারে কোন দোষ নাই, বরং ঐ মাধ্যম ছওয়াব লাভের সুযোগ পাইবে। ● দান-খয়রাত যথাসম্ভব সম্পন্ন করা উত্তম (১২৯ পৃষ্ঠা ৩৪৮ হাদীছ)। অর্থাৎ দান-খয়রাতের কোন কিছু থাকিলে উহা যথাসম্ভব গরীবদেরকে দিয়া দেওয়া সুন্নত, বিলম্ব করিবে না। ● দান-খয়রাতে গোনাহ মাফ হইয়া থাকে (১৮৩ পৃঃ ৩২৫ হাঃ)। ● যাকাত বা দান-খয়রাত কোন এক ব্যক্তিকে কি পরিমাণ দেওয়া যায়? নফল দান খয়রাত এক ব্যক্তিকে তাহার প্রয়োজনাতিরিক্তও দেওয়া যায়। যাকাতও এক ব্যক্তিকে বিশেষতঃ ঋণগ্রস্ত বা অভাবী পরিবার বহনকারী হইলে তাহাকে উপস্থিত এক সঙ্গে যে পরিমাণ ইচ্ছা দেওয়া যায় তাহাতে দোষ নাই। অবশ্য একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিবে— একজন গরীবকে নেছাব পরিমাণের অধিক টাকা এক সঙ্গে দিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত নেছাব পরিমাণে টাকা দিয়া ঐ টাকা তাহার হাতে জমা থাকাবস্থায় পুনঃ তাহাকে যাকাত দেওয়া যাইবে না। অবশ্য যদি সে ঋণগ্রস্ত হয় বা পরিজনকে দিয়া ফেলিয়া থাকে কিম্বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে ব্যয় করিয়া ফেলিয়া থাকে, তবে দিতে পারে। ঋণ বা অভাবী পরিবার বিহীন এক ব্যক্তিকে এককভাবে নেছাব পরিমাণ মাল এক সঙ্গে দেওয়াকে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মকরূহ বলিয়াছেন। ● যাকাত উসুল করিতে লোকদের শুধু ভাল ভাল জিনিস বাছিয়া লইবে না। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের মালের যাকাত যদি কেহ টাকা-পয়সা দ্বারা না দিয়া ঐ মালেরই চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিয়া দিতে চায়—সে ক্ষেত্রে যেমন যাকাত দাতার কর্তব্য যে, খারাপ জিনিস বাছিয়া দিবে না; তদ্রূপ সরকারের পক্ষ হইতে যাকাত উসুল করা হইলে তাহারও কর্তব্য যে, শুধু ভাল মাল বাছিয়া না লয়। (১৯৬ পৃষ্ঠা ৩৭৬ হাদীছ) ● কাহারও নিকট কোন বস্তু আছে যাহার উপর যাকাত ফরজ হইয়াছে; ঐ ব্যক্তি উহা হইতে যাকাত আদায় না করিয়া উহা সম্পূর্ণই বিক্রি করিয়া ফেলিল এবং অন্যত্র হইতে যাকাত আদায় করিল—ইহা জায়েজ আছে। (২০১ পৃষ্ঠা)

● নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বংশধর তথা বনী-হাশেম বংশের লোকদের জন্য যাকাত এবং ছদকায়ে-ফেৎর গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, উহা তাঁহাদেরকে দেওয়া হইলে আদায় হইবে না (২০২ পৃঃ)। ● দান-খয়রাত কৃত বস্তুর উৎপন্নও দানই পরিগণিত হইবে; উহা দানের পাত্রেই ব্যয়িত হইবে। (২০৩ পৃষ্ঠা)

● আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছদকায়ে-ফেৎর ছোট-বড় প্রত্যেকের পক্ষ হইতে আদায় করিতেন। অর্থাৎ—ছেলে-মেয়ে নাবালেগ হইয়া গেলে যদি তাহাদের নিজস্ব মাল থাকে তবে সেই মাল হইতে তাহাদের ছদকা-ফেৎর আদায় করিতে হইবে। যদি তাহাদের নিজস্ব মাল না থাকে তবে তাহাদের ছদকা-ফেৎর ওয়াজেব থাকে না; এমনকি পিতার উপরও তাহাদের পক্ষ হইতে ছদকা-ফেৎর আদায় করা ওয়াজেব হয় না: পিতার উপর শুধু নাবালেগ সন্তানদের পক্ষ হইতে ছদকা-ফেৎর ওয়াজেব হয়।

অবশ্য যে সব বালেগ ছেলে-মেয়ের নিজস্ব মাল নাই: পিতার ভরণ পোষণেই থাকে—সে ক্ষেত্রে উক্ত ছেলে-মেয়েদের পক্ষ হইতে ছদকা-ফেৎর আদায় করা পিতার জন্য মোস্তাহাব। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাহাই করিতেন। (২০৫ পৃঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বালেগ সন্তানের নিজস্ব মাল আছে তাহার ফেৎরা পিতা আদায় করিলে এবং স্ত্রীর নিজস্ব মাল আছে তাহার ফেৎরা স্বামী আদায় করিলে যদি তাহা অনুমতি তথা তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা সাব্যস্ত করা ছাড়া হয় তবে সাধারণ বিধান মতে উহা আদায় না হওয়াই সাব্যস্ত। অবশ্য এক অন্নভুক্ত থাকিলে আদায় হইয়া যায় বলিয়া ফৎওয়া রহিয়াছে (শামী, ২—১০৩); সুতরাং সর্বাবস্থায় তাহাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াই তাহাদের ফেৎরা আদায় করা উত্তম। এক অন্নভুক্ত মালদার ভাই-বেরাদরের মছআলাহও তদ্রূপই (ঐ)।

● ছাহাবীদের যুগে ছদকা-ফেৎর ঈদের এক-দুই দিন পূর্বেই দেওয়া হইত। ইমাম বোখারী (রঃ) এই কথাটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ছদকা-ফেৎর গরীব-দুঃখীজনকে সুষ্ঠুরূপে পৌছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে সরকার ছদকা-ফেৎর সংগ্রহের জন্য লোক নিয়োগ করিত। সংগৃহীত ছদকা-ফেৎর যাহাতে সময় মত ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বেই গরীব-দুঃখীকে পৌছাইয়া দেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে ঈদের এক-দুই দিন পূর্ব হইতেই সংগ্রহ অভিযান পরিচালন করা হইত এবং ছদকা-ফেৎরদাতা জনগণ সেই এক-দুই দিন পূর্ব হইতেই উক্ত সংগ্রহকারীদের নিকট নিজ নিজ ছদকা-ফেৎর অর্পণ করিতে থাকিত।

মছআলাহ ঃ—ছদকা-ফেৎর ঈদের দিনের পূর্বে আদায় করা জায়েয; তবে দান করার সময় ছদকা-ফেৎর দানের নিয়্যত সুস্পষ্টরূপে মনে উপস্থিত রাখিবে। অনেকের মতে রমজান মাসের পূর্বেও আদায় করা যায়। (শামী, ২—১০৬)

এতিম তথা নাবালেগ ছেলে-মেয়ে যাহাদের পিতা জীবিত নাই, উত্তরাধিকার সূত্রে বা যে কোন সূত্রে প্রাপ্ত তাহাদের মাল থাকিলে তাহাদের ছদকা-ফেৎর আদায় করা ওয়াজেব। মুরব্বীরা আদায় না করিলে বালেগ হওয়ার পর হিসাব করিয়া সমুদয় বকেয়া ছদকা-ফেৎর তাহাদের আদায় করিতে হইবে। (২০৫ পৃষ্ঠা)

● পাগল—বালেগ হউক বা নাবালেগ তাহার নিজস্ব মাল থাকিলে উহা হইতে তাহার ছদকা-ফেৎর আদায় করা হইবে। যদি তাহার মাল না থাকে, কিন্তু মালদার পিতা জীবিত থাকে, তবে পাগল সন্তান বালেগ হইলেও তাহার পক্ষ হইতে ছদকা-ফেৎর আদায় করা পিতার উপর ওয়াজেব। (২০৫ পৃষ্ঠা)

দশম অধ্যায়

হজ্জ

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ـ

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ـ

"আল্লার (আদেশ পালনার্থে এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে আল্লার ঘর—কা'বা শরীফের হজ্জব্রত পালন করা ফরজ—ঐ ব্যক্তিদের উপর, যাহারা সেই ঘর পর্যন্ত পৌঁছিবার সামর্থ রাখে। কোন ব্যক্তি (আল্লার উপাসক না হইয়া) কাফের হইলে (আল্লাহ তায়ালার ক্ষতি হইবে না;) আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্ট জগত হইতে বে-পরোয়া। (কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন)।" (৪ পারা ১ রুকু)

৭৯৩। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জের† সময় (আমার ভ্রাতা) ফজল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে একই যানবাহনের উপর আরোহিত ছিল। এমতাবস্থায় "খাসআ'ম" গোত্রের একটি যুবতী নারী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলে ফজল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং যুবতীটিও ফজলের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করিল। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ হস্তে ফজলের চেহারা বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া দিলেন (এবং বলিলেন, সুন্দর যুবক ও সুন্দরী যুবতীদের পরস্পরের মধ্যে শয়তানের ওছওয়াছাহ হইতে নিরাপদ হওয়া যায় না)। ঐ স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল—ইয়া রসুলাল্লাহ! হজ্জ ফরজ হওয়ার আদেশ আমার পিতার উপর এমন অবস্থায় বলবৎ হইয়াছে যখন তিনি এরূপ বৃদ্ধ যে, তিনি যানবাহনের উপর বসিয়া থাকিতে সক্ষম নহেন। (অর্থাৎ এই অবস্থায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন বা হজ্জ ফরজ হওয়ার মত ধনের মালিক হইয়াছেন)। এমতাবস্থায় আমি তাঁহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিতে পারি কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—হাঁ।

শুদ্ধ হজ্জের ফজিলত

৭৯৪। হাদীছ:—একদা আয়েশা (রাঃ) প্রশ্ন করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! জেহাদকে আমরা সকলেই সর্বশ্রেষ্ঠ আমলরূপে গণ্য করিয়া থাকি, তাই আমরা (নারী সমাজও

---

† হিজরতের পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি হজ্জ করিয়াছেন যাহা ১০ম হিজরী সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যে হজ্জের অনতিকাল পরেই তিনি ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সেই হজ্জকে বিদায়-হজ্জ বলা হয়।

পুরুষগণের ন্যায়) জেহাদে শরীক হইলে তাহা ভাল হয় না কি? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, কিন্তু স্মরণ রাখিও—(তোমাদের জন্য) সর্বোত্তম জেহাদ ঐ হজ্জ, যাহা আল্লাহ তায়ালার দরবারে মকবুল—গ্রহণীয় হওয়ার উপযোগী।

৭৯৫। হাদীছঃ— قال ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ۔

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি আল্লার (সন্তুষ্টি) উদ্দেশ্যে হজ্জ করিতে যাইবে এবং সর্বপ্রকার অশোভনীয় কাজ ও গোনাহের কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, ঐ হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে সেই ব্যক্তির অবস্থা এমন হইবে যে, তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া সে এরূপ বে-গোনাহ হইয়া গিয়াছে যেরূপ বে-গোনাহ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হওয়ার দিন ছিল।

ব্যাখ্যাঃ—অনেক প্রকার গোনাহ আছে, যাহা সাধারণতঃ তওবা ব্যতিরেকে মাফ হয় না, কিন্তু উল্লিখিত পর্যায়ের হজ্জকালে আল্লার দরবারে কান্নাকাটা ও তওবা অনুষ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক। আর হক্কুল-এবাদ অর্থাৎ কোন মানুষের কোন প্রকার হক তাহার উপর থাকিলে ঐ হকদারের নিকট হইতে মুক্তির ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে

মিকাত বা এহরামের স্থান

৭৯৬। **হাদীছঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিভিন্ন দেশবাসীদের জন্য মিকাত নিম্নরূপ নির্ধারিত করিয়াছেন, যথা—নজদবাসীদের জন্য "করন" নামক স্থান। মদীনাবাসীদের জন্য জুল-হোলায়ফা ও সিরিয়াবাসীদের জন্য "জোহফা" নামক স্থান।

৭৯৭। **হাদীছঃ**— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মিকাত নিম্নরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন। যথা—মদীনাবাসীদের জন্য "জুল-হোলায়ফা" নামক স্থান, সিরিয়াবাসীদের জন্য "জোহফা" নামক স্থান, নজদবাসীদের জন্য "করনুল-মানাযিল", ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালমলম্ নামক পর্বত।+ এই সমস্ত মিকাত উল্লিখিত দেশবাসীদের জন্য এবং তাহাদের পথে আগন্তুকদের জন্য; যাহারা হজ্জ বা ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে আসিবে। আর যাহারা এই সব মিকাতের

+ হিন্দুস্থান, পাকিস্তানের এবং বাংলাদেশের হাজীগণ সমুদ্র পথে আদন তথা ইয়ামনের পথে যাইয়া থাকে, তাই তাহাদের জন্য এহরামের স্থান ইয়ালমলম্ পাহাড় বরাবর।

অভ্যন্তরে বসবাস করে তাহাদের মিকাত হরম শরীফের সীমার বাহিরে যে কোন স্থান এবং মক্কাবাসীদের জন্য এহরামের স্থান মক্কানগরী।

৭৯৮। **হাদীছ ঃ**--আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন ইরাকস্থিত কুফা ও বছরা শহরদ্বয়ের এলাকা মুসলমানদের আধিপত্যে আসিল এবং সেখানে মুসলমানদের বসতি স্থাপিত হইল তখন তথাকার বাসিন্দাগণ খলীফা ওমর (রাঃ)এর নিকট আরজ করিল, রসুলুল্লাহ (দঃ) (আমাদের নিকটবর্তী) নজদবাসীদের জন্য "করন" নামক স্থানকে মিকাত নির্ধারিত করিয়াছেন, কিন্তু উহা আমাদের প্রচলিত পথ হইতে দূরে অবস্থিত। আমরা সেই পথে যাতায়াত করিলে তাহা আমাদের জন্য কষ্টদায়ক হয়। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা স্বীয় প্রচলিত পথে ঐ "করন" বরাবর স্থান নির্ধারিত কর। অতঃপর তিনি তদন্ত করিয়া "জাত-এরক্" নামক স্থানটি নির্ধারিত করিলেন।

৭৯৯। **হাদীছ ঃ**—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ("জুল-হোলায়ফা"* এলাকাস্থিত) ওয়াদি আকিক নামক স্থানে রাত্রি যাপনকালে (নিদ্রাবস্থায়) অহীর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তাঁহাকে জ্ঞাত করা হইল, (আপনি অতি মোবারক—উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন স্থানে অবস্থান করিতেছেন।) এই মোবারক এলাকায়ই আপনি দুই রাকাত নামায পড়িয়া (এহরাম বাঁধাকালে) হজ্জ ও ওমরা উভয়ের উল্লেখ করিবেন।

হজ্জের ছফরে পাথেয় গ্রহণ করা চাই

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى "হজ্জের ছফরে পাথেয় অবশ্যই গ্রহণ করিবে; পাথেয় গ্রহণের বড় সুফল এই যে, (ভিক্ষা করার বা অসদুপায়ের গোনাহ হইতে) নিস্তার পাওয়া যায়। (২ পাঃ ৯ রুঃ)

৮০০। **হাদীছ ঃ**—ছাফওয়ান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইয়ামানবাসীদের মধ্যে কুপ্রথা ছিল যে, তাহারা পাথেয় তথা পথের সম্বল না লইয়া হজ্জ করিতে যাইত। তাহারা বলিত, আমরা আল্লার উপর ভরসা স্থাপনকারী। অতঃপর মক্কায় পৌছিয়া লোকদের নিকট ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। উক্ত ভ্রান্ত রীতির বিরুদ্ধে এই আয়াত নাজেল হয়—

وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

---

* এই স্থানটি এখন মদীনার শহরভুক্ত এবং ওয়াদি-আকিক সংলগ্ন। বর্তমানে উহাকে বীরে আলী নামে অভিহিত করা হয়। এখানে হাজীদের গাড়ী থামাইবার মঞ্জিল আছে এবং মঞ্জিলের নিকটবর্তীই একটি মছজিদ আছে, যে স্থানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহরাম বাঁধিয়াছিলেন।

সুগন্ধি বা সুগন্ধময় কাপড় এহরামকালে ব্যবহার করিবে না কিম্বা ধৌত করিয়া লইবে, যেন সুগন্ধ না থাকে

৮০১। হাদীছঃ—ছাফওয়ান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা ইয়া'লা (রাঃ) ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি অহী নাযেল হওয়াকালীন তাঁহার অবস্থা আমাকে দেখাইবেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) "জেয়ে'ররাণা" (মক্কা নগরী হইতে ১১/১২ মাইল দূরে অবস্থিত) স্থানে থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। লোকটির পরিধানে একটি জুব্বা ছিল এবং উহা খালুক—জাফরান মিশ্রিত তৈরী সুগন্ধি মাখানো ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! ওমরার এহরাম অবস্থায় সুগন্ধি মাখানো জামা গায়ে থাকিলে কি করিতে হইবে? এবং আমি ওমরা কিরূপে আদায় করিব? রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নীরব রহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরতের প্রতি অহী নাযেল হওয়া আরম্ভ হইল এবং তাঁহাকে একটি চাদর দ্বারা ঘেরাও করিয়া দেওয়া হইল। তখন ওমর (রাঃ) ইয়া'লা (রাঃ)কে তাঁহার পূর্ব অনুরোধ অনুসারে ইশারা করিয়া ডাকিলেন। তিনি আসিয়া ঐ ঘেরাও-এর ভিতর মাথা ঢুকাইয়া দেখিতে পাইলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ এবং তাঁহার কণ্ঠনালী হইতে একপ্রকার শব্দ নির্গত হইতেছে। কিছুক্ষণ পর যখন তাঁহার ঐ অবস্থা দূরীভূত হইল তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ওমরার বিষয় প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোথায়? তখন ঐ ব্যক্তিকে সংবাদ দিয়া উপস্থিত করা হইল। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমার পরিধানের জুব্বাটি খুলিয়া ফেল, (কারণ এহরাম অবস্থায় তৈরী জামা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ; তদুপরি ইহা সুগন্ধ যুক্তও বটে।) এবং (এই জাফরান মিশ্রিত) সুগন্ধ (তোমার জুব্বাটি হইতে) তিনবার ধৌত করিয়া ফেল। (কারণ, জাফরানের রং পুরুষের জন্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।) আর হজ্জ অবস্থায় যেরূপ চলিয়া থাক ওমরা অবস্থায়ও তদ্রূপই চল।

এহরামের পূর্বক্ষণে (শরীরে) সুগন্ধি ব্যবহার করা

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, এহরাম অবস্থায় ফুল শোঁখিতে পারে,* আয়নায় চেহারা দেখিতে পারে। যে সব বস্তু মূল সুগন্ধি নহে, বরং উহা মূলতঃ অন্য ব্যবহারের; যথা—আহার্য্য বস্তু; যেমন তৈল, ঘি এরূপ সুগন্ধময় বস্তু শরীরে ঔষধরূপে ব্যবহার করিলে কোন কাফ্ফারা দিতে হইবে না। আর যাহা মূলতঃ সুগন্ধি যেমন জাফরান, কস্তুরী ইত্যাদি উহা শরীরে প্রয়োজনে ঔষধরূপে ব্যবহারেও কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে (শামী, ২—২৭৭)।

---

* ফুল বা সুগন্ধি শুধু শোঁখিলে কাফ্ফারা দিতে হয় না, কিন্তু স্বেচ্ছায় তাহা করা মাকরূহ-তাহরিমী।

আ'তা (রাঃ) বলিয়াছেন, এহরাম অবস্থায় অঙ্গুরি ব্যবহার করিতে পারে এবং টাকা পয়সা রাখিবার জন্য "জালি" নামে যে লম্বা থলিয়াবিশেষ কোমরে পেঁচাইয়া বাঁধা হয়—উহাও এহরাম অবস্থায় কোমরে বাঁধিতে পারে।

মেহনত ও শক্তির কাজে শ্রমিকরা লুঙ্গির নীচে লেঙ্গট পড়িয়া থাকে।× আয়েশা (রাঃ) ঐরূপ ক্ষেত্রে এহরাম অবস্থায় সেই লেঙ্গট পরা জায়েজ বলিয়াছেন।

৮০২। হাদীছঃ— সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইব্রাহীম (রঃ)কে বলিলাম—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এহরামের প্রস্তুতিকালে (শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার জায়েজ মনে করিতেন না, যেহেতু তাহা করিলে এহরামের পরেও সুগন্ধ বিদ্যমান থাকিবে, অতএব তিনি ঐ সময়) সুগন্ধবিহীন সাধারণ তৈল ব্যবহার করিতেন। ইব্রাহীম (রঃ) বলিয়াছেন, তুমি (সুস্পষ্ট হাদীছ বিদ্যমান থাকাবস্থায়) তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিবে কেন?

আসওয়াদ (রঃ) আমার নিকট আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে (এহরাম বাঁধার পূর্বক্ষণে আমি) তাঁহার মাথায় আঁচড়ানো চুলের মধ্য রেখায় (সুগন্ধি লাগাইয়া দিয়া ছিলাম;) এহরাম অবস্থায় সেই সুগন্ধির উজ্জ্বল চিহ্ন আমি দেখিয়াছি; এখনও যেন উহা আমার চোখে ভাসে।

৮০৩। হাদীছঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নিজ হস্তে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সুগন্ধি লাগাইয়া দিয়াছি:* এহরামের প্রস্তুতির সময় এবং এহরাম খোলার পর—তওয়াফে জেয়ারতের পূর্বে।

মাথায় বড় চুল থাকিলে এহরাম বাঁধিতে উহা জমাইয়া দিবে, যেন এলোমেলো না হইতে পারে

৮০৪। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তলবিয়া পড়িতে শুনিয়াছি; তখন তাঁহার মাথার চুল জমানো ছিল।

রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর এহরাম স্থান

৮০৫। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিল-হোলায়ফার (পরবর্তীকালে নির্মিত তথাকার) মসজিদের নিকট হইতেই এহরাম বাঁধিয়াছিলেন।

× এক হয় "জাঙ্গিয়া" যাহা খাট হাফপেন্টের ন্যায় শরীরের গঠন ও আকৃতিতে তৈরী থাকে; উহা এহরাম অবস্থায় পরিধান করা জায়েজ নহে। আর এক হয় লেঙ্গট, যাহা শরীরের কোন অংশের গঠন ও আকৃতিতে তৈরী নহে, বরং উহা কোন বিশেষ গঠনবিহীন শুধু লম্বা লেজবিশিষ্ট হয়; কোমরে পেঁচাইয়া উহা পরা হয়—যেমন কুস্তিগীররা পরিয়া থাকে। উহা এহরাম অবস্থায় পরিধান করা জায়েজ আছে।

* শরীরে সুগন্ধি লাগাইবে, কিন্তু কাপড়ে লাগাইবে না, নতুবা ঐ কাপড়ে এহরাম বাঁধিতে পারিবে না।

এহরাম অবস্থায় কি কি কাপড় পরিধান নিষিদ্ধ

৮০৬। হাদীছ ঃ--আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ ! এহরামওয়ালা ব্যক্তি কি কি কাপড় ব্যবহার করিতে পারে? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এহরামওয়ালা (পুরুষ) ব্যক্তি কোন প্রকার জামা, পায়জামা, পাগড়ি, টুপি ইত্যাদি পরিধান করিতে পারিবে না। মোজাও ব্যবহার করিতে পারিবে না, কিন্তু যদি জুতার ব্যবস্থা না থাকে তবে চামড়ার মোজা পায়ের মধ্যপৃষ্ঠের উঁচু স্থান এবং গোছের নিম্নে উভয় দিকের গিঁঠদ্বয় উন্মুক্ত থাকে এইরূপে উপরের অংশ কাটিয়া ফেলিয়া উহা (জুতার ন্যায়) ব্যবহার করিতে পারিবে। আর একটি বিষয় স্মরণ রাখিও যে, তোমরা কোন অবস্থাতেই 'অরস' (একপ্রকার উদ্ভিদ জাতীয় রং করার বস্তু) বা জাফরানে রং করা কাপড় ব্যবহার করিও না।

হজ্জের কার্য্য সম্পাদনে যানবাহন ব্যবহার করা

৮০৭। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আরফা হইতে মোজদালেফা আসাকালে উসামা (রাঃ)কে স্বীয় যানবাহনে বসাইয়া ছিলেন এবং মোজদালেফা হইতে মীনা আসাকালে ফজল (রাঃ)কে বসাইয়া ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জামরা আকাবার রমী করা (অর্থাৎ বড় শয়তানকে ১০ তারিখে কঙ্কর মারা) পর্য্যন্ত তলবিয়া পড়িয়াছেন।

এহরাম অবস্থায় পরিধেয়

- এহরাম অবস্থায় চাদর এবং লুঙ্গি* পরিধান করিবে।
- পুরুষ এহরাম অবস্থায় মাথা ঢাকিতে পারিবে না। মহিলার মাথা যেহেতু তাহার ছতরের অন্তর্ভুক্ত, তাই উহা অবশ্যই ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু মহিলাদের চেহারা যেহেতু ছতরের অন্তর্ভুক্ত নহে, তাই এহরাম অবস্থায় উহাকে পরিধাক বিহীন রাখিতে

---

* এহরাম অবস্থায় সেলাই করা লুঙ্গিও পড়া জায়েয। কারণ এহরাম অবস্থায় যে, পুরুষের জন্য সেলাই করা কাপড় নিষিদ্ধ উহার উদ্দেশ্য যাহা শরীর বা অঙ্গের গঠন আকৃতিতে সেলাই করা হয়; যেমন—জামা, পায়জামা। লুঙ্গির শুধু দুই মাথা জুড়িয়া দেওয়া হয়, উহা শরীরের গঠন আকৃতির নহে। আমাদের দেশের হাজীগণ সেলাই বিহীন লুঙ্গি পরিতে যাইয়া বার বার কবিরা গোনাহ এবং অতি জঘন্য লজ্জাকর অবস্থায় পতিত হয়। কাপড়ের হিসাবের বেলায় লুঙ্গির হিসাব চার হাত ঠিক রাখিয়া সেলাই বিহীন পরে, ফলে চলা-ফেরায় এবং শয়নে বা সামান্য বাতাসেও ছতর খুলিয়া যাইতে থাকে যাহা হারাম কবিরা গোনাহ। এত বড় গোনাহ দিবারাত্র অসংখ্য বার সংঘটিতে হইতে থাকে; ইহার প্রতি লক্ষ্য করা কতই না আবশ্যক! সেলাই বিহীন লুঙ্গি পরিতে হইলে অন্ততঃ পাঁচ হাত এবং মোটা শরীর হইলে ছয় হাত লম্বা লইবে, অন্যথায় লুঙ্গি সেলাই করা ব্যবহার করিবে।

হইবে ; এই কারণেই বোরকা পরিধান করিতে উহার নেকাব সাধারণভাবে চেহারার উপর পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় ছাড়িয়া দেওয়া বা শুধু চোখ খোলা রাখিয়া নাক-মুখ পর্যন্ত কাপড় জড়াইয়া দেওয়া এহরাম অবস্থায় নিসিদ্ধ। কিন্তু নারীদের জন্য বেগানা পুরুষ হইতে স্বীয় চেহারা পর্দায় রাখা ওয়াজেব, তাই নারীদেরকে এহরাম অবস্থায়ও বেগানা পুরুষদের সম্মুখে স্বীয় চেহারার পর্দা অবশ্যই করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে মাথার সঙ্গে কোন বস্তু রাখিয়া (যেমন ক্রিকেট খেলোওয়াড়দের ললাটের উপর থাকে) উহার উপর নির্দ্বিধায় বোরকার নেকাব ঝুলাইয়া দিতে পারে ; ইহাতে চেহারার পর্দা হইবে এবং যেহেতু নেকাব চেহারা হইতে আলগ থাকিবে, তাই উহা পরিধেয় গণ্য হয় না ; এহরাম অবস্থায় ঐরূপ ব্যবহার জায়েয। (বেগানাদের সম্মুখে চেহারার পর্দা করা এহরাম অবস্থায় নারীদের জন্য ওয়াজেব (শামী, ২—২৬০)

● আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, মহিলারা এহরাম অবস্থায় অলঙ্কার পরিধান করিতে পারে, মোজা পরিতে পারে।

● নারী-পুরুষ কেহই সুগন্ধ বস্তুর দ্বারা রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার করিতে পারিবে না, অবশ্য যদি সেই কাপড় হইতে সুবাস সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া গিয়া থাকে তবে উহা পরা জায়েয।

● কাল, গোলাবী ইত্যাদি সাধারণ যে কোন রঙ্গের রঙ্গীন কাপড় নারী-পুরুষ সকলেই এহরাম অবস্থায় বিনা দ্বিধায় পরিতে পারে ; তাহাতে দোষ নাই।+

● ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) বলিয়াছেন, এহরাম অবস্থায় পরিধেয় কাপড় বদলাইতে পারিবে ; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিবে।

৮০৮। **হাদীছ**ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায় হজ্জে) মদীনা হইতে যাত্রা করিয়াছেন মাথা আঁচড়াইয়া তৈল ব্যবহার করিয়া (—পারিপাট্যের সহিত)। তাঁহার পরিধানে লুঙ্গি ও চাদর ছিল। নবী (দঃ) এবং তাঁহার ছাহাবীগণ এই পোশাকেই ছিলেন। এবং কোন প্রকার চাদর ও লুঙ্গি পরিধানেই নিষেধ করেন নাই ; অবশ্য জাফরান (ইত্যাদি সুগন্ধ বস্তুর) রঙ্গে

+ আমাদের দেশের হাজীগণ সাদা কাপড় পরে, কিন্তু লজ্জা-শরমের কোনই ধার ধারে না। অনেকে কম মূল্যের শিথিল বুননের কাপড় পরে, এহরাম অবস্থায় গায়ে জামা থাকে না, তাই শুধু ঐ কাপড়ে নির্লজ্জতার ছায়া সর্বদাই প্রকাশ পাইতে থাকে এতদ্ভিন্ন সাদা কাপড় পরিয়াই সকলে বিশেষতঃ জাহাজের মধ্যে এক সঙ্গে গোসল করিতে থাকে। সাদা কাপড় ভিজিলে কিরূপ জঘন্য দৃশ্যের সৃষ্টি হয় তাহা সহজেই অনুমেয় এবং অপেক্ষমান লোক সমাবেশের সম্মুখে ঐ দৃশ্যে দাঁড়াইয়া গোসল করিতে থাকে—এ সব আমার চোখের দেখা অবস্থাবলী। হজ্জের ছফর অত্যন্ত পাক-পবিত্র ছফর ; এ সময় সংযত থাকা অধিক প্রয়োজন! গোসলের জন্য একটি রঙ্গিন কাপড় অবশ্য রাখিবে। এহরাম অবস্থায় সাদা কাপড় উত্তম বটে, কিন্তু ভাল বাইনের কাপড় সংগ্রহ করিতে না পারিলে রঙ্গিন কাপড় পরিবে।

রঞ্জিত কাপড়—যদি উহার রঙ্গ শরীরে লাগে তবে (অবশ্যই উহার সুবাস তখন কাপড়ে বিদ্যমান থাকিবে, তাই ঐ অবস্থায়) উহা নিষিদ্ধ। নবী (দঃ) (জোহর নামাযান্তে মদীনা হইতে যাত্রা করিয়া) জুলহোলায়ফা নামক স্থানে (পৌঁছিয়া আছর নামায পড়িলেন এবং তথায়ই রাত্রি যাপন করিয়া) প্রভাত করিলেন। (এবং তথায়ই দিনের বেলায় - ফতহুলবারী, ৩—৩২২) এহরাম বাঁধিলেন।) তথা হইতে যাত্রা আরম্ভে তিনি উটে আরোহণ করিলেন এবং সংলগ্ন ময়দানে পৌঁছিলে নবী (দঃ) ও ছাহাবীগণ সজোরে তলবিয়া পড়িলেন এবং নবী (দঃ) নিজ সঙ্গের কোরবানীর পশুগুলির গলায় (কোরবানীর নিদর্শনস্বরূপে) মালা পরাইয়া দিলেন। তখন জিলকদ চাঁদের পাঁচ দিন বাকি ছিল। জিলহজ্জ চাঁদের চার তারিখ (শনিবার দিন ভোরের দিকে) হযরত (দঃ) মক্কায় পৌঁছিলেন; প্রথমেই বাইতুল্লাহ্ শরীফের তওয়াফ করিলেন এবং ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করিলেন। নবী (দঃ) এহরাম অক্ষুণ্ণ রাখিলেন যেহেতু তাঁহার সঙ্গে কোরবানীর পশু নিয়া আসিয়াছিলেন। অতঃপর নবী (দঃ) "হাজুন" মহল্লায় অবস্থান করিলেন। তিনি হজ্জের এহরাম অবস্থায়ই ছিলেন। আরফা হইতে প্রত্যাবর্তনের (তথা জিলহজ্জের ১০ তারিখের) পূর্বে নবী (দঃ) আর তওয়াফ করিতে বাইতুল্লাহ্ শরীফের নিকটে আসেন নাই। ছাহাবীদিগকে কিন্তু তওয়াফ ও ছায়ী করার পরই মাথার চুল কাটিয়া এহরাম ভঙ্গ করার নির্দেশ দিলেন। এমনকি যাহার সঙ্গে স্ত্রী ছিল স্ত্রী ব্যবহার হালাল হইল এবং সুগন্ধি ও জামা-কাপড় ইত্যাদি সবই ব্যবহার করা হালাল হইয়া গেল। এই নির্দেশ শুধু তাহাদের জন্য ছিল যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল না।

ব্যাখ্যাঃ—যাঁহারা তওয়াফ ও ছায়ী করতঃ চুল কাটিয়া হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করিয়াছিলেন তাঁহাদের উক্ত তওয়াফ ও ছায়ী ওমরা পরিগণিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা জিলহজ্জের আট তারিখে পুনঃ হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া মিনায় যাত্রা করিয়াছিলেন এবং পূর্ণ হজ্জ সমাপন করিয়াছিলেন।

হজ্জের এহরাম ভঙ্গ প্রসংগটি সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী; শুধু ঐ এক বৎসরই বিশেষ কারণাধীন রসূলের আদেশে হইয়াছিল। এবং তাহাদিগকে কোন কাফ্ফারা দিতে হয় নাই। আমাদিগকে সাধারণ নিয়মই পালন করিতে হইবে; যে কোন কারণে হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করিলে তাহাকে এহরাম ভঙ্গের কাফ্ফারা অবশ্যই আদায় করিতে হইবে।

এহরাম বাঁধার সময় তল্বিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলা

৮০৭। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায় হজ্জে যাত্রাকালে) মদীনা শহরে জোহরের নামায পূর্ণ চারি রাকাত আদায় করিয়া মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং জুলহোলায়ফার এলাকায় পৌঁছিয়া আছরের নামায দুই রাকাত কছর পড়িলেন। পরদিন ঐ এলাকায় যখন এহরাম বাঁধিলেন তখন

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে উচ্চৈঃস্বরে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের নামে তলবিয়া পড়িতে শুনিয়াছি।

তল্‌বিয়া

৮১০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তল্‌বিয়া এইরূপ ছিল—

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ـ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ـ اِنَّ الْحَمْدَ

وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ـ لَاشَرِيْكَ لَكَ ـ

অর্থ—গোলাম উপস্থিত হইয়াছে, হে আল্লাহ্! গোলাম উপস্থিত হইয়াছে। গোলাম উপস্থিত হইয়াছে; তুমিই একমাত্র প্রভু, তোমার কোন শরীক নাই। গোলাম উপস্থিত হইয়াছে; সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য; যত নেয়ামতরাশি উপভোগ করিতেছি সবই তোমার এবং সারা বিশ্বের একচ্ছত্র রাজত্ব তোমার। তোমার কোনও শরীক নাই।

৮১১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় আমি জ্ঞাত আছি, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তল্‌বিয়া কিরূপ পড়িতেন—

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা। লাব্বাইকা লা-শরীকা-লাকা লাব্বাইকা।

ইন্নাল্-হাম্‌দা ওয়ান্-নে'মাতা লাকা' (ওয়াল্-মুল্‌কা লাকা। লা-শরীকা-লাকা*)।

মছআলাহ ঃ—এহরাম বাঁধা হইতে আরম্ভ করিয়া দশ তারিখ সকাল বেলায় জুমরা-আকাবাহ তথা বড় শয়তানকে কঙ্কর মারার পূর্ব পর্য্যন্ত এই তল্‌বিয়া সতত পড়িয়া যাইবে। (১৩১ পৃঃ ৮০৭ হাদীছ)

এহরাম বাঁধিবার সময় আল্লার প্রশংসা করা তছবীহ পড়া এবং তকবীর বলা

৮১২। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায় হজ্জে যাত্রার প্রাক্কালে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া জোহরের নামায মদীনাতে পূর্ণ চারি রাকাত পড়িলেন এবং জুল-হোলায়ফা এলাকায় আছরের নামায কছর দুই রাকাত পড়িলেন এবং সেই এলাকায়ই রাত্রি যাপন করিলেন। ভোর হইলে পর (দিনের বেলা) তিনি যানবাহনের উপর আরোহণ করিলেন। যানবাহন যখন তাঁহাকে লইয়া "বায়দা" নামক ময়দানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিলেন—

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বাক্য এই হাদীছে উল্লেখ নাই; ইহা সংক্ষিপ্ত তল্‌বিয়া প্রথমোক্ত হাদীছে এই বাক্যও আছে, উহা পূর্ণ তল্‌বিয়া।

"ছোবহানাল্লাহ" বলিয়া আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বয়ান করতঃ আল্লাহু আকবার বলিয়া আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব প্রকাশ করিলেন। অতঃপর হজ্জ ও ওমরা উভয়ের এহরাম বাঁধিলেন, (আমার নিকটস্থ) অন্যান্য সকলেও ঐ উভয়ের এহরামই বাঁধিল।

কেবলামুখী হইয়া এহরাম বাঁধা

৮১৩। **হাদীছ :—** আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এরূপ অভ্যস্ত ছিলেন যে, হজ্জের জন্য যাত্রাকালে জুল-হোলায়ফা নামক স্থানে ফজরের নামায শেষ করিয়া যানবাহন প্রস্তুত করার আদেশ করিতেন। অতঃপর উহার উপর আরোহণ করিতেন। যানবাহন যখন তাঁহাকে লইয়া দাঁড়াইত তখন তিনি কেবলামুখী হইয়া তল্‌বিয়া পড়িতেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ করিয়াছেন।

হায়েজ ও নেফাছ অবস্থায় এহরাম বাঁধা যায়

৮১৪। **হাদীছ :—** আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায় হজ্জকালে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আমরাও ছিলাম। মিকাত হইতে আমি শুধু ওমরার এহরাম বাঁধিয়া ছিলাম। (মক্কা হইতে ১০/১২ মাইল দূরে) সারেফ নামক জায়গায় পৌঁছিয়া নবী (দঃ) সাথীগণকে নির্দেশ দিলেন, যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু রহিয়াছে তাহারা (শুধু ওমরার এহরামে থাকিলে) ওমরার সঙ্গে হজ্জের এহরামও বাঁধিয়া নিবে এবং হজ্জ সমাপ্তে উভয় এহরাম হইতে এহরাম মুক্ত হইবে। যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু নাই (হজ্জের এহরাম থাকিলেও) তাহারা এহরামকে কার্য্যতঃ ওমরার উপরই ক্ষান্ত করিবে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, মক্কায় পৌঁছিয়া আমি হায়েজে লিপ্ত হইয়া পড়িলাম; (আমার ওমরার কার্য্যাবলী হইল না;) বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করিতে পারিলাম না, তাই ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করিতে পারিলাম না। নবী (দঃ) আমার নিকট তশরীফ আনিলেন— আমি কাঁদিতে ছিলাম। নবী (দঃ) বলিলেন, হে বোকা! কাঁদ কেন! আমি বলিলাম আমি ত ওমরা আদায় করিতে অপারগ রহিয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, নামায না পড়ার অবস্থা আমার হইয়াছে। নবী (দঃ) বলিলেন তোমার কোন ক্ষতি হইবে না; তুমি আদম জাতেরই একজন মহিলা; আদম-জাত সকল মহিলাদের উপর যাহা আল্লাহ তায়ালা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তোমার উপরও তাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। নবী (দঃ) বলিলেন, মাথার চুল খুলিয়া ফেল, মাথা আঁচড়াইয়া নেও (অর্থাৎ ওমরার এহরাম ভাঙ্গিয়া ফেল) ও ওমরা ছাড়িয়া দাও এবং হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া নেও: হাজীদের সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাও, শুধু বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ পবিত্রতা লাভের পূর্বে করিও না। আমি তাহাই করিলাম। আমার হায়েজ অবস্থা আরফার দিন পর্য্যন্ত থাকিল; আরফা হইতে মিনায় আসিয়া আমি পাক হইলাম।

তখন মিনা হইতে আসিয়া হজ্জের ফরজ তওয়াফ করিয়া গেলাম। মিনায় অবস্থানের দিনগুলি পূর্ণ করিয়া ১৩ই জিলহজ্জ বিদায় তওয়াফের জন্য হযরত (দঃ) মিনা হইতে যাত্রা করিলেন আমিও তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করিলাম। মোহাছ্ছাব নামক জায়গায় হযরত (দঃ) অবতরণ করিলেন, আমরাও অবতরণ করিলাম। তথায় রাত্রে আমি আরজ করিলাম, সকলে ওমরা ও হজ্জ উভয়টি লইয়া বাড়ী যাইবে, আর আমি শুধু হজ্জ লইয়া যাইব! তখন হযরত (দঃ) আমার ভ্রাতা আবদুর রহমানকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার ভগ্নিকে নিয়া হরম সীমার বাহিরে তানয়ীমে যাও। সে তথা হইতে ওমরার এহ্‌রাম বাঁধিবে। তারপর তোমরা ওমরার কার্য্যাবলী সমাপ্ত করিয়া এ-স্থানেই আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইবে; আমি তোমাদের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিব। সেমতে ভ্রাতার সঙ্গে আমি বাহির হইলাম; তওয়াফ-ছায়ী করিয়া ওমরা সমাপ্ত করিয়া (চুল কর্তনে এহ্‌রাম খুলিয়া) শেষ রাত্রে হযরতের নিকট পৌঁছিলাম; তিনি তখন বিদায় তওয়াফ করিয়া ফিরিয়াছেন মাত্র। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ওমরা সমাপ্ত করিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার এই ওমরা তোমার পরিত্যক্ত ওমরার স্থলে হইল। অতঃপর হযরত (দঃ) সকলকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন; সকলে মদীনা পানে যাত্রা করিল।

অন্যের এহ্‌রাম দ্বারা নিজের এহ্‌রাম নির্দ্ধারণ

হজ্জ তিন প্রকার—এফরাদ, ক্বেরাণ ও তামাত্তো'। বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে। এফরাদ হইলে এহ্‌রাম বাঁধিবার সীমানা হইতে শুধু হজ্জের নিয়্যত করিতে এবং শুধু উহারই এহ্‌রাম বাঁধিতে হয়। তামাত্তো' হইলে সেই সীমানা হইতে শুধু ওমরার নিয়্যত ও এহ্‌রাম বাঁধিতে হয়। ক্বেরাণ হইলে হজ্জ ও ওমরা একত্রে উভয়ের নিয়্যত ও এহ্‌রাম বাঁধিতে হয়। নিয়্যত ও এহ্‌রাম বাঁধার সময় উক্ত তিন প্রকারের একটি নির্দ্ধারণ করে যদি এরূপ বলে যে, আমি অমুক ব্যক্তির এহ্‌রামের ন্যায় এহ্‌রাম বাঁধিলাম, তবে তাহার নিয়্যত ও এহ্‌রাম শুদ্ধ গণ্য হইবে এবং কার্য্য আদায় আরম্ভ পর্য্যন্ত উক্ত ব্যক্তির এহ্‌রাম কোন্ প্রকারের তাহা জানিতে পারিলে তাহার এহ্‌রাম ঐ প্রকারেরই সাব্যস্ত হইবে; সে ঐ অনুপাতেই আমল করিবে। আর যদি উক্ত ব্যক্তির এহ্‌রামের খোঁজ না পায় তবুও তাহার মূল এহ্‌রাম শুদ্ধ হইবে, কার্য্যারম্ভে তাহাকে উক্ত তিন প্রকারের কোন এক প্রকার নির্দ্ধারিত করিয়া লইতে হইবে এবং সেই অনুপাতে কার্য সম্পাদন করিতে হইবে। শামী, ২—২১৭

৮১৫। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায় হজ্জ উপলক্ষে হজ্জের এহ্‌রামের সহিত মক্কাভিমুখে চলিলেন, আমরাও তাঁহার সহিত এহ্‌রাম বাঁধিয়া চলিলাম। মক্কায় পৌঁছিয়া হযরত নবী (দঃ) সকলকে তাকিদ দিলেন যে, যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু আনা হয় নাই তাহারা নিজ

নিজ এহরাম ওমরায় পরিণত করিয়া ফেল। (অর্থাৎ তাহারা ওমরার কার্য্য সমাধা করিয়া এহরাম ভঙ্গ করিয়া ফেলিবে।) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল।

আলী (রাঃ) ইয়ামানে ছিলেন, তথা হইতে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌঁছিলেন। নবী (দঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রকার হজ্জের এহরাম বাঁধিয়াছ? তোমার স্ত্রী (ফাতেমা রাঃ) আমার সঙ্গে আসিয়াছে। আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি এহরাম বাঁধিতে এইরূপ বলিয়াছি—নবী (দঃ) যে প্রকার হজ্জের এহরাম বাঁধিয়াছেন আমারও তাহাই। নবী (দঃ) বলিলেন, তবে তুমি এহরাম অবস্থায়ই থাক; আমাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু আছে। ৬২৪ পৃঃ

৮১৬। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী (রাঃ) রাষ্ট্রিয় দায়িত্বে ইয়ামানে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তথা হইতে তিনি মক্কায় পৌঁছিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রকার হজ্জের এহরাম বাঁধিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি বলিয়াছি—

لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم

"রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হজ্জ অনুরূপ হজ্জের নিয়্যতে আমি তলবিয়া পড়িতেছি।" নবী (দঃ) বলিলেন, তবে তুমি নিজ সঙ্গে কোরাবনীর পশু অবলম্বনকারী পরিগণিত থাক; তথা এহরাম অবস্থায়ই থাক—যেরূপ আছ। জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, আলী (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য কতিপয় কোরবানীর পশু সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিলেন এবং নবী (দঃ) তাঁহাকে কোরবানীর পশুর মধ্যে অংশীদার করিয়া নিয়াছিলেন। (৩৩১ ও ৬২৪ পৃঃ)

৮১৭। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী (রাঃ) ইয়ামান হইতে মক্কায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পৌঁছিলেন। নবী (দঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রকার এহরাম বাঁধিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি এরূপ বলিয়াছিলাম, যে প্রকার এহরাম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের, আমারও তাহাই। নবী (দঃ) বলিলেন, আমার সঙ্গে কোরবানীর পশু না থাকিলে আমি এহরাম ভঙ্গ করিয়া ফেলিতাম।

৮১৮। হাদীছ ঃ— আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে আমার দেশ ইয়ামানে পাঠাইয়াছিলেন। (বিদায় হজ্জ উপলক্ষে) আমি তথা হইতে মক্কায় পৌঁছিলাম। নবী (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপ এহরাম বাঁধিয়াছে? আমি আরজ করিলাম, আমি এরূপ বলিয়াছি—

"আমি তল্‌বিয়া পড়িতেছি এহরামের উদ্দেশ্যে—ঐরূপ এহরাম যেরূপ এহরাম রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বাঁধিয়াছেন"। নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সঙ্গে কোরবানীর পশু আছে কি? আমি বলিলাম, না। নবী (দঃ) আমাকে বলিলেন, কা'বা শরীফের তওয়াফ কর এবং ছাফা-মারওয়ার ছায়ী কর অতঃপর এহরাম ভঙ্গ করিয়া ফেল। আমি তাহাই করিলাম; তওয়াফ-ছায়ী করিয়া আমার বংশীয় এক মহিলার নিকট আসিলাম, সে আমার মাথা ধোয়ার ও আঁচড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিল—আমি এহরাম ভঙ্গ করিলাম। (৬৩১ পৃঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—নবী (দঃ) বিদায় হজ্জে একশত উট কোরবানী করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৬৩টা নবী (দঃ) স্বয়ং মদীনা হইতে সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিলেন, আর ৩৭টা আলী (রাঃ) ইয়ামান হইতে নিয়া আসিয়াছিলেন। উক্ত পশু জবেহ করার সময় স্বীয় বয়সের বৎসর সংখ্যায় ৬৩টি স্বয়ং নবী (দঃ) নিজ হাতে জবেহ করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্টগুলি আলী (রাঃ)কে জবেহ করিতে দিয়াছিলেন। অতঃপর প্রতিটি উট হইতে সামান্য অংশ গোশত একত্র করতঃ উহা পাকাইয়া নবী (দঃ) ও আলী (রাঃ) উভয়ে তাহা আহার করিয়াছিলেন। এই সব তথ্য মোছলেম শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে। সেমতে দেখা যায় আলী (রাঃ) কোরবানীর পশু সঙ্গে আনিতেও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শরীক ছিলেন। উহা জবেহ করা এবং আহার করায়ও তাঁহার শরীক ছিলেন। তদুপরি ৮০৬নং হাদীছে ইহাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ হইয়াছে যে, নবী (দঃ) আলী (রাঃ)কে স্বীয় কোরবানীর পশুর মধ্যে শরীক বা অংশীদার করিয়া নিয়াছিলেন। সুতরাং আলী (রাঃ) কোরবানী পশু সঙ্গে অবলম্বনকারী পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাই এহরাম ভঙ্গের নির্দেশ তাঁহার প্রতি হয় নাই; তাঁহার জন্য এহরাম অবস্থায় থাকারই নির্দেশ ছিল যেরূপ নবী (দঃ) ছিলেন। ছাহাবী আবু মুছার অবস্থা তদ্রূপ ছিল না, তিনি কোরবানীর পশু সঙ্গে অবলম্বনকারী ছিলেন না, তাই সকলের ন্যায় তাঁহাকে এহরাম ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল। কারণ, ঐ বৎসর কোরবানীর পশু সঙ্গে থাকা না থাকার উপরই এহরাম রাখা বা ভঙ্গ করা আরোপিত ছিল।

হজ্জের সময়

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ
وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ -

অর্থ—হজ্জ (তথা হজ্জের এহরাম) সম্পাদন করার জন্য একাধিক নির্দিষ্ট মাস আছে। যে ব্যক্তি ঐ মাসের মধ্যে হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া নেয় তাহার অবশ্য কর্তব্য হইবে, সে যেন হজ্জ তথা এহরাম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী সুলভ ব্যবহারের তথা মুখে উচ্চারণও না করে এবং কোন

প্রকার শরীয়ত বিরোধী কার্য্য না করে এবং কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়। (যদিও হজ্জের বিশিষ্ট কার্য্যসমূহ জিলহজ্জ মাসের ৫।৬ দিনে মাত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাবে, তথাপি যখন এহরাম বাঁধা হইয়াছে তখন হইতেই সে হজ্জের মধ্যে পরিগণিত হইবে)। (২ পাঃ ৯ রুঃ) আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন---

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

অর্থ—কাফেররা আপনাকে (বিব্রত করার জন্য) জিজ্ঞাসা করে প্রতি মাসেই চন্দ্রের মধ্যে (ছোট বড় হওয়ার বিরাট) পরিবর্তন কেন হইয়া থাকে ? আপনি বলিয়া দিন, এই পরিবর্তনের দ্বারা (মাস সৃষ্টি হইয়া থাকে ; মাসের দ্বারাই) বিশ্বাবাসী তাহাদের ক্রিয়া কার্য্যসমূহের হিসাব স্থির করিয়া থাকে এবং হজ্জের সময়ও উহার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। (২ পারা ৮ রুকু)

● আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, হজ্জের মাস এই—শাওয়াল, জুলকাদাহ এবং জুল-হেজ্জার প্রথম দশ দিন।

● আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছুন্নত তরিকা এই যে, হজ্জের মাসের পূর্বে এহরাম বাঁধিবে না।

● ওসমান (রাঃ) এহরামের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ন্যায় নির্দিষ্ট স্থানের প্রতিও লক্ষ্য রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট মীকাতের পূর্বে অন্য স্থান হইতে এহরাম বাঁধা মকরূহ বলিয়াছেন।

হজ্জের প্রকার

হজ্জ তিন প্রকার—(১) হজ্জে এফ্‌রাদ, (২) হজ্জে কেরাণ, (৩) হজ্জে তামাত্তো'। নিয়্যত করা তথা এহরাম বাঁধার সময় শুধু হজ্জেরই এহরাম বাঁধা এবং শেষ পর্য্যন্ত শুধু হজ্জের কার্য্যাবলী সমাপন করা উহাকে হজ্জে-এফ্‌রাদ বলে।

নিয়্যত করা ও এহরাম বাঁধার সময়েই হজ্জ ও ওমরা উভয়ের নিয়্যত ও এহরাম একত্রে হইলে, কিম্বা প্রথমে হজ্জ বা ওমরা একটির নিয়্যত ও এহরাম বাঁধিয়া উহার কার্য্য আরম্ভের পূর্বে যে কোন সময় এমনকি মক্কায় পৌঁছিয়াও অপরটির নিয়্যত সঙ্গে করিয়া নিলে উহাকে হজ্জে-কেরাণ বলা হয়। ইহার জন্য অতিরিক্ত কাজ হইল---হজ্জের ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত তওয়াফ ছাড়া অতিরিক্ত ওমরার নিয়্যতে সাত চক্কর তওয়াফ করা এবং হজ্জের ওয়াজেব ছাফা-মারওয়ার সায়ী ছাড়াও অতিরিক্ত ওমরার নিয়্যতে সায়ী করা, আর ১০ই জিলহজ্জ নিয়মিত কোরবানী ছাড়া হজ্জে-কেরাণের নিয়্যতে কোরবানী করা। আরও প্রকাশ থাকে যে, হজ্জে কেরাণকারী ওমরা ও হজ্জ উভয়ের এহরাম এক সঙ্গে রাখিয়াছে, তাই হজ্জ সমাপ্তির পূর্বে ওমরার তওয়াফ ও ছায়ী করার পরও এহরাম অবস্থায় থাকিবে।

আর প্রথম হইতে শুধু ওমর'র এহরাম বাঁধিয়া মকায় পৌঁছিয়া হজ্জের নির্ধারিত মাস সমূহের মধ্যে ওমরার নিয়্যতে তওয়াফ, ছায়ী করার পরে হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া হজ্জের দিন সমূহে হজ্জ সমাপনা করা হইলে উহাকে হজ্জে-তামাত্তো' বলা হয়। প্রকাশ থাকে যে, হজ্জে-তামাত্তো'তে যেহেতু ওমরার এহরামের সঙ্গে হজ্জের এহরাম থাকে না, তাই ওমরার কার্য্যাবলী তথা তওয়াফ ও ছায়ী করিয়াই (সাধারণ অবস্থায়) চুল ফেলিয়া এহরাম খুলিয়া নিবে এবং ৮ই জিলহজ্জ মিনায় যাত্রার পূর্বে হজ্জের এহরাম বাঁধা পর্য্যন্ত এহরাম বিহীনই থাকিবে। হজ্জে-কেরাণের ন্যায় এক্ষেত্রেও হজ্জে-তামাত্তো'র নিয়্যতে কোরবানী করিতে হইবে। হজ্জে-কেরাণ ও হজ্জেতামাত্তোর মধ্যে পার্থক্য দুইটি—(১) হজ্জে-কেরাণ হজ্জ ও ওমরা উভয়ের নিয়্যত প্রথম হইতে বা কার্য্য আরম্ভের পূর্বে একত্রিত হয়, পক্ষান্তরে হজ্জে-তামাত্তো'তে প্রথম হইতে শুধু ওমরার নিয়্যত করা হয়; ওমরা শেষ করিয়া তারপর হজ্জের এহরাম ও নিয়্যত করা হয়। (২) হজ্জে-কেরাণে এহরাম বাঁধিবার পর মধ্যভাগে এহরাম খোলার কোন ব্যবস্থা নাই, হজ্জ সমাপ্তেই এহরাম খুলিবে, তাই ইহাতে দীর্ঘ দিন এহরাম অবস্থায় থাকিতে হয় যাহা একটি এবাদৎ এবং কষ্টসাধ্য হওয়ায় অধিক ছওয়াবের আমল। পক্ষান্তরে হজ্জে-তামাত্তো'তে মক্কায় পৌঁছিয়া ওমরার তওয়াফ, ছায়ী করতঃ চুল ফেলিয়া এহরাম খুলিয়া ফেলা হয়, পুনরায় ৮ই জিলহজ্জে দুই দিনের জন্য এহরাম বাঁধিতে হয়—ইহাই সাধারণ তামাত্তো-এর নিয়ম।

অধিক এবং সাব্যস্ত রকমের প্রমাণ অনুসারে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিদায় হজ্জ, হজ্জে-কেরাণ ছিল। হানফী মজহাব মতে হজ্জে-কেরাণই সর্বোত্তম কিন্তু হজ্জের তারিখের অধিক পূর্বে এহরাম বাঁধা হইলে সে ক্ষেত্রে হজ্জে-কেরাণ এবং হজ্জে-এফরাদও সঙ্কটাপূর্ণ ও ভয় সঙ্কুল; এমতাবস্থায় হজ্জে-তামাত্তো' করাই কর্তব্য, ইহা হজ্জে-এফরাদ হইতে উত্তমও বটে।

৮১৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অন্ধকার যুগে আরবের লোকদের আকিদা ও বিশ্বাস এরূপ ছিল যে, হজ্জের মাস সমূহের × যে কোন দিনে ওমরা

× হজ্জের মাস সমূহ হইল—শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ্জের দশ তারিখ পর্য্যন্ত। হজ্জের মূল কার্য্য—আরাফায় অবস্থান শুধু নয় তারিখেই নির্দ্ধারিত; অপর মূল কার্য্য তথা হজ্জের ফরজ নিয়্যতে তওয়াফ, ইহার জন্য নিয়মিত সময় দশ তারিখ শুধু সহজ করার উদ্দেশ্যে; ইহা পরে করিলেও জায়েয হয়। এতদসত্ত্বেও হজ্জের মাস শাওয়াল হইতে ধরা হইয়াছে, কারণ মানুষ বহু দুর-দুরান্ত হইতে হজ্জ করিতে আসিবে; তাহাদের জন্য মক্কা হইতে বহু দুরে দুরে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন স্থান "মীকাত"রূপে শরীয়ত কর্তৃক নির্দ্ধারিত রহিয়াছে; তথা হইতে হজ্জকারীগণকে বাধ্যতা মূলক এহরাম বাধিয়া আসিতে হইবে। সেই এহরাম অবশ্যই হজ্জের মূল কার্য্য আদায়ের দিন

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

করা প্রত্যেকের জন্যই অতি বড় জঘন্য পাপ। তাহারা বলিত, হজ্জের দীর্ঘ ছফরে সৃষ্ট উটের পৃষ্ঠের ঘা সুস্থ হওয়ার এবং শ্রান্তি দূর হওয়ার পর—জিলহজ্জ মাসের পরে আরও একমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর ওমরাকারীর জন্য ওমরা শুদ্ধ হইবে। উক্ত গর্হিত আকিদা চিরতরে খণ্ডন-উদ্দেশ্যে নবী (দঃ) বিদায় হজ্জ উপলক্ষে জিলহজ্জ মাসের চার তারিখের ভোরে মক্কায় পৌঁছিয়াই সকলকে তাকিদ দিলেন তাহাদের হজ্জের এহরামকে ওমরায় পরিণত করার জন্য।

হজ্জের দিন নিকটবর্তী অবস্থায় হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করিতে ছাহাবীদের মনে আতঙ্ক হইল; তাঁহারা পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! এহরাম ভঙ্গ কি রকমের হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, পূর্ণরূপে এহরাম ভঙ্গ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ— উল্লিখিত অন্ধকার যুগের আকিদাটি ইসলামী বিধানের পরিপন্থিত ছিলই, অধিকন্তু উত্তম প্রকারের হজ্জ—হজ্জে-কেরাণ ও হজ্জে-তামাত্তো' এরও অন্তরায় ছিল। মোসলমানগণ সঠিক বিধান ও মছআলাহ সাধারণভাবে জ্ঞাত ছিল; বিদায় হজ্জ যাহা হজ্জের মাসেই ছিল—ঐ সময় হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আরও অনেকে হজ্জের সহিত ওমরার নিয়্যত করিয়াছিলেন, অনেকে শুধু ওমরার এহরাম বাঁধিয়া ছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত ভ্রান্ত আকিদাটি এত দৃঢ় এবং ব্যাপক ভাবে প্রচারিত ছিল যে, উহা খণ্ডনের জন্য নবী (দঃ) উহার বিপরীত বিরাট আলোড়ন সৃষ্টির প্রয়োজন বোধ করিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নবী (দঃ) তাঁহার লক্ষাধিক সঙ্গীদের মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল তাঁহারা ছাড়া ব্যাপকভাবে সকলকে নিজ নিজ হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করতঃ ওমরায় পরিণত করার আদেশ করিলেন। মক্কা হইতে ৯।১০ মাইল ব্যবধানে "সারেফ" নামক মঞ্জিলে অবতরণ করিয়া নবী (দঃ) এই আদেশ জারী করেন এবং মক্কায় পৌঁছিয়া উহার প্রতি পুনঃ পুনঃ তাকিদ দেন; উহাতে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় যাহার বিবরণ পরবর্তী হাদীছে আসিতেছে। শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ লোকের হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করতঃ ওমরায় পরিণত করিয়া হজ্জের মাসে ওমরা করার বৈধতা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ঐ সব লোকের হজ্জ, হজ্জে-তামাত্তো' রূপে আদায় হয়। হজ্জের এহরাম

হইতে বহু পূর্বে অনুষ্ঠিত হইবে; কারণ এহরামের নির্দ্ধারিত স্থান তথা "মীকাত" সমূহ মক্কা হইতে বহু দূরে অবস্থিত। এহরাম হজ্জের সর্বপ্রথম কাজ—এই কাজটি যদি হজ্জের সময়ভুক্ত না হয় তবে তাহা অসুন্দর দেখাইবে, তাই এহরামের সাধারণ সম্ভাব্য সময়কে হজ্জের সময়ের গণ্ডিভুক্ত করার জন্য শাওয়াল মাস হইতে হজ্জের সময় গণ্য করা হইয়াছে। ইহা পূর্ব হইতেই প্রবর্তিত ছিল, এমনকি অন্ধকার যুগে কাফেরদের মধ্যেও ইহা প্রচলিত ছিল। কোরআন শরীফে ২ পাঃ ৯ রুকুতে যে উল্লেখ আছে—'হজ্জের সময় হইল কতিপয় নির্দ্ধারিত মাস' উহার উদ্দেশ্যও এই যে, শরীয়ত কর্তৃক উক্ত মাস সমূহই হজ্জের কার্য্যাবলীর জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।

এইরূপে ভঙ্গ করিলে সাধারণ বিধান মতে কাফ্‌ফারা আদায় করিতে হয়, কিন্তু ঐ বৎসর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশে এহ্‌রাম ভঙ্গকারীরা উক্ত কাফ্‌ফারা হইতে রেহায়ী পায়।

৮২০। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জে আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী ছিলাম। আমাদের প্রায় সকলেই হজ্জে-এফরাদের ছিল। আমরা "লাব্বাইকা বিল-হজ্জে" বলিয়া স্পষ্টরূপে হজ্জের উল্লেখ পূর্বক এহ্‌রাম বাঁধিয়া ছিলাম। আমাদের কাহারও সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল না—শুধুমাত্র নবী (দঃ) ও তাল্‌হা (রাঃ) (এবং আর কতিপয় নগণ্য সংখ্যক লোক) ছাড়া। আলী (রাঃ) ইয়ামান হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গেও কোরবানীর পশু ছিল। (যাহাদের সঙ্গে পশু ছিল না তাহাদের) সকলকে নবী (দঃ) আদেশ করিলেন, তোমরা বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার সায়ী (তথা শুধু ওমরা) আদায় করিয়া চুল কর্তন পূর্বক হজ্জের এহ্‌রাম ভঙ্গ করিয়া ফেল, ৮ তারিখে পুনঃ হজ্জের এহ্‌রাম বাঁধিবে। এই ভাবে তোমরা যে, হজ্জের নিয়্যত করিয়া আসিয়াছ উহাকে হজ্জে-তামাত্তো'রূপে রূপান্তরিত কর। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আমরা বর্তমান এহ্‌রামকে ভাঙ্গিয়া হজ্জে তামাত্তো'-এর ওমরায় পরিণত করিব কিরূপে, অথচ আমরাত এহ্‌রাম বাঁধিবার সময় স্পষ্টরূপে হজ্জের এহ্‌রাম বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, আমি যাহা আদেশ করিয়াছি তাহা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য; আমি কোরবানীর পশু সঙ্গে না আনিলে আমিও তোমাদের ন্যায় এহ্‌রাম ভঙ্গ করিতাম। অনেকের মনে এরূপ সঙ্কোচেরও উদয় হইল যে, হজ্জ আরম্ভের দিন সম্মুখে আগত, আমরা এখন এহ্‌রাম ভঙ্গ করিয়া সাধারণভাবে স্ত্রীও ব্যবহার করিতে পারি—সেমতে স্ত্রী ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে হজ্জ সমাপনে মিনায় যাত্রা করিব; ইহা কিরূপ হইবে? এই সব ইতঃস্ততার সংবাদ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গোচরীভূত হইল। নবী (দঃ) ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, আমি সংবাদ পাইয়াছি, অনেকে এই, এই কথা বলিতেছে। আল্লার কসম—আমি নেক কাজকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভালবাসি এবং আল্লাহ তায়ালাকে বেশী ভয় করি। (ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডনের জন্য এহ্‌রাম ভঙ্গের) যে প্রয়োজনীয়তা আমি পরে অনুভব করিয়াছি তাহা পূর্বে অনুভব করিলে আমি কোরবানীর পশু সঙ্গে আনিতাম না এবং আমার সঙ্গে ঐ পশু না থাকিলে অবশ্যই আমিও এহ্‌রাম ভঙ্গ করিতাম। অতঃপর আমরা সকলে আমাদের হজ্জের এহ্‌রাম ও নিয়্যতকে ওমরায় রূপান্তরিত করিয়া নিলাম। সোরাকাহ ইবনে মালেক (রাঃ) দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! ইহা (অর্থাৎ হজ্জের মাসে ওমরা করার বৈধতা) শুধু আমাদের উপস্থিতগণের জন্য, না—কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদার জন্য? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমাদের জন্যই নয় শুধু, বরং সর্বদার জন্য।

৮২১। হাদীছ ঃ—উম্মুল-মোমেনীন হাফছাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! লোকগণ (আপনার নির্দেশে) তাহাদের হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করিয়া ওমরায় রূপান্তরিত করিয়াছে, আপনি কি সেরূপ ওমরা করতঃ এহরাম ভঙ্গ করিবেন? রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন, আমি এহরামকে স্থায়ী করার ব্যবস্থা করিয়া কোরবানীর নিদর্শনযুক্ত পশু সঙ্গে আনিয়াছি। সুতরাং কোরবানী না করা পর্যন্ত আমি এহরাম ছাড়িতে পারি না।

৮২২। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে এক সঙ্গে হজ্জ ও ওমরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, বিদায়-হজ্জ কালে আমরা সকলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এহরাম বাঁধিয়া চলিলাম; মক্কায় পৌছিয়া রসুলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে তাকিদ দিলেন যে, তোমরা তোমাদের হজ্জের এহরামকে ওমরায় পরিণত করিয়া নেও—তাহারা ছাড়া যাহারা কোরবানীর পশু সঙ্গে আনিয়াছে। সেমতে আমরা তওয়াফ ও সায়ী করিয়া (এহরাম ভঙ্গ করতঃ) স্ত্রী ব্যবহার, জামা-কাপড় ব্যবহার করিলাম। যাহারা কোরবানীর পশু সঙ্গে আনিয়াছিল তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন, তাহারা (১০ তারিখে) কোরবানী না করিয়া এহরাম ছাড়িতে পারিবে না। অতঃপর ৮ই জিলহজ্জ তারিখে দুপুরের পর আমাদিগকে (এহরাম ভঙ্গকারীদিগকে) পুনঃ হজ্জের এহরাম বাঁধার আদেশ করিলেন।

অতঃপর আমরা হজ্জের কার্য্যাবলী সমাপ্ত করিলে আমাদের উপর একটি কোরবানী ওয়াজেব হইল যেরূপ কোরআনের আয়াতের নির্দেশ রহিয়াছে। এই সময় সকলে একই বৎসর এক সঙ্গে হজ্জ ও ওমরা উভয়টি আদায় করিল; ইহার বিধান আল্লাহ তায়ালা কোরআনে নাযেল করিয়াছেন এবং নবী (দঃ) উহার আদর্শ স্থাপন করিয়া লোকদের জন্য উহাকে বৈধ সাব্যস্ত করিয়াছেন। অবশ্য ইহা মক্কাবাসী ভিন্ন অন্য লোকদের জন্যই বৈধ। আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন—"ইহা (তথা হজ্জ ও ওমরা এক সঙ্গে করা) শুধু মাত্র ঐ লোকদের জন্য যাহাদের পরিবারবর্গ মক্কা নিবাসী না হয়" (২ পাঃ ৮ রুঃ)।

মছআলাহ্ ঃ— যে প্রকার হজ্জের নিয়্যত ও এহরাম বাঁধা হয় এহরাম বাঁধাকালীন "লাব্বাইকা" পড়িতে উহার উল্লেখ করা উত্তম। যথা—হজ্জে এফরাদকারী বলিবে—

لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ . لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ...... (১০৩ পৃঃ ৮২০ হাদীছ)

এবং হজ্জে-তামাত্তো'কারী বলিবে—

لَبَّيْكَ بِالْعُمْرَةِ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ . لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ....

এবং হজ্জে-কেরাণকারী বলিবে—

لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ .... (৯৪ পৃঃ ৮০৯ হাদীছ)

মক্কা শরীফে প্রবেশের পূর্বে গোছল করা

৮২৩। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) (হরম শরীফের নিকটবর্তী আসার পূর্ব পর্য্যন্ত শুধু তলবিয়া পড়িতেন, কিন্তু) হরম শরীফের নিকটবর্তী হইলে পর (শুধু) তলবিয়া পড়িতেন না (বরং অন্যান্য দোয়া-দরূদ পড়ায়ও মশগুল হইতেন) এবং "জি-তুয়া" নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিতেন। তথায় ফজরের নামাজ আদায় করিতেন, অতঃপর গোসল করিতেন। তিনি বর্ণনা করিতেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ করিয়াছেন।

কোন্ পথে মক্কায় প্রবেশ করিবে

৮২৪। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা শরীফে ছানিয়াতুল-ও'লইয়া—উর্দ্ধ প্রান্তের "কাদা" নামক পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ছানিয়াতুছ-ছোফলা—নিম্ন প্রান্তের পথে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন।

বাইতুল্লাহ শরীফের প্রতিষ্ঠা

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ...... إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ -

অর্থ—এই বিষয় লক্ষ্য রাখিও যে, আমি বাইতুল্লাহ শরীফকে বিশ্ব-মানবের জন্য এবাদতের স্থান এবং শান্তি ও নিরাপত্তার স্থানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। এবং এই আদেশ করিয়াছি যে, বিশেষরূপে মকামে-ইব্রাহীমের নিকটবর্তী স্থানে নামায আদায় কর। আর ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করিয়াছিলাম যে, আমার ঘরকে পাক-পবিত্র রাখ তওয়াফকারীদের জন্য, তথায় এবাদতরত অবস্থানকারীদের জন্য এবং নামায আদায়কারীদের জন্য। ইহাও স্মরণ রাখিও যে, ইব্রাহীম (আঃ) প্রার্থনা করিয়াছিলেন—হে পরওয়ারদেগার! এই শহরটিকে শান্তিময় ও নিরাপত্তার স্থান বানাইয়া দাও এবং শহরবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী হয় তাহাদের জন্য ফল-ফলাদি ও খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়া দাও। (কারণ, ইহা এরূপ পাথরময় স্থান যে, উৎপাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম।) আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, (ইহজগতের জন্য আমার যে নীতি প্রচলিত আছে সেই নীতি অনুসারে) জাগতিক জীবনে কাফেরদের জন্যও আমি খাদ্য জোটাইব, কিন্তু পরকালে তাহাদিগকে অনিবার্য্যতঃ দোযখের আজাবে নিক্ষিপ্ত করিব; উহা অতিশয় কষ্টদায়ক জঘন্য স্থান। স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের ভিত্তি স্থাপন ও দেয়াল প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন তখন তাঁহারা অতি নম্রতা ও কাকুতি-মিনতির সহিত এই

আরাধনা ও প্রার্থনা করিতেছিলেন—হে আমাদের পালনকর্তা প্রভু! তুমি আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল কর। তুমি আমাদের প্রার্থনা ইত্যাদি সব কিছু শ্রবণ করিয়া থাক এবং আমাদের অন্তরের এখলাছ—নিষ্কাম আগ্রহ-আকাঙ্খা সব কিছু জ্ঞাত আছ। হে প্রভু! আমরা—পিতা-পুত্রদ্বয়কে এবং আমাদের বংশধরকে তোমার দাস, তোমার একান্ত অনুগত আজ্ঞাবহ বানাও এবং তোমার এই ঘরের হজ্জের নিয়মাবলী শিক্ষা দান কর এবং আমাদের সমুদয় গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া আমাদের প্রতি রহম কর; তুমি নিশ্চয় তওবা কবুলকারী দয়ালু। (১ পারা ১৯ রুকু)

৮২৫। **হাদীছ ঃ—** *আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, হাতীমের স্থানটুকু × বাইতুল্লাহ শরীফের অংশ কি না? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—বাইতুল্লারই অংশ। আমি আরজ করিলাম, বাইতুল্লাহ শরীফ তৈয়ারীর সময় এই অংশকে উহার শামিল করা হয় নাই কেন? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তুমি জান না যে, তোমার বংশীয় কোরায়েশরা যখন এই বাইতুল্লাহ শরীফের পুনঃ নির্মাণের ইচ্ছা করিল, তখন (তাহারা এই পণ করিল যে, হারাম ও জুলুম অত্যাচার এবং জুয়া, লুট ও ডাকাতি ইত্যাদি অবৈধ উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদ এই ঘর নির্মাণের কার্য্যে ব্যয় করিবে না। অথচ সেকালে তাহাদের অধিকাংশ উপার্জন ঐসব উপায়েই ছিল, অতএব) তাহাদের (হালাল) মাল সম্পূর্ণ ঘরের ব্যয় নির্বাহের পরিমাণ হইতে কম হইয়া গেল। (তাই তাহারা ঘরের প্রকৃত মাপ হইতে উত্তর দিকে কিছু অংশ ছাড়িয়া দিয়া ঘরটিকে ছোট আকারে নির্মাণ করিল এবং ঐ পরিত্যক্ত অংশটুকুই হইল হাতীম। আয়েশা (রাঃ) বলেন—) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাইতুল্লাহ শরীফের দরওয়াজা এত উপরে স্থাপিত হইয়াছে কেন? (যে, উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে প্রায় ৫।৬ হাত সিঁড়ির সাহায্যে উঠিতে হয়)। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমাদের বংশীয় লোকেরা এই উদ্দেশ্যে এইরূপ করিয়াছিল যেন বাইতুল্লাহ শরীফের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র তাহাদের হস্তে ন্যস্ত থাকে; যাহাকে ইচ্ছা করিবে প্রবেশ করিতে দিবে, আর যাহাকে ইচ্ছা করিবে বঞ্চিত রাখিবে।

অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের বংশীয় কোরায়েশরা যেহেতু সদ্য ইসলামী দলভুক্ত এবং সবেমাত্র অন্ধকার যুগের শৃঙ্খলমুক্ত নবাগত মোসলমান—তাই আমার আশঙ্কা হয় যে, বাইতুল্লাহ শরীফের ঘরের পরিবর্তন সাধন করিলে তাহাদের অন্তরে নানাপ্রকার সংশয়ের উদয় হইবে। (হয়ত তাহারা মনে করিবে, আল্লার রসুল হওয়ার দাবী করিয়া এখন আল্লার ঘর ভাঙ্গিয়া দিল।) নতুবা আমি নিশ্চয়

---

* এখানে আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত কতিপয় হাদীছ একত্রে অনুবাদ করা হইয়াছে।

× বাইতুল্লাহ শরীফ সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে ছোট দেয়ালে ঘেরাও করা স্থানকে হাতীম বলে।

বাইতুল্লাহ শরীফের পুনঃ নির্মাণ করিতাম এবং ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের নির্মিত পরিমাপ অনুযায়ী হাতীমস্থিত অংশও ঘরের মধ্যে শামিল করিয়া দিতাম এবং উহার দরওয়াজা নীচু করিয়া দিতাম (যেন সিঁড়ির সাহায্য ব্যতিরেকেই উহাতে প্রবেশ করা যায়)। এবং (বর্তমান অবস্থার—এক দরওয়াজাবিশিষ্ট না করিয়া) পশ্চিম দিকে অপর একটি দরওয়াজা খুলিয়া কা'বাকে দুই দরওয়াজাবিশিষ্ট নির্মাণ করিতাম। (কারণ প্রবেশ করার ও বাহির হওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দরওয়াজা হইলে তাহাতে ভীড় এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইত না।)

(আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ভাগিনা—) আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) খলীফা হইবার দাবী করিয়া মক্কা নগরী এলাকার শাসন ক্ষমতা লাভ করতঃ ৬৪ হিজরী সনে যখন বাইতুল্লাহ শরীফের ঘরের পুনঃ নির্মাণের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া উহার পুনঃ নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিলেন, তখন স্বীয় খালা আয়েশা (রাঃ)-এর এই হাদীছ অনুসারে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভিপ্রায় অনুযায়ী হাতীমের অংশকে ঘরের শামিল করিয়া নীচু আকারের দুই দরওয়াজাবিশিষ্ট রূপে ঘর নির্মাণ করিয়াছিলেন।

আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার এই হাদীছ ও বর্ণনা তাঁহার আপন ভাগিনা ওরওয়ার মাধ্যমে বর্ণনাকারী এযীদ ইবনে রুমান বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) যখন বাইতুল্লাহ শরীফের পুনঃ নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) স্বয়ং এই কার্য্য পরিচালনা করিলেন। তিনি ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিমূলের চিহ্ন খুঁজিয়া বাহির করার জন্য খনন কার্য্য চালাইলেন, কিন্তু কোন চিহ্ন পাওয়া যাইতেছিল না, তাই তিনি বিচলিত হইতেছিলেন। অবশেষে মানুষ পরিমাপের দেড়গুণ খনন করার পর বড় বড় পাথরে নির্মিত ভিত্তিমূল দৃষ্টিগোচর হইল। বর্ণনাকারী বলেন—আমি স্বয়ং নিজ চক্ষে ঐ ভিত্তি দেখিয়াছি; উহার পাথরগুলি উটের পিঠের ন্যায় ছিল।

এই প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনাকারীর শাগের্দ জরীর (রঃ) বলেন, আমি স্বীয় ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখনও কি আপনি ঐ ভিত্তিমূলের স্থানটি আমাকে নির্দিষ্ট করিয়া দেখাইতে পারিবেন? তিনি বলিলেন, এখনই চল তোমাকে দেখাইব। তখন আমি তাঁহার সঙ্গে হাতীমের বেষ্টনীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। তিনি একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন, এই স্থানে সেই ভিত্তি অবস্থিত।

জরীর (রঃ) বলেন—আমি ঐ ভিত্তিস্থান হইতে বর্তমানে নির্মিত বাইতুল্লাহ-ঘরের সীমার মধ্যবর্তী স্থানটুকুর পরিমাপ করিলাম, তাহাতে আমার অনুমান হইল—ঐ স্থানটি (উত্তর দক্ষিণে) ছয় হাত পরিমিত দীর্ঘ হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের যমানায় ক্রোধান্বিত ঐশ্বরিক শক্তিতে পরিচালিত সর্বগ্রাসী তুফানের ধ্বংসলীলা সমগ্র বিশ্বের ধ্বংস সাধন করার সঙ্গে সঙ্গে বাইতুল্লাহ

শরীকের পূর্ব নির্মিত ঘরেরও বিলুপ্তি সাধন করে। যেরূপ আল্লাহ তায়ালার কুদরতের নিদর্শন আপদ-বিপদ, রোগ-ব্যাধি, পীর-পয়গাম্বর, নবী-রসুল সকলকেই গ্রাস করিয়া থাকে। আল্লার কুদরত সর্বতোমুখী, তাই বাইতুল্লার ঘর বিলুপ্ত হইল বটে, কিন্তু আল্লার কুদরত আবার উহার বিশিষ্ট বিশিষ্ট দ্রব্যাদিকে হেফাজতও করিয়াছিল। অতঃপর সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে ইব্রাহীম (আঃ) ও তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ) ঐ ঘরের পুনঃ নির্মাণ করেন। অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে কোরায়েশগণ কর্তৃক উহা পুনঃ নির্মিত হয় এবং ছোট আকারে নির্মিত হয়, যাহার ঘটনা উল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত আছে। তৎপর আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) কর্তৃক সঠিকরূপে স্বর্ণ মাপে পুনঃ নির্মিত হয়। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের ক্ষমতার পতনের পর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের প্রতিনিধি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ভাবিল, বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ চির জাগরুক এই নিদর্শন আমাদের শত্রু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রূপে কায়েম থাকা আমাদের পক্ষে ভাল হইবে না। এই ভাবিয়া সে স্বীয় আমীরের আদেশ লইয়া ঐ ঘর ভাঙ্গিয়া পুনরায় কোরায়েশদের নির্মিত আকারে তৈরী করে। যুগের পরিবর্তন সাধনকারী শক্তির ধ্বংসলীলার স্রোত প্রবাহে ঐ সমস্ত দাম্ভিক ব্যক্তিরা ভূ-পৃষ্ঠ হইতে বিলীন হইয়া গেলে অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের মধ্যে বাদশাহ হারুনুর-রশীদ বা অন্য কোনও বাদশাহ হাজ্জাজ কর্তৃক কোরায়েশদের নির্মিত আকারে তৈরী ঘরকে পুনরায় ভাঙ্গিয়া আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) কর্তৃক হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভিপ্রায় অনুসারে নির্মিত ঘরের আকারে তৈরী করার ইচ্ছা করিয়া আলেম সমাজের মতামত প্রার্থী হইলেন। তদানীন্তন মদীনাবাসী খ্যাতনামা ইমাম মালেক (রঃ) বিশেষ দৃঢ়তার সহিত ইহাতে বাধা প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, এইরূপ করিতে গেলে বাইতুল্লাহ শরীফ অবশেষে রাজা-বাদশাদের খেল্‌নার বস্তুতে পরিণত হইয়া যাইবে। ইমাম মালেকের এই বিজ্ঞোচিত উক্তি সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বিশ্ব-মোসলেমের নিকট অখণ্ডনীয় বিষয়রূপে গ্রহণীয় হইয়া আসিয়াছে। তদবধি আজ যুগযুগান্তর পর্য্যন্ত বাইতুল্লাহ শরীফের ঘর সেই হাজ্জাজ কর্তৃক কোরায়েশদের নির্মিত ছোট আকারে তৈরী অবস্থায়ই রহিয়াছে। বর্তমানেও উহা এক দরওয়াজাবিশিষ্ট উঁচু দরওয়াজাযুক্ত রহিয়াছে এবং হাতীমও পূর্বের ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে যেরূপ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় কোরায়েশদের নির্মিত অবস্থায় ছিল। (ফতহুলবারী)

হরম শরীফের ফজিলত

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে শিক্ষা দেওয়া উক্তির উদ্ধৃতি দানে বলিয়াছেন—

إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ -

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

অর্থ :—(আপনি ঘোষণা করুন,) বিশেষভাবে আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমি যেন ঐ সর্ব-শক্তিমান প্রভুর এবাদৎ—বন্দেগী ও দাসত্ব অবলম্বন করি যিনি এই মহান নগরীর প্রভু, যিনি এই মহান নগরীকে অতি উচ্চ মর্য্যাদা দান করিয়াছেন এবং সমস্ত চীজ-বস্তুর একমাত্র মালিক তিনিই। আমি তাঁহার অনুগত থাকার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি (২০ পাঃ ৩রুঃ)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন -

أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا

مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ -

অর্থ :—(আমি মক্কাবাসীদের প্রতি কত কৃপাই না করিয়াছি! দেখ—) আমি কি তাহাদিগকে এমন এক নগরীর অধিকারী করি নাই—যে নগরী অতি মহান মর্য্যাদা সম্পন্ন, শান্তিময়, নিরাপত্তার স্থান—যে নগরে আমার কৃপায় দেশ-বিদেশের সর্বপ্রকার ফল-ফুলাদি আমদানী হইরা থাকে? কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাহাদের অধিকাংশই নির্বোধ। (সত্যিকারের জ্ঞান তাহাদের নাই, নতুবা তাহারা এরূপ কৃপাময় দয়াল মাবুদের বিদ্রোহিতা করিত না)। (২০ পাঃ ৯ রুঃ)

৮২৬। **হাদীছ :** ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় ভাষণে বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালাই মক্কা এলাকাকে পবিত্র হরম শরীফ সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন—সপ্ত আকাশ ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করার দিন হইতেই। অতএব আল্লাহ তায়ালার সেই সাব্যস্ত অনুসারেই উহা সেইরূপ পবিত্র হরম শরীফ হওয়া অক্ষুন্ন থাকিবে কেয়ামত পর্য্যন্ত। সেমতে ঐ এলাকায় যুদ্ধ-বিগ্রহ আমার পূর্বেও হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কাহারও জন্য হালাল হইবে না। একমাত্র আমার পক্ষে শুধু এক দিনের অল্প সময়ের জন্য আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে উহা হালাল করা হইয়াছিল। (সেই সময়ের পর মুহূর্ত হইতে পূর্বের ন্যায় কেয়ামত পর্য্যন্ত উহা হরম শরীফ পরিগণিত থাকিবে।) উহার কোন গাছের একটি কাঁটা ভাঙ্গাও নিষিদ্ধ, উহার কোন বন্য জন্তুকে তাড়া করাও নিষিদ্ধ এবং উহার পথে পাওয়া কোন বস্তু, মালিকের সন্ধান লাভের জন্য বিশেষরূপে ঢোল-শোহরত করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে উঠাইয়া লওয়াও নিষিদ্ধ। উহার কোন ঘাস-পাতা তৃণ-লতা ছিন্ন করাও নিষিদ্ধ। তখন আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! 'এজখের' নামীয় ঘাসকে এই নিষেধাজ্ঞার বহির্ভুত রাখুন; কারণ উহা আমাদের গৃহের জন্য এবং কর্মকারদের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। নবী (দঃ) বলিলেন আচ্ছা—এজখের ঘাস এই নিষেধাজ্ঞার বাহিরেই থাকিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বন্য জন্তু তাড়া করার মধ্যে ইহাও শামিল যে, কোন একটি পশু বা পক্ষী কোন ছায়া স্থলে বিশ্রাম নিয়াছে, তুমি তথায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য উহাকে তাড়াইয়া দিবা ইহাও নিষিদ্ধ।

হরম শরীফের মসজিদে সকলের সমান অধিকার

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন (১৭ পাঃ ৩রুঃ)—

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ - وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ -

অর্থ ঃ—যাহারা কুফুরী করে এবং আমার (দীনের) রাস্তায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং মসজিদে-হারামের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে (যেরূপ হোদায়বিয়ার ঘটনায় মক্কার কাফেররা করিয়াছিল ;) যে মসজিদে আমি প্রত্যেকের সমান অধিকার দিয়াছি—নিকটবর্তী বাসিন্দা হউক বা দূরপ্রান্তের আগন্তুক হউক। স্মরণ রাখিও, যে ব্যক্তি ঐ মসজিদের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে নিয়ম বিরোধী কার্য্য করিবে তাহাকে কষ্টদায়ক আজাব ভোগে বাধ্য করিব।

মক্কাস্থিত হযরতের বাড়ী

৮২৭। হাদীছ ঃ—উছামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) (মক্কা বিজয়ের ঘটনায় বা বিদায় হজ্বের সময় মক্কা নগরীতে প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তে) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আগামী কল্য মক্কায় প্রবেশ করিয়া কোথায় অবস্থান করিবেন, আপনার (পৈত্রিক) বাড়ীতে অবস্থান করিবেন কি? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আমার পৈত্রিক বাড়ী আছে কোথায়? (চাচা আবু তালেবের ছেলে) আকীল বাড়ী-ঘর সব বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লা'মর পিতামহ—আবদুল মোত্তালেব স্বীয় পিতা হেশাম ইবনে আবদে-মনাফ হইতে উত্তরাধিকার সুত্রে একখানা বাড়ী লাভ করেন। আবদুল মোত্তালেব বৃদ্ধ বয়সে স্বীয় পুত্রদ্বয়—আবদুল্লাহ (হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর পিতা) এবং আবু তালেবের মধ্যে ঐ বাড়ীখানা বন্টন করিয়া দেন। ঐ বাড়ীতেই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভুমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় পিতার অংশের উত্তরাধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি হিজরত করিয়া চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার চাচার ছেলে আকীল সম্পূর্ণ বাড়ীটি দখল করিয়া বিক্রি করিয়া ফেলে।

হযরতের চাচা আবু তালেবের চার পুত্র ছিল। আকীল, তালেব, জাফর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)। তন্মধ্যে জাফর (রাঃ) ও আলী (রাঃ) মোসলমান ছিলেন, আকীল ও তালেব অমোসলেম। অতএব, কেবলমাত্র শেষোক্ত দুইজন আবু তালেবের উত্তরাধিকারী গণ্য হয়, জাফর ও আলী (রাঃ) উত্তরাধিকারী গণ্য হন নাই। (অতঃপর তালেব নিখোঁজ হইয়া গেলে সম্পূর্ণ বাড়ী ঘরের উত্তরাধিকারী একমাত্র আকীল থাকিয়া যায়।)

ওমর (রাঃ) বলিলেন, উক্ত ঘটনার দ্বারাও এই মছআলাহ প্রমাণিত হয় যে, মোসলেম ও অমোসলেমের মধ্যে উত্তরাধিকারের সম্পর্ক বহাল থাকে না।

ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন—

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ۔ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ رَبَّنَآ اِنِّىْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ۔ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ۔ رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ۔ رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ۔ رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ۔

অর্থ—স্মরণ রাখিও, ইব্রাহীম (রাঃ) আল্লার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া ছিলেন, হে প্রভু! তুমি এই (মক্কা) শহরটিকে শান্তিময় নিরাপত্তার শহর বানাইয়া দাও এবং আমাকে ও আমার বংশধরকে মূর্তিপূজা হইতে বাঁচাইয়া রাখ। হে প্রভু! এসব মূর্তি বহু মানুষের পথভ্রষ্টতার কারণ হইয়াছে। (তাই এই প্রার্থনা জানাইলাম; তোমার সাহায্য ব্যতিরেকে উহা হইতে

বাঁচিতে সক্ষম হইব না। সকল প্রকার মূর্তিপূজা হইতে দূরে থাকার চেষ্টায়) যে আমার অনুসারী হইবে সে আমার দলভুক্ত, আমার দোয়া তাহারই জন্য। পক্ষান্তরে যে আমার বিরোধী হইবে (সে কাফের হইবে, কাফেরের জন্য ক্ষমার দোয়া করা যায় না।) তুমি ক্ষমাকারী দয়ালু। (দয়াবলে তাহাদেরে ক্ষমার যোগ্য করিয়া লইয়া ক্ষমা করিতে পার।)

হে আমাদের প্রভু! আমি আমার স্ত্রী ও কচি শিশু-পুত্রকে তোমার মর্য্যাদাপূর্ণ ঘরের নিকটবর্তী উৎপাদনে অক্ষম প্রস্তরময় এক নির্জন ময়দানে (তোমার আদেশে) রাখিয়া যাইতেছি। হে প্রভু! তাহাদিগকে নামায কায়েম করার তৌফিক দান করিও এবং এই জনশূন্য ময়দানকে তুমি আবাদ করিয়া দিও এবং ফল-ফুলাদি খাদ্য বস্তুর ব্যবস্থা তাহাদের জন্য করিয়া দিও; এই সব নেয়ামতের অছিলায় তাহারা শোকর আদায় করার সুযোগ লাভ করিবে।

হে প্রভু! তুমি আমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব অবস্থাই অবগত আছ। আল্লাহ তায়ালার নিকট আসমান-জমিনের কোন বস্তুই লুকায়িত নাই। আল্লাহ তায়ালার জন্য সমুদয় প্রশংসা যে, তিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইস্হাক পুত্রদ্বয় দান করিয়াছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু দোয়া কবুল করেন।

হে প্রভু! তুমি আমাকে এবং আমার বংশধরকে নামায কায়েমকারী হওয়ার তৌফিক দান করিও। হে প্রভু! আমাদের দোয়া কবুল কর।

হে প্রভু! তুমি আমার এবং আমার মাতা-পিতার এবং সমস্ত মোমেনগণের (মধ্য হইতে ক্ষমার যোগ্যদের) প্রতি হিসাবের দিন ক্ষমা প্রদর্শন করিও। (১৩ পাঃ ১৮ রুঃ)

কা'বা শরীফ ইহজগতের স্থিতির ধারক

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ

"সম্মানিত ঘর কা'বা শরীফকে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির স্থিতির ধারক বানাইয়াছেন।" (৭ পারা ৩ রুকু)

অর্থাৎ যত দিন এই সম্মানিত গৃহ ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান থাকিবে ততদিনই মানব জাতি এবং ইহার জন্য সারা বিশ্বজগৎ বিদ্যমান থাকিবে। সম্মানিত কা'বা গৃহের বিলুপ্তির অনতি ব্যবধানেই মহাপ্রলয়ে ইহজগতের অবসান হইবে। এই তথ্যের অধিক বিবরণ "বাইতুল্লাহ শরীফের বিনাশ সাধন" পরিচ্ছেদে দেখুন।

৮২৮। হাদীছ ঃ—আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের অতি নিকটবর্তী সময়ে ইয়াজুজ-মাজুজ দলের আবির্ভাব হওয়ার পরেও বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ ও ওমরা অনুষ্ঠিত হইবে। বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জব্রত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কেয়ামত তথা মহাপ্রলয় আসিবে না।

বাইতুল্লাহ্ শরীফকে গেলাফ দ্বারা আচ্ছাদিত রাখা

৮২৯। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম-পূর্ব যুগে কোরায়েশরাও আশুরার রোযা রাখিত। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও তখন ঐ রোযা রাখিতেন এবং মদীনায় আসিয়াও রমজানের রোযা ফরজ হওয়ার পূর্বে এই আশুরার রোযা নিজেও রাখিয়াছেন, সকলকে এই রোযা রাখার আদেশও করিয়াছেন। কারণ, ঐ দিনটি এই হিসাবেও মাহাত্ম্যপূর্ণ ছিল যে, প্রাচীনকাল হইতেই (প্রতি বৎসর) ঐ দিনে বাইতুল্লার উপর নুতন গেলাফ প্রদান করা হইত।

রমজানের রোযা ফরজ হইবার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আশুরার রোযা ইচ্ছা হইলে রাখা যাইবে এবং ইচ্ছা হইলে ছাড়াও যাইতে পারে।

ব্যাখ্যা :—বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার প্রখ্যাত মোহাদ্দেছ হাফেজ ইবনে হজর আসকালানী (রঃ) যিনি অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম ও হাফেজে-হাদীছ তিনি লিখিয়াছেন, আশুরার দিন বাইতুল্লাহ শরীফের উপর নুতন গেলাফ দেওয়ার রীতি পরিবর্তিত হইয়া এই রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে যে, হজ্জের মৌসুমে কোরবাণীর দিন যখন সমস্ত লোক মিনার ময়দানে হজ্জ উদযাপনে ব্রতী থাকে, সেই দিন বাইতুল্লার উপর নুতন গেলাফ দেওয়া হয়। বর্তমানেও এই নিয়মই প্রচলিত।

ফতহুলবারী নামক কিতাবে উল্লিখিত কতিপয় রেওয়ায়েতের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বাইতুল্লাহ শরীফের উপর গেলাফ প্রদান বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। এমনকি, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ) হইতেই ইহা প্রথম আরম্ভ হয়। অধিকন্তু ইহারও প্রমাণ আছে যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং খোলাফায়ে-রাশেদীনের আমলেও এই রীতি বিদ্যমান ছিল এবং সর্বদা মোসলমান বাদশাহগণ ইহার প্রচলন অব্যাহত রাখিয়াছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রঙ্গের রেশমী গেলাফ দেওয়ার রীতি প্রবর্তিত হয় এবং সর্বশেষ বারে কাল রেশমী গেলাফ প্রদান করা হয়, তদবধি ঐ নিয়মই প্রচলিত থাকে। এমনকি ৭৪৩ হিঃ সনে সুলতান ছালেহ—ইসমাঈল ইবনে নাছের কর্তৃক মিশরের একটি এলাকা উহার ব্যয়ভার বহনের জন্য ওয়াকফ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; মিশর হইতে ঐ গেলাফ তৈরী হইয়া আসিত। এখন সৌদী আরবেই উহা তৈরী হয়; জিদ্দা হইতে মক্কার পথের কিনারায় ঐ গেলাফ তৈরীর বিশেষ কারখানা আছে।

কা'বা শরীফের বিশেষ সম্মানে যেরূপ একমাত্র উহারই বৈশিষ্ট্যরূপে প্রচলিত রহিয়াছে উহাকে মূল্যবান গেলাফে আচ্ছাদিত করা; তদ্রূপ প্রাচীনকালে কা'বা শরীফের নামে স্বর্ণ-চান্দি ইত্যাদি মূল্যবান ধন-রত্ন নজর-নেয়াজরূপেও প্রদত্ত হইত এবং সেই সব ধন-রত্ন রক্ষিত থাকিত। ইসলাম পূর্বকালে কা'বা গৃহের নব নির্মাণের সময় লোকেরা ঐ ধন-রত্ন

কা'বা গৃহের সুউচ্চ পোঁতায় পোঁতিয়া রাখিয়াছে। অদ্যাবধি উহা ঐ অবস্থায়ই আছে; কা'বা গৃহের পোঁতা মানব দৈর্ঘ অপেক্ষাও অধিক উচু। নিম্নের হাদীছে উক্ত তথ্যের বর্ণনা রহিয়াছে—

৮৩০। হাদীছঃ—শায়বা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা খলীফা ওমর (রাঃ) হরম শরীফের মসজিদে বসিয়া বলিলেন, আমার ইচ্ছা হয়—কা'বা শরীফের পোঁতার মধ্যে ভুগর্ভে যে সোনা চান্দি পোঁতা রহিয়াছে উহা বাহির করিয়া গরীব মোছলমানদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেই। আমি তাঁহাকে বলিলাম, এরূপ করার অধিকার আপনার নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? আমি বলিলাম, আপনার মুরুব্বিদ্বয়—রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) ইহা করেন নাই। (অথচ তাঁহারাও ইহার খোজ রাখিতেন এবং আপনার অপেক্ষা তাঁহাদের সময়ে মোসলমানদের ধনের প্রয়োজন অধিক ছিল।) ওমর (রাঃ) নতশিরে বলিলেন, সত্যই—তাঁহারা দুইজন অবশ্যই অনুসরণীয়; আমি তাঁহাদেরই পদাঙ্কে চলিব।

ব্যাখ্যাঃ—কা'বা শরীফে প্রোথিত ধন-রত্ন স্থানান্তর না করা যুক্তিযুক্ত এবং কল্যাণকরই হইয়াছে। যদিও প্রয়োজনে কা'বা শরীফের সংস্কার ইত্যাদির ব্যয়ভার বহনের জন্য মোসলমানদের মধ্যে সর্বদাই লোক পাওয়া যাওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক, যেরূপ অদ্যাবধি হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কা'বা শরীফকে প্রত্যাশী না রাখিয়া স্বাবলম্বী রাখাই উহার সম্মানের পক্ষে শ্রেয়। এতদ্ভিন্ন কা'বার নামে পূর্ব রক্ষিত নজর-নেয়াজ মোসলমানগণ নিজেদের জন্য ব্যয় করিলে তাহা বিধর্মীদের চোখে মোসলেম সমাজের উপর নিন্দার কারণ হইত। তাই পূর্ব হইতে যাহা জমা ছিল উহাকে রক্ষিত রাখা হইয়াছে। কিন্তু সর্বদার জন্য ঐ প্রথা চালু রাখার প্রয়োজন মোটেই নাই; অতএব ছাহাবীদের যুগ হইতেই কা'বা শরীফের নামে নজর-নেয়াজ গ্রহণের ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। কা'বা শরীফের জন্য নির্দিষ্ট যুগ-যুগান্তের খাদেম-বংশধর ওসমান ইবনে তালহা হাজাবী (রাঃ) ছাহাবীর পুত্র—আলোচ্য হাদীছ বর্ণনাকারী বিশিষ্ট তাবেয়ী শায়বা (রঃ) জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত ঐরূপ নজর-নেয়াজ গ্রহণ না করিয়া তাহাকে আলোচ্য হাদীছ শুনাইয়াছেন (ফতহুলবারী ৩—৩৫৭)। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কা'বা শরীফে যে ধন রক্ষিত আছে উহাই যথেষ্ট; আরও অধিক ধন সংরক্ষণ নিষ্প্রয়োজন। কা'বা শরীফের জন্য দেওয়া নজর-নেয়াজের ধন গরীবদের মধ্যে বিতরণই শ্রেয়ঃ। ফেকার কিতাবেও মছআলাহ রহিয়াছে—দান-খয়রাতের নজর-মান্নত কা'বা শরীফ ইত্যাদি যে কোন বিশেষ স্থান বা পাত্রের জন্য নির্ধারিত করা হইলেও উহা অন্যত্র যোগ্য পাত্রে ব্যয় করা হইলে সেই নজর-মান্নত আদায় হইয়া যায়।

কা'বা শরীফের বিনাশ সাধন

৮৩১। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন (কেয়ামত ঘনাইরা আসিলে এবং পৃথিবীর ধ্বংস ও বিলুপ্তি নিকটবর্তী

হইলে দস্যু প্রকৃতির) এক হাবশী—নিগ্রো লোক যাহার পায়ের গোছা অপেক্ষাকৃত সরু হইবে, সে বাইতুল্লাহ শরীফকে বিধ্বস্ত করিবে।

৮৩২। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (বাইতুল্লাহ বিধ্বস্তকারী ব্যক্তির আকৃতি-প্রকৃতি ও তাহার হুলিয়া এত স্পষ্টরূপে আল্লাহ তায়ালা আমাকে অবগত করাইয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তি ও তাহার কার্য্যকলাপ যেন আমার চোখে ভাসিতেছে—) আমি যেন দেখিতেছি, কৃষ্ণবর্ণ বাঁকা গোছাযুক্ত ব্যক্তিটি বাইতুল্লাহ শরীফের এক একটি পাথর বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাকে বিধ্বস্ত করিতেছে।

ব্যাখ্যা ঃ—জাগতিক নিয়মাধীনেও সাধারণতঃ এরূপ দেখা যায় যে, কোনও রাজা-বাদশাহ যখন কোন জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং ঐ আয়োজন অনুষ্ঠানের পরিবেশে কোন মঞ্চ ইত্যাদি বিশিষ্ঠ স্থান নির্মাণ করেন ; সে অবস্থায় যাবৎ বাদশাহ ঐ অনুষ্ঠানকে অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাওয়ার এবং অক্ষুন্ন রাখার ইচ্ছা করেন তাবৎ কোন ব্যক্তিই বিশিষ্টরূপে নির্মিত ঐ স্থান বা মঞ্চটির কোন প্রকার ক্ষতি সাধনে অগ্রসর হওয়াত দূরের কথা উহাকে কেহ স্পর্শ করিতেও সক্ষম হয় না। কোন অশুভ শক্তি উহার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হইলে বাদশাহ তাহার অপ্রতিহত ক্ষমতাবলে উহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া সমুচিত শিক্ষা ও শাস্তির বিধান করিয়া থাকেন। অধিকন্তু ঐ শাহী মর্য্যাদাপূর্ণ মঞ্চটিকে অহরহ সযত্নে রক্ষা করিবার যথোপযুক্ত সংরক্ষণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করতঃ উহার মান-মর্য্যাদাহানিকর কোন কার্য্য বা সামান্যতম প্রচেষ্টাকেও তিনি বরদাশত করেন না।

কিন্তু অবলীলাক্রমে যখন ঐ অনুষ্ঠানের অবসান করতঃ উহার সমাপ্তির সময় আসে, তখন বাদশার জ্ঞাতসারেই ঐ আয়োজিত অনুষ্ঠানের অন্যান্য আনুসঙ্গিক পরিবেশ বিচ্ছিন্ন করার পূর্বে ঐ সুরক্ষিত মঞ্চটিকেই সর্ব প্রথমে বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত করতঃ অনুষ্ঠান সমাপ্তির সুচনা করা হয় এবং অতি সাধারণ লোক কামলা-মজুরের হস্তেই উহাকে বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত করা হইয়া থাকে।

অনুরূপভাবে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটিও সর্বশক্তির আধার—সমগ্র বাদশাহগণের বাদশাহ আল্লাহ তায়ালার অনুষ্ঠানবিশেষ। এবং বাইতুল্লাহ শরীফ হইতেছে এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি স্বরূপ মহান মর্য্যাদপুর্ণ মঞ্চ সদৃশ। তাই যাবৎ এই সুবিশাল অনুষ্ঠান তথা পৃথিবীকে অক্ষুন্ন ও বিদ্যমান রাখার ইচ্ছা আছে, তাবৎ আল্লাহ তায়ালা ঐ মঞ্চ সদৃশ বাইতুল্লাহ শরীফের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। আজ অবধি যে কোনও অশুভ শক্তি ঐ মহান মঞ্চের মর্য্যাদা হানিকর কোন কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে, উহাকেই আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ আবরাহার ন্যায় পরাক্রমশালী এবং অপরাজেয় শক্তিকে মুহূর্তের মধ্যে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার ঘটনা কোরআন শরীফের মধ্যেই বর্ণিত রহিয়াছে। নিম্নের হাদীছও উহার আর একটি দৃষ্টান্ত বহন করে।

পক্ষান্তরে যখন এই সমগ্র অনুষ্ঠান তথা পৃথিবীর অস্তিত্বকে বিলুপ্ত ও ধ্বংস করিয়া দেওয়াই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইবে, তখন ঐ সুরক্ষিত মঞ্চ সদৃশ বাইতুল্লাহ শরীফকেই সর্বপ্রথমে বিধ্বস্ত করা হইবে এবং অতি সাধারণ লোকের হস্তেই উহার বিলুপ্তি ও ধ্বংস-কার্য্য সাধিত হইবে।

৮৩৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত বিরাট একদল লোক বাইতুল্লাহ শরীফের উপর আঘাত হানিবার জন্য অগ্রসর হইবে। কিন্তু সেই পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই কোন একটি ময়দানে ময়দানস্থিত তাহাদের সকলকে ধ্বসাইয়া দেওয়া হইবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! সকলকেই কেন ধ্বসানো হইবে? অথচ সেখানে এমন এমন লোকও ত থাকিতে পারে যাহারা সেস্থানে শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আসিয়াছে বা জবরদস্তিরূপে তাহাদিগকে উক্ত দলে শামিল করা হইয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ঐ সময় সকলকেই ধ্বসানো হইবে। পরে কেয়ামতে হিসাব-নিকাশের দিন নিয়্যতের তারতম্য রক্ষা করা হইবে। (২৮৪ পৃঃ)

হজরে-অস্ওয়াদ চুম্বন করা

৮৩৪। হাদীছ ঃ—আবেছ ইবনে রবীয়া (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) একবার হজর-আসওয়াদের প্রতি অগ্রসর হইয়া উহাকে চুম্বন করিলেন। অতঃপর বলিলেন, (তোমরা ভালরূপে শুনিয়া ও উপলব্ধি করিয়া রাখিও, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি— হে হজরে-আসওয়াদ!) আমি জানি ও দৃঢ়তার সহিত এই বিশ্বাস পোষণ করি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র; কাহারও কোন ভাল বা মন্দ করিবার কোনরূপের ক্ষমতা তোমার আদৌ নাই। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তোমাকে চুম্বন করিয়াছেন। (সে সূত্রে তোমাকে চুম্বন করা শরীয়তের একটি নিয়ম; তাই আমি তোমাকে চুম্বন করিলাম;) নতুবা আমি তোমাকে কখনই চুম্বন করিতাম না। (অর্থাৎ তোমাকে খোদার অংশীদার বা আমার ভাল মন্দের মালিক-মোখতাররূপে চুম্বন করি না, শুধু আল্লার রসুলের অনুসরণে চুম্বন করি।)

সুধী পাঠক! ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই উক্তিটি অতিশয় সারগর্ভ এবং অত্যাবশ্যকীয় একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ। ঈমান ও কুফর, তৌহীদ ও শেরক, একত্ববাদ ও পৌত্তলিকতার বিরাট পার্থক্য ও ব্যবধানের রহস্য ও তত্ব উদ্ঘাটন কল্পেই তিনি এই উক্তি করিয়াছিলেন।

ইসলাম অনুমোদিত ও শরীয়ত নির্দ্ধারিত কোন কোন এবাদতের রীতি নীতির বিশেষতঃ হজ্জের অধিকাংশ কার্য্যাবলী ও আমলের বাহিক ধারা ও গতি-প্রকৃতি দৃষ্টে শয়তান অতি সহজে ধোকা দেওয়ার বা মানুষের অন্তরে নানারূপে কু-প্ররোচনামূলক

অছওয়াছা উদিত করার প্রয়াস পাইয়া থাকে। যেহেতু অন্যান্য বিধর্মী কাফের মোশরেকরা যেরূপ নানাপ্রকার জড় বস্তুকে ভজনা উপাসনা করিয়া থাকে মোসলমানদের হজ্জব্রতের রীতি এবং ধারাসমূহও আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রায় অনেকটা ঐরূপ দেখায়। যথা—বাইতুল্লাহ শরীফের চতুঃসীমা ঘুরিয়া তওয়াফ করা। হজ্‌রে-আসওয়াদ তথা বিশেষ পাথর খণ্ডকে ভক্তিভরে চুম্বন করা। বিভিন্ন ময়দানে অবস্থান করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঐরূপ কু-অছওয়াছার মুলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই উক্তি। কিন্তু উহার বিশ্লেষণের পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ একটি যুক্তিগত বিষয় উপলব্ধি করা আবশ্যক। বিষয়টি এই—

অনেক ক্ষেত্রে দুইটি বস্তুর মধ্যে রাত্র-দিন অপেক্ষাও অধিক পার্থক্য এবং ব্যবধান থাকে; হয়ত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত বস্তুদ্বয়ের মৌলিক পার্থক্যকে উপেক্ষা করিয়া কিম্বা উহাকে নগণ্য মনে করিয়া সেই বস্তুদ্বয়কে সমপর্য্যায়ের গণ্য করা নিতান্তই বোকামী। যেমন—একটি ঘুমন্ত মানব-দেহ এবং আর একটি মৃত মানব-দেহ পাশাপাশি পতিত আছে। বাহ্যিক সাদৃশ্য দৃষ্টে উভয়কে সম-পর্য্যায়ের গণ্য করা কিম্বা সামান্য একটু বায়ু তথা শ্বাস প্রশ্বাস নির্গত হওয়া না হওয়ার পার্থক্যকে নগণ্য ভাবিয়া উভয়ের ব্যবধানকে উপেক্ষা করা নিতান্তই বোকামী। এস্থলে সামান্য বায়ুটুকুর পার্থক্য এতই ক্রিয়াশীল যে, উহার দরুন উক্ত দেহ দুইটির মধ্যে আইন, বিধান এবং বাস্তবেও রাত্র-দিন অপেক্ষা অধিক ব্যবধান সর্বজনীন স্বীকৃত। তদ্রূপ বিবাহিতা নারী ও পর-নারী উভয়ের মধ্যে নীতিগত প্রভেদ রহিয়াছে; সেই প্রভেদকে নগণ্য মনে করিয়া উহাকে উপেক্ষা করা কতই না বোকামী! উভয়ের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্যের পরিবর্তন না আসিলেও নীতিগত প্রভেদ ও পার্থক্যের দরুণ উভয়ের মধ্যে কিরূপ আকাশ-পাতালের ব্যবধানই না রহিয়াছে! এই দৃষ্টিতেই মূল আলোচ্য বিষয়টা লক্ষ্য করা আবশ্যক—

কাফের-মোশরেকরা যে, দেব-দেবী বা বিভিন্ন বস্তুর পূজা করিয়া থাকে; আর মোমেন-মোসলমানগণ কোন বস্তুকে ভক্তি ও সম্মানের সহিত কেন্দ্র করিয়া আল্লাহ তায়ালার এবাদত-বন্দেগী করিয়া থাকে—এই সম্প্রদায়দ্বয়ের কার্য্যক্রমের মৌলিক ব্যবধান ও পার্থক্যটা বস্তুতঃ রাত্র-দিন আলো-অন্ধকার এবং মৃত-ঘুমন্তের ব্যবধান অপেক্ষাও অধিক। কারণ, উভয় কার্য্যক্রমের মধ্যে নীতিগত, উদ্দেশ্যগত ও গভীর ক্রিয়াশীল নিগুঢ় তত্বজনক পার্থক্য এবং সুপ্রশস্ত ব্যবধান বিদ্যমান রহিয়াছে; যদ্দরুণ একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত, একটি অপরটি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই মৌলিক ব্যবধান ও পার্থক্য প্রকাশার্থেই ওমর (রাঃ) উল্লিখিত উক্তি করিয়াছিলেন। সেই ব্যবধান ও পার্থক্যের বিবরণ হইল এই যে, কোনও জড় বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া এবাদত বা উপাসনা করার তিনটি পর্য্যায় আছে। যথা—

প্রথম—আল্লাহ তায়ালাকে যেরূপ ভাবে সরাসরি উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহার এবাদৎ ও উপাসনা করা হয় ঐ বস্তুটিকে তদ্রূপ সরাসরি উদ্দেশ্য করিয়া এবাদৎ ও উপাসনা করা।

দ্বিতীয়—আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর এবাদত উপাসনা এই ভাবিয়া করা যে, আল্লাহ তায়ালা অতি মহান। তাঁহার নৈকট্য লাভের জন্য ঐ বস্তু-বিশেষকে আল্লাহ তায়ালা হইতে নিম্ন শ্রেণীর মাবুদরূপে কল্পনা করিয়া উহার এবাদত ও উপাসনা করা। অর্থাৎ—এবাদৎ ও উপাসনা করা হইবে আল্লাহ ভিন্ন ঐ নিম্ন শ্রেণীর মাবুদেরই জন্য, অবশ্য সেই বস্তুবিশেষ—নিম্ন শ্রেণীর মাবুদের পূজা ও উপাসনার উদ্দেশ্য হইবে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করা।

এই উভয় পর্য্যায়ের উপাসনাই কুফরী ও শেরক। কাফের ও মোশরেকরা যে নানা প্রকার ব্যক্তি, বস্তু বা মূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া উপাসনা করিয়া থাকে তাহা এই দুই পর্য্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়—কোনও জড় বস্তুকে কেন্দ্র করা হইয়া থাকিলেও মূল এবাদৎ ও বন্দেগী একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইয়া থাকে। বন্দেগীর মধ্যে কোন পর্য্যায়েই ঐ বস্তুর প্রতি এবাদতের সামান্যতম উদ্দেশ্যও নিহিত রাখা হয় না, বরং সামগ্রিক বন্দেগী ও এবাদৎ খাঁটীরূপে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য করা হয়। আর এবাদতের আনুষঙ্গিকরূপে যে বস্তুকে কেন্দ্র করা হয় তাহাও একমাত্র আল্লাহ বা আল্লার প্রতিনিধি রসুলের আদেশক্রমেই করা হয়। এমনকি, ঐ বস্তুকে কেন্দ্র করার যুক্তি এবং সুফল বুঝে আসিলে বা না আসিলে—উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের আদেশ অনুসারেই উক্ত বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া আল্লার এবাদৎ ও বন্দেগী করা হয়। তাই এই বস্তু-বিশেষকে কেন্দ্র করার মধ্যেও আল্লাহ তায়ালারই বন্দেগী ও দাসত্ব পরিস্ফুটিত হয়। এই তথ্যটি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিম্নে বর্ণিত আয়াতে বলিয়াছেন—

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ

الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ـ

অর্থ—কেবলাকে নির্দ্ধারিত করার উদ্দেশ্য ইহাই যে, আমি দেখিতে চাই—কোন ব্যক্তি আমার প্রতিনিধি রসুলের (আদেশ তথা আমার) আদেশের অনুসারী হয় আর কোন্ ব্যক্তি উহার প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ করে। (২ পাঃ ১ রুঃ)

এই তৃতীয় পর্য্যায়টিই হইল মোমেন ও মোসলমানগণের কার্য্যধারা এবং ইহারই প্রতি ওমর (রাঃ) ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

অবশ্য হজরে-আছওয়াদ, বাতুল্লাহ শরীফ, ইত্যাদি বস্তু ও স্থান সমূহকে তাজীম করা তথা উহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকেও মোসলমানগণ অত্যাবশ্যক মনে করেন। কারণ, আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত কেন্দ্রসমূহ সম্মানের উপযুক্ত হওয়া অতি স্পষ্ট বিষয়, ইহার অর্থ কখনও এই নহে যে, মুসলমানগণ ভ্রম ক্রমেও ইহাদিগকে উপাস্য সাব্যস্ত করতঃ উহাদের প্রতি তাজীম-প্রদর্শন করিয়া থাকে। বলাবাহুল্য, তাজীম তথা সম্মান প্রদর্শন করা ভিন্ন জিনিষ এবং এবাদৎ তথা উপাসনা ভিন্ন জিনিষ।

মোমেন-মোসলমান এবং কাফের-মোশরেক সম্প্রদায়দ্বয়ের কার্য্যধারার বিরাট ব্যবধানকে পবিত্র কোরআন আরও কত বিরাট আকারে প্রকাশ করিয়াছে যে—

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ

وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَاءُ وَالْاَمْوَاتُ ـ

"অন্ধ এবং দর্শক সমান নহে, অন্ধকার এবং আলো সমান নহে, ঠাণ্ডা এবং গরম সমান নহে। আর জীবন্ত এবং মৃতও সমান নহে।" বিভিন্ন শ্রেণীর বিপরিতমুখী দুই দুইটি বস্তুর দৃষ্টান্ত দানে মোমেন ও মোশরেক সম্প্রদায়দ্বয়ের কার্য্যধারার ব্যবধান এবং পার্থক্য ও প্রভেদকে বুঝান হইয়াছে।

সুধী সমাজ! স্মরণ রাখিবেন—সামগ্রিক ভাবে এবাদৎ ও উপাসনার পাত্র একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে সাব্যস্ত করা—ইহাই সমস্ত আমল এবং আমলকারীর আত্মা স্বরূপ। কারণ, মানবের সৃষ্টি ইহারই জন্য; আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন:

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

"জিন এবং মানবকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি এই জন্য যে, তাহারা আমার এবাদত করিবে; অর্থাৎ অন্য কাহারও নহে।" সুতরাং যে সব কার্য্যধারায় এবং কার্য্য সম্পাদনকারীগণের মধ্যে এই আত্মা নাই উহারা মৃত; আর যে কার্য্যাধারায় এবং কার্য্য সম্পাদনকারীগণের মধ্যে এই আত্মা বিদ্যমান আছে উহারা জীবন্ত ও শ্বাসত। অতএব, মোমেন-মোসলমান এবং তাহাদের কার্য্যধারা আর কাফের-মোশরেক এবং তাহাদের কার্য্যধারার মধ্যে ততটুকুই পার্থক্য ও ব্যবধান রহিয়াছে, যতটুকু পার্থক্য ও ব্যবধান মৃত ও জীবন্তের মধ্যে বিদ্যমান আছে।

অতঃপর কোন কাফের-মোশরেক যদি উল্লিখিত বক্তব্য শুনিয়া এই দাবী করিয়া বসে যে, আমরা যে সমস্ত বট-বৃক্ষ, গঙ্গা-যমুনা, পাথর-নুড়ি, কীট-পতঙ্গ, গরু-মহিষ, মুণী-ঋষী দেব-দেবী বা মূর্তি ইত্যাদিকে পূজা করিয়া থাকি তাহাও তৃতীয় পর্য্যায়রূপেই করিয়া থাকি অন্য পর্য্যায়ে নহে।

এরূপ দাবীর অসারতা ধর্মীয় বিধানাবলীর বিবরণ বিচার করিলেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে এবং কোন ধর্মের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি দানের পর ঐ ধর্মের অনুশাসন ব্যতীত অন্য কাহারও কোন নিজস্ব নীতি ও ধারার প্রতি কর্ণপাত করা যাইতে পারে না, বরং ঐ ধর্মের অনুশীলন-বিধি অনুসারেই সব কিছু স্থির করা হইবে, নতুবা তাহাকে ঐ ধর্ম পরিত্যাগের ঘোষণা দিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন ঐরূপ দাবীর অসারতা প্রমাণের প্রধান সূত্র এই যে—যদি উপাসনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যস্থল একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হন, তবে কোন বস্তুকে আনুষঙ্গিকরূপে

সেই উপাসনার কেন্দ্র কমা একমাত্র তাঁহার আদেশানুক্রমেই হইতে হইবে; যাহা একমাত্র তাঁহারই প্রেরিত সত্য বাণী বা খাঁটী প্রতিনিধির মারফতেই বান্দাদের নিকট পৌঁছিতে পারে। তৃতীয় পর্য্যায়ের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঠিক পরিচয় ও নিদর্শন ইহাই। ইহা ব্যতীত কেবলমাত্র মৌখিক দাবী করিলেই উহা প্রতিষ্ঠিত হয় না। কারণ, উহা একটি নিয়মতান্ত্রিক বাস্তব কর্মপন্থা ও কার্য্যধারা। যেরূপ ডাক বিভাগের উদ্দেশ্যে চিঠীপত্র বাক্সে ফেলিবার একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক পন্থা এই যে, উহা ডাক বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট বাক্স সমূহেই ফেলিতে হইবে, তবেই উহা ডাক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হইবে। অন্যথায় নিজস্ব বা সমাজগত মনগড়া বাক্সে পত্র ফেলিয়া যদি কেহ দাবী করে যে, ডাক বিভাগের উদ্দেশ্যে ফেলিয়াছি তবে উহা পাগলামীই গণ্য হইবে।

অতঃপর ঐ পরিচয় ও নিদর্শন তথা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দিষ্টকৃত হওয়া প্রমাণ করার জন্য যে প্রামাণ্য বস্তুর আশ্রয় লইয়া যাইতে পারে উহা হইল একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ। কিন্তু ধর্ম বা ধর্মীয় গ্রন্থের আশ্রয় লইবার পূর্বে উহার সত্যতা প্রমাণের চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করিতে হইবে। এই ময়দানের একমাত্র বিজয়ী হইল ইসলাম। ইসলাম উহার প্রথম দিন হইতে কেয়ামত পর্য্যন্ত সময়ের জন্য ঐরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়া রাখিয়াছে। যাহার উল্লেখ কোরআন মজীদের কতিপয় স্থানে স্পষ্টাক্ষরে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কা'বা শরীফের ভিতরে নামায পড়া

৮৩৫। হাদীছ ঃ—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কা'বা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করিলে দরওয়াজা অতিক্রম করিয়া সোজা সম্মুখের দিকে এতদূর অগ্রসর হইতেন যে, সম্মুখস্থ দেয়াল প্রায় তিন হাত ব্যবধানে থাকিত এবং তথায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এইরূপে কাজ করিয়া বস্তুতঃ সেই স্থানকে অবলম্বনের চেষ্টা করিতেন যে স্থানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায পড়িয়াছিলেন বলিয়া বেলাল (রাঃ) তাঁহাকে খোঁজ দিয়াছিলেন। অবশ্য কা'বা শরীফের ভিতরে যে কোন স্থানে নামায পড়া কাহারও জন্য দুষণীয় নহে।

বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে প্রবেশ না করা

● ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) অনেক হজ্জ করিয়াছেন, বহুবার তিনি কা'বা শরীফে প্রবেশ করেন নাই।

৮৩৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওমরার নিয়্যত করিয়া মক্কায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর প্রথমে তওয়াফ করিলেন এবং পরে মকামে ইব্রাহীমের নিকটবর্তী স্থানে দুই রাকাত নামায পড়িলেন। (সেই সময় তথায় শত্রুদের আশংকা বিদ্যমান থাকায়) সতর্কতামূলক

ভাবে তাঁহার সঙ্গে কিছু লোক নিয়োজিত ছিল। ঘটনা বর্ণনাকারী ছাহাবীকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, ঐ সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কা'বা ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন কি? তিনি বলিলেন ঐ ওমরাকালীন তিনি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন নাই।

মছআলাহ ঃ—বাইতুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা জায়েয বটে, উহার প্রমাণ উপরোক্ত ৮৩৫নং হাদীছে স্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু উহা কোন স্তরেই অত্যাবশ্যক আমল নহে। তাহাই উপরোল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। অতএব, বে-আদবীসূচক হুড়াহুড়ি, দস্তাদস্তি করিয়া কা'বা শরীফের ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে প্রবেশ করিলে উহার কোণ-সমূহে তকবীর উচ্চারণ করা

৮৩৭। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মক্কা বিজয়কালীন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়া কা'বা গৃহের ভিতরে কাফের-দের উপাস্য মূর্তিসমূহ বিদ্যমান থাকাবস্থায় উহাতে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং ঐ সকল মূর্তিসমূহ বাহির করিয়া ফেলিবার আদেশ করিলেন। তন্মধ্যে ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ)-এর দুইটি মূর্তিও বাহির করা হইল। উহাদের হাতে (জুয়া জাতীয় ভাগ বন্টনের এবং যাত্রার শুভাশুভ নির্ধারণ বা ভাগ্য পরীক্ষা করার প্রতীক স্বরূপ) কতকগুলি তীর ছিল।* রসুলুল্লাহ (দঃ) কাফেরদের কুকাণ্ডের এই দৃশ্য দেখিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই তাহারা ভালরূপেই জানে যে, ইব্রাহিম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) (এই মক্কাবাসী কাফেরদের ন্যায়) কখনও জুয়া জাতীয় কোন প্রকার ভাগ-বন্টন করিতেন না। (তাহারা মিথ্যা এই দৃশ্য দেখাইয়াছে।) অতঃপর হযরত (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং উহার প্রত্যেক কোণে তকবীর উচ্চারণ করিলেন।

তওয়াফের মধ্যে রমল করা

৮৩৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মক্কা বিজয়ের পূর্বে সপ্তম হিজরী সনে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণকে লইয়া ওমরাতুল-কাজা

---

* কাফেরদের মধ্যে এক প্রকার জুয়ার প্রচলন ছিল, যেমন—দশজন লোকে একত্রে সমান সমান বিশ টাকা হারে জমা করিয়া দুই শত টাকা দ্বারা একটি উট ক্রয় করিল। কিন্তু উহার গোশত বন্টনের বেলায় সমভাবে বন্টন করার পরিবর্তে ঐ মূর্তির হাতের তীর সমূহের নির্দেশ অনুসারে বন্টন করা হইত। ঐ তীরগুলির মধ্যে বিভিন্ন নিদর্শন থাকিত এবং সেই নিদর্শন অনুযায়ী কেহ বেশী পাইত, কেহ কম পাইত, কেহ ফাকা ও শূন্য হস্তে যাইত।

করিতে আসিলেন। পূর্বাহ্নে মক্কাবাসী মোশরেকেরা অপবাদ রটাইল যে, (আমাদের দেশ-ত্যাগী) একদল লোক আসিতেছে যাহারা মদীনায় থাকিয়া তথাকার জ্বরে-তাপে দুর্বল ও শক্তিহীন হইয়া গিয়াছে। (শত্রুপক্ষের দৃষ্টিতে দুর্বল পরিগণিত হওয়া বিপদের কারণ,) তাই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করিবে অর্থাৎ বীরদর্পে বাহাদুরীপূর্ণ গতি (Motion) প্রদর্শন করিয়া চলিবে এবং পশ্চিম-দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণ কোণদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে স্বাভাবিকরূপে চলিবে। * ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, পূর্ণ সাত চক্করেই ঐরূপে চলা কঠিন হইবে; তাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দয়া পরবশে শুধু তিন চক্করের মধ্যে ঐরূপে চলিবার আদেশ করিয়াছেন।

৮৩৯। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জ বা ওমরা উভয়ের জন্যই মক্কা শরীফে আসিয়া প্রথমে তওয়াফের মধ্যে হজরে-আছওয়াদকে চুম্বন করিয়াছেন এবং তিন চক্করে সজোরে বীরের ন্যায় চলিয়াছেন।

৮৪০। **হাদীছ ঃ**—ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু (৮৩৪ নং হাদীছে বর্ণিত উক্তির পর প্রথমে) বলিয়াছেন যে, বর্তমানে আমাদের জন্য রমল করার আবশ্যকতা কি? আমরা কেবলমাত্র মক্কার কোরায়েশদিগকে স্বীয় বীরত্ব প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ করিয়া থাকিতাম, এখন তাহাদের কোনই অস্তিত্ব নাই; আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) নিজেই পুনরায় বলিলেন, (হাঁ, প্রয়োজন আছে বৈ কি! কারণ ঐ বিশেষ উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব না থাকিলেও অন্য একটি বিশেষ কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা এই যে, বিদায়-হজ্জকালীন ঠিক এইরূপ অবস্থায়—যখন মক্কা নগরীতে মোশরেকদের অস্তিত্ব ছিল না তখনও) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমল করিয়াছিলেন। এই কারণেই উহা পরিত্যাগ করাকে আমরা পছন্দ করিতে পারি না।

ব্যাখ্যা ঃ—তওয়াফের মধ্যে রমল তথা বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া চলার একটি প্রধান উদ্দেশ্য মোশরেকদের সম্মুখে নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ করা ছিল বটে, কিন্তু একটি কার্য্যের মধ্যে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও কার্য্যকারণের সমন্বয় থাকা বিচিত্র নহে। কাজেই যদিও তখন রমল করার উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য ও কারণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তবুও হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যেহেতু পূর্বাপর এমনকি, ইসলাম ও মুসলমানদের শৌর্য্য-বীর্য ও শান-শওকতপূর্ণ অবস্থায়—বিদায় হজ্জকালীন অন্য যে কোনও কারণ বশতঃ রমল

---

* পশ্চিম-দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণ কোণদ্বয় সম্পর্কে এই স্থানে যাহা বলা হইল তাহা একমাত্র ঐ ওমরাতুল-কাজার ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিদায়-হজ্জকালীন স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তিন চক্করের পূর্ণ চক্করেই রমল করিয়াছেন এবং পূর্বাপর ইহাই সুন্নতরূপে প্রচলিত।

করিয়াছিলেন; তাই উহা শরীয়তের একটি বিশেষ বিধানরূপে নির্ধারিত হয়। উহার প্রতিই ওমর (রাঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং রমল করাকে ছুন্নতরূপে সাব্যস্ত রাখিয়াছেন।

৮৪১। **হাদীছ ঃ—** নাফে (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, কা'বা শরীফের এই (তথা দক্ষিণ দিকের) কোণদ্বয়কে এসতিলাম করিবই; (ভিড়ের কারণে) কঠিন হউক বা সহজ হউক—যখন হইতে দেখিয়াছি, রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত কোণদ্বয়কে এসতিলাম করিয়াছেন।

নাফে (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, (তওয়াফের মধ্যে রমল করা তথা সজোরে চলা কালে) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) উক্ত কোণদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্বাভাবিক রকমে চলিতেন কি? নাফে (রঃ) উত্তরে বলিলেন, (ভিড়ের সময়) স্বাভাবিক রকমে চলিতে বাধ্য হইতেন সহজে এসতিলাম করার জন্য।

মছআলাহ ঃ—সমস্ত তওয়াফের প্রতি চক্করে দক্ষিণ দিকের কোণদ্বয়কে এসতিলাম করা সুন্নত। অবশ্য দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ এসতিলাম করার আকার হইল—উক্ত কোণকে ভক্তিভরে উভয় হাতে স্পর্শ করা। ভক্তিভরে হাত স্পর্শ করাও শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি সাধারণ প্রথা; যেরূপ কদমবুসী তথা মুরুব্বির পদদ্বয় ভক্তিভরে হাতে স্পর্শ করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। আর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে "হজরে-আসওয়াদ" স্থাপিত রহিয়াছে; উহাকে এসতিলাম করার আকার হইল—ভক্তিভরে উহাকে চুম্বন করা। অবশ্য ভিড়ের দরুণ চুম্বন করা সম্ভব না হইলে অন্য ব্যবস্থার বয়ান পরে আসিতেছে।

মছআলাহ ঃ—রমল করা বস্তুতঃ পূর্ণ চক্করেই করিতে হয়। অবশ্য দক্ষিণ দিকের কোণদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্বভাবতঃই ভিড় থাকে, তাই সেস্থানে রমলের মধ্যে শিথিলতা আসিতে পারে।

ছড়ির সাহায্যে হজরে আসওয়াদ চুম্বন করা

৮৪২। **হাদীছ ঃ—**ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জকালে একদা উষ্ট্রের উপর আরোহিত অবস্থায় তওয়াফ করিলেন। হজরে-আসওয়াদের কোণ অতিক্রম করিতে প্রত্যেক বারেই হযরত (দঃ) তকবীর বলিতেন এবং ছড়ির সাহায্যে ইশারা করতঃ হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করিতেছিলেন।

মছআলাহ ঃ—বিশেষ ওজর বশতঃ যানবাহনের উপর ছওয়ার হইয়া তওয়াফ করা জায়েব বটে; কিন্তু বাইতুল্লাহ শরীফ যেহেতু মসজিদে-হারামের মধ্যে অবস্থিত, তাই তওয়াফ কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে মসজিদের ভিতরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অথচ মসজিদের মধ্যে কোন পশুকে লইয়া যাওয়া জায়েয নহে; কেননা, উহাদের মলমূত্র ত্যাগের সময়ের কোন ঠিক-ঠিকানা নাই।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মোজেযা স্বরূপ তাঁহার ব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহ আল্লাহ তায়ালার কুদরতে অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী হইয়া থাকিত। তদনুযায়ী

তাঁহার স্বীয় যানবাহন উটের প্রতি ঐ ব্যাপারে তিনি আস্থাশীল ছিলেন। তাই তিনি উহাকে মসজিদের ভিতরে লইয়া গিয়াছিলেন।

মছআলাহ ঃ— বেয়াদবী হয় বা অন্যকে কষ্ট দিতে হয় এরূপ হুড়াহুড়ি না করিয়া হজরে-আস্‌ওয়াদকে সরাসরি চুম্বন করা সহজসাধ্য হইলে তাহাই করিবে। যেমন ৮৪৬নং হাদীছে বর্ণিত হইবে।

চুম্বন করার নিয়ম—"হজরে-আস্‌ওয়াদ" অর্থ কৃষ্ণবর্ণের পাথর। আদি আমলে উহা একটি আস্ত পাথরখণ্ড ছিল, কিন্তু পূর্বকাল হইতেই উহা আর আস্ত পাথরখণ্ড থাকে নাই; ছোট ছোট টুকরায় বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। কা'বা শরীফের গায়ে—উহার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে, মানুষের বুক সমান উপরে, মাথা প্রবেশ করা যায় এই পরিমাণ খোড়ল আছে যাহার ভিতরে হজরে-আস্‌ওয়াদ বর্ণেরই বিশেষ মসলার মধ্যে হজরে-আস্‌ওয়াদের টুকরা সমূহ বিদ্ধ রহিয়াছে। টুকরাগুলি অধিকাংশই ছোট ছোট—আঙ্গুলের মাথা পরিমাণের; এক-দুইটা টুকরা বৃদ্ধাঙ্গুলির পেট বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় আছে।

নামাযে সেজদা কালে যে ভাবে উভয় হাত জমিনের উপর রাখা হয় ঐ ভাবে উভয় হস্ত উক্ত খোড়লের ভিতর এমনভাবে রাখিবে যেন হস্তদ্বয়ের মধ্য ফাঁকে হজরে-আস্‌ওয়াদের কোন টুকরা ভাসমান থাকে। খোড়লের ভিতরে হস্তদ্বয়ের উপর মুখমণ্ডল ঠেকাইয়া হস্তদ্বয়ের মধ্যস্থ হজরে-আসওয়াদ টুকরাকে এমন সতর্কতার সহিত চুম্বন করিবে, যেন উহাতে মুখের লালার কোন আদ্রতা না লাগে, হজরে-আসওয়াদ টুকরার উপর কপালও স্পর্শ করিবে। এইরূপে সরাসরি চুম্বনের সুযোগ না পাইলে উভয় হাত বা ডান হাত দ্বারা হজরে-আসওয়াদ খণ্ডকে শুধু স্পর্শ করিবে এবং হাতকে চুম্বন করিবে। ইহারও সুযোগ না হইলে ছড়ি ইত্যাদির ন্যায় কোন বস্তু হজরে-আসওয়াদ খণ্ডে স্পর্শ করিয়া ঐ বস্তুকে চুম্বন করিবে। ঐরূপ করারও সুযোগ না হইলে দূর হইতেই হজরে-আসওয়াদের প্রতি মুখ করতঃ তকবীর, কলেমা-তৈয়্যেব ও দরূদ পড়িবে এবং হস্তদ্বয়ের তালু উহার মুখী করিয়া হস্তদ্বয় উহার উপর রাখার ন্যায় ইশারা করিবে, অতঃপর হস্তদ্বয়কে চুম্বন করিবে। (শামী)

বাইতুল্লাহ শরীফের কোণ ভক্তিভরে স্পর্শ করা

৮৪৩। হাদীছ ঃ— আবুশ-শা'ছা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোয়াবিয়া (রাঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের প্রত্যেক কোণকেই স্পর্শ করিতেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, (উত্তর দিকের) কোন দুইটি স্পর্শ করার বিধান নাই। তদুত্তরে মোয়াবিয়া (রাঃ) বলিলেন, বাইতুল্লার কোন অংশই পরিত্যক্ত নহে।

আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ)ও প্রত্যেক কোণকে স্পর্শ করিতেন।

৮৪৪। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দক্ষিণ দিকের কোণদ্বয় ব্যতীত অন্য কোনও কোণকে স্পর্শ করিতে দেখি নাই।

ব্যাখ্যা :—প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিটি কার্য্যপদ্ধতি অনুধাবন ও অনুসরণের প্রতি সর্বদা বিশেষ তৎপর থাকিতেন; তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তর কোণদ্বয়কে স্পর্শ করিতেন না। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্বয়ং এই রীতি অনুযায়ী আমলও করিয়াছেন—তিনি উত্তর কোণদ্বয়কে কোন সময়ই তওয়াফকালে স্পর্শ করিতেন না। তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিতেন, আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছি রসুলুল্লাহ (দঃ) এই কোণদ্বয়কে স্পর্শ করেন নাই। হযরত রসুলুল্লাল্লাহ (দঃ) কর্তৃক এই কোণদ্বয়কে স্পর্শ না করার কারণ স্বরূপ তিনি বর্ণনা করিয়া থাকিতেন যে, আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত (৮২৫ ও ৮৪৫ নং) হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান বাইতুল্লাহ শরীফের ঘরের সীমানার বাহিরে উত্তর পার্শ্ব-সংলগ্ন—"হাতীম" নামক স্থানটুকু বস্তুতঃ কা'বা শরীফ ঘরেরই অংশবিশেষ। কিন্তু বর্তমান কা'বা গৃহের নির্মাণকালে ঐ স্থানটুকু পরিত্যাগ করিয়া কা'বা-ঘর ছোট আকারে তৈরী করা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা গেল যে, উত্তর পার্শ্বস্থ বর্তমান কোণদ্বয় বাইতুল্লাহ শরীফের প্রকৃত কোণ নহে, বরং উহা প্রকৃত প্রস্তাবে মধ্যবর্তী একটি স্থান বটে। বস্তুতঃ যেখানে বাইতুল্লাহ শরীফের কোণ হওয়ার নির্দিষ্ট স্থান ছিল সেখানে কোণ স্থাপিত হয় নাই। এই কারণেই এই দিকের বর্তমান কোণদ্বয়কে স্পর্শ করা হয় নাই। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে এই তথ্যেরই উল্লেখ রহিয়াছে।

৮৪৫। হাদীছ :—মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর পুত্র আবদুল্লাহ (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীকে আয়েশা (রাঃ) হইতে এই হাদীছ বর্ণিত শুনাইলেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে বলিয়াছেন, এই তথ্য তোমার জানা নাই কি যে, তোমার বংশধররা যখন কা'বা শরীফের পুনঃ নির্মাণ করিয়াছিল তখন তাহারা ইব্রাহীম আলাইহে চ্ছালামের স্থাপিত ভিত্তির পরিমাণ হইতে কা'বা গৃহকে ছোট করিয়া দিয়াছিল?

আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, তখন আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ। আপনি কা'বা ঘরকে ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া পুনঃ নির্মাণ করিবেন কি? তদুত্তরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমার বংশের (অধিকাংশ) লোকেরা যদি ইসলামে নবদীক্ষিত না হইত তবে আমি তাহা করিতাম।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) উক্ত হাদীছ শ্রবণে বলিলেন, আয়েশা (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে যে তথ্য শুনিয়াছেন উহা দ্বারাই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) হাতীমের দিকের তথা কা'বা-ঘরের উত্তর দিকের কোণদ্বয়ের এস্‌তিলাম—ভক্তিভরে স্পর্শ করেন নাই একমাত্র এই কারণেই যে, (কোরায়েশগণ কর্তৃক পুনঃ নির্মাণকালে) ঐ উত্তর দিকে বাইতুল্লাহ শরীফকে ইব্রাহীম আল্লাইহেচ্ছামের ভিত্তির উপর সম্পূর্ণ করা হয় নাই।

যথাসাধ্য হজরে-অলওয়াদকে চুম্বন করা

৮৪৬। **হাদীছ ঃ**—একদা এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে হজরে-আস্ওয়াদ চুম্বন করার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, আমি দেখিয়াছি—রসুলুল্লাল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহাকে ভক্তি ও মহব্বতের সহিত চুম্বন করিয়া থাকিতেন। ঐ ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, বলুন ত যদি ভিড় হয় কিংবা যদি চুম্বন করিতে কষ্ট হয় তবে কি করিব? আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রাগান্বিত স্বরে বলিলেন, তোমার "বলুনত" বাক্যটি তোমার দেশ ইয়ামানে রাখিয়া আস, আমি উহা শুনিতে চাই না। আমি দেখিয়াছি, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজরে-আস্ওয়াদকে চুম্বন করিয়াছেন।

মছআলাহ ঃ—ভিড় থাকা অবস্থায় যথাসাধ্য নিজে কষ্ট করিয়া হইলেও হজরে-আস্ওয়াদ চুম্বনে সচেষ্ট হইবে। কিন্তু অন্যকে কষ্ট দিয়া বাইতুল্লাহ শরীফ ও হজরে-আস্ওয়াদের সম্মান ও আদবের বরখেলাফ করিয়া চুম্বনের জন্য হুড়াহুড়ি ধস্তাধস্তি করিবে না। কারণ, চুম্বন করা সুন্নত এবং ঐ সমস্ত অবাঞ্ছিত কর্ম হারাম। ছুন্নত হাসিলের জন্য হারাম কার্য্যে লিপ্ত হওয়া যায় না।

মক্কায় পৌঁছিয়া সর্বপ্রথম তওয়াফ করা

৮৪৭। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কায় পৌছিয়া সর্বপ্রথম অজু করিলেন, অতঃপর তওয়াফ করিলেন।

৮৪৮। **হাদীছ ঃ**— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জ বা ওমরার জন্য প্রথম তওয়াফের তিন চক্করে "রমল" করিতেন এবং অবশিষ্ট চারি চক্করে স্বাভাবিকরূপে চলিতেন। অতঃপর (মকামে-ইব্রাহীমের নিকটবর্তী ওয়াজেবুত-তওয়াফ) দুই রাকাত নামায পড়িতেন। তৎপর ছাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী সায়ী করিতেন।

নারী-পুরুষ একই সময়ে তওয়াফ করিতে সতর্কতা অবলম্বন করিবে

৮৪৯। **হাদীছ ঃ**—ইবনে জোরায়েজ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হিজরী প্রথম শতাব্দীর ঘটনা—তৎকালীন বাদশাহ হেশাম-ইবনে আবদুল মালেক কর্তৃক নিয়োজিত হজ্জ-কার্য্য পরিচালনার প্রধান তথা আমিরুল-হজ্জ) ইব্রাহীম ইবনে হেশাম যখন নারীগণের প্রতি পুরুষের সঙ্গে একত্রে তওয়াফ করার নিষেধাজ্ঞা জারী করিলেন, তখন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আ'তা (রঃ) বলিলেন, নারী-পুরুষের এক সময়ে তওয়াফ করাকে কিরূপে নিষিদ্ধ করা যাইতে পারে? অথচ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণও পুরুষদের তওয়াফ করা কালেই (একই সময়ে) তওয়াফ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি নারীদের প্রতি পর্দার আদেশ জারী হওয়ার পরের ঘটনা? তিনি বলিলেন—

নারীগণ পুরুষদের সঙ্গে একত্রিত হইতেন না। (আমি দেখিয়াছি,) আয়েশা (রাঃ) পুরুষদের তওয়াফ করার সময়ে তওয়াফ করিতেন বটে, কিন্তু পুরুষগণ হইতে পৃথক থাকিয়া তওয়াফ করিতেন এবং তাহাদের সঙ্গে একত্রিত হইতেন না। (একদা) এমতাবস্থায় একটি নারী তাঁহাকে বলিল, হে উম্মুল মোমেনিন! চলুন, আমরা হজরে-আস্‌ওয়াদ চুম্বন করিয়া আসি। (যেহেতু হজরে-আস্‌ওয়াদের নিকটবর্তী স্থানে পুরুষদের ভিড় হইতে বাচিয়া থাকা কঠিন ছিল, তাই) আয়েশা (রাঃ) উহা অস্বীকার করিলেন এবং রাগান্বিত স্বরে বলিলেন—দূর।

আতা (রঃ) আরও বলিলেন, আমি দেখিয়াছি—নারীগণ বিশেষরূপে রাত্রিকালে পর্দার সহিত আসিতেন এবং পুরুষদের তওয়াফ করাকালীন কেনারায় কেনারায় তওয়াফ করিতেন। কিন্তু নারীগণ বাইতুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইলে তাহারা প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেন এবং পুরুষগণকে ঘরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত, (তৎপর নারীগণ প্রবেশ করিতেন)।

মছআলাহ্ঃ—নারীগণের পক্ষে পুরুষদের সহিত হুড়াহুড়ি করিয়া বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে প্রবেশ করা জায়েয নহে।

তওয়াফ করার সময় প্রয়োজনীয় কথা বলা

৮৫০। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা তওয়াফ করাকালে এক ব্যক্তির নিকটস্থ পথে চলিবার সময় দেখিতে পাইলেন—সে নিজকে একটি দড়ি দ্বারা বাধিয়াছে এবং অন্য এক ব্যক্তি ঐ দড়ি ধরিয়া পশুর ন্যায় তাহাকে টানিয়া নিতেছে*। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বহস্তে ঐ দড়ি কাটিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আবশ্যক হইলে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাও।

ফজর ও আছরের পরে তওয়াফ করা

ফজর ও আছরের নামাযের পরে তওয়াফ করা জায়েয; ইহাতে কোন দ্বিমত নাই বলা যায়। অবশ্য তওয়াফের পরে যে, দুই রাকাত নামায পড়িতে হয় সেই নামায ফজর নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আসরের নামাযের পর সূর্য্যাস্তের পূর্বে পড়া সম্পর্কে ইমামগণের মতাভেদ রহিয়াছে।

উক্ত দুই সময়ে ফরজ কাজা নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া নিষিদ্ধ। সে মতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ)-এর মজহাব মতে তওয়াফের নামায ঐ সময় পড়িতে পারিবে না। কোন ব্যক্তি যদি ফজর নামাযের বা আছর নামাযের পরে তওয়াফ করে তবে তাহাকে তওয়াফের নামায সূর্য্য উদয়ের বা অস্তের পরে পড়িতে হইবে।

---

* অন্ধকার যুগে এরূপ করাকে পূণ্য মনে করা হইত এবং নানাপ্রকার আপদ-বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার বা বিবিধ মকছুদ হাসিলের জন্য এরূপ করার মান্নত মানা হইত।

অন্য ইমামগণের মতে উদয়-অস্তের পূর্বেই তওয়াফের নামায পড়িতে পারিবে। এ সম্পর্কে ছাহাবীগণের মধ্যে উভয় রকম আমলই দেখা যায়।

● আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রঃ) তওয়াফের নামায সুর্য্য উদয়ের পূর্বে পড়িতেন, অবশ্য ঠিক উদয়ের সময় পড়িতেন না।

● একদা ওমর (রাঃ) ফজর নামাযান্তে তওয়াফ করিলেন; তওয়াফের নামায ঐ সময় পড়িলেন না, বরং "জি-তুয়া" নামক স্থানে পৌছিয়া (সূর্য্য উদয়ের পরে) তওয়াফের নামায পড়িয়াছেন।

৮৫১। হাদীছ ঃ—ওরওয়াহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কতিপয় ব্যক্তি ফজর নামাযান্তে তওয়াফ করিল, অতঃপর তাহারা ওয়াজ শুনিতে বসিল, সূর্য্যোদয়ের নিকটবর্তী সময় তাহারা তওয়াফের নামাযে দাঁড়াইল। তখন আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তাহারা বসিয়াছিল—তবুও নামাযের জন্য মকরূহ সময় থাকিতেই নামাযে দাঁড়াইল।

ব্যাখ্যা ঃ—আয়েশা (রাঃ) উল্লেখিত অবস্থায় সূর্য্য উদয়ের পরে তওয়াফের নামায পড়িতে আদেশ করিতেন।

অসুস্থতার দরুণ কোন কিছুতে চড়িয়া তওয়াফ করা

৮৫২। হাদীছ ঃ—উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জ সমাপনান্তে মদীনা পানে যাত্রার প্রস্তুতি নিলেন; উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-ছালামাহ (রাঃ)ও যাত্রার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তিনি বিদায়-তওয়াফ করেন নাই। তিনি হযরতের নিকট স্বীয় অসুস্থতার উল্লেখ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, ফজর নামাযের জমাত দাঁড়াইলে লোকগণ নামাযে থাকিবে তখন তুমি উটে চড়িয়া লোকদের পেছন দিয়া তওয়াফ করিয়া নিও। তিনি তাহাই করিলেন এবং তওয়াফের দুই রাকাত নামায অন্যত্র বাহিরে কোথাও পড়িয়া নিলেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, আমি যখন তওয়াফ করিতেছিলাম তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফ সংলগ্নে নামায পড়িতে ছিলেন; হযরত (দঃ) ছুরা "ওয়াততুর" পাঠ করিতেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—মদীনায় যাত্রার সময় হযরতের বিবি উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) অসুস্থ হওয়ায় তিনি বিদায়-তওয়াফ করিতে পারেন নাই; বিদায়-তওয়াফ ওয়াজেব। মক্কা হইতে যাত্রার প্রক্কালে উহা আদায় করিতে হইবে, তাই নবী (দঃ) তাঁহাকে স্বীয় উট দিলেন এবং উহাতে চড়িয়া তওয়াফ আদায় করিতে বলিলেন। উটে চড়িয়া তওয়াফ করার পরিবেশ লাভের জন্য নবী (দঃ) তাঁহাকে ফজর নামাযের জমাত হওয়াকালে তওয়াফ করার পরামর্শ দিলেন। নামাযীদের যেন বিব্রত হওয়ার কারণ না হয়, তাই তাহাদের পেছন দিয়া তওয়াফ করিতে বলিলেন। অধিকাংশ হাজী মক্কা ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় তখন ফজরের জমাতে যে

পরিমাণ লোক ছিল তাহাদের পেছন দিয়া উটের সাহায্যে তওয়াফ করা সহজ সাধ্যই ছিল। মসজিদের ভিতরে উট ইত্যাদি পশু নেওয়া বিশেষতঃ দীর্ঘ সময়ের জন্য নিষিদ্ধ; কারণ উহার মল-মূত্র ত্যাগের কোন ঠিক-ঠিকানা নাই—যাহাতে মসজিদ অপবিত্র হওয়ার প্রবল আশঙ্কা। কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মোজেযারূপে তাঁহার উট নির্ভরযোগ্য ছিল যে, মসজিদে মল-মূত্র ত্যাগ করিবে না, তাই হযরতের বিবি সেই উট মসজিদের ভিতরে নিয়া উহার উপর চড়িয়া তওয়াফ করিয়াছেন ৮৪২নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, স্বয়ং নবী (দঃ)ও বিশেষ কারণে স্বীয় উটের উপর চড়িয়া তওয়াফ করিয়াছেন।

সর্ব-সাধারণের জন্যও মাছআলাহ রহিয়াছে—অসুস্থতার দরুণ হাটিয়া তওয়াফ করিতে সক্ষম না হইলে পশু ভিন্ন অন্য কিছুতে চড়িয়া তওয়াফ আদায় করিতে পারে। বর্তমানে দেখিয়াছি—ছোট চৌকির ন্যায় তৈরী কাঠের উপর রুগ্ন-অচল ব্যক্তিকে বসাইয়া বা শোয়াইয়া ঐ কাঠ দুইজন শ্রমিক মাথায় বহন করতঃ তওয়াফ আদায় করাইয়া থাকে। ছাফা-মরওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে ছায়ী করার মছআলাহও রুগ্ন-অচলদের জন্য তদ্রূপই, বর্তমানে সে ক্ষেত্রে উক্তরূপ চৌকি ভিন্ন ছোট হাত গাড়ীও ব্যবহার করা হয় এবং এই কাজের জন্য অনেক শ্রমিক চৌকি বা গাড়ী নিয়া মোতায়েন থাকে।

মছআলাহ ঃ—তওয়াফ করা অবস্থায় কোন গর্হিত কাজ হইতে দেখিলে সে কাজে বাধা দিতে এবং উহা রহিতের ব্যবস্থা করিতে পারে। ৮৫০ হাদীছ

তওয়াফ ও উহার নামাযের বিভিন্ন মাছআলাহ

মছআলাহ ঃ—বিশিষ্ট তাবেয়ী আতা (রঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি তওয়াফ করিতেছে এমতাবস্থায় সাত চক্কর পূর্ণ হইবার পূর্বেই নামাযের জমাত আরম্ভ হইয়া গেল কিম্বা অন্য কোনও কারণে তওয়াফ কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হইল; তখন সে ব্যক্তি নামাযান্তে বা বাধা মুক্তির পর অবশিষ্ট তওয়াফ ঐ স্থান হইতে পুনরারম্ভ করিবে যথা হইতে পরিত্যাগ করিয়াছে। ইবনে ওমর (রাঃ) ও আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) তাঁহারাও এইরূপ ফতোয়া দিয়াছেন।

মছআলাহ ঃ—প্রতি সাত চক্কর তওয়াফ পূর্ণ করার পর দুই রাকাত নামায পড়িবে। এমনকি, তওয়াফের সংলগ্ন কোনও ফরজ নামায পড়িলে তাহাতে ঐ তওয়াফের নামায আদায় হইবে না, বরং ভিন্নভাবে তওয়াফের জন্য দুই রাকাত ওয়াজেব নামায পড়িতে হইবে। (২২০)

মছআলাহ ঃ—মসজিদে-হরমের বাহিরে, এমনকি হরম শরীফের সীমার বাহিরেও যদি তওয়াফের দুই রাকাত নামায আদায় করে তবে জায়েয হইবে। কিন্তু এই দুই রাকাত নামায মকামে ইব্রাহীমকে সম্মুখে রাখিয়া পড়া উত্তম।

মছআলাহ ঃ—মক্কা শরীফে পৌঁছিয়াই অনতিবিলম্বে তওয়াফ করা কর্তব্য। যদি শুধু হজ্জের এহরাম থাকে তবে সেই তওয়াফ হইবে "তওয়াফে কুদুম" যাহা ছুন্নত, আর শুধু

ওমরার এহরাম থাকিলে সেই তওয়াফ হইবে ওমরার ফরজ তওয়াফ। আর হজ্জ ও ওমরা উভয়ের তথা হজ্জে-কেরাণের এহরাম থাকিলে প্রথমে ওমরার ফরজ তওয়াফ আদায় করা ওয়াজেব অতঃপর ওমরার সায়ী করিবে, তারপর হজ্জের ছুন্নত তয়াফে-কুদুম করিবে। তারপরেও যত সময় মক্কায় থাকিবে বেশী পরিমাণে নফল তওয়াফ করা উত্তম, এমনকি মক্কার বাহিরের লোকদের জন্য নফল নামায অপেক্ষাও নফল তওয়াফ অগ্রগণ্য। অবশ্য যদি নফল তওয়াফ না করে এবং শুধু ১০ তারিখে বা উহার পর ফরজ তওয়াফ—তওয়াফ-যেয়ারত করে তবুও গোনাহ হইবে না। হযরত (দঃ) বিদায়-হজ্জে নফল তওয়াফ করিয়াছিলেন না। হযরত (দঃ) হজ্জের মাত্র চার দিন পূর্বে মক্কায় পৌঁছিয়া ছিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে দ্বীনি প্রয়োজন আনেক ছিল। এতদ্ভিন্ন হযরতের সঙ্গে যে অসংখ্য লোকের কাফেলা ছিল—চার দিনের মধ্যে তাহাদের সকলের প্রাথমিক তওয়াফ আদায় করার অপরিহার্য্য প্রয়োজন ছিল, হয়ত সেই দিক লক্ষ্য করিয়াই হযরত (দঃ) নফল তওয়াফে যান নাই। কারণ, তাহা হইলে নফল তওয়াফকারীদের ভীড় অধিক হইয়া যাইবে।

(২২০ পৃষ্ঠা ৮৩৮ হাদীছ)

মছআলাহ ঃ—তওয়াফ অজুর সহিত করা কর্তব্য; অধিকাংশ ইমামগণের মতে অজু-বিহীন তওয়াফ শুদ্ধই হয় না।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জে মক্কায় পৌঁছিয়াই অজু করিয়া কা'বা শরীফের তওয়াফ করিয়াছিলেন। ৮৭৪ হাদীছ

হাজীদেরে পানি পান করাইবার খেদমত

৮৫৩। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জের সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চাচা আব্বাস (রাঃ) হযরতের নিকট অনুমতি চাহিলেন যে, হাজীদের পানি পান করানের খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিনায় অবস্থানের নির্দিষ্ট ১০, ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ সমূহের রাত্রিবেলা আমি মক্কায় থাকিতে চাই। (হাজীদেরকে যমযমের পানি পান করানো তাঁহাদের বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য ছিল।) রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে সেই অনুমতি প্রদান করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—মিনা অবস্থানের তারিখসমূহে মিনাতে রাত্রি যাপন করা ওয়াজেব। কিন্তু হাজীদের পানি পান করানোর খেদমতে এতই ফজিলত যে, উহার জন্য আব্বাস (রাঃ) সেই ওয়াজেব হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

৮৫৪। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায়-হজ্জকালীন মক্কায়) হাজীদের জন্য বিশেষরূপে পানি পানের ব্যবস্থাপনার স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং পানি পানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন তাঁহার চাচা আব্বাস (রাঃ) স্বীয় পুত্র ফজলকে আদেশ করিলেন—তোমার মাতার নিকট হইতে রসুলুল্লাহ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য খাছ পানি নিয়া আস। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সর্ব-সাধারণের পানি হইতেই পান করান। আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! এই পানির এবং এই পাত্রের মধ্যে সর্ব-সাধারণ সকলেই হাত ভিজাইয়া থাকে, আপনার জন্য বিশেষ পানির ব্যবস্থা করিতেছি। হযরত (দঃ) পুনরায় বলিলেন, সর্ব-সাধারণের জন্য প্রস্তুত পাত্র হইতেই আমাকে পান করান। হযরত (দঃ) সেই পাত্র হইতেই পানি পান করিয়া "যমযম" কুপের নিকটবর্তী আসিলেন। তথায় বহু লোক পানি পান করিতেছিল এবং কিছু সংখ্যক লোক পরিশ্রম করিয়া পানি পান করাইতেছিল। তাহাদিগকে নবী (দঃ) বলিলেন, তোমরা অতি উত্তম কাজ করিতেছ। তোমাদের উপর সকলের ভিড় হওয়ার আশঙ্কা না হইলে আমিও দড়ি লইয়া (যমযম কূপ হইতে পানি উত্তোলন পূর্বক) তোমাদের সঙ্গে পানি পান করানোর কার্য্যে যোগদান করিতাম।

যমযমের পানি দাঁড়াইয়া পান করা

৮৫৫। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নিজে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে যমযমের পানি পান করাইয়াছি। তিনি উহা দাঁড়াইয়া পান করিয়াছেন।

ছাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী ছায়ী করা ওয়াজেব

৮৫৬। হাদীছঃ—ওরওয়াহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার খালা আয়েশা (রাঃ)কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি এই আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন? আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ○

অর্থ—নিশ্চয় ছাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দ্ধারিত একটি এবাদতের স্থান। যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ বা ওমরা করিবে, তাহার জন্য দুষণীয় হইবে না ঐ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে ছায়ী করা। (২ পাঃ ৩ রুঃ)

ওরওয়াহ (রঃ) বলেন, এই আয়াতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ছাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে ছায়ী করা ওয়াজেব নহে, ঐ ছায়ী না করিলে গোনাহ হইবে না। নতুবা আল্লাহ তায়ালা এরূপ বলিতেন না যে, ছায়ী করা দুষণীয় নহে।

আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ যে, "ছায়ী না করিলে গোনাহ হইবে না" যদি তাহাই হইত তবে আল্লাহ তায়ালা এখানে এইরূপ বলিতেন—"দুষণীয় হইবে না ছায়ী না করা।" কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাহা বলেন নাই।

অতঃপর আয়েশা (রাঃ) বলিলেন—(ছায়ী করা বস্তুতঃ ওয়াজেব কিন্তু) "ছায়ী করা দুষণীয় নহে" এখানে এই ধরণের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—ইসলামের পূর্বে অন্ধকার যুগে কাফেররাও নানারূপ গর্হিত ও কল্পিত নিয়মানুসারে হজ্জব্রত পালন করিয়া থাকিত। ঐ সময় মদীনাবাসী একদল লোক "কোদায়েদ" নামক স্থানের সম্মুখে "মোশাল্লাল" নামক একটি টিলার উপর প্রতিষ্ঠিত "মানাত" নামক একটি মূর্তিকে মা'বুদরূপে উপাসনা করিত। তাহারা ঐ মূর্তির উদ্দেশ্যে এবং উহার উপাসনারূপেই হজ্জব্রত পালন করিয়া থাকিত। তখন ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপরও দুইটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। মদীনাবাসীরা উক্ত মূর্তিদ্বয়কে মাবুদরূপে মান্য করিত না এবং উহাদের উপাসনাও করিত না। এই কারণে তাহারা ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী ছায়ী করাকে গোনাহ মনে করিত।

কালক্রমে মোসলমান হওয়ার পর তাঁহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিট জিজ্ঞাসা করিলেন—আমরা ত পূর্বে ছাফা-মারওয়ার ছায়ীকে গোনাহ ভাবিয়া উহা হইতে বিরত থাকিতাম, এখন আমাদের প্রতি কি আদেশ?

তাঁহাদের এই প্রশ্ন উপলক্ষেই উক্ত আয়াত নাযেল হয় এবং তাঁহাদের পূর্বেকার এই ভুল ধারণা যে, ছাফা-মারওয়ার ছায়ী গোনাহের কাজ—ইহা খণ্ডন করার পরিপ্রেক্ষিতেই বলা হয় যে, ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করা দুষণীয় নহে। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক নির্দ্ধারিত ও নির্দেশিত একটি বিশেষ ধর্মীয় বিধান। সুতরাং কাহারও জন্য উহা হইতে বিরত থাকার অনুমতি নাই।

এতদ্ব্যতীত মদীনাবাসীদের বিপরীত আচরণকারী অন্য একদল লোকও উক্ত আয়াতের লক্ষ্যস্থল ছিল। তাহারা হইল মক্কাবাসী ও তাহাদের অনুসারীগণ। (ছাফা পাহাড়ের উপর "এছাফ" নামের একটি মূর্তি এবং মারওয়া পাহাড়ের উপর "নায়েলা" নামে অপর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্ধকার যুগে মক্কাবাসীরা ঐ মূর্তিদ্বয়ের পূজারী ছিল এবং ঐ মূর্তিদ্বয়ের উদ্দেশ্য ও উপাসনা রূপেই তাহারা ছাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী ছায়ী করিয়া থাকিত। তাহারাও মোসলমান হওয়ার পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই মনোভাব ব্যক্ত করিল যে, আমরা পূর্বে একটি জঘন্য কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করিতাম। এখন আমরা মোসলমান হইয়া ঐ কাজ করাকে গোনাহ মনে করি।) এবং আল্লাহ তায়ালা কা'বা-ঘরের তওয়াফের আদেশ অবতীর্ণ করিয়াছেন, ছাফা-মারওয়ার উল্লেখ করেন নাই (১৭ পাঃ ছুরা-হজ্জ ২৯ আয়াত দ্রষ্টব্য)। এমতাবস্থায় ছাফা-মারওয়ার ছায়ী কারায় গোনাহ হইবে কি? উক্ত দলের প্রশ্ন এবং মনোভাবকেও এই আয়াতের দ্বারা রদ করা হইয়াছে যে, হজ্জ বা ওমরার মাধ্যমে ছাফা-মারওয়ার ছায়ীকে গোনাহ মনে করা নিতান্ত ভুল ও অহেতুক। কারণ, হজ্জ বা ওমরা বস্তুতঃ একমাত্র আল্লার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অতএব, উহার মাধ্যমে ছায়ীও আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইবে। সুতরাং উহা গোনাহ বা দুষণীয় হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—বিপরীত মতবাদের দুই দল লোকের ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব প্রসূত একই ভুল ধারণাকে রদ করতঃ প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপনার্থে এই আয়াতটি নাযেল হয়। আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতের মূল বিষয় বস্তু উল্লেখ করার পূর্বে অতি সুন্দর একটি ভূমিকার উল্লেখ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, বহু পূর্ব হইতে ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত বিশেষ এবাদতের স্থান। যাহারা কোন মূর্তির উদ্দেশ্য ও উপসনারূপে এই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী ছায়ী করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় গোনাহ ও শেরেকী কাজ করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই পাহাড়দ্বয়কে আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত এবাদতের স্থানরূপে আল্লার নির্দেশিত বিধান হিসাবে একমাত্র আল্লার এবাদৎ বন্দেগী উদ্দেশ্য করিয়া ছায়ী করা—ইহাই ছিল এই পাহাড়দ্বয়ের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। অবশ্য অন্ধকার যুগে নানাবিধ কুসংস্কারের সৃষ্টি হইয়াছিল। এখন তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া অন্ধকার যুগের কুসংস্কার হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র হইয়াছ। অতএব, পূর্ব উদ্দেশ্য তথা আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত বিশেষত্বকে রূপায়িত করার মধ্যে এখন কি দোষ থাকিতে পারে? এবং যাহারা অন্ধকার যুগে নানাবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকিয়া ছাফা-মারওয়ার ছায়ীকে গোনাহ মনে করিত তাহারাও এখন আর উহাকে গোনাহ মনে করিতে পারে না। কারণ, ইসলাম সমস্ত কুসংস্কারেরই মূলোৎপাটন করিয়া দিয়াছে। মূর্তি দূর করিয়া ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। গর্হিত মূর্তির কারণে মূল জিনিস নষ্ট হইবে না। মূল জিনিস আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এখনও তাহাই বলবৎ আছে এবং থাকিবে।

৮৫৭। **হাদীছ ঃ**— আমূর ইবনে দীনার (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম—কোন ব্যক্তি ওমরার এহরাম বাঁধিয়াছে; অতঃপর ওমরার দুইটি কাজ তথা তওয়াফ ও ছায়ী হইতে শুধু বাইতুল্লার তওয়াফ করিয়াছে; ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করে নাই; সে এহরামের বিপরীত কাজ—স্ত্রী-ব্যবহার করিতে পারে কি? অর্থাৎ ছাফা-মারওয়ার ছায়ী ব্যতিরেকে তাহার ওমরা পূর্ণ হইয়াছে কি? আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, নবী (দঃ) বিদায়-হজ্জকালে মক্কায় আসিয়া সাত চক্কর তওয়াফ করিয়াছেন এবং মকামে-ইব্রাহীমকে সম্মুখে রাখিয়া দুই রাকাত নামায পড়িয়াছেন এবং ছাফা-মারয়ার সাত ফেরা ছায়ী করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, "তোমাদের জন্য রসুলুল্লার কার্য্যাবলীতে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে।" অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ) ছায়ী করিয়াছেন, সুতরাং সকল মোসলমানকে হজ্জ এবং ওমরায় ছায়ী অবশ্যই করিতে হইবে; উহা ব্যতিরেকে হজ্জ বা ওমরা সম্পন্ন হইবে না। অতএব ছায়ী করার পূর্বে এহরামের বিপরীত কাজ—স্ত্রী-ব্যবহার করিতে পারিবেনা।

আমর ইবনে দীনার (রঃ) আরও বলিয়াছেন যে, উক্ত বিষয়টি আমরা জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি সরাসরি স্পষ্টই বলিলেন—ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করার পূর্বে কিছুতেই স্ত্রী-ব্যবহার করিতে পারিবে না।

মছআল্লাহ্‌ঃ—হজ্জ এবং ওমরায় ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের ছায়ী করা একটি বিশেষ ওয়াজেব। ইহা আদায় না করা পর্য্যন্ত হজ্জ ওমরা পূর্ণ হইবে না। ইহার বিধানগত সময় হইল ওমরার তওয়াফের সঙ্গে এবং হজ্জের যে কোন তওয়াফের সঙ্গে করা। যদি ঐরূপ না করিয়া থাকে তবে পরে যে কোন সময় অবশ্যই আদায় করিবে, এমনকি যদি উহা না করিয়া এহরাম ভাঙ্গিয়াও ফেলিয়া থাকে তবুও উহা আদায় করিতে হইবে। অবশ্যই উহা জিম্মায় ওয়াজেব থাকিবে। এই ওয়াজেব আদায় করার জন্য পুনরায় তাহাকে হজ্জ বা ওমরার নিয়্যতে মক্কা শরীফে আসিয়া উহা আদায় করিতে হইবে। কিম্বা একটি কোরবানীর টাকা কাহারও হাতে মক্কা শরীফ পাঠাইতে হইবে এবং কাফ্‌ফারারূপে সেই কোরবানী হরম শরীফের সীমার ভিতর জবেহ করা হইলে উক্ত ওয়াজেব আদায় না করার বিনিময় আদায় হইয়া নিস্কৃতি লাভ হইবে।

৮ই জিলহাজ্জ জোহরের নামায কোথায় পড়িবে ?

৮৫৮। হাদীছঃ—আবতুল আজিজ ইবনে রোফায় (রঃ) আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ৮ই জিলহাজ্জ জোহর ও আছরের নামায কোথায় পড়িয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন—মিনায়। তৎপর জিজ্ঞাসা করিলেন, মিনা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে আছরের নামায কোথায় পড়িয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, "আবতাহ্‌" নামক স্থানে। (যাহাকে "মোহাচ্ছাব" বলা হয়, যাহার বর্ণনা ৯০৫নং হাদীছে উল্লেখ আছে।) অতঃপর আনাছ (রাঃ) আরও একটি কথা বলিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য এই যে—এই বিবরণের অনুসরণ ছুন্নত বটে, কিন্তু উহা সুযোগ-সুবিধা সাপেক্ষ—ওয়াজেব বা ছুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ নহে।

মছআলাহ্‌ঃ—মক্কায় অবস্থানকারী ব্যক্তি ৮ই জিলহজ্জের পূর্বেও এহরাম বাঁধিতে পারে ; ৮ই জিলহাজ্জ এহরামের শেষ তারিখ। সে মক্কার সব স্থানেই এহরাম বাঁধিতে পারিবে। (১২৪ পৃঃ)

আরফায় অবস্থানের দিন রোযা না রাখা

৮৫৯। হাদীছঃ—উম্মুল-ফজল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আরফায় অবস্থানের দিন সকলের মনেই এই বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রোযা রাখিয়াছেন কি-না ? (কারণ, সাধারনতঃ আরফার দিনের নফল রোযা অনেক ফজিলত রাখে।) তখন আমি প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য হযরতের নিকট পানীয়রূপে কিছু দুধ পাঠাইয়া দিলাম। হযরত (দঃ) পান করতঃ প্রকাশ করিয়া দিলেন—তিনি রোযা রাখেন নাই।

মছআলাহ্‌ঃ—আরফার দিন অর্থাৎ জিলহজ্জ চাঁদের নবম তারিখে রোযা রাখার অতিশয় ফজিলত ও ছওয়াব বর্ণিত আছে। কিন্তু যাহারা হজ্জ উপলক্ষে আরফার ময়দানে অবস্থানরত থাকিবে তাহারা ঐ রোযা রাখিবে না। আরফার ময়দানে বেশী বেশী দোয়া-এস্তেগফার ও জিকির-তছবীহ এবং নফল নামায ইত্যাদি এবাদৎ অধিক উত্তম ; রোযার দরুন উহা ব্যহত হইবে।

মিনা হইতে আরফায় যাওয়ার পথে

৮৬০। হাদীছঃ—এক ব্যক্তি আনাছ (রাঃ)কে মিনা হইতে আরফায় যাওয়াকালীন জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা এই দিন অর্থাত জিলহজ্জের নবম তারিখে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে থাকাকালীন কি কি কাজ করিতেন? আনাছ (রাঃ) বলিলেন, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ লাব্বাইকা……বলিতে থাকিত, তাহাতে বাধা দেওয়া হইত না এবং কেহ কেহ তকবীর-তশরীক বলিত, তাহাতেও বাধা দেওয়া হইত না।

আরফার ময়দানে

জিলহজ্জের ৯ তারিখে বেলা এক প্রহরের মধ্যেই সাধারণতঃ আরফার ময়দানে পৌঁছা হয়। আরফায় পৌঁছিয়াই দোয়া-দরূদ, জিকর, তলবিয়া এবং নফল নামায ইত্যাদিতে মশগুল থাকিবে; সময় মোটেই নষ্ট হইতে দিবে না।

জোহরের নামাযের পর হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পূর্ণ সময়টুকু আরফার দিনের বিশেষ সময় এবং গোটা হজ্জব্রতের বরকত ও মঙ্গল কুড়াইবার সময়, আল্লাহ তায়ালার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ করাইবার সময়, দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি ও সুখ-শান্তি এবং কল্যাণ আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে চাহিয়া লইবার সময়, কবরের আজাব, হাশরের কষ্ট, পোলছেরাতের বিপদ ও দোযখ হইতে উদ্ধারের এবং বেহেশত লাভের আবেদন-নিবেদন আল্লাহ তায়ালার দরবারে পেশ করার সময়। এই সময়টুকুকে ওকুফে-আরফাহ বা আরাফায় অবস্থানের সময় বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ আরফার ময়দানে আল্লার দরবারে কান্দাকাটা করা, তওবা-এস্তেগফার করা, দোয়ায় লিপ্ত হওয়া—যাহা আরফার ময়দানে অবস্থানের মুল উদ্দেশ্য—সেই উদ্দেশ্য সমাপন করার সময় ইহাই। এই উদ্দেশ্য সমাপনের সময়কে সুদীর্ঘ করার জন্য শরীয়তের বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা ও মহআলাহ বোখারী (রঃ) ২২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—(১) আরফার দিন জোহরের নামায শীঘ্র পড়িয়া নেওয়া। (২) জোহরের সঙ্গেই আছর নামাযও পড়িয়া নেওয়া। (শর্ত সাপেক্ষ—বিবরণ সম্মুখে)। (৩) জোহর নামাযের পুর্বক্ষণে খলীফা বা তাঁহার প্রতিনিধির ভাষণ সংক্ষিপ্ত হওয়া। (৪) যথা সম্ভব সত্বর আরফায় অবস্থানের উপরোল্লিখিত মুল কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা।

৮৬১। হাদীছঃ—সালেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ইতিহাস প্রসিদ্ধ কঠোর প্রকৃতির মানুষ মক্কার) গভর্ণর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে তাহার রাষ্ট্রপতি আবদুল মালেক আদেশ-নামা লিখিয়া পাঠাইলেন—গভর্ণর যেন হজ্জের সমুদয় ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর পরামর্শে চলেন; তাঁহার কথার বাহিরে না চলেন। তাই গভর্ণর হাজ্জাজ আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের নিকট আরফার ময়দানের কার্য্য সম্পাদনের নিয়ম জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

সালেম বলেন, সেমতে পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরফার দিন সূর্য্য মধ্যাকাশ অতিক্রম করিতেই আমাকে সঙ্গে নিয়া হাজ্জাজের তাঁবুর নিকটবর্তী আসিয়া তাঁহাকে

ডাকিলেন। তিনি বাহিরে আসিলে আবত্নল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, ছুন্নত আদায় করিতে চাহিলে এখনই জোহর নামাযের জন্য চলুন। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মুহূর্তে? আবত্নল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হাজ্জাজ বলিলেন, সামান্য অবকাশ দিন; সংক্ষিপ্ত গোসল করিয়াই আমি বাহির হইতেছি। আবত্নল্লাহ (রাঃ) স্বীয় বাহন হইতে নামিলেন; ইতিমধ্যেই হাজ্জাজ বাহির হইয়া আসিলেন এবং আমার ও আমার পিতা আবত্নল্লাহর মধ্যে হাজ্জাজ—এই অবস্থায় আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমি হাজ্জাজকে বলিলাম, আজিকার দিনের ছুন্নত তরীকা পালন করিতে চাহিলে ভাষণ সংক্ষিপ্ত করিবেন, জোহরের নামায অবিলম্বে যথা সম্ভব সত্বর পড়িবেন এবং আরফায় অবস্থানের মূল উদ্দেশ্য-কার্য্যে যথারীতি আত্মনিয়োগ করিবেন। আমার কথা শ্রবণে হাজ্জাজ পিতা আবত্নল্লাহ ইবনে ওমরের প্রতি তাকাইলেন। তখন আবত্নল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, সে ঠিকই বলিয়াছে। তিনি আরও বলিলেন, আরফার দিন জোহরের আউয়াল ওয়াক্তে আছরের নামাযকেও জোহরের নামাযের সঙ্গে একত্রে পড়িয়া নেওয়ার রীতি মোসলমানগণ রসুলের আদর্শ মতে এই উদ্দেশ্যেই পালন করিয়া আসিতেছে। অর্থাৎ আরফায় অবস্থানের মূল উদ্দেশ্য-কার্য্যের সময়কে প্রশস্ত করার জন্য।

সালেমের শাগের্দ ইমাম জুহরী সালেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আরফার দিন জোহরের ওয়াক্তে আছর নামায পড়িয়া নেওয়া—ইহাকি স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) করিয়াছেন? সালেম বলিলেন, এইরূপ ব্যাপারে মোসলমানগণ একমাত্র রসুলের আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যাঃ—পূর্বোল্লিখিত চারিটি বিষয়ের দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ আরফার দিন আছরের নামায জোহরের সঙ্গে পড়িয়া নেওয়া যাহার বর্ণনা আবত্নল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) করিয়াছেন উহা বিশেষ শর্ত সাপেক্ষ। আরফার ময়দানের মসজিদে-নামেরাতে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার নিয়োজিত প্রতিনিধীর ইমামতীতে জমাতের সহিত জোহর নামায পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে আছরেরও জমাত পড়া হইবে। অন্য স্থানে নামায পড়া হইলে বা অন্য ইমামের জমাতে কিম্বা একা নামায পড়া হইলে সে ক্ষেত্রে জোহর নামাযের ওয়াক্তে আছর নামায শুদ্ধ হইবে না। আছর নামায উহার নিয়মিত ওয়াক্তেই পড়িতে হইবে। বর্তমান যুগেও আরফার দিন মসজিদে-নামেরায় জোহর নামায বাদশার প্রতিনিধির ইমামতীতে জমাতে হইয়া থাকে, কিন্তু তথায় যাইয়া জোহর নামায পড়া বাংলাদেশের লোকের ন্যায় দুর্বলদের জন্য অসম্ভব ও অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল দেখিয়াছি। আমাদের ন্যায় লোকদের জন্য নিজ নিজ তাবুতে জোহর আছর নামায নিয়মিত ওয়াক্তেই পড়িতে হইবে। অবশ্য তুপুরের প্রারম্ভেই গোসল করতঃ আউয়াল ওয়াক্তে জোহর পড়িয়া যথা শীঘ্র দোয়া-কালামে আত্মনিয়োগ করা চাই এবং আছরের ওয়াক্তে আছর নামায পড়িয়া পুনঃ দোয়া-কালামে রত হইয়া যথা সম্ভব অধিক সময় দোয়া-কালামে রত থাকা চাই। জীবনের এই অতি অসাধ্য সুযোগের এক মুহূর্তও অপব্যয় করা চাই না।

আরফার ময়দানে প্রত্যেক হাজীকেই অবস্থান করিতে হইবে

৮৬২। **হাদীছঃ**—ওরওয়া (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অন্ধকার যুগের রীতি ছিল কোরায়েশ বংশের লোকগণ ছাড়া অন্য সকলেই উলঙ্গ হইয়া কা'বা শরীফ তওয়াফ করিত। কোরায়েশ বংশের লোকেরা অন্য লোকদেরকে কাপড় দিয়া সাহায্য করিত—পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে; ঐ কাপড় যাহারা পাইত তাহারা অবশ্য সেই কাপড় পরিয়া তওয়াফ করিত। যাহারা কোরায়েশদের হইতে কাপড় না পাইত তাহারা সকলে উলঙ্গ তওয়াফ করিত।

অন্ধকার যুগে কোরায়েশদের আরও বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সকল লোকই (জিলহজ্জের নয় তারিখে) আরফায় অবস্থান করিত এবং তথা হইতে ঐ দিন সন্ধ্যা বেলায় মোযদালেফার দিকে প্রত্যাবর্তন করিত, কিন্তু কোরায়েশরা আরফার ময়দানে মোটেই যাইত না, তাহারা মোযদালেফায়ই থাকিয়া যাইত এবং দশ তারিখ প্রভাতে তথা হইতে মিনায় প্রত্যাবর্তন করিত।

ওরওয়া (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, কোরায়েশদের উক্ত গর্হিত কার্য্যের খণ্ডনেই পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাযেল হইয়াছে—

ثم افيضوا من حيث افاض الناس "হে কোরায়েশরা! তোমরাও ঐ স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে যে স্থান হইতে অন্য সকল লোক প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে।" অর্থাৎ সকলে যেরূপ আরফায় পৌছিয়া তথা হইতে মোযদালেফায় প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে; তোমরাও আরফায় পৌছিয়া তথা হইতে নয় তারিখ সন্ধ্যায় মোযদালেফায় প্রত্যাবর্তন করিয়া দশ তারিখ ভোরে মিনায় প্রত্যাবর্তন করিবে।

৮৬৩। **হাদীছঃ**—জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ) তাঁহার ইসলাম-পূর্ব ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইসলাম-পূর্বকালে একবার আমার একটি উট হারাইয়া গেলে উহার তালাশে আমি আরফার ময়দানে পৌছিয়া ছিলাম; তখন হজ্জের দিন। আমি দেখিলাম, নবী (দঃ) আরফায় অবস্থানরত; আমি ভাবিলাম, এই ব্যক্তি ত কোরায়েশ বংশের—তিনি কেন এখানে আসিয়াছেন?

ব্যাখ্যাঃ—নবী (দঃ) নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে অন্যান্যদের ন্যায় হজ্জ করিয়াছেন; তখনও তিনি এই সত্যটি পালন করিয়াছেন যে, কোরায়েশ বংশ সহ প্রত্যেক হাজী আরফার ময়দানে অবশ্যই যাইবে। নবুওতের পূর্বে নবী (দঃ) এই একটি সাধারণ ব্যাপারেও কাফেরদের গর্হিত নীতির বিরুদ্ধে সত্যকে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

আরফা হইতে মোযদালেফা যাত্রা

৮৬৪। **হাদীছঃ**—উসামা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জে আরফা হইতে মোযদালেফায় প্রত্যাবর্তনে কিরূপ চলনে চলিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, সাধারণ দ্রুত চলনে। আর পথ ফাঁকা পাইলে অধিক দ্রুত চলিয়াছেন;

আরফা-মোযদালেফার পথিমধ্যে প্রয়োজনে অবতরণ করা

৮৬৫। হাদীছ ঃ—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরফা হইতে মোযদালেফা যাওয়া কালে পথিমধ্যে পাহাড়ের সেই বাঁকে যাইতেন যথায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রস্রাব ত্যাগে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় যাইয়া প্রস্রাব করিতেন এবং অজু করিতেন, কিন্তু নামায পড়িতেন না ; মগরেব নামায মোযদালেফায় পৌছিয়া পড়িতেন।

আরফা হইতে মোযদালেফার পথে শান্তি শৃঙ্খলার সহিত চলিবে

৮৬৬। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জে আরফা হইতে মোযদালেফায় আসার পথে তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। নবী (দঃ) পেছন দিকে উট দৌড়াইবার হাঁকাহাঁকি ও পিটাপিটির শব্দ শুনিতে পাইয়া চাবুক হস্তে ইশারা করতঃ লোকদিগকে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে আদেশ করিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, হে লোক সকল! শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা তোমাদের বিশেষ কর্তব্য ; উট দ্রুত হাঁকাইবার মধ্যে কোন ছওয়াব ও পূণ্য নাই।

মোযদালেফায় নামাযের সময়

মছআলাহ ঃ- সূর্য্যাস্তের পর আরফা হইতে মোযদালেফা যাওয়ার জন্য রওয়ানা হইতে হয় এবং মগরেবের নামাযের সাধারণ ওয়াক্ত হইয়া যায়, কিন্তু ঐ দিন মগরেবের নামাযের ওয়াক্ত মোযদালেফায় পৌঁছার পর এশার নামাযের সহিত একই সঙ্গে হইয়া থাকে। অতএব মগরেবের নামাযের নিয়মিত ওয়াক্তে অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের পরেই আরফার ময়দানে বা পথিমধ্যে মগরেবের নামায পড়িলে তাহা শুদ্ধ হইবে না। কারণ, এরূপ করিলে মগরেবের নামায ঐ দিনের জন্য নির্দিষ্ট ওয়াক্তের পূর্বে পড়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। এ সম্পর্কে প্রথম খণ্ডের ১১০নং হাদীছ অতি সুস্পষ্ট, যাহা এখানেও উল্লেখ আছে।

৮৬৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোযদালেফায় মগরেব ও এশার নামাযদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন একামত দ্বারা একই ওয়াক্তে পড়িয়াছেন এবং উভয় নামাযের মধ্যবর্তী বা শেষে কোন (ছুন্নত বা নফল) নামায পড়েন নাই।

৮৬৮। হাদীছ ঃ—আবু আইউব আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জে (আরফার দিন) মগরেবের ও এশার নামাযদ্বয় একত্রে এশার সময়ে মোযদালেফায় পড়িয়াছেন।

মছআলাহ ঃ- মোযদালেফায় মগরেব ও এশার নামায একত্রে পড়িবে। এমনকি, অনাবশ্যক কোন কাজে লিপ্ত হইয়া উভয় নামাযের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিবে না এবং সেই ক্ষেত্রে উভয় নামাযের জন্য আজান একবারই দিতে হইবে। অবশ্য একামত ভিন্ন ভিন্ন বলিবে এবং মধ্যস্থলে কোনরূপ ছুন্নতও পড়া হইবে না।

মোযদালেফায় শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার প্রতি বিশেষ তৎপর হওয়া চাই। এমতাবস্থায় বেতের নামায ইত্যাদি শেষ রাত্রেই আদায় করিবে। এশার নামাযের পর নফল, বেতের ইত্যাদি নামাযে লিপ্ত হওয়ার আবশ্যক হয় না, বরং এশার নামাযান্তে যথা সত্বর একটু আরাম করার ব্যবস্থা করিবে, যেন শেষ রাত্রে বিশেষরূপে তাহাজ্জুদ নামায, দোয়া, এসতেগফার, তলবিয়া, তাকবীরে-তশরীক ইত্যাদি পড়া সহজসাধ্য হয় এবং বেতের নামাযও তখনই পড়িবে। এমনকি, ঐ অবস্থায় মুসাফির হওয়ার দরুণ মগরেব ও এশার ছুন্নত তখন ছুন্নতে-মোয়াক্কাদা থাকে না বলিয়া শেষ রাত্রে বেশী এবাদতের আশায় এশার নামাযের পর দ্রুত আরাম করার উদ্দেশ্যে ঐ ছুন্নত সঙ্গে সঙ্গে না পড়িলেও দোষ নাই।

কিন্তু শেষ রাত্রে উঠিয়া এবাদৎ করার ভরসা না থাকিলে মগরেব ও এশার ছুন্নত এশার ফরজের পরেই পড়িবে (অবশ্য উহা না পড়িলেও চলিবে) এবং তৎপর বেতের নামায পড়িবে।

৮৬৯। **হাদীছ** :—আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) একবার হজ্জ করিলেন, আমরা তাহার সঙ্গে ছিলাম। আমরা আরফা হইতে মোযদালেফায় এমন সময় পৌঁছিলাম, যখন এশার নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি এক ব্যক্তিকে আজান দিতে বলিলেন। সে আজান দিল, তৎপর একামত বলিল। তখন তিনি মগরেবের নামায পড়িলেন, তৎসঙ্গে দুই রাকাত ছুন্নতও পড়িলেন। অতঃপর খাওয়া-দাওয়া করিলেন। তৎপর পুনরায় এক ব্যক্তিকে আজান দিতে আদেশ করিলেন। সে ব্যক্তি আজান দিয়া একামত বলিল, তিনি এশার নামায (কছর) দুই রাকাত পড়িলেন।

রাত্রি শেষে ছোবেহ-ছাদেক উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এমনকি কেহ বলিতেছিল, ছোবেহ-ছাদেক উদিত হইয়াছে; কেহ বলিতেছিল, উদিত হয় নাই। (অর্থাৎ ফজরের নামাযের একেবারে আউয়াল ওয়াক্তে—যখন যথেষ্ট অন্ধকার থাকিয়া যায়,) তখন তিনি বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সাধারণতঃ ফজরের নামায এরূপ আউয়াল ওয়াক্তে পড়িতেন না, * কিন্তু এই দিন এই স্থানে ফজরের নামায এই সময়েই পড়িয়াছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) অতঃপর বলিলেন, কেবলমাত্র এই মোযদালেফার মধ্যেই দুই ওয়াক্ত নামায নিয়মিত সাধারণ সময় হইতে ব্যতিক্রম করিয়া পড়া হয়। প্রথম—মগরেবের নামায; উহাকে উহার আসল ওয়াক্ত সূর্য্যাস্তের সংলগ্ন সময় হইতে সরাইয়া এশার নামাযের সময়ে পড়া হয়। দ্বিতীয়—ফজরের নামায; উহাকে সাধারণ মোস্তাহাব ওয়াক্ত তথা ছোবেহ-ছাদেকের পর আলো আসার পূর্বে অন্ধকার থাকিতেই পড়া হয়। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এইরূপই করিতে দেখিয়াছি।

* কারণ ছোবহে-ছাদেক উদিত হওয়ার পর সূর্যোদয়ের পূর্বে অন্ধকার যাইয়া আলো আসিলে পর সাধারণতঃ ফজরের নামাযের মোস্তাহাব ওয়াক্ত হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) আরও বর্ণনা করিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এই স্থানে (অর্থাৎ ৯ই জিলহজ্জ দিবাগত রাত্রে হাজীদের জন্য মোযদালেফায়) একই সময় দুইটি নামাযকে উহার নিয়মিত সাধারণ ওয়াক্ত হইতে সরানো হইয়াছে। মগরেবের নামায যাহা এশার সময় পড়া হয়; লোকগণ মোযদালেফায় এশার সময়ই পৌঁছিয়া থাকে। আর ফজরের নামায যাহা এই সময় (ছোবেহ-ছাদেক উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলো হইবার পূর্বে অন্ধকারের মধ্যে) পড়া হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ফজর নামাযান্তে "ওকুফ" করিলেন—অর্থাৎ মোযদালেফায় অবস্থানের মূল কার্য্য—নির্ধারিত সময় তথা ছোবেহ-ছাদেক উদিত হওয়ার পর দোয়া-এস্তেগফারে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং পূর্ণরূপে আলো হওয়া পর্য্যন্ত উহাতে রত রহিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমীরুল-মোমেনীন এখন (অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্বে) মিনা যাত্রা করিলে নিয়মিত ছুন্নত সঠিকরূপে পালনকারী হইবেন। তিনি যখন এই কথা বলিতে ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তেই—যেন উহারও পূর্বক্ষণে আমীরুল-মোমেনীন ওসমান (রাঃ) মিনার দিকে যাত্রা করিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ১০ তারিখে জামরা-আকাবায় কঙ্কর মারা পর্য্যন্ত তলবিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন।

মছআলাহ ঃ—মোযদালেফায় অবস্থানের ওয়াজেব আদায়ের নির্ধারিত সময় ছোবেহ-ছাদেক উদিত হওয়ার পর হইতে আরম্ভ হয় এবং ছোবেহ-ছাদেকের আলো পূর্ণতা লাভ করিলে, কিন্তু সূর্য্য উদিত হওয়ার পূর্বে মোযদালেফা হইতে মিনার দিকে যাত্রা করিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ—বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ যদি মোযদালেফায় মগরেব ও এশার নামাযদ্বয়ের মধ্যস্থলে কোন কার্য্যে লিপ্ত হইতে হয় যদ্দরুণ মগরেবের নামায পড়ার পর এশার নামায পড়িতে কিছুটা বিলম্ব ঘটিবে, এমতাবস্থায় উভয় নামাযের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আজান একামত বলায় এবং মগরেবের ছুন্নত উহার ফরজের সংলগ্ন পড়ায় কোনও দোষ হইবে না।

মোযদালেফা হইতে মিনা রওয়ানা হওয়ার সময়

৮৭০। হাদীছ ঃ—আমর ইবনে মায়মুন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার হজ্জের সময় আমি ওমর (রাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। আমি দেখিয়াছি, তিনি মোযদালেফায় আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়ার পর অপেক্ষা করিলেন এবং বলিলেন, অন্ধকার যুগে কাফের-মোশরেকরা এই রীতিতে হজ্জ করিত যে, তাহারা মোযদালেফা হইতে মিনার দিকে সূর্য্য উদয়ের পূর্বে যাত্রা করিত না। তাহারা "ছবীর" নামক পাহাড়ের উপর সূর্য্যের কিরণ দৃষ্ট হওয়ার অপেক্ষায় থাকিত। কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রীতি তাহাদের রীতির বিপরীত ছিল। এই বলিয়া ওমর (রাঃ) সূর্যোদয়ের পূর্বেই মোযদালেফা হইতে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। ২২৮ পৃঃ

৮৭১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে (নারী এবং অল্প বয়স্ক ইত্যাদি দুর্বল লোকদের সঙ্গে) রাত্রি বেলায়ই মোযদালেফা হইতে মিনা পাঠাইয়াছিলেন।

৮৭২। হাদীছ ঃ—আসমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার খাদেম আবদুল্লাহ বর্ণনা করিয়াছেন, আসমা (রাঃ) মোযদালেফায় অবস্থান করাকালীন রাত্রে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন চন্দ্র অস্তমিত হইয়াছে কি? আমি বলিলাম—না। তিনি পুনরায় নামায আরম্ভ করিলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্র অস্তমিত হইয়াছে কি? আমি বলিলাম—হাঁ! তিনি বলিলেন, এখনই মিনার দিকে রওয়ানা হও। আমি তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করিলাম এবং আমরা মিনায় পৌছিয়া "জাম্‌রা আকাবায়" কঙ্কর মারা সম্পন্ন করিলাম। অতঃপর তিনি তাঁবুতে আসিয়া ফজরের নামায পড়িলেন। আমি বলিলাম, আমার মনে হয় নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্বেই আমরা মোযদালেফা হইতে আসিয়াছি এবং কংকর মারিয়াছি; তিনি বলিলেন, হে বৎস! রসুলুল্লাহ (দঃ) নারীদের জন্য এরূপ করার অনুমতি দান করিয়াছেন।

৮৭৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায়-হজ্জে) আমরা মোযদালেফায় অবস্থানরত হইলে পর (হযরতের বিবি) ছওদা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন—লোকজনের ভিড় হওয়ার পূর্বে রাত্রেই মোযদালেফা হইতে মিনায় চলিয়া আসার জন্য। কারণ, ছওদা (রাঃ) অপেক্ষাকৃত মোটা শরীর বিশিষ্টা ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে অনুমতি দিলেন; তিনি ভিড়ের পূর্বে রাত্রেই চলিয়া আসিলেন। আমরা মোযদালেফায় থাকিলাম; ফজরের নামাযের পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আসিলাম। আমরা ভিড়ের দরুণ বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইলাম এবং উপলব্ধি করিলাম যে, আমিও যদি ছওদা (রাঃ)-এর ন্যায় অনুমতি প্রার্থনা করিতাম তবে আমার জন্য উত্তম ও শ্রেয়ঃ ছিল।

মছআলাহ ঃ—ওকুফে-মোযদালেফা ওয়াজেব এবং সেই ওয়াজেব আদায় হওয়ার জন্য নির্দ্ধারিত সময় হইল ছোবেহ-ছাদেক হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত। সমস্ত রাত্রি মোযদালেফায় অবস্থান করিয়া ছোবেহ-ছাদেকের পূর্বে তথা হইতে চলিয়া আসিলে সেই ওয়াজেব আদায় হইবে না। তাই ওয়াজেব আদায় করার জন্য হইলেও মোযদালেফায় অবস্থান করিতে হইবে। অতএব, ছোবেহ-ছাদেকের পূর্বে মোযদালেফা হইতে কিছুতেই আসা যাইবে না, অন্যথায় ওয়াজেব আদায় হইবে না। কিন্তু নারী, নাবালেগ, বৃদ্ধ, রোগী ইত্যাদি দুর্বল ব্যক্তিগণ ভিড় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মোযদালেফায় অবস্থান পূর্বক তথা হইতে ছোবেহ-ছাদেকের পূর্বে চলিয়া আসিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই কংকর মারার কাজ সম্পন্ন করিয়া লইলে তাহাদের জন্য ওয়াজেব আদায় হইয়া যাইবে। অবশ্য তাহাদের জন্যও সূর্য্যোদয়ের

পর কংকর মারা উত্তম; আর তাহাদিগকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মিনায় পৌঁছিয়া কংকর মারা যেন ছোবেহ-ছাদেকের মুহূর্ত পূর্বেও অনুষ্ঠিত না হয়। কারণ দশ তারিখে কংকর মারা যে ওয়াজেব উহা আদায় হওয়ার নির্দ্ধারিত সময় হইল সূর্য্যোদয়ের পরে। অবশ্য দুর্বলদের জন্য সূর্য্যোদয়ের পূর্বে উহা আদায় করার অনুমতি আছে, কিন্তু ছোবেহ-ছাদেকের পূর্বে কংকর মারিলে তাহা বাতিল গণ্য হইবে।

৮৭৪। হাদীছঃ—সালেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁহার পরিবারের দুর্বল লোকদিগকে আগে রাখিতেন। তাহারা নয় তারিখ দিবাগত রাত্রে মোযদালেফায় মাশয়ারুল-হারাম নামক পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিয়া নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লার জিকর করিত। অতঃপর তথায় রাষ্ট্রিয় প্রতিনিধি আসিবার পূর্বে এবং মিনার দিকে তাঁহার যাত্রা করার পূর্বে ঐ দুর্বল লোকগণ মিনার দিকে যাত্রা করিত। তাহাদের কেহ ফজর নামাযের সময় মিনায় পৌঁছিত কেহ আরও একটু পরে পৌঁছিত। তাহারা মিনায় পৌঁছিয়াই জামরা আকাবায় কংকর মারিত। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁহার পরিবারের দুর্বলদের ব্যাপারে এই ব্যবস্থা করিয়া বলিতেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সব বিষয়ে অনুমতি দিয়াছেন। (২২৭ পৃঃ)

তামাত্তো' হজ্জ

সাধারণতঃ তামাত্তো'-হজ্জে মক্কা শরীফ উপস্থিত হইয়া ওমরার সংক্ষিপ্ত কার্য্য আদায় করতঃ এহরাম ভঙ্গ করা হয়। এই এহরাম ভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া অনেকে তামাত্তো'-হজ্জের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু তাহা অবাস্তব—ইহাই নিম্নের হাদীছে ব্যক্ত করা হইতেছে।

৮৭৫। হাদীছঃ—আবু জামরা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি তামাত্তো'-হজ্জ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে ঐ হজ্জ করার আদেশ করিলেন। তামাত্তো'-হজ্জে একটি কোরবাণী করিতে হইবে বলিয়া কোরআন শরীফের আয়াতে উল্লেখ আছে (২ পাঃ ৮ রুঃ দ্রষ্টব্য); আমি তাঁহাকে সেই কোরবাণী সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, একটি উট বা গরু বা বকরী কিম্বা উট-গরুর সপ্তম অংশ। (ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আদেশ মতে আমি তামাত্তো'-হজ্জ করিলে) কিছু সংখ্যক লোক উহা নাপছন্দ করিল। আমি স্বপ্নে দেখিলাম, এক ব্যক্তি আমাকে বলিতেছে, হজ্জও কবুল এবং তৎসঙ্গের ওমরাও কবুল (অর্থাৎ তামাত্তো-হজ্জ কবুল হইয়াছে।) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইয়া আমি তাঁহার নিকট আমার স্বপ্ন ব্যক্ত করিলাম। তিনি আনন্দে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলেন এবং বলিলেন, তামাত্তো'-হজ্জ আবুল কাসেম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামেরই ছুন্নত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে তাঁহার অতিথি হওয়ার জন্য বলিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাকে আমার নিজস্ব মাল হইতে পুরস্কার দিব। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? তিনি বলিলেন, ঐ স্বপ্নের দরুণ যাহা তুমি দেখিয়াছ।

ব্যাখ্যা ঃ—বিদায়-হজ্জে নবী (দঃ) নিজে হজ্জে-কেরাণ করিয়াছিলেন, সাথীদের মধ্যে যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল না তাহাদের হজ্জ তামাত্তো-হজ্জ করার আদেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং তামাত্তো'-হজ্জ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছুন্নত এবং ইহা হজ্জে-এফরাদ তথা শুধু হজ্জ হইতে উত্তম। এই একটি সুন্নতের প্রতি লোকদের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়াছিল। উল্লিখিত ঘটনায় স্বপ্নের দৈব বাণীতে ছুন্নতটির বিরুদ্ধে বিভ্রান্তির খণ্ডন হইয়াছে, তাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এত আনন্দিত। ছাহাবীদের নিকট ছুন্নতের মর্য্যাদা কিরূপ ছিল তাহা লক্ষণীয়!

কোরবাণীর উট সঙ্গে লইলে প্রয়োজনে আরোহণ করা

৮৭৬। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন, (সে অতি কষ্টে হাটিয়া চলিতেছে, অথচ) তাহার সঙ্গে হরম শরীফে কোরবাণী দেওয়ার নিয়্যতে একটি উট রহিয়াছে। রসুলুল্লাহ(দঃ) তাহাকে উহার উপর আরোহণের আদেশ করিলেন। সে বলিল—ইহাত কোরবানীর জানোয়ার! রসুলুল্লাহ (দঃ) পুনরায় তাহাকে উহাই বলিলেন। তৃতীয়বার ক্রোধ স্বরে বলিলেন, আরোহণ কর।

৮৭৭। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে কোরবাণীর উট হাকাইয়া চলিয়াছে; (আর সে অতি কষ্টের সহিত পায়ে হাটিতেছে; উটটির উপর আরোহণ করে না।) নবী (দঃ) তাহাকে বলিলেন, উটটির উপর আরোহণ কর। সে বলিল, ইহাত কোরবাণীর জন্য! নবী (দঃ) বলিলেন, উহার উপর আরোহণ কর—এইরূপে তিনবার বলিলেন।

মক্কায় প্রেরিত কোরবাণীর জানোয়ার চিহ্নিত করা এবং অন্যের সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া

৮৭৮। **হাদীছ ঃ**—মেছওয়ার (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (ষষ্ঠ হিজরী সনে) ওমরা করার উদ্দেশ্যে প্রায় দেড় হাজার ছাহাবীগণকে লইয়া মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জুল-হোলায়ফা নামক স্থানে পৌছিয়া নিজের সঙ্গে পরিচালিত কোরবাণীর জানোয়ার সমূহের গলায় নিদর্শনরূপে মালা লটকাইয়া দিলেন এবং উহাদের পিঠের কুজের এক পার্শ্বের চামড়া চিরিয়া চিহ্নিত করিয়া দিলেন। অতঃপর ওমরার এহরাম বাঁধিলেন।

৮৭৯। **হাদীছ ঃ**—গভর্ণর যেয়াদ আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যের সঙ্গে কোরবাণীর পশু মক্কা শরীফে কোরবানী করার জন্য পাঠাইয়া দেয় উক্ত পশু কোরবাণী না হওয়া পর্য্যন্ত

ঐ ব্যক্তির উপর ঐ সব কার্য্য হারাম থাকে যাহা হাজীদের উপর এহরাম অবস্থায় হারাম হয়। এই কথার প্রতিবাদে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্ত্তৃক মক্কায় প্রেরিত কোরবাণীর জানোয়ার সমূহের গলার মালা দিবার জন্য আমি নিজ হস্তে দড়ি পাকাইয়া দিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ দড়ি দ্বারা স্বয়ং উহাদের গলায় মালা বানাইয়া দিয়াছেন এবং আমার পিতা আবু বকরের সঙ্গে ঐ সব জানোয়ার মক্কায় প্রেরণ করিয়াছেন। (ইহা নবম হিজরী সনের ঘটনা) রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনাতেই অবস্থান করিয়াছেন এবং এহরাম অবস্থায় নয়, বরং সাধারনরূপে অবস্থান করিয়াছেন—কোরবাণীর জানোয়ার মক্কায় প্রেরণের দরুণ কোন রকমের বাছ-বিচার মোটেই করেন নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রাচীনকাল হইতেই এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, শত দুষ্ট প্রকৃতির লোক হইলেও সে মক্কায় প্রেরিত কোরবাণীর জানোয়ার সমূহকে আক্রমণ করিত না, এমনকি উহাদের সঙ্গী রক্ষণাবেক্ষণকারীকেও কোন প্রকার কষ্ট দিত না। এই সুফল লাভের জন্য প্রত্যেকেই ঐরূপ জানোয়ারকে দেশ প্রথানুযায়ী নিদর্শনযুক্ত করিয়া লইত, যাহাতে সকলেই সহজে উহার পরিচয় পাইতে পারে। মালা দেওয়া হইলে পুরাতন জুতার চামড়া ইত্যাদি অতি মামুলী বস্তুর মালা দেওয়া হইত; কারণ উহা শুধু নিদর্শনরূপেই ব্যবহৃত হইত।

কোরবাণীর জানোয়ার-সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি খয়রাত করা

৮৮০। হাদীছ ঃ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে আদেশ করিয়াছেন—যে সব উট তিনি হজ্জ উপলক্ষে কোরবাণী করিয়াছিলেন উহাদের চামড়া এবং জুল্ (ঘোড়া, উট ইত্যাদির পিঠের উপর আবরণের জন্য চাদররূপে যে বস্ত্র বা কম্বল দেওয়া হয়—ঐ সব) খয়রাত করিয়া দিবার জন্য।

স্ত্রীর পক্ষে স্বামী কর্ত্তৃক কোরবাণী করা

৮৮১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, জি-কা'দা চান্দের পাঁচ দিন বাকী থাকিতে আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হজ্জের জন্য যাত্রা করিয়াছিলাম। হজ্জ সমাপনান্তে দশই জিলহজ্জ কোরবাণীর দিন আমার নিকট গোশত উপস্থিত করা হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই গোশত কিসের? গোশত উপস্থিতকারী ব্যক্তি বলিল, রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় বিবিগণের পক্ষ হইতে গরু কোরবাণী করিয়াছেন, ইহা উহারই গোশত।

মছআলাহ ঃ—স্ত্রীর উপর যদি কোরবাণী ওয়াজেব থাকে এবং স্বামী সেই কোরবাণী দেয়—এরূপ ক্ষেত্রে যদি স্ত্রীর সহিত তাহার কোরবাণী দেওয়া সম্পর্কে কথাবার্তা পূর্বেই সাব্যস্ত করিয়া নিয়া থাকে তবে স্ত্রীর কোরবাণী আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি পূর্বে কথা সাব্যস্ত না করিয়া স্ত্রীর কোরবাণী দেয় তবে সেই কোরবাণী স্ত্রীর পক্ষে আদায় হওয়া

সম্পর্কে মতভেদ আছে; ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) বলিয়াছেন, সেই কোরবাণী আদায় হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ যদি স্ত্রীর কোরবাণী স্বামী কর্তৃক আদায় করার নিয়ম উভয়ের মধ্যে প্রচলিত হয় তবে ত যুক্তিযুক্তরূপেই তাহা আদায় হইয়া যাইবে (শামী, ৪—২৭৫)।

অবশ্য পূর্বাহ্নে স্ত্রীর সহিত কথাবার্তা সাব্যস্ত করিয়া তারপর তাহার কোরবাণী আদায় করাই কর্তব্য। কারণ, অধিকাংশ ইমামগণের মতে পূর্বাহ্নে কথা সাব্যস্ত করা ব্যতিরেকে স্ত্রীর কোরবাণী আদায় হইবে না, বরং সে ক্ষেত্রে অন্য শরীকদেরও কোরবাণী শুদ্ধ হইবে না।

প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের উপর ওয়াজেব কোরবাণী পিতা কর্তৃক আদায় করিয়া দেওয়ার মাছআলাহও এইরূপই।

হাজীদের কোরবাণী মিনায় হইবে

৮৮২। হাদীছ ঃ—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোরবাণী করার স্থানে কোরবাণী করিতেন।

৮৮৩। হাদীছ ঃ—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্বীয় কোরবাণীর পশু মোযদালেফা হইতে শেষ রাত্রে অন্য হাজীদের সহিত পাঠাইয়া দিতেন; সেই পশু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোরবাণী করার স্থানে পৌছানো হইত।

ব্যাখ্যা ঃ—মোযদালেফা হইতে যাত্রা করার নির্দ্ধারিত সময় হইল রাত্রি শেষ হইয়া ছোবহে-ছাদেক হওয়ার পর। অবশ্য মহিলা, বৃদ্ধ ও দুর্বলদের জন্য উহার পূর্বে রাত্র থাকিতেই মোযদালেফা হইতে যাত্রা করা জায়েয। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ শ্রেণীর লোকদের সহিত স্বীয় কোরবাণীর পশু মোযদালেফা হইতে রাত্রেই পাঠাইয়া দিতেন। কারণ, তিনি নিজে নির্দ্ধারিত সময় ছোবেহ-ছাদেকের পরে আসিবেন; তখন অধিক ভিড়ের দরুণ পশু লইয়া চলা কঠিন হইবে।

● হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোরবাণী করার স্থান হইল জামরা-আকাবাহ তথা ১০ই জিলহজ্জ তারিখে সর্বপ্রথম কংকর মারার স্থানের নিকটবর্তী। সেই নির্দিষ্ট স্থানে কোরবাণী করা উত্তম বটে যাহা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) করিতেন, কিন্তু মিনার যে কোন স্থানে কোরবাণী করিলেই সুন্নত আদায় হইবে (শামী, ২—৩৪৪)।

নিজ হস্তে কোরবাণীর জানোয়ার জবেহ করা

৮৮৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিজ হস্তে সাতটি * উট কোরবাণী করিয়াছেন। প্রতিটি উটকে দাঁড়ান অবস্থায় উহার

---

* হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায় হজ্জে একশত উট কোরবাণী করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৬৩টি নিজ হস্তে জবেহ করিয়াছিলেন। আলোচ্য হাদীছে সাতটির উল্লেখ রহিয়াছে উহা বর্ণনাকারীর উপস্থিতি ও চাক্ষুষ দর্শন অনুসারে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

গলার তলদেশে ছুরি বিদ্ধ করিয়াছেন। (এই ব্যবস্থাকে "নহ'র" বলা হয়; উট জবেহ করার এই ব্যবস্থাই ছুন্নত।) এতদভিন্ন (মদীনা শরীফে হযরত (দঃ) এক সময় যে) দুইটি হৃষ্ট-পুষ্ট সুন্দর দুম্বা কোরবাণী করিয়াছিলেন, তাহাও নিজ হস্তে জবেহ করিয়াছিলেন।

৮৮৫। হাদীছ ঃ—যিয়াদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে একটি উটকে বসাইয়া উহার তলদেশে ছুরি বিদ্ধ করিতেছে। ইবনে ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, উটটিকে দাড় করাও এবং উহার বাম পাওটি মুড়িয়া বাঁধিয়া দাও, তৎপর উহার গলদেশে ছুরি বিদ্ধ কর; ইহাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুন্নত।

ব্যাখ্যা ঃ—গরু, ছাগল, পশু-পক্ষী ইত্যাদি জবেহ করার নিয়ম সর্বসাধারণ্যে প্রসিদ্ধ আছে। উট ব্যতীত সমস্ত জীবকে ঐরূপেই জবেহ করা চাই। উল্লিখিত হাদীছে যে ব্যবস্থা বর্ণিত হইল তাহা একমাত্র উটের জন্য উত্তম।

কোরবাণীর জানোয়ারের কোন অংশ কসাইকে দিবে না

৮৮৬। হাদীছ ঃ— আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে তাঁহার কোরবাণীর জানোয়ার সমূহের সুব্যবস্থা করার জন্য পাঠাইলেন। আমি তাঁহার আদেশানুসারে গোশতসমূহ বন্টন করিলাম এবং ঐ জানোয়ারগুলির চামড়া এবং উহাদের পিঠের উপর আবরণস্বরূপ ব্যবহার্য্য কম্বল বা কাপড়গুলিকেও দান করিয়া দিলাম। তিনি আমাকে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, কসাইকে যেন (তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ) উহা হইতে কোন অংশ দেওয়া না হয়।

ব্যাখ্যা ঃ— চুক্তি বা দেশ-প্রথারূপে কসাইকে বা যে কোন পরিশ্রমীকে তাহার পারিশ্রমিক কোরবাণীর জানোয়ার হইতে দেওয়া জায়েয নহে। অবশ্য তাহার পারিশ্রমিক ভিন্নরূপে আদায় করিয়া একজন মোসলমান ভাই হিসাবে অন্যান্যের ন্যায় তাহাকেও খাইবার জন্য গোশত দান করা জায়েয আছে।

৮৮৭। হাদীছ ঃ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায় হজ্জে) এক শতটি উট কোরবাণী দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন এবং আমাকে উহার গোশত বন্টনের আদেশ করিলেন। আমি সমুদয় গোশত বন্টন করিয়া দিলাম; উহাদের পিঠের উপরে ব্যবহৃত জুলও (গরীবদের মধ্যে) বন্টনের আদেশ করিলেন। আমি তাহাই করিলাম; উহার চামড়াগুলিও বন্টন করার আদেশ করিলেন আমি তাহাও বন্টন করিয়া দিলাম।

যে কোরবাণীর গোশত কোরবাণীদাতা খাইতে পারে

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তিনি বলিয়াছেন, (এহরাম অবস্থায় কোন বন্য পশু-পক্ষী বধ করা হারাম, তাহা করিলে শাস্তি ভোগ স্বরূপ) বধকৃত

জানোয়ার অনুপাতে কোরবাণী দেওয়া ওয়াজেব হয়; সেই কোরবাণীর গোশত, (তদ্রূপ এহরাম অবস্থায় নিয়ম-কানুন প্রতিপালনে ব্যতিক্রম হইলেও নির্দ্ধারিত বিধান অনুসারে কোরবাণী ওয়াজেব হয় এবং হজ্জের নিয়মাবলীর মধ্যে ক্রটি-বিচ্যুতির জন্যও কোরবাণী ওয়াজেব হইয়া থাকে। এই সব কোরবাণী) এবং নজর বা মান্নতকৃত কোরবাণীর গোশত কোরবাণীদাতা খাইতে পারিবে না। সাধারণ নিয়মিত কোরবাণীর গোশত সে খাইতে পারিবে।

আতা (রঃ) বলিয়াছেন, তামাত্তো' বা কেরাণ হজ্জে যে কোরবাণী করা ওয়াজেব হয় উহার গোশত কোরবাণীদাতা খাইতে পারে।

১০ই জিলহজ্জের ৪টি আমলের মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ করা

৮৮৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, আমি (১০ তারিখে কংকর মারার পূর্বেই "তওয়াফে-যিয়ারত" করিয়া ফেলিয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, তাহাতে কোন গোনাহ হইবে না। সে বলিল, কোরবাণী দেওয়ার পূর্বে চুল ফেলিয়া দিয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, তজ্জন্যও কোন গোনাহ হইবে না। সে বলিল, (১০ তারিখে) কংকর মারার পূর্বেই কোরবাণী করিয়া ফেলিয়াছি! নবী (দঃ) বলিলেন, তাহাতেও কোন গোনাহ হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—১০ই জিলহজ্জ একের পর এক ৪টি আমল করিতে হয়—(১) কংকর মারা (২) কোরবাণী করা (৩) মাথা মুণ্ডান (৪) তওয়াফে-যিয়ারত করা। এই তরতীবের খেলাফ অজানাভাবে অথবা ভুলক্রমে অগ্র-পশ্চাৎ করার দরুণ কোনও গোনাহ হইবে না বটে, কিন্তু হানাফী মজহাব মতে আসল নিয়মের ব্যতিক্রম করার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি জানোয়ার কোরবাণী করিতে হইবে।

এহরাম খুলিবার সময় মাথা মুড়াইয়া ফেলা

৮৮৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জকালীন (১০ তারিখে এহরাম খোলার সময়) মাথা মুড়াইয়া ফেলিয়া ছিলেন এবং ছাহাবীদের মধ্যেও অনেকেই মাথা মুড়াইয়া ছিলেন। কিছু সংখ্যক লোক চুল কাটিয়া ছিল।

৮৯০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দোয়া করিয়াছেন, হে আল্লাহ! যাহারা (হজ্জের এহরাম খুলিতে) মাথা মুড়াইয়া ফেলে তাহাদের প্রতি রহম কর। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, যাহারা চুল কাটে তাহাদিগকেও দোয়ায় শামিল করুন! দ্বিতীয়বারও হযরত (দঃ) এই দোয়াই করিলেন, হে আল্লাহ! যাহারা মাথা কামাইয়া ফেলে তাহাদের প্রতি রহম কর। ছাহাবীগণ এইবারও আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। যাহারা চুল কাটে তাহাদিগকেও শামিল করুন। তৃতীয় বা চতুর্থবারে হযরত (দঃ) বলিলেন, যাহারা চুল কাটে তাহাদিগকেও।

৮৯১। **হাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দোয়া করিলেন—اللهم اغفر للمحلقين "হে আল্লাহ হজ্জ উপলক্ষে যাহারা মাথা মুড়াইয়া ফেলে তাহাদের সমুদয় গোনাহ মাফ করিয়া দিন।" ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, যাহারা চুল কাটে তাহাদিগকেও দোয়ার মধ্যে শামিল করুন! দ্বিতীয়বারও হযরত (দঃ) ঐরূপ দোয়াই করিলেন—হে আল্লাহ! যাহারা মাথা মুড়াইয়া ফেলে তাহাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিন। ছাহাবীগণ এইবারও আরজ করিলেন, যাহারা চুল কাটে তাহাদেরেও শামিল করুন। তৃতীয়বারের পর রসুলুল্লাহ (দঃ) وللمقصرين "এবং যাহারা চুলের কিছু অংশ কাটিয়া ফেলে তাহাদের গোনাহ সমূহও মাফ করিয়া দিন" এই বলিয়া উভয়কেই দোয়ার মধ্যে শামিল করিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—এই হাদীছ দ্বারা হজ্জ উপলক্ষে পুরুষের জন্য মাথা মুড়াইয়া ফেলার ফজিলত প্রমাণিত হইল। মাথা মুড়াইয়া ফেলিলে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিন বা চারবারের দোয়া লাভ হইবে। যে ব্যক্তি চুলের শুধু কিছু অংশ কাটিবে সে মাত্র একবারের দোয়া লাভ করিবে। মহিলাদের মাথা মুড়ানো নিষিদ্ধ। তাহারা চুলের মাথা কর্তন করিবে—এত গুলি চুলের মাথা যাহা পূর্ণ মাথার চুলের অন্ততঃ চতুর্থাংশ হয়।

৮৯২। **হাদীছ**ঃ—মোয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (একবার ওমরার এহরাম খোলাকালে) আমি ধারাল লৌহ-ফলক দ্বারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চুল কাটিয়া দিয়াছিলাম।

মছআলাহঃ—চুল যদি কাটা হয় তবে অন্ততঃ মাথার চতুর্থাংশ পরিমাণের চুলের আগা সুস্পষ্ট পরিমাণে কাটা ওয়াজেব। (শামী, ২—২৪৮)

মছআলাহঃ—১০ই জিলহজ্জ দিনে জামরা-আকাবায় কংকর মারা এবং কোরবাণী করা এবং চুল কাটিয়া এহরাম খোলার পর মিনার মধ্যে কাজ থাকে শুধু ১১ই তারিখে তিনটি জামরায় কংকর মারা এবং ১২ই তারিখেও তিনটি জামরায় কংকর মারা। সেই কংকর মারার সময় হইল দিনে; তবুও মধ্যবর্তী দুইটি রাত্র মিনাতেই অবস্থান করিতে হইবে। রাত্রে অন্যত্র থাকিয়া দিনের বেলা আসিয়া কংকর মারার কাজ সমাধা করা ইহা নিয়ম বিরোধী কাজ; অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে তাহা করা যাইতে পারে।

কঙ্কর নিক্ষেপ করার বিভিন্ন মছআলাহ

৮৯৩। **হাদীছ**ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ১০ই জিলহজ্জ কোরবাণীর দিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের এক প্রহর বেলার পর কংকর মারিয়াছেন এবং অবশিষ্ট কয়দিন দ্বিপ্রহরের সূর্য্য মধ্য আকাশ অতিক্রম করার পর কংকর মারিয়াছেন!

৮৯৪। **হাদীছ**ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল (১০ই তারিখের পর) কংকর কোন সময় মারিব? তিনি বলিলেন, শাসনকর্তা কোনও

বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে তাঁহার সহিত (তথা তাঁহার প্রবর্তিত ব্যবস্থানুসারে) তুমিও কঙ্কর মারার কাজ সম্পন্ন কর। ঐ ব্যক্তি পুনরায় ঐ প্রশ্নই করিল। তখন তিনি বলিলেন, আমরা (ছাহাবীগণ) অপেক্ষারত থাকিতাম; যখন সূর্য্য মধ্য-আকাশ অতিক্রম করিয়া যাইত তখন কঙ্কর মারিতাম।

মছআলাহ্ঃ—হানাফী মজহাব মতে এরূপ অপেক্ষা করিয়া সূর্য্য মধ্য-আকাশ অতিক্রম করার পর কঙ্কর মারা ওয়াজেব, ইহার ব্যতিক্রম করা জায়েয নহে।

৮৯৫। হাদীছঃ—আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) জামরা-আকাবায় কঙ্কর মারার সময় নিম্ন প্রান্তে দাঁড়াইয়া কঙ্কর মারিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, অনেক লোক উর্দ্ধ প্রান্তে দাঁড়াইয়া কঙ্কর মারিয়া থাকে। তিনি বলিলেন, আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাঁহার উপর (হজ্জের বিধি-নিষেধ সম্বলিত) কোরআন শরীফের ছুরা-বাকারা নাযেল হইয়াছিল অর্থাৎ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই স্থানে অর্থাৎ নিম্ন প্রান্তে দাঁড়াইয়া কঙ্কর মারিয়াছেন।

৮৯৬। হাদীছঃ—আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি এইরূপে দাঁড়াইয়া জামরা-আকাবাকে সাতটি কঙ্কর মারিয়াছেন যে, বাইতুল্লাহ শরীফের দিক তাঁহার বাম-পার্শ্বে এবং মিনার দিক তাঁহার ডান-পার্শ্বে ছিল এবং প্রতিটি কঙ্কর মারিবার সময় "আল্লাহ আকবার" ধ্বনি দিতেছিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহার উপর ছুরা বাকারাহ নাযেল হইয়াছিল, তিনি (অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ)) এইরূপই করিয়াছেন অর্থাৎ মক্কা শরীফকে বাম দিকে মিনাকে ডান দিকে রাখিয়া জামরার দিকে মুখ করিয়া কঙ্কর মারিয়াছেন।

৮৯৭। হাদীছঃ—সালেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) "প্রথম জামরা"কে সাতটি কঙ্কর মারিতেন; প্রতিটির সঙ্গেই "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারণ করিতেন। অতঃপর সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইয়া নিম্ন প্রান্তে দীর্ঘ সময় কেবলামুখী হইয়া দাড়াইয়া হাত উত্তোলন পূর্বক দোয়া করিতেন। তারপর "মধ্যম জামরা"কে ঐরূপেই কঙ্কর মারিতেন এবং বাম দিকে আসিয়া নিম্ন প্রান্তে কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইতেন এবং দীর্ঘ সময় হাত উত্তোলন পূর্বক দোয়া করিতেন। অতঃপর "জামরা-আকাবা"কে নিম্ন প্রান্তে দাঁড়াইয়া কঙ্কর মারিতেন উহার নিকটবর্তী কোন স্থানে অপেক্ষা করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি।

মছআলাহ্ঃ—দশই জিলহজ্জ জামরা-আকাবায় কঙ্কর মারা এবং চুল ফেলিয়া এহরাম খোলার পর তাওয়াফে-যেয়ারত তথা হজ্জের ফরজ তওয়াফ আদায় করার পূর্বেই সুগন্ধি ব্যবহার করিতে পারে। (২৩৬ পৃঃ ৮০৩ হাদীছ)

ফরজ তওয়াফ করার পূর্বে শুধুমাত্র স্ত্রী ব্যবহার ছাড়া আর সবই করিতে পারে। একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে—অনেকে ভুল করে। মাথার চুল ফেলিয়া এহরাম খুলিবার পূর্বে জামা-কাপড় পড়া বা সুগন্ধি ব্যবহার করা কিম্বা নখ কাটা ইত্যাদি যে কোন কাজ করিলে কাফ্ফারা ওয়াজেব হইয়া যাইবে। চুল ফেলিয়া এহরাম খুলিবার পূর্বে ঐরূপ কিছুই করা যাইবে না; চুল ফেলিতে যত বিলম্বই হউক। চুল ফেলিয়া এহরাম খুলিবার পরেই ঐসব কাজ করা জায়েয হইবে—পূর্বে নহে।

বিদায় তওয়াফ

৮৯৮। হাদীছ:—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সকলের প্রতিই এই আদেশ যে, প্রত্যেকেরই মক্কা শরীফ ত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কালে বিদায়ের সময় বাইতুল্লার সহিত শেষ মোলাকাত তওয়াফের দ্বারা অনুষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহাকে বিদায় তওয়াফ বলে। অবশ্য ঋতুবতী নারীকে এই আদেশ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

৮৯৯। হাদীছ:—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মিনা ত্যাগের দিন) জোহর, আছর, মাগরেব ও এশার নামায মোহাচ্ছাবে আসিয়া পড়িয়াছিলেন এবং তথায় কিছু সময় আরাম করার পর বাইতুল্লাহ শরীফে উপস্থিত হইয়া (বিদায়) তওয়াফ করিয়াছিলেন।

তওয়াফে-জেয়ারতের পর এবং বিদায়-তওয়াফের পূর্বে ঋতু আরম্ভ হইলে সেই নারী কি করিবে?

৯০০। হাদীছ:—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায়-হজ্জের সময় হযরতের বিবি—) ছফিয়্যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার (বিদায়-তওয়াফের পূর্বে) ঋতু আরম্ভ হইয়া গেল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহা অবগত হইয়া বলিলেন, সে কি আমাদের সকলকে অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিবে? (হযরত (দঃ) ভাবিয়াছিলেন, তওয়াফে-জেয়ারত যাহা ফরজ হয়ত তিনি তাহাও শেষ করেন নাই। তাই ঐ তওয়াফের জন্য ঋতু শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষা করিতে হইবে এবং তাহার জন্য হযরতেরও অপেক্ষা করিতে হইবে, ফলে সকলকেই অপেক্ষমান থাকিতে হইবে।) কিন্তু অনেকেই তাঁহাকে জানাইল যে ছফিয়্যা (রাঃ) পূর্বেই তওয়াফে-জেয়ারত করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তবে আর অপেক্ষা করিতে হইবে না।

মছআলাহ:—তওয়াফে-জেয়ারত যাহা কোরবানী দেওয়ার পর আদায় করা হয় উহা ফরজ। উহা ব্যতিরেকে হজ্জ পূর্ণ হয় না। তাই উহা আদায়ের পূর্বে ঋতু আরম্ভ হইলে ঋতু শেষে ঐ তওয়াফ না করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেই।

বিদায়-তওয়াফ যাহা হজ্জ-কার্য্য সমাপন করিয়া প্রত্যাবর্তনের সময় করা হয় উহা ফরজ নহে, ওয়াজেব বটে, কিন্তু ঋতু অবস্থায় নারীর উপর উহা ওয়াজেবও থাকে না। তাই উহার জন্য অপেক্ষা করা আবশ্যক নহে।

৯০১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, কোন মহিলা যদি তওয়াফে জেয়ারত করিয়া থাকে তবে ঋতু অবস্থায় বিদায় তওয়াফের জন্য অপেক্ষা না করিয়া তাহাকে চলিয়া যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রথমে ইহার বিপরীত বলিয়া থাকিতেন, কিন্তু পরে তিনিও বলিয়াছেন যে, সত্যই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঋতু অবস্থায় নারীদের জন্য ঐ অনুমতি দান করিয়াছেন।

মোহাচ্ছাবে অবতরণ করা

মিনা ও মক্কা শহরের মধ্য ভাগে একটি স্থানের নাম "মোহাচ্ছাব"। অতীতে মক্কা শহর-সম্প্রসারণ ঐ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ছিল না, সম্পূর্ণ এলাকা জনশূন্য ফাকা ময়দান ছিল। বিদায়-হজ্জে রসুলুল্লাহ (দঃ) মিনায় অবস্থান সমাপ্ত করিয়া ১৩ই জিলহজ্জ তারিখে বিদায় তওয়াফের জন্য মক্কায় প্রত্যাবর্তন কালে তথায় অবতরণ করিয়াছিলেন এবং জোহর, আছর, মগরেব ও এশার নামায তথায়ই পড়িয়াছিলেন, কিছু সময় নিদ্রাও গিয়াছিলেন। অতঃপর মক্কায় আসিয়া বিদায় তওয়াফ করিয়াছিলেন। আনাছ (রাঃ) বর্ণিত ৮৯৯ নং হাদীছে ইহার বর্ণনা আছে।

মক্কা হইতে মদীনার পথ মোহাচ্ছাব এলাকা দিয়াই ছিল, তাই বিদায় তওয়াফের জন্য মক্কা শহরে আসিবার কালে নবী (দঃ) মাল-আছবাব মোহাচ্ছাবেই রাখিয়া আসিয়াছিলেন এবং বিদায় তওয়াফের পর মোহাচ্ছাবেই ফিরিয়া আসিয়া তথা হইতেই মদীনা পানে যাত্রা করিয়াছিলেন।

১৩ তারিখ মিনা হইতে মক্কায় আসাকালে যে, নবী (দঃ) মোহাচ্ছাবে অবতরণ করিয়াছিলেন এ সম্পর্কে অনেক ছাহাবী এবং বিভিন্ন ইমামগণের মত এই যে, ইহা একটি স্বাভাবিক অবতরণ ছিল; হজ্জের নিয়মিত এবাদতের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

৯০২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আবতাহ তথা মোহাচ্ছাব নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি স্বাভাবিক অবতরণস্থল ছিল—শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তথায় মাল-ছামান রাখিয়া তথা হইতে মদীনা পানে যাত্রা সহজ ছিল।

৯০৩। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, মোহাচ্ছাবে অবতরণ শরীয়তের কোন হুকুম নহে। উহা শুধু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি স্বাভাবিক অবতরণস্থল ছিল।

● ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, উক্ত অবতরণ হজ্জের একটি সুন্নত এবাদৎ।* আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) উহাকে হজ্জের একটি সুন্নতই গণ্য করিতেন এবং তথায় অবতরণে সচেষ্ট হইতেন। (মোসলেম শরীফ)

৯০৪। **হাদীছ ঃ**—ওবায়দুল্লাহ (রঃ)কে মোহাচ্ছাবে অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি নাফে (রঃ) হইতে বর্ণনা করিলেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং খলীফা ওমর (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তথায় অবতরণ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তথায় জোহর, আছর, মগরেব ও এশার নামায পড়িতেন এবং কিছু সময় নিদ্রা যাইতেন—এই সব আমল নবী (দঃ) করিয়াছেন, বলিয়াও বর্ণনা করিতেন।

৯০৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জের সময় কোরবাণীর পর (১২ তারিখে) মীনার ময়দানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোষণা করিলেন, আগামীকল্য মিনা হইতে রওয়ানার দিন (১৩ তারিখে) আমরা (বিদায় তওয়াফের জন্য মিনা হইতে মক্কা যাওয়ার পথে) মক্কা সংলগ্ন খায়ফে-বনী কেনানা তথা "মোহাচ্ছাব" নামক স্থানে অবতরণ করিব। সেস্থানেই মক্কার বৃহৎ বৃহৎ শক্তি ও গোত্রদ্বয়—কোরায়েশ ও কেনানা (অঙ্কুরেই ইসলামকে বিলুপ্ত ও আল্লার রসুলকে পর্যুদস্ত করার জন্য আল্লার রসুলের সহায়তাকারী) হাশেম বংশ ও মোত্তালেব বংশের বিরুদ্ধে অসহযোগ প্রতিষ্ঠার উপর শপথ করিয়াছিল। তাহারা পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিল যে, আমাদের মধ্যে কেহই হাশেম ও মোত্তালেব বংশীয় কোন লোকের সঙ্গে বিবাহ-শাদী, ক্রয়-বিক্রয়, কোনপ্রকার আচার-ব্যবহার ইত্যাদি করিতে পারিবে না—যাবৎ তাহারা মোহাম্মদ (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)কে আমাদের হস্তে সমর্পন না করে। (২১৬ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—নবুওত প্রাপ্তি তথা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লার রসুল নিয়োজিত হওয়ার সপ্তম বৎসরের ঘটনা ইহা। ধীরে ধীরে ইসলামের প্রসার এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাফল্য কোরায়েশ ও মক্কাবাসীকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তাহারা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রাণে বধ করিবে ইহাই স্থির করিল। হযরতের প্রধান সহায়তাকারী স্বীয় চাচা আবু তালেব এই সংবাদ অবগত হইয়া হাশেম

---

* ১৯৫০ ইং সনে আমি নরাধম হজ্জ উদযাপনে মিনা হইতে মক্কায় পায়ে হাটিয়া আসিয়াছিলাম। তখন মোহাচ্ছাব এলাকাটি ফাকা ময়দানই ছিল; শুধু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবতরণস্থলে একটি মসজিদ ছিল। আমরা অতি সহজেই তথায় অবতরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ১৯৫৮ ইং সনে দেখিলাম, মক্কা শহর সম্প্রসারিত হইয়া উক্ত সমুদয় এলাকা শাহী মহল সহ বড় বড় সুরম্য দালান কোঠায় ঘিরিয়া গিয়াছে। উল্লিখিত মছজিদখানা এখনও বিদ্যমান আছে, কিন্তু বাড়ী-ঘরের ঘেরাও এর মধ্যে আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে। কিঞ্চিৎ পায়ে হাটিয়া খোঁজ করিলে বাহির করা সম্ভব হইতে পারে।

ও মোত্তালেব বংশীয় লোকদিগকে একত্র করিলেন। এই বংশদ্বয় কোরায়েশ গোত্রের মধ্যে হযরতের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ছিল, তাই তাহারা স্বীয় প্রথা ও রীতি অনুযায়ী অন্যান্যদের বিরুদ্ধে স্বীয় ঘনিষ্ঠের রক্ষা ও সহায়তায় উদবুদ্ধ হইল এবং আবু তালেবের কথায় হযরতের রক্ষণাবেক্ষণে বদ্ধপরিকর হইয়া তাঁহাকে নিজেদের বস্তিতে নিয়া আসিল।

অন্যান্য কোরায়েশগণ হাশেম ও মোত্তালেব বংশদ্বয়ের এই আচরণে ক্ষুদ্ধ হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অসহযোগ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিল। এমনকি, মক্কার প্রভাবশালী অধিবাসী— অন্যান্য কোরায়েশ ও কেনানা গোত্রদ্বয় "মোহাচ্ছাব" নামক ময়দানে একত্রিত হইয়া আনুষ্ঠানিকরূপে এই অসহযোগিতার উপর শপথ গ্রহণ করিল। অসহযোগিতার বিষয়বস্তু একটি শপথনামা আকারে লিখিত হইল এবং তৎকালীন প্রথানুযায়ী বিশেষ দৃঢ়তা প্রকাশার্থে ঐ শপথনামার একটি নকল আল্লার ঘরে লটকাইয়া রাখা হইল।

হাশেম ও মোত্তালেব বংশদ্বয় স্ব স্ব প্রতিজ্ঞার উপর অটল রহিল; কোন ভয়-ভীতিই তাহাদিগকে দমাইতে পারিল না। তাহারা স্বীয় বস্তির মধ্যে অবরুদ্ধ জীবন-যাপন করিতে লাগিল। সমগ্র দেশ তাহাদের প্রতি অসহযোগিতায় মাতিয়া উঠিল। জীবন-ধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি সংগ্রহ করা পর্য্যন্ত তাহাদের জন্য দুরূহ হইয়া উঠিল। এমনকি, তাহারা বৃক্ষপত্রের সাহায্যে জীবনধারণে বাধ্য হইল, কিন্তু তথাপিও প্রতিজ্ঞাচ্যুত হইল না—হযরত (দঃ)কে শত্রুদের হাতে অর্পণ না করায় অটল থাকিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও আবু তালেব এবং আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বংশদ্বয়ের লোকজন দীর্ঘ তিন বৎসরকাল এইরূপে বন্দী-জীবনের ন্যায় সমগ্র দেশ-খেশ হইতে বিচ্ছিন্ন জীবন অতিবাহিত করিলেন।

অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা স্বীয় চাচা আবু তালেবকে এই সংবাদ শুনাইলেন যে, তাহারা শপথ নামার যে দুইটি কপি লিখিয়াছিল, উহার একটি নিজেদের নিকট রাখিয়াছিল এবং অপরটি কা'বা ঘরে লটকাইয়া রাখিয়াছিল। উহার একটির মধ্যে প্রারম্ভিক ও শপথ ইত্যাদিতে লিখিত আল্লার নামসমূহ এবং অপরটির মধ্যে আল্লার নাম ব্যতীত অন্যান্য লিখিত বিষয়বস্তুসমূহ ঘুণ পোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে। (ইহার মধ্যে বোধ হয় এরূপ ইঙ্গিত নিহিত ছিল যে—আল্লাহ দ্রোহিতামূলক অন্যায় অত্যাচারের অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞাসমূহ আল্লার নামের সহিত বিজড়িত রাখা হইল না।)

আবু তালেবের নিকট ইহা বহু পরীক্ষিত ছিল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন সংবাদ অবাস্তব হয় না। তাই তিনি তাঁহার এই সংবাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতঃ কয়েক জন সঙ্গীকে লইয়া মসজিদে-হারামে উপস্থিত হইলেন এবং কোরায়েশ-দিগকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার ভাতিজা আমাকে একটি আশ্চর্যজনক অদৃশ্য সংবাদ জানাইলেন। আমি মনে করি, এই সংবাদের সত্যাসত্য পরীক্ষার উপরই তাঁহার সম্পর্কিত

বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লওয়া উচিত। তিনি খবর দিয়াছেন, তোমাদের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিজ্ঞাসমূহ আল্লার নামের সহিত বিজড়িত অবস্থায় বাকী থাকে নাই। যদি এই সংবাদ সত্য হয় তবে তোমাদের আশু কর্তব্য এই যে, তোমরা স্বীয় গোড়ামী পরিত্যাগ কর। স্মরণ রাখিও—জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা কস্মিনকালেও তাঁহাকে তোমাদের নিকট অর্পণ করিব না। হাঁ—যদি ঐ সংবাদ অবাস্তব হয় তবে এখনই আমরা তাঁহাকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইব। এই মীমাংসায় তাহারা সম্মত হইয়া শপথনামা খুলিয়া দেখিতে পাইল সত্য সত্যই ঐ অবস্থাই সংঘটিত হইয়াছে। এই ঘটনা দৃষ্টে তাহারা তাহাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী ইহাকে হযরতের যাদুবিদ্যার ক্রিয়া বলিয়া আখ্যায়িত করিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কয়েক জন লোকের প্রচেষ্টায় এই পরীক্ষার উপর শপথ ছিড়িয়া ফেলা হইল এবং অসহযোগিতা প্রত্যাহৃত হইল। (ফতহুল-মোলহেম)

তৎপর সুদীর্ঘ প্রায় ষোল বৎসর পরে ইসলামের উন্নতি ও প্রভাব বিস্তারের চরম অবস্থায় বিদায়-হজ্জকালীন রসুলুল্লাহ (দঃ) অতীত জীবনের দুঃখ-যাতনার অবস্থাসমূহ স্মরণ করতঃ বর্তমান জীবনের উপর প্রাণ ভরিয়া স্বীয় মাবুদের শোকরিয়া আদায় করার জন্য সেই "মোহাচ্ছাব" ময়দানে অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

কেয়ামত পর্য্যন্ত হযরতের উম্মতগণেরও কর্তব্য—হজ্জের সফরকালে ঐ স্থানে অবতরণ করতঃ হযরতের সাধনার লক্ষ্য করা এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চরম দুর্দিনের বিনিময়ে ইসলামের চরম সুদিনের উপর আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করা।

"জু-তুয়া" স্থানে অবতরণ

৯০৬। হাদীছঃ—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কায় প্রবেশ করিতে "জু-তুয়া"* নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিতেন এবং ভোর বেলায় মক্কা শহরে প্রবেশ করিতেন। আর মক্কা হইতে যাত্রাকালেও জু-তুয়ার পথেই যাইতেন এবং ভোর পর্য্যন্ত রাত্রি যাপন করিতেন। তিনি বর্ণনা করিতেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ করিয়াছেন।

---

* পূর্বোল্লিখিত "মোহাচ্ছাব" স্থানটি বাইতুল্লাহ শরীফ তথা মক্কা শহরের কেন্দ্রীয় স্থান হইতে এক মাইলের অধিক দূরে। আর আলোচ্য "জু-তুয়া" স্থানটি বাইতুল্লাহ শরীফের অনতি দূরেই। হযরতের যুগে হযরত এই স্থানটি মক্কার শহরতলি ছিল, কিন্তু এখন উহা মক্কা শহরেরই একটি মহল্লা। আমরা ইহাকে এই নামেই পরিচিত পাইয়াছি। উক্ত মহল্লায় মসজিদ আছে, কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবতরণের স্থল ঐ মসজিদের স্থানে নয়। উহার নিকটবর্তীই একটি কূপ; সেই কূপের নিকটেই হযরত (দঃ) অবতরণ করিয়া ছিলেন বলিয়া সাব্যস্ত। উক্ত কূপকে কেন্দ্র করিয়া তথায় একটি গুম্বজের ন্যায় নির্মিত ১৯৫০ ইং সনে দেখিয়াছি।

রসুলুল্লার (দঃ) বিদায়-হজ্জ*

হিজরতের পূর্বে রসুলুল্লাহ (দঃ) অনেক হজ্জই করিয়াছেন, এমনকি হয়ত প্রতি বৎসই হজ্জ করিয়া থাকিতেন। হিজরতের পর অষ্টম হিজরী পর্য্যন্ত ত হজ্জ করা হযরতের জন্য অসাধ্য ছিল; যেহেতু মক্কা শত্রু কবলিত ছিল। অষ্টম হিজরীর শেষ ভাগে মক্কা জয় হইল; ঐ বৎসর তিনি হজ্জের সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। নবম হিজরীর বৎসরও নবী (দঃ) নিজে হজ্জে গেলেন না, আবু বকর (রাঃ)কে আমীরুল-হজ্জ নিয়োজিত করিলেন; তিনি হজ্জ গমনেচ্ছু মোসলমানদিগকে নিয়া হজ্জ সমাপন করিয়া আসিলেন। হযরতের হজ্জে এই বিলম্বের হেতু ও কারণ হয়ত অনেকই ছিল, কিন্তু এই সুযোগে বিশেষ দুইটি সুফলও ফলিয়াছিল।

(১) নবম হিজরী পর্য্যন্ত আরবে কাফের-মোশরেকরা অবাদে চলাফেরা করিত, এমনকি কাফের-মোশরেক অমোসলেমরাও হজ্জ করিতে আসিত। নবম হিজরী সনে পবিত্র কোর-আনে ছুরা তওবার এক বিশেষ ঘোষণা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আরব ভুখণ্ডকে একমাত্র আল্লার অনুগত মোসলেম জাতির জন্য সুরক্ষিত করার পদক্ষেপ হিসাবে তথায় কাফের-মোশরেকদের অবস্থান ও অবাধ চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। ঘোষণার তারিখ নবম হিজরী ১০ই জিলহজ্জ হইতে চার মাসের অবকাশ প্রদান করা হইল। এমনকি যাহাদের সঙ্গে অনির্দিষ্টকালের সহ-অবস্থান চুক্তি সম্পাদিত ছিল তাহাদিগকে শুধু চার মাস নিরাপত্তা দানের সহিত ঐরূপ সমুদয় চুক্তি বাতিল ঘোষিত হইল। ছুরা তওবার উক্ত ঐতিহাসিক ঘোষণাকে লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিশেষতঃ নবম হিজরী সনের হজ্জ উপলক্ষে পূর্ব নীতি অনুযায়ী সমাগত সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে জারী করার জন্য হযরত (দঃ) আলী (রাঃ)কে নিজস্ব যানবাহনে করিয়া বিশেষ প্রতিনিধিরূপে পাঠাইলেন। নিয়মতান্ত্রিক আমীরুল-হজ্জ আবু বকর (রাঃ) সকলকে নিয়া মক্কা পানে যাত্রা করিয়াছিলেন; তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পরে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে জিব্রিল (আঃ) মারফত আদিষ্ট হইয়া হযরত (দঃ) আলী (রাঃ)কে বিশেষরূপে উক্ত দায়িত্ব দিয়া মক্কায় পাঠাইলেন। ঘোষণাটি বিশেষভাবে ঢোল-শোহরত করা হইল এবং স্পষ্ট ভাষায় এই ঘোষণাও দেওয়া হইল— لا يحجن بعد العام مشرك "এই বৎসরের পর কোন কাফের-মোশরেক অমোসলেম হজ্জ করিতে আসিতে পারিবে না।" সুদীর্ঘ হজ্জের কার্য্য বিধি সকলকে প্রত্যক্ষরূপে দেখাইয়া শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য উন্মুক্ত ও বাহিক নিরাপদ পরিবেশের প্রয়োজন ছিল; উল্লিখিত ব্যবস্থা সেই প্রয়োজনেরই সমাধান হইল।

(২) মোসলমানদের সারা জীবনে একবারের একটি বিশেষ ফরজ, যাহার কার্য্যাবলী সুদীর্ঘ এবং জটিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে প্রত্যক্ষরূপে উহার শিক্ষা লাভ করিতে ব্যাপক হারে অধিক সংখ্যায় লোকদের সুযোগ পাওয়ার প্রয়োজন ছিল যাহা সময় সাপেক্ষ। এক

---

* হজ্জ অধ্যায়ে ইমাম বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদটি রাখেন নাই। ৬৩১ পৃষ্ঠায় অন্য প্রসঙ্গে এই পরিচ্ছেদটি উল্লেখ করিয়াছেন।

বৎসর অধিক সময় পাওয়াতে চতুর্দিকে ব্যাপকহারে লোকগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করার প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হইল। হযরতের পক্ষ হইতেও ব্যাপক ভাবে অধিক প্রচারণা চালাইবার সুযোগ হইল। ফলে (সংখ্যা নির্দ্ধারণকারীদের কাহারও মতে) এই হজে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার মোসলমানের সমাবেশ হইল ; ঐ সময় মোসলমান শুধু আরবের বিভিন্ন এলাকায়ই সীমাবদ্ধ ছিল। মোসলেম শরীফের হাদীছে জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) দশম হিজরী সনে হজ্জ করিবেন বলিয়া সর্বত্র লোকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাইলেন। ফলে চতুর্দিক হইতে মদীনায় অসংখ্য লোকের সমাবেশ হইল ; সকলেরই উদ্দেশ্য রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিয়া তাঁহার অনুকরণে হজ্জ আদায় করিবে। হযরত (দঃ) স্বীয় উটের উপর ছওয়ার হইলেন, আমি তাঁহার কাফেলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম ; এত অধিক সংখ্যক লোকের কাফেলা ছিল যে, হযরতের ডানে, বামে সম্মুখে ও পেছনে আমার দৃষ্টির শেষ সীমা পর্য্যন্ত লোক ছিল। সকলের মধ্যভাগে ছিলেন রসুলুল্লাহ (দঃ)। হযরতের উপর বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হইতে ছিল ; তিনি স্বীয় আমল ও কার্য্যের দ্বারা পবিত্র কোরআনের কার্যকরী ব্যাখ্যা দেখাইতে এবং আমরা তাঁহার অনুকরণে কাজ করিয়া যাইতে ছিলাম।

হজ্জ অধ্যায়ের প্রায় সমুদয় হাদীছই বিভিন্ন ছাহাবী কর্তৃক সেই বিদায়-হজ্জেরই খণ্ড খণ্ড বর্ণিত হাদীছসমূহ। "বিদায়-হজ্জ" আরবী ভাষায় "হজ্জাতুল-ওয়াদা"-এরই অর্থ। এই আখ্যাটি হযরতের সময়েই ছাহাবীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই হজ্জের পরে অনতিবিলম্বেই ইহজগত হইতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিদায় গ্রহণই এই আখ্যার মর্ম ছিল। এই হজ্জের পূর্বক্ষণে এবং সমাপনের মধ্যে হযরত (দঃ) ইহজগত ত্যাগ আসন্ন হওয়ার বিভিন্ন ইঙ্গিত আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে পাইয়াছিলেন—যাহার বিস্তারিত বিবরণ পঞ্চম খণ্ডে "হযরতকে ইহজগত ত্যাগের সূচনা জ্ঞাপন" পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে। উহা লক্ষ্যেই হয়ত হযরত (দঃ) নিজেই এই হজ্জকে বিদায়-হজ্জ আখ্যা দিয়াছিলেন। এই হজ্জে মিনায় অবস্থানকালে হযরতের সুদীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের আরম্ভে হযরত (দঃ) উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, এই বৎসর পরে এই দিনে এই স্থানে হয়ত তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ আর হইবে না। এইভাবে সকলকে বিদায় দানের ভঙ্গিমায় হযরত (দঃ) সেই ভাবণে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, তাই ছাহাবীগণও সেই আখ্যা ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তাঁহার এই আখ্যার অর্থ তখনই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যখন উহার মর্ম—ইহজগত হইতে হযরতের বিদায় বাস্তবায়িত হইয়াছিল।

৯০৭। হাদীছ ঃ—+ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) আমাদের মধ্যে থাকা সময়েই আমরা কথা-বার্তায় হজ্জাতুল-'ওয়াদা'—বিদায়-হজ্জ আখ্যাটি ব্যবহার করিতাম। অবশ্য ঐ সময় আমরা লক্ষ্য করিতাম না, বিদায়-হজ্জ আখ্যার মর্ম কি।

× এই হাদীছের প্রথম অংশ ৬৩২ পৃষ্ঠা হইতে এবং অবশিষ্ট ২২৯ পৃষ্ঠা হইতে অনূদিত।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বিদায়-হজ্জের সময় হজ্জ এবং ওমরা এক সঙ্গে করার সুযোগ নিয়াছিলেন (যাহাকে হজ্জে-কেরাণ বলা হয় *।) হযরত (দঃ) নিজের সঙ্গে (৬৩টি) কোরবাণীর উটও নিয়াছিলেন। (মদীনার অনতি দূরে মদীনার দিকের মিকাত) জুল-হোলায়ফা হইতে নিয়মিত ভাবে কোরবাণীর পশুগুলি সঙ্গে পরিচালিত করার বিশেষ ব্যবস্থা * করিয়াছিলেন। তথা হইতে এহরাম বাঁধাকালে প্রথম ওমরা তারপর হজ্জ উভয়টির উল্লেখ করিয়া ছিলেন। তাঁহার অনুকরণে আরও কিছু সংখ্যক লোক ওমরা ও হজ্জ একত্রে করার সুযোগ নিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোরবাণীর পশু সঙ্গে লইয়া ছিল; আর কেহ কেহ তাহা সঙ্গে লয় নাই। মক্কায় পৌঁছিয়া হযরত (দঃ) লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা দিলেন যে, যাহারা কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনিয়াছে তাহারা ত হজ্জ সমাপ্ত পর্য্যন্ত নিজ নিজ এহরামের উপর স্থির থাকিবে। কিন্তু যাহারা কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনে নাই তাহারা ওমরার দুইটি কার্য্য তথা তওয়াফ ও ছায়ী করিয়া মাথার চুল কাটিয়া এহরাম ভঙ্গ করিবে। অতঃপর (৮ তারিখে) পুনরায় হজ্জের এহরাম বাঁধিবে। (এইরূপে মধ্যস্থলে এহরাম ভঙ্গ করিয়া একই ছফরে প্রথমে ওমরা তৎপর হজ্জ করাকে "হজ্জে-তামাত্তো" বলা হয়। এই প্রকার হজ্জে ১০ তারিখে একটি কোরবাণী করা ওয়াজেব হয়।) যদি কেহ সেই কোরবাণীর জন্য পশু সংগ্রহ করিতে সক্ষম না হয়, তবে হজ্জ অবস্থায় (১০ তারিখের পূর্বে) তিনটি রোযা এবং বাড়ী আসিয়া সাতটি (মোট দশটি) রোযা রাখিবে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কায় পৌঁছিয়া তওয়াফ করিলেন তওয়াফের সময় হজরে-আসওয়াদ চুম্বন করিলেন, তিন চক্করে রমল করিলেন এবং চার চক্করে সাধারণরূপে চলিলেন। তওয়াফ পূর্ণ করিয়া মকামে-ইব্রাহীমের নিকটবর্তী স্থানে দুই রাকাত নামায পড়িলেন। অতঃপর ছাফা পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলেন এবং ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে ছায়ী করিলেন। (সেই পর্য্যন্ত তাঁহার ওমরার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু যেহেতু তিনি কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনিয়াছিলেন সেই জন্য তিনি এহরাম ছাড়িতে পারিলেন না;) তিনি এহরাম অবস্থায়ই রহিলেন। দশ তারিখে কোরবাণীর দিন হজ্জের সমুদয় কার্য্য আদায় করিয়া এবং কোরবাণীর পশু জবেহ করিয়া এবং তওয়াফে জেয়ারত আদায়

---

* হযরতের নিজস্ব বিদায়-হজ্জ হজ্জে-কেরাণ ছিল—ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ ৮০৯ ও ৮১২ নং হাদীছে রহিয়াছে এবং আরও প্রমাণাদি আছে।

* মক্কা শরীফে কোরবাণী করার জন্য কোন পশু সঙ্গে লইলে কোরবাণীর জন্য নির্দ্ধারিত হওয়ার নিদর্শনরূপে অতি সাধারণ বস্তু—পুরাতন চামড়া ইত্যাদি গাথিয়া মালারূপে সেই পশুর গলায় লটকাইয়া দেওয়া উত্তম। এতদ্ভিন্ন উক্ত নিদর্শনের আরও ব্যবস্থা আছে। হযরত (দঃ) তাহাই সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

করিয়া পূর্ণরূপে এহরাম খুলিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণের মধ্যে যাহারা তাঁহার ন্যায় কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনিয়া ছিল তাহারাও তাঁহার ন্যায় সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিল।

ব্যাখ্যা ঃ—মিকাত হইতে শুধু ওমরার এহরাম বাঁধিয়া আসিলে মক্কায় তওয়াফ ও ছায়ী করার পর এহরাম ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু হজ্জ বা হজ্জ ও ওমরা উভয় তথা হজ্জে-কেরাণের এহরাম বাঁধিলে সাধারণ মছআলাহ এই যে, কোরবাণীর পশু সঙ্গে না আনিলেও সে হজ্জের সমুদয় কার্য্য পূর্ণ না করা পর্য্যন্ত এহরাম ছাড়িবে না। নবী (দঃ) বিদায়-হজ্জ কালে এই সাধারণ মছআলার বিপরিত অর্থাৎ কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনে নাই এমন সকল ব্যক্তিকেই এহরাম ভঙ্গ করিবার আদেশ দিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা বিশেষ কারণবশতঃ ছিল; যাহা "হজ্জের প্রকার" পরিচ্ছেদে ৮১৯ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ এরূপ করিতে স্বয়ং নবী (দঃ)ই নিষেধ করিয়াছেন। অতএব আমাদের সাধারণ মছআলাহ অনুযায়ীই চলিতে হইবে; অন্যথায় কাফ্‌ফারা ওয়াজেব হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—হজ্জের মধ্যে খলীফা তথা মোসলেম রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁহার নিয়োজিত বিশেষ প্রতিনিধি আমীরুল হজ্জকে তিন দিন ভাষণ দিতে হয়। (১) জিলহজ্জের সাত তারিখ মক্কায় জোহর নামাযের পর একটি ভাষণ। (২) নয় তারিখ আরাফার মসজিদে নামেরাতে জোহর ও আছর একত্রে জোহরের ওয়াক্তে পড়াকালে; নামাযের পূর্বক্ষণে জুমার নামাযের ন্যায় আজানের সহিত দুই খুৎবার ন্যায় দুইটি ভাষণ। (৩) এগার তারিখ মিনায় জোহর নামাযের পর একটি ভাষণ।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিদায়-হজ্জে উক্ত তিন দিন এবং দশ তারিখেও ভাষণ দিয়া ছিলেন। হযরতের সেই সব ভাষণ যে কিরূপ ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাহা বলার প্রয়োজন নাই। ঐ সব ভাষণে হযরত (দঃ) দ্বীন-ইসলামের বিশেষ বিশেষ বৈপ্লবিক নীতি ও আদর্শের বর্ণনা দিয়াছেন; যাহা ইসলামী ইতিহাসের এবং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবনী আলোচনা শাস্ত্রের বিশেষ বিষয়বস্তুরূপে দীপ্তমান রহিয়াছে। কোন কোন বিষয় বিশেষতঃ মানুষের জান-মাল, আবরু-ইজ্জতের নিরাপত্তার মূল নীতিটি উক্ত ভাষণ সমূহের প্রত্যেকটিতেই বিঘোষিত হইয়াছিল। উক্ত ভাষণ সমূহের কোনটিই পূর্ণ ও ধারাবাহিকরূপে একজনের বর্ণনায় একত্রিত নাই। বরং উহার বিশেষ বিশেষ খণ্ড সেই ভাষণের অংশ হওয়া উল্লেখের সহিত হাদীছরূপে বিভিন্ন বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় সুরক্ষিত রহিয়াছে। উহার কোন কোন বর্ণনা বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে; উহা ছাড়া আরও কিছু বর্ণনা বিভিন্ন কেতাবে রহিয়াছে। বোখারী শরীফ অনুবাদ কার্য্যে ফয়েজ ও বরকত দানের মূল কেন্দ্র মাওলানা শামছুল হক রহমতুল্লাহ আলাইহে একটি ছোট পুস্তিকায় এই সম্পর্কে অনেকগুলি বর্ণনার সমাবেশ করিয়াছিলেন। এখানে প্রথমে বোখারী শরীফে বিদ্যমান বর্ণনার অনুবাদ হইবে, অতঃপর উক্ত পুস্তিকার বর্ণনাগুলিও উদ্ধৃত হইবে এবং উহাতে অতিরিক্ত অনেক বর্দ্ধিত অংশও আছে যাহা 'আল-বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ' কিতাব হইতে গৃহিত

৯০৮। হাদীছ :— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায়-হজ্জে ১০ই জিলহজ্জ) কোরবাণীর দিন ভাষণ দিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا

قَالُوْا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هٰذَا

قَالُوْا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هٰذَا

قَالُوْا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ

وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ

كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ

هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا. فَأَعَادَهَا

مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ

هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ لَا تَرْجِعُوْا

بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ

بَعْضٍ. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

হে জনমণ্ডলী! আজিকার দিনটি কিরূপ দিন? সকলেই বলিল, বিশেষ সম্মানিত দিন (যে দিন কোন প্রকার মারামারি কাটাকাটি বিশেষভাবে নিষিদ্ধ—হারাম বলিয়া সর্বস্বীকৃত)। হযরত (দঃ) পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে, এই এলাকাটি কোন্ এলাকা? সকলেই বলিল, হরম শরীফের এলাকা (যাহার সম্মান আদিকাল হইতেই সর্ব-স্বীকৃত)। হযরত (দঃ) আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ মাস? সকলেই বলিল, (সর্ব সম্মত ও সুপরিচিত) বিশেষ সম্মানিত মাস। (এই ভাবে সম্মানের দিন, সম্মানের মাস, সম্মানের এলাকা একত্রে সমাবেশিত হওয়ার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক) হযরত (দঃ) বলিলেন, এই মাসের, এই এলাকার, এই দিনের সমষ্টিতে যে সম্মান এবং পরস্পরের মারামারি কাটাকাটি যেরূপ কঠোর হারাম, প্রত্যেক মোসলমানের জান, মাল, আবরু-ইজ্জত সর্বত্র ও সর্বদাই তদ্রূপ সম্মানিত এবং উহার ক্ষতি সাধন তদ্রূপ কঠোর হারাম। হযরত (দঃ) এই সতর্কবাণী পুনঃ পুনঃ কয়েকবার দোহ্‌রাইলেন। তারপর উর্দ্ধপানে দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও—আমি আমার দায়িত্ব পৌছাইয়া দিলাম। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও—আমি আমার দায়িত্ব পৌছাইয়া দিলাম। খবরদার, খবরদার—তোমরা আমার তিরোধানের পরে কাফেরী কার্যে লিপ্ত হইও না যে, একে অন্যকে হত্যা কর। হে লোক সকল! তোমরা প্রত্যেক উপস্থিত অনু-পস্থিতকে আমার এই সতর্ক বাণী পৌছাইয়া দিও।

قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّهَا لَوَصِيَّتُهٗ اِلٰى اُمَّتِهٖ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত হাদীছ বর্ণনান্তে বলিয়াছেন, ঐ আল্লার কসম যাহার হাতে আমার জান—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই বাণী স্বীয় উম্মতের প্রতি তাঁহার ওছিয়্যত—শেষ বিদায়ের বাণী ; সযত্নে উহা রক্ষা করা উম্মতের বিশেষ কর্তব্য। (২৩৪ পৃঃ)

৯০৯। হাদীছ ঃ— عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, বিদায়-হজ্জে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভাষণ দানে বলিলেন—

اَلَا اَىُّ شَهْرٍ تَعْلَمُوْنَهٗ اَعْظَمَ حُرْمَةً قَالُوْا اَلَا شَهْرُنَا هٰذَا قَالَ اَلَا اَىُّ بَلَدٍ تَعْلَمُوْنَهٗ اَعْظَمَ حُرْمَةً قَالُوْا اَلَا بَلَدُنَا هٰذَا قَالَ اَلَا اَىُّ يَوْمٍ تَعْلَمُوْنَهٗ اَعْظَمَ حُرْمَةً قَالُوْا اَلَا يَوْمُنَا هٰذَا ـ

হে জনমণ্ডলী! তোমরা কোন্ মাসকে অধিক সম্মানিত মনে কর (যে মাসে সর্বপ্রকার ঝগড়া-লড়াই ও লুট-ছিনতাই কঠোর হারাম গণ্য করিয়া থাক)? সকলেই বলিল, নিশ্চয় এই মাস। হযরত (দঃ) বলিলেন, কোন্ এলাকাকে অধিক সম্মানিত গণ্য কর? সকলেই বলিল, নিশ্চয় এই এলাকা। হযরত (দঃ) বলিলেন কোন্ দিনকে অধিক সম্মানিত মনে কর? সকলেই বলিল, নিশ্চয় এই দিন—জিলহজ্জের ১০ তারিখ।

قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا ـ

হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ—তোমাদের জান, মাল, আবরু-ইজ্জৎ সর্বত্র ও সর্বদাই তদ্রূপ সুরক্ষিত—পরস্পর উহার ক্ষতি সাধনকে আল্লাহ কঠোরভাবে হারাম করিয়া দিয়াছেন যেরূপ এই দিনের, এই এলাকার, এই মাসের সমাবেশিত সম্মানের অবস্থায়। অবশ্য শরীয়তের বিধান মতে যে হক উহার উপর প্রবর্তিত হইবে তাহা উসুল করা হইবে *।

اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا كُلَّ ذٰلِكَ

তোমরা লক্ষ্য কর। আমি আমার দায়িত্ব পৌছাইয়া দিলাম ত? এই কথাটি তিনবার

* যেমন—জানের উপর হদ্দ ও কেছাছ, মালের উপর যাকাত ইত্যাদি, আবরু-ইজ্জতের উপর তা'যিরাত তথা শরীয়ত নির্ধারিত বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

يُجِيبُونَهُ أَلَا نَعَمْ قَالَ وَيْلَكُمْ لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

বলিলেন! প্রত্যেক বারই লোকেরা উত্তর দিতেছিল, নিশ্চয় হাঁ। হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, খবরদার—আমার তিরোধানের পরে তোমরা কাফেরী কাজে লিপ্ত হইয়া যাইও না যে—তোমাদের একে অন্যকে হত্যা করে।

(বোখারী শরীফ ১০০৩ পৃঃ)

৯১০। হাদীছ :— عن ابن عمر وقف النبى صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِى الْحَجَّةِ الَّتِى حَجَّ وَقَالَ

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায় হজ্জে ১০ই জিলহজ্জ কোরবাণীর দিন মিনায় কংকর মারিবার জায়গা সমূহের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াইলেন এবং সমবেত লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

أَتَدْرُونَ أَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قَالُوا اَللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ أَتَدْرُونَ أَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوا اَللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هٰذَا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ أَتَدْرُونَ أَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قَالُوا اَللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ.

তোমরা জান কি—এইটা কোন্ এলাকা? সকলে উত্তর করিল, আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলই ভালভাবে বলিতে পারেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা হরম শরীফের এলাকা (যথায় মারামারি কাটাকাটি কঠোর হারাম এবং অতি জঘণ্য বলিয়া সর্বস্বীকৃত।) হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এইটা কোন দিন? সকলে উত্তর করিল, আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলই ভাল ভাবে বলিতে পারেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা বিশেষ সম্মানিত দিন (যে দিনে খুন-খারাবী করা কঠোর হারাম ও অতি জঘণ্য বলিয়া সর্ব স্বীকৃত)। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এইটা কোন্ মাস? সকলে উত্তর করিল, আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলই ভালভাবে বলিতে পারেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা বিশেষ সম্মানিত মাস (যে মাসে কোন অন্যায় অত্যাচার করা কঠোর হারাম ও অতি জঘণ্য বলিয়া সর্ব স্বীকৃত)।

قَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا ـ هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ وَوَدَّعَ النَّاسَ فَقَالُوْا هٰذِهٖ حَجَّةُ الْوَدَاعِ ـ

হযরত (দঃ) বলিলেন, জানিয়া রাখ—নিশ্চয় তোমাদের জান, মাল, আবরু-ইজ্জতকে পরস্পর ক্ষতি সাধন করা আল্লাহ তায়ালা সর্বত্র ও সর্বদার জন্য ঐরূপ হারাম করিয়াছেন, যেরূপ হারাম এই দিনের এই মাসের এই এলাকার সমাবেশিত সম্মানের অবস্থায়। (পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত) হজ্জে-আকবার তথা মহান হজ্জের একটি বিশেষ দিন এই দিনটি; (এই মহান দিনে এই বিদায়ী বাণী।) অতঃপর হযরত নবী (দঃ) বার বার বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও (আমি আমার দায়িত্ব পৌঁছাইয়া দিলাম।) এই বলিয়া নবী (দঃ) লোকদেরকে শেষ বিদায় দিতে লাগিলেন, সেই সূত্রেই লোকেরা ইহাকে বিদায় হজ্জ আখ্যা দিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত উক্ত তিনটি হাদীছের ন্যায় আবু বকরাহ (রাঃ) হইতেও হাদীছ বর্ণিত আছে, যাহার অনুবাদ প্রথম খণ্ডে ৬০ নং হাদীছে হইয়াছে। উক্ত হাদীছের অনুবাদে দেখান হইয়াছে যে, মানুষের শরীরের চামড়াটুকুর নিরাপত্তার বিষয়টিও এই ঘোষণায় উল্লেখ রহিয়াছে। জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতেও একটি সংক্ষিপ্ত হাদীছ এই বিষয়ে বর্ণিত আছে, যাহার অনুবাদ ১৬ নং হাদীছে হইয়াছে। এই হাদীছ সমূহের মূল বিষয়বস্তু একই; অবশ্য শ্রোতাদের সঙ্গে হযরতের কথোপকথনের ভূমিকা বর্ণনায় কিছু বিভিন্নতা রহিয়াছে; উহার দরুণ ছাহাবীগণের বর্ণনায় গড়মিলের ধারণার বিভ্রান্তি হওয়া চাই না। কারণ, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভাষণ মক্কায়, আরফায়, মিনার—বিভিন্ন দিনে হইয়াছে; তদুপরি লক্ষ্যের অধিক লোকের সমাবেশ, গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ; যথা-সাধ্য সকলকে শুনাইবার প্রয়োজন, অতএব অন্ততঃ মিনার মধ্যে যথায় হজ্জের কোন সুদীর্ঘ আমলের ব্যস্ততা নাই—সেখানে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইসলামের একটি বৈপ্লবিক মূল নীতি (Fundamenutal right) "মানুষের জান, মাল, আবরু-ইজ্জতের নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার এর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাকে খণ্ড খণ্ড সমাবেশে বিশেষ ভাষণরূপে শুনাইয়া ছিলেন এবং বিভিন্ন সমাবেশে শ্রোতাদের সঙ্গে হযরতের কথোপকথনে বস্তুতঃই বিভিন্নতা ছিল; বর্ণনাকারীগণ এক একজনে এক এক সমাবেশের বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। এক আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)ই তিন সমাবেশের বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন।

শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম ইসলামের গৌরবোজ্জল মূল নীতি—

● মানুষের জানের নিরাপত্তা, এমনকি তাহার শরীরের এবং উহার চামড়াটুকুরও নিরাপত্তা, ● মানুষের মালের নিরাপত্তা, এবং ● মানুষের আবরু-ইজ্জতের নিরাপত্তা— এই ব্যাপক নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার দানই ছিল ইসলামের একটি বিশেষ মূল নীতি যাহার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়াছিলে বিশ্ব নবী মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সর্বত্র। বিশেষতঃ তাঁহার বিদায়-হজ্জের বিদায় বাণীর প্রতিটি ভাষণে তিনি উক্ত অধিকারের পুনঃ পুনঃ ঘোষণা দিয়াছেন। হযরত (দঃ) ১০ই জিলহজ্জ মিনার ভাষণের মধ্যে উক্ত নিরাপত্তাকে অত্যন্ত কঠোর এবং বিশেষরূপে মজবুত প্রতিপন্ন করার জন্য ভাষণ দানের দিন, কাল ও স্থানের প্রতি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ প্রশ্নের মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক এই বাস্তবটি তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন যে, এই দিনটি মহান কোরবাণীর দিন—যেই দিনটিতে কাহারও জান-মালের উপর কোন প্রকার আক্রমণ করাকে অতীত কাল হইতেই সর্ববাদী সম্মতরূপে, এমনকি তৎকালীন খুন-খারাবী লুটপাটকারী দুর্দ্ধর্ষ বেদুইন আরব জাতির ধর্ম মতেও অত্যন্ত জঘন্য ও অবৈধ গণ্য করা হইত। তদ্রূপ এই মহান জিলহজ্জ মাস—মহা সম্মানের চার মাসের একটি যাহার পবিত্রতাও ঐরূপই। তদ্রূপ এই এলাকাটি মহা পবিত্র হরম শরীফের এলাকা—যেই এলাকার পবিত্রতাও ঐরূপই। এই তিনটি মহা পবিত্রের একত্রে সমাবেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক হযরত (দঃ) তাঁহার মূল উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই ত্রিবিধ পবিত্রের সমাবেশে মানুষের জান-মালকে যেরূপ সুরক্ষিত গণ্য করা হইয়া থাকে, ইসলামের বিধানে প্রতিটি দিনে, প্রতিটি মাসে, প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি মানুষের জান-মাল, আবরু-ইজ্জত এমনকি তাহার চামড়াটুকুও সুরক্ষিত পরিগণিত—উহার উপর সামান্য আচড়ও হারাম নিষিদ্ধ। উল্লিখিত উদ্দেশ্যকে আরও অধিক সুকঠিনরূপে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ভূমিকা স্বরূপ প্রথমে আরও একটি তথ্য হযরত (দঃ) ব্যক্ত করিয়াছেন যাহার উল্লেখ মোসলেম শরীফে আবু বকরাহ (রাঃ)-এর হাদীছে রহিয়াছে—

أَلاَ اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهٖ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَلسَّنَةُ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ

"শুনিয়া রাখ, কালের চক্র ঘূর্ণায়মান হইয়া উহার ধারা-পরম্পরা ঐ অবস্থায় আসিয়াছে যে অবস্থা উহার ছিল ঐ দিন হইতে যেই দিন আল্লাহ তায়ালা আসমান জমিন বিশ্বভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বৎসর বার মাসের ; তন্মধ্যে চারটি মাস মহা সম্মানিত ;

যাহার তিনটি একের পর এক মিলিত— ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ
জিলকদ, জিলহজ্জ ও মহররম। আর একটি
হইল রজব যাহা শাবানের পূর্বে।” الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ -

ব্যাখ্যা ঃ— চারটি মহা সম্মানিত মাস যাহার মধ্যে কাহারও জান-মালের উপর কোন প্রকার আক্রমণ করা সকলেই নিষিদ্ধ ও অবৈধ গণ্য করিত। অন্ধকার যুগে খুন ও লুটের ব্যবসায়ী আরব জাতিরা নিজেদের উক্ত ব্যবসার সুবিধার জন্য ঐ সম্মানিত মাসগুলির বিশেষতঃ ধারাবাহিক মাস তিনটির অবস্থানে রদ-বদল করিত। যেমন—জিলকদ মাসে খুন-লুট হইতে বিরত থাকায় অভাব দেখা দিয়াছে; পরবর্তী আরও দুই মাস ঐরূপে বিরত থাকিলে খাওয়া জুটিবে না, তাই সাব্যস্ত করা হইত যে, জিলহজ্জ বা মহররম তাহার অবস্থান তথা জিলকদের পর পর আসিবে না, বরং দুই বা চার মাস পরে আসিবে। এইভাবে জিলকদের পর বস্তুতঃ জিলহজ্জ সম্মানিত মাসের অবস্থান বা তারপর সম্মানিত মাস মহররমের অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও উহাকে অন্য মাসের নামকরণ করিয়া তখন খুন ও লুটের কাজ চালাইয়া নিত এবং সুযোগ মতে অন্য যে কোন সময় জিলহজ্জ বা মহররম মাস উদযাপন করিত। এই শ্রেণীর রদ-বদল দ্বারা মাস সমূহের ধারা-পরম্পরা ও ক্রমিকতায় বিরাট গড়মিল সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল; যদ্দরুণ ইতিপূর্বে হজ্জও উহার যথাসময়ে উদযাপিত হইত না। কোন অন্য মাসের উপর জিলহজ্জের নামকরণে হজ্জ হইত। অতএব কারণেই উক্ত রদ-বদলকে “নাছী” নামে আখ্যায়িত করিয়া পবিত্র কোরআন উহাকে অতিরিক্ত কুফুরী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিদায়-হজ্জের বৎসর ঘটনাক্রমে রদ-বদলের ঘূর্ণিচক্র মাসগুলিকে প্রকৃত ধারা ও ক্রমিকতার উপর আনিয়া দিয়াছিল। অনেকে লিখিয়াছেন, অষ্টম হিজরীতে ইসলামে হজ্জ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও নবম হিজরীতে নবী (দঃ) হজ্জ করেন নাই। দশম হিজরী সনে ঘূর্ণিচক্র উক্ত ক্রিয়া করিবে এবং হজ্জ উহার সঠিক সময় প্রকৃত জিলহজ্জ মাসে উদযাপিত হইবে উহারই অপেক্ষায় আল্লার কুদরত হযরতের হজ্জকে এক বৎসর বিলম্বিত করিয়াছিল।

ঘূর্ণিচক্রের উক্ত প্রতিক্রিয়ার তথ্যটি প্রকাশ করিয়া নবী (দঃ) এই কথাটিও বুঝাইয়াছেন যে, বর্তমান জিলহজ্জ মাস কৃত্রিম—শুধু নামের জিলহজ্জ মাস নহে, বরং প্রকৃত জিলহজ্জ মাস এবং কোরবাণীর দিনটির দিনটিও তদ্রূপ প্রকৃত কোরবাণী দিন। এই প্রকৃত জিলহজ্জ মাসে এবং কোরবাণীর দিন মানুষের জানমাল যেরূপ সর্ববাদী এবং সর্ব সম্মতভাবে সুরক্ষিত গণ্য; ইসলামের বিধানে প্রতি দিনে ও প্রতি মাসে উহা তদ্রূপই সুরক্ষিত গণ্য।

উম্মতের কল্যাণের আরও অনেক কিছু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সেই বিদায় বাণীর ভাষণে বলিয়াছেন। যথা—

৯৯১। **হাদীছ**ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিদায়-হজ্জের উল্লেখ করতঃ বলিলেন, নবী (দঃ) ভাষণ দানে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও ছানা-ছিফত বয়ান করিলেন। তারপর দজ্জালের আলোচনা করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন—

مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا اَنْذَرَ اُمَّتَهٗ اَنْذَرَهٗ نُوْحٌ وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاِنَّهٗ يَخْرُجُ فِيْكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَاْنِهٖ فَلَيْسَ يَخْفٰى عَلَيْكُمْ اَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ وَاِنَّهٗ اَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهٗ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا اَلَاهَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلٰثًا وَيْلَكُمْ اُنْظُرُوْا لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

যত নবী আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করিয়াছেন প্রত্যেকেই নিজ উম্মতকে দজ্জাল হইতে সতর্ক করিয়াছিলেন, এমনকি নুহ (আঃ)ও স্বীয় উম্মতকে দজ্জাল হইতে সতর্ক করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরবর্তী নবীগণ ত করিয়াছেনই! (পূর্বে কোন উম্মতেই দজ্জালের আবির্ভাব হয় নাই;) তোমাদের মধ্যে অবশ্যই তাহার আবির্ভাব হইবে। (সে খোদায়ী দাবী করিবে, কিন্তু সে যে খোদা নয় উহার প্রমাণে) তাহার বিভিন্ন অবস্থাবলী তোমাদের সাধারণ বুঝে সুস্পষ্ট না হইলেও ইহা ত নিশ্চয় সুস্পষ্ট হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা ত সর্বময় দোষ-ত্রুটিমুক্ত, আর দজ্জালের চোখও দোষী হইবে—(বাম চোখটা ত একেবারেই লেপাপোছা দৃষ্টিহীন হইবে এবং) ডান চোখটা স্ফীত হইবে, যেমন আঙ্গুরের ছড়ায় কোন একটি আঙ্গুর বহির্ভূত থাকে।

জানিয়া রাখ—নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরস্পর তোমাদের জান-মালকে সর্বদার জন্য ঐরূপ কঠোর ভাবে হারাম করিয়া রাখিয়াছেন যেরূপ এই মহান দিনে, এই এলাকায় এই মাসে উহা (সর্ব স্বীকৃতরূপে) কঠোর হারাম। হে লোক সকল! আমি আমার দায়িত্ব পৌঁছাইয়া দিলাম ত! সকলেই সমবেত কণ্ঠে স্বীকৃতি জানাইল—হাঁ। হযরত (দঃ) তিন বার বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও। হে লোক সকল! তোমাদের ধ্বংস হইবে—লক্ষ্য রাখিও, তোমরা আমার তিরোধানের পর কাফেরীরূপ ধারণ করিও না যে—একে অন্যের গলা কাটিবে। (৬৩২ পৃঃ)

● অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঐতিহাসিক বিদায়-হজ্জের ভাষণ সমূহের যে সব খণ্ড বিভিন্ন কেতাব হইতে মাওলানা শামছুল হক রহমতুল্লাহ আলাইহে পুস্তিকাকারে একত্রিত করিয়া গিয়াছেন উহা বদ্ধিতাকারে উদ্ধৃত হইল—

হে লোক সকল! আমার কথাগুলি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিও! বোধ হয়—এই বৎসরের পরে এইরূপ মহান হজ্জের সুযোগে এই মহান মাসে এই মহান জায়গায় তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাত আর ঘটিবে না।

أَيُّهَا النَّاسُ اِسْمَعُوْا فَانِّىْ لَاأَدْرِىْ لَعَلِّىْ لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِىْ هٰذَا فِىْ مَوْقِفِىْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا۔

(১) তোমরা সকলে ভালভাবে—শুনিয়া রাখ—বর্বর ও অন্ধকার যুগের সমস্ত কুসংস্কার* আমি পদদলিত ও বাতিল করিলাম।

● أَلَاكُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوْعٌ۔

(২) হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বর্বর ও অন্ধকার যুগের রীতি** পদদলিত ও বাতিল। হত্যার ঐরূপ প্রতিশোধের সর্বপ্রথম বাতিল ঘোষিত ঘটনা আমাদের নিজেদের একটি ঘটনা—রবিয়া ইবনে হারেসের পুত্রের খুনের ঘটনা।+ সে বাল্যাবস্থায় বনুসায়াদ গোত্রীয় দাই মাতার গৃহে থাকিয়া দুধ পান করিত; বনুহোজায়েলদের কাহারও নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে সে তথায় নিহত হইয়া ছিল।

● دِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَاِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا فِىْ بَنِىْ سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ۔

(৩) সুদ ব্যবসা যাহা অন্ধকার যুগের গহিত ব্যবস্থা উহা সম্পূর্ণ বাতিল। অবশ্য ঋণের আসল টাকা প্রাপ্য হইবে; (পাওনাদার খাতকের নিকট হইতে মূল ঋণের অধিক উসুল করার) অন্যায় তোমরা করিতে পারিবে না;

● وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ لَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُوْنَ

---

* অন্ধকার যুগের কুসংস্কার বলিতে সকল প্রকার অন্যায়, অত্যাচার, দুর্বলের উপর সবলের জুলুম, লুটপাট, সুদ, ঘুষ, জুয়া, মদ্যপান, নাচ-গান বাদ্য এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্যের পূজা। আর নারীদের বেপর্দা বেহায়ারূপে অবাধ চলাচলকে ত পবিত্র কোরআনেই সুস্পষ্টরূপে অন্ধকার যুগের কুসংস্কার বলা হইয়াছে (২২ পাঃ ১রুঃ দ্রষ্টব্য)

** পিতার অপরাধে পুত্রকে, পুত্রের অপরাধে পিতাকে এইরূপ একজনের অপরাধে তাহার আত্মীয়-কুটুম্বের বা বংশের কিম্বা দেশের অন্যকে প্রতিশোধ গ্রহণে হত্যা করার নীতি অন্ধকার যুগে প্রচলিত ছিল।

\+ "রবিয়া" নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাৎ চাচাতো ভাই-এর ছেলে ছিলেন, তাঁহার ছেলে বনুহোজায়েল গোত্রের কোন লোকের দ্বারা নিহত হইয়া ছিল; তাই বর্বর যুগের রীতি অনুযায়ী রবিয়ার গোষ্ঠি বনুহোজায়েল গোত্রের যে কোন মানুষকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টায় ছিল। নবী (দঃ) সেই প্রচেষ্টাকে প্রত্যাহৃত বাতিল ঘোষণা করিলেন।

وَلَا تُظْلَمُوْنَ وَاَوَّلُ رِبًا اَضَعُ رِبَانَا رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاِنَّهٗ مَوْضُوْعٌ كُلُّهٗ ـ

তোমাদের উপরও (আসল টাকা না দেওয়ার) অন্যায় করা হইবে না। সুদ বাতিল করার ঘোষণা সর্বপ্রথম আমাদের উপর বাস্তবায়িত করিতেছি। (আমার চাচা) আব্বাস-পুত্র আবদুল মোত্তালেবের সুদের পাওনা টাকা বাতিল করিয়া দিলাম। তাঁহার সমস্ত সুদ প্রত্যাহার বাতিল হইয়া গেল×।

● اَلدَّيْنُ مَقْضِىٌّ وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ ـ

(৪) ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, সাময়িক কাজ উদ্ধারের জন্য চাহিয়া আনা জিনিষ আমানতরূপে ফেরত দিতে হইবে এবং দুগ্ধবতী পশুকেও সাময়িকভাবে দুধ খাওয়ার সাহায্য স্বরূপ দিলে সেই পশুও আমানতরূপে ফেরত দিতে হইবে ÷। কেহ কোনরূপ জামিন হইলে সে দায়ী হইবে।

● اَيُّهَا النَّاسُ اَلَا اِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَاِنَّ اَبَاكُمْ وَاحِدٌ اَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلٰى عَرَبِيٍّ وَلَا لِاَحْمَرَ عَلٰى اَسْوَدَ وَلَا لِاَسْوَدَ عَلٰى اَحْمَرَ اِلَّا بِالتَّقْوٰى اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ـ

(৫) হে জনমণ্ডলী! তোমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা একই এবং আদি পিতাও একই। সুতরাং কোন আরবী কোন অ-আরবীর প্রতি বৈষম্য দেখাইতে পারিবে না, কোন অ-আরবী কোন আরবীর প্রতি বৈষম্য দেখাইতে পারিবে না। সাদা কালোর প্রতি এবং কালা সাদার প্রতি বৈষম্য দেখাইতে পারিবে না। হাঁ—খোদাভক্তি ও খোদা-ভিরুতার চরিত্রগুণে মানুষের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে; সেই গুণ যাহার বেশী হাসিল হইবে সে আল্লার নিকট অধিক মর্য্যাদাবান হইবে।

× আইনের শাসন প্রবর্তনে সোনালী আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নবী (দঃ) এখানে দেখাইয়াছেন। শাসনকর্তাকে প্রতিটি আইন সর্বপ্রথম নিজের গোষ্ঠির উপর প্রয়োগ করিতে হয়।

হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে আদর্শ আইন প্রবর্তন করিতে যাইয়া নবী (দঃ) দেশের প্রচলিত রীতিকে বাতিল ঘোষণা করিলেন এবং সেই আইনকে সর্বপ্রথম নিজের গোষ্ঠির উপর প্রয়োগ করিলেন—আপন ভাতিজার দাবীকে উক্ত আইনে বাতিল করিয়া দিলেন। তদ্রূপ সুদের পাওনা বাতিল করার আইন নবী (দঃ) সর্বপ্রথম নিজ চাচার উপর প্রয়োগ করিলেন। তাঁহার চাচা আব্বাস (রাঃ) লগ্নির ব্যবসা করিতেন; লোকদের নিকট সুদের বহু টাকা তাঁহার পাওনা ছিল। সেই সব টাকার দাবীকে নবী (দঃ) বাতিল করিয়া দিলেন।

÷ অর্থাৎ শুধু ভোগ দখলের দ্বারা মালিকানা সত্ত্ব কায়েম হইবে না।

● اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ فَاتَّقُوْا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ اِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَاِنَّ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ وَعَلَيْهِنَّ اَنْ لَا يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَاِنْ فَعَلْنَ فَقَدْ اُذِنَ لَكُمْ اَنْ تَهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَتَضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَاِنِ انْتَهَيْنَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَا يَمْلِكْنَ لِاَنْفُسِهِنَّ شَيْئًا وَاِنَّكُمْ اِنَّمَا اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ.

(৬) পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্ব প্রাপ্ত, অতএব হে পুরুষগণ ! নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখিও। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক আছে, স্ত্রীদেরও হক তোমাদের উপর রহিয়াছে। তোমাদের বড় হক তাহাদের উপর এই যে, তাহারা তোমাদের বিছানায় অন্যের স্থান দিবে না যাহা তোমাদের অসহনীয় (স্বীয় সতীত্ব পূর্ণরূপে রক্ষা করিবে।) এবং এই হক যে, তাহারা এমন কোন কাজ করিবে না যাহা সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা, ফাহেসা ও বেহায়াপনা; যদি ঐরূপ কাজ করে তবে তোমাদের জন্য অনুমতি আছে, শয্যায় তাহাদের হইতে বিমুখ বিরাগী হইয়া থাকা; আরও প্রয়োজন হইলে শাস্তিও দিতে পার, কিন্তু আঘাত জনিত প্রহার করিতে পারিবে না। শাস্তিমুলক ব্যবস্থায় যদি নির্লজ্জ কাজ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায় তবে ভদ্রোচিত খোরপোশের পূর্ণ অধিকার তাহাদের জন্য প্রবর্তিত থাকিবে। আমার বিশেষ নির্দেশ নারীদের সম্পর্কে পালন করিও যে, তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার বজায় রাখিবে; তাহারা তোমাদের স্বামীত্বের বন্ধনে আবদ্ধা রহিয়াছে, স্বেচ্ছাধীন তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের পথ নিজে গ্রহণ করার সুযোগ তাহাদের নাই। তোমরা তাহাদিগকে লাভ করিয়াছ আল্লার আমানতরূপে এবং তাহাদের সতীত্বকে নিজের জন্য হালাল করিতে পারিয়াছ আল্লার বিধানের অধীনে। (সেই আল্লার রসুল আমি তাহাদের সম্পর্কে তোমাদেরে এই সব নির্দেশ দিলাম।)

● لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِهَا اِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

(৭) কোন মহিলা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত সংসারের কোন কিছু ব্যয় করিবে না। প্রশ্ন করা হইল, খাদ্যবস্তুও নয়—ইয়া রসুলুল্লাহ!

হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহাত উত্তম মাল পরিগণিত। (আল্লারই রসুল—আমি তোমাদের সম্পর্কে তোমাদের প্রতি এই সব নির্দেশ দিলাম।)	وَلَا الْأَنْعَامَ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ـ
(৮) হে জনমণ্ডলী! তোমরা আমার কথা ভালভাবে বুঝিয়া রাখ। আমি আমার দায়িত্ব পৌঁছাইয়া দিয়াছি, তদুপরি এমন জিনিষ তোমাদের জন্য রাখিয়া যাইতেছি যে, যাবৎ তোমরা উহাকে দৃঢ়রূপে আঁকড়িয়া থাকিবে কিছুতেই কস্মিন কালেও তোমরা ভ্রষ্টতায় পতিত হইবে না; উহা অতি পরিস্কার উজ্জল জিনিষ —আল্লার কেতাব (কোরআন শরীফ) এবং আল্লার নবীর ছুন্নাহ (হাদীছ)।	● فَاعْقِلُوْا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهٖ لَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا ـ أَمْرًا بَيِّنًا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهٖ ـ
(৯) হে লোক সকল! তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়া শোন এবং উহাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি কর। জানিয়া রাখিও—প্রত্যেক মোসলমান অপর মোসলমানের ভাই এবং সকল মোসলমান পরস্পর ভাই ভাই, কাহারও জন্য স্বীয় ভ্রাতার কোন জিনিষ হস্তগত করা জবর দখল করা হালাল নহে, অবশ্য যদি কেহ নিজ মনের খুশিতে কোন কিছু দিয়া দেয়।	● أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوْا قَوْلِي وَاعْقِلُوْهُ تَعْلَمُنَّ كُلُّ مُسْلِمٍ أَخُ الْمُسْلِمِ وَأَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ إِخْوَةٌ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ أَخِيْهِ إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ مِنْ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ـ
(১০) নাক-কান কাটা কালা হাবশী গোলামকেও যদি কোন কাজে তোমাদের উপরস্থ নিয়োগ করা হয় এবং সে আল্লার কেতাব কোরআন তথা শরীয়ত অনুযায়ী তোমাদিগকে পরিচালিত করে তবে তোমরা তাহার কথা মানিয়া চলিবে এবং তাহার আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করিবে, যাবৎ না সুস্পষ্ট আল্লার নাফরমানী দেখিতে পাও।	● إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاسْمَعُوْا لَهٗ وَأَطِيْعُوْا حَتّٰى تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا ـ
(১১) সতর্ক থাকিও, সতর্ক থাকিও দাস-দাসী (এবং করতলগত ভৃত্য-মজদুরদের) সম্পর্কে।	● أَرِقَّائَكُمْ أَرِقَّائَكُمْ أَطْعِمُوْهُمْ

مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَاَكْسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ -

তোমরা যেরূপ খাইবে তাহাদেরও অবশ্যই খাওয়ার ব্যবস্থা করিবে। তোমরা যেরূপ পরিবে তাহাদেরও অবশ্যই পরার ব্যবস্থা করিবে।

● اَلَا اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ اَنْ يُّعْبَدَ فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَبَدًا وَلٰكِنْ سَتَكُوْنُ لَهٗ طَاعَةٌ فِيْمَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ اَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضٰى بِهٖ -

(১২) তোমাদের এই পবিত্র ভূখণ্ডে শয়তান-পূজা পুনঃ প্রচলিত হইবে—ইহা হইতে শয়তান চিরতরে হতাশ হইয়াছে; কিন্তু তোমরা যাহা ছোট বা হাল্কা গণ্য কর সেইরূপ পাপেও শয়তার সন্তুষ্ট হইবে। (আর শয়তানকে সন্তুষ্ট করিলে ধাপে ধাপে তোমাদের উপর ধ্বংস নামিয়া আসিবে।)*

● اَلَا لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ ضُلَّالًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْئَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ -

(১৩) খবরদার—তোমরা আমার পরে পথভ্রষ্ট হইয়া যাইও না—(দলাদলি, মারামারি স্বার্থের লড়াই করিয়া একে অন্যকে আক্রমণ ও) হত্যা করিও না। অচিরেই তোমাদিগকে আল্লার দরবারে হাজির হইতে হইবে; আল্লাহ তোমাদের কার্য্যাবলীর হিসাব নিবেন।

● اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ صَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاٰتُوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ وَاَطِيْعُوْا ذَا اَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ -

(১৪) তোমাদের প্রভু পরওয়ারদেগারের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে, পাঞ্জেগানা নামায পড়িবে, রমজান মাসের রোযা রাখিবে, নিজ নিজ মালের যাকাত আদায় করিবে, উপরস্থের নিয়মানুবর্ত্তী থাকিয়া শান্তি বজায় রাখিবে—এই সবই হইল, প্রভু-পরওয়ারদেগারের বেহেশত লাভের অবলম্বন।

● اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ اَدّٰى اِلٰى كُلِّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهٗ وَاِنَّهٗ لَا يَجُوْزُ وَصِيَّةٌ لِّوَارِثٍ (وَلَا اِقْرَارٌ) وَالْوَلَدُ

(১৫) হে লোক সকল! আল্লাহ তায়ালা মিরাস বন্টনে প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য (পবিত্র কোরআনে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; কোন ওয়ারেসের জন্য (উহার অতিরিক্ত বেশী পাইবার সুযোগ দানার্থে) কোন প্রকার অছিয়াত

---

* এই অবস্থা সর্ব ক্ষেত্রেই। যেখানে ইসলামী সমাজ মজবুতরূপে গড়িয়া উঠিবে এবং মূর্তি ও দেব-দেবী ইত্যাদির শয়তানী পূজা বন্ধ হইয়া যাইবে সেখানেও সকলকে সতর্ক ও সচেতন থাকিতে হইবে যে, অন্যান্য পাপাচার দ্বারা যেন শয়তানকে সন্তুষ্ট করা না হয়। অন্যথায় সেখানেও ধাপে ধাপে ধ্বংস নামিয়া আসিবে।

لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ
عَلَى اللّٰهِ وَمَنِ ادَّعَى اِلَى غَيْرِ
اَبِيْهِ اَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ
لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
اَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ لَهُ صَرْفًا
وَلَا عَدْلًا ۔

কার্য্যকরী হইবে না। (কোন স্বীকৃতিও কার্য্যকরী হইবে না।) কোন নারীর বৈধ সম্পর্ক যে পুরুষের সহিত থাকিবে উক্ত নারীর সন্তানের বংশ তাহার সঙ্গেই গণ্য হইবে; প্রকৃত অবস্থার ব্যাপারে তাহাদের হিসাব আল্লার নিকট হইবে। ব্যাভিচারের দ্বারা বংশ-সম্পর্ক স্থাপিত হইবে না, পক্ষান্তরে ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে। যে ব্যক্তি নিজের পিতা তথা জন্মের বংশ ছাড়িয়া নিজকে অন্য বংশের সম্পৃক্ত করিবে এবং উহার নামে আত্মপরিচয় দিবে বা নিজের মনিব ছাড়িয়া অন্য মনিবের পরিচয় দিবে তাহার উপর আল্লার লা'নৎ এবং সমস্ত ফেরেশতা ও সকল লোকদের লা'নৎ হইবে; তাহার ফরজ নফল কোনও এবাদত আল্লাহ্ কবুল করিবেন না। (এই জালিয়াতির প্রতারণা ও ভ্রান্তি সুদূর-প্রসারি।)

● قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْيَوْمَ
اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ
الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۔

(১৬) আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়া দিয়াছেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন বা ধর্মকে সম্পূর্ণতার পর্য্যায়ে পৌঁছাইয়া দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ নেয়ামত ইসলামকে পূর্ণত্ব দান করিলাম এবং একমাত্র ইসলামকেই তোমাদের দ্বীন ও জীবন-ব্যবস্থারূপে তোমাদের জন্য পছন্দ করিয়া নিলাম। (সুতরাং কোন রকম পরিবর্তন, সংযোজন ও সংশোধন ব্যতিরেকে তোমরা একমাত্র এই দ্বীন-ইসলামের অনুসরণ করিবে।)

● اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِىَّ
بَعْدِىْ قَدِ انْقَطَعَ الْوَحْىُ ۔

(১৭) আমি সর্বশেষ নবী; আমার পরে আর কোন নবী আসিবে না। আমার পরে অহী চিরতরে বন্ধ। (সুতরাং দ্বীন-ইসলামের কোন অংশে Amendment সংযোজন Correction সংশোধন Modify বদলানো, Change রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা ও অবকাশই থাকিল না।)

(১৮) হে জনমণ্ডলী! আমি মানুষই বটি; হয়ত অচিরেই প্রভু-পরওয়ারদেগারের দুত আমাকে নিয়া যাওয়ার জন্য আমার নিকট পৌঁছিবে, আমি তখন প্রভুর ডাকে সারা দিব। অতএব (সমুদয় দায়িত্ব আমার হইতে বুঝিয়া রাখিয়া) প্রত্যেক উপস্থিত অনুপস্থিতকে পৌছাইয়া দিবে।

● اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ اَنْ يَاتِىَ رَسُوْلُ رَبِّى فَاُجِيْبَ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ـ

(১৯) চারটি বিষয় বিশেষ অনুধাবনযোগ্য ১। কোন বস্তুকে আল্লার তুল্য (পূজনীয় বা সঙ্গী-সাথী) গণ্য করিবে না, ২। আল্লার নিষিদ্ধ—না-হকরূপে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিবে না, ৩। ব্যভিচার করিবে না, ৪। চুরি করিবে না।

● اِنَّمَا هُنَّ اَرْبَعٌ ـ لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَسْرِقُوْا ـ

আরফার দিন ভাষণের শেষ দিকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—

(২০) ভাই সকল। আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে (কেয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসা করা হইবে (যে, আল্লার দ্বীন পৌঁছাইবার কর্তব্য আমি কিরূপ আদায় করিয়াছি।) তোমরা তখন কি বলিবে? উপস্থিতবর্গ বলিয়া উঠিল, আমরা সাক্ষ্য দিব, নিশ্চয় আপনি দ্বীনকে পূর্ণরূপে পৌছাইয়াছেন; আপনার কর্তব্য পূর্ণ আদায় করিয়াছেন, আমাদের সকল প্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রচেষ্টা আপনি করিয়াছেন। তখন নবী (দঃ) স্বীয় শাহাদতের অঙ্গুল আকাশের প্রতি উর্দ্ধমুখী এবং লোকদের প্রতি নিম্নমুখী করতঃ বলিলেন, হে আল্লাহ। সাক্ষী থাকিও, হে আল্লাহ। সাক্ষী থাকিও, হে আল্লাহ। সাক্ষী থাকিও—এইরূপ তিনবার করিলেন।

● وَاَنْتُمْ تُسْئَلُوْنَ عَنِّى فَمَا اَنْتُمْ قَائِلُوْنَ؟ قَالُوْا نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَاَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ ـ فَقَالَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا اِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا عَلَى النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ

ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর সম্মুখে যে স্বীকৃতি ও সাক্ষ্য দানের অঙ্গীকার প্রদান করিয়াছিলেন পরবর্তীকালে মোসলমানগণ পবিত্র মদীনায় হযরতের রওজা পাকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দরূদ ও সালাম পাঠ লগ্নে উক্ত স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার প্রদানের উক্তি করিয়া থাকে। এই রীতি পূর্বাপর প্রচলিত রহিয়াছে এবং থাকিবে; দরূদ-সালাম পাঠ শিক্ষা দান ক্ষেত্রে অবশ্যই উহার উল্লেখ থাকে।

হজ্জ উপলক্ষে এবং বিধর্মীদের হাট-বাজারে ব্যবসা করা

৯১২। **হাদীছ:**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "জুল-মাজায" "ওকাজ" ইত্যাদি নামক অন্ধকার যুগের কতিপয় হাট বা মেলা ছিল যাহা হজ্জ উপলক্ষে মক্কার নিকটস্থ বা মক্কার পথে অনুষ্ঠিত হইত। বিভিন্ন দেশের লোকজন হজ্জ উপলক্ষে এই সব হাট-বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত; ইসলাম আবির্ভাবের পর মোসলমানগণ ঐরূপে হজ্জের ছফরে ব্যবসা করাকে অসঙ্গত ভাবিতে লাগিল। সেই ধারণা খণ্ডনে কোরআন শরীফের এই আয়াত নাযেল হইল—

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ -

অর্থ:—তোমরা (হজ্জ উপলক্ষেও) হালাল রুজি উপার্জনের চেষ্টা করিতে পার, তাহাতে কোন গোনাহ হইবে না। (২ পাঃ ৯ রুঃ)

ওমরা করা আবশ্যক এবং উহার ফজিলত

● ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেককেই হজ্জ ও ওমরা উভয়ই করা চাই।

● ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, কোরআন শরীফে হজ্জের সঙ্গে ওমরাও উল্লেখ আছে, যথা—وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ "হে মোসলমানগণ! তোমরা আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় কর।"

৯১৩। **হাদীছ:**— عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا

بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهٗ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ -

অর্থ:—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একবার ওমরা করার পর দ্বিতীয়বার ওমরা করার মধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায় এবং আল্লার দরবারে গ্রহণীয় তথা শুদ্ধ হজ্জের একমাত্র প্রতিদান হইল বেহেশত।

হজ্জের পূর্বে ওমরা করা

৯১৪। হাদীছঃ—একরেমা ইবনে খালেদ (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে হজ্জের পূর্বে ওমরা করার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, উহাতে দোষ নাই এবং ইহাও বলিলেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জ করার পূর্বে ওমরা করিয়াছেন।

৯১৫। হাদীছঃ—কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতটি ওমরা করিয়া ছিলেন? তিনি বলিলেন, চারটি ওমরা করিয়াছেন—(১) (ষষ্ঠ হিজরী সনে ঐতিহাসিক) হোদায়বিয়ার ঘটনার ওমরা (২) (সপ্তম হিজরী সনে) উক্ত হোদায়বিয়ার ঘটনার অসম্পন্ন ওমরার কাজা-ওমরা (৩) (অষ্টম হিজরী সনে) হোনায়নের জেহাদে জয়লাভ করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা হইতে ১৩।১৪ মাইল দূরে অবস্থিত "জোয়েররানা" নামক স্থানে অবস্থানরত ছিলেন। তথা হইতেও তিনি (রাত্রে মক্কায় আসিয়া) একটি ওমরা করিয়াছেন *। (৪) বিদায়-হজ্জে হজ্জের পূর্বেকার ওমরা। প্রথম তিনটির প্রত্যেকটি (সংশ্লিষ্ট বৎসরের) জি-কা'দা মাসে এবং চতুর্থটি হজ্জের সঙ্গেই জিলহজ্জ মাসে করা হইয়াছিল।

ব্যাখ্যাঃ—প্রথম ওমরা তথা হোদায়বিয়ার ওমরাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্যান্য ওমরার সহিত গণনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ উহা অনুষ্ঠীত হইতে পারে নাই। মক্কায় পৌছিবার পূর্বে মক্কা হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত "হোদায়বিয়া" নামক স্থানে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কাফেরগণ কর্তৃক মক্কা প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হন। এমনকি ওমরার কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া ঐ স্থানেই ওমরার এহরাম ভঙ্গ করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। ঘটনার বিবরণ (ইনশা আল্লাহ তায়ালা) তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইবে।

এই ঘটনায় হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রায় পনর শত ছাহাবী সঙ্গে লইয়া ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলেন। তাঁহারা কোরবাণীর জানোয়ার সঙ্গে লইয়া মিকাত হইতে এহরাম বাঁধিয়া চলিতে থাকেন। শত্রুগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ঐ ওমরা সম্পন্ন করিতে তাঁহারা সক্ষম হন নাই বটে, কিন্তু ওমরা করার সমুদয় চেষ্টা ও ব্যবস্থাই তাঁহারা করিয়াছিলেন সুতরাং আল্লাহ তায়ালার নিকট উহার পূর্ণ ছওয়াব লাভ হওয়া স্থিরকৃত। তাই উহাকে একটি ওমরা গণ্য করা হইয়াছে। অবশ্য বাহ্যিক কার্য্যে উহা সম্পন্ন হয় নাই; সদ্ধরুণ হযরত (দঃ) ঐ ঘটনায় সন্ধিপত্রের সুযোগ অনুযায়ী পর বৎসর ঐ অসম্পূর্ণ ওমরার কাজা করিয়াছেন; যাহাকে দ্বিতীয় ওমরা গণনা করা হইয়াছে।

---

* বর্তমানেও হাজীগণ তথা হইতে ওমরা করিয়া থাকেন। আমি নরাধমও তথায় উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। বর্তমান সময় সাধারণ্যে ঐ স্থান হইতে এহরাম বাধিয়া ওমরা করাকে বড় ওমরা বলা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ--হজ্জে-কেরাণ ও হজ্জে-তামাত্তো' প্রকারের হজ্জকারীদের হজ্জের পূর্বে ওমরা আদায় করিতে হয়; হজ্জের পূর্বে এই ওমরা আদায় করা সম্পর্কে কোন দ্বিমতের অবকাশই নাই। উল্লিখিত হাদীছ সমূহে যে, হজ্জের পূর্বে হযরতের ওমরার উল্লেখ আছে তাহা ঐ শ্রেণীর ওমরাই ছিল। কারণ, হযরত (দঃ) হজ্জে-কেরাণকারী ছিলেন। কিন্তু কোরবাণীর পশু বিহীন হজ্জে-তামাত্তো'কারী ব্যক্তি মক্কায় উপস্থিত হইয়া ওমরা আদায় করিয়া হজ্জের পূর্ব পর্য্যন্ত এহরামবিহীন মক্কায় অবস্থান করে—সেই সময় ঐ ব্যক্তি "তানয়ীম" ইত্যাদি স্থান হইতে এহরাম বাঁধিয়া আসিয়া যদি ওমরা করিতে চায় যেরূপ হজ্জের পরে সচরাচর সকলেই করিয়া থাকে তাহা জায়েয কি-না ?

এই মছআলাহ ফতওয়া শামী দ্বিতীয় খণ্ডে ২০৮ ও ১৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, হজ্জের পূর্বে ঐরূপ ওমরা সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও মতে উহা নিষিদ্ধ মকরূহ এবং কাহারও মতে উহা দোষমুক্ত জায়েয।

অবশ্য—দলীল প্রমাণের দিক দিয়া জায়েয হওয়াই অগ্রগণ্য দেখা যায়, কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে ঐরূপ করিতে সাধারণতঃ দেখা যায় না। কার্য্য ক্ষেত্রে উহা না করাই অগ্রগণ্য দেখা যায়।

রমজান মাসে ওমরা করার ফজিলত

৯১৬। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনা নিবাসী একটি স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গে হজ্জ করিতে যাও নাই কেন ? সে আরজ করিল, আমাদের দুইটি মাত্র উট আছে। উহার একটিকে লইয়া আমার স্বামী ও পুত্র বিদেশে চলিয়া গিয়াছিল এবং দ্বিতীয়টি পানি বহনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। (অতএব আমার কোন যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না বলিয়া আমি হজ্জে যাইবার সুযোগ পাই নাই।) রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, (সুযোগ হইলে পর) রমজান শরীফে ওমরা করিয়া নিও; রমজান শরীফের ওমরা হজ্জ সমতুল্য।

"তানয়ীম" নামক স্থান হইতে ওমরা করা

৯১৭। হাদীছঃ—আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন, তিনি যেন (স্বীয় ভগ্নি) আয়েশা (রাঃ)কে নিজ বাহনে বসাইয়া "তানয়ীম" নিয়া যান এবং তথা হইতে তাহার ওমরা সম্পন্ন করাইয়া দেন।

৯১৮। হাদীছঃ—আছওয়াদ (রঃ) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার সঙ্গীগণ সরাসরি হজ্জ ও ওমরা দুইটি আমল লইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছে, আর আমি শুধু হজ্জ নিয়া যাইতেছি। আয়েশা (রাঃ)কে বলা হইল, তুমি পবিত্র হইলে পর তানয়ীমে যাইও এবং তথা হইতে ওমরার

এহরাম বাঁধিয়া আসিয়া ওমরা আদায় করিও। কিন্তু ব্যয় ও কষ্টের পরিমাণেই ওমরার ছওয়াব হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—ওমরার এহরাম হরম শরীফের সীমার বাহিরে বাঁধিতে হয় এবং হরমের সীমা মক্কার বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন পরিমাণের দূরত্বে অবস্থিত। "তানয়ীম" নামক স্থানটি মক্কার সন্নিকটে—প্রায় তিন মাইল দূরে হরমের সীমার বাহিরে অবস্থিত এবং এই দিকেই হরমের সীমার দূরত্ব কম। এই জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশা (রাঃ)কে তথায় যাইয়া ওমরার এহরাম বাঁধার পরামর্শ দিলেন। ঐ ঘটনায় একা আয়েশা (রাঃ)ই ওমরা করিয়াছিলেন না। আবদুর রহমান (রাঃ)ও ওমরা করিয়াছিলেন বলিয়া বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে। অতএব ঐরূপ ওমরার ফজিলত অবশ্যই আছে।

বর্তমানেও হাজীগণ সেই স্থানে যাইয়া ওমরার এহরাম বাঁধিয়া ওমরা করিয়া থাকেন। ইহাকে সাধারণ্যে ছোট ওমরা বলা হয়, কারণ ঐ স্থানটি মক্কা নগরীর নিকটবর্তী মাত্র তিন মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। বর্তমানে ঐ স্থানে একটি মসজিদ আছে উহাকে মসজিদে আয়েশা বলা হয়; ঐ স্থান হইতেই আয়েশা (রাঃ) এহরাম বাঁধিয়াছিলেন। মক্কা নগরী হইতে বার-তের মাইল ব্যবধানে "জেয়েররানা" নামক আর একটি স্থান আছে। তথা হইতে একবার রসুলুল্লাহ (দঃ) ওমরা করিয়াছিলেন। তথা হইতে ওমরা করাকে সাধারণ্যে বড় ওমরা বলা হয়।

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, হজ্জের পরে ওমরা করা জায়েয এবং এই মছআলাহও প্রমাণিত হইয়াছে যে, এরূপ ওমরার জন্য কোরবাণী করিতে হইবে না বা রোজাও রাখিতে হইবে না (২৪০ পৃঃ)। অর্থাৎ হজ্জের পূর্বে ওমরা করিয়া হজ্জ করিলে সেই হজ্জ "হজ্জে-কেরাণ" বা "হজ্জে-তামাত্তো" হইয়া থাকে এবং উহার জন্য একটি কোরবাণী দেওয়া আবশ্যক হয়। কোরবাণী দেওয়ার সুযোগ পাওয়ার আশা না থাকিলে কোরবাণীর ঈদের দিনের পূর্বে তিনটি এবং বাড়ী ফিরিয়া সাতটি মোট দশটি রোজা রাখিতে হয়। এই সকল ব্যবস্থা তখনই অবলম্বিত হইবে যখন ওমরা হজ্জের পূর্বে করা হয়। কিন্তু হজ্জের পরে ওমরা করিলে ঐ কোরবাণী বা রোজার কোনই প্রয়োজন হইবে না। অবশ্য ছওয়াবও সেই অনুপাতে কম বেশী হইবে।

শেষ বাক্যটির মর্ম এই যে, হজ্জ ছাড়া শুধু ওমরার জন্য বাড়ী হইতে দীর্ঘ ব্যয় ও পথ অতিক্রম করতঃ মক্কায় পৌছিয়া ওমরা করা উত্তম এবং উহার ছওয়াব অনেক বেশী—ঐ ওমরা অপেক্ষা যেই ওমরা হজ্জের ছফরেই আদায় করা হয়। তদ্রূপ হজ্জের ছফরেই হজ্জের পূর্বে ওমরা করতঃ হজ্জে-কেরাণ বা হজ্জে-তামাত্তো করা যাহাতে কোরবাণী বা রোযা ওয়াজেব হয় উহাতে ছওয়াব বেশী হইবে হজ্জের পরে ওমরা করা অপেক্ষা।

মছআলাহ ঃ—শুধু ওমরা সমাপনান্তে মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন মুহূর্তে বিদায় তওয়াফ করার প্রয়োজন হয় না। (১৪০ পৃঃ)

কি কি কার্য্যে ওমরা পূর্ণ হয়

জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জে নবী (দঃ) ছাহাবীগণকে আদেশ করিলেন—নিজ নিজ এহরাম ওমরায় পরিণত করিবার জন্য। (বাইতুল্লাহ শরীফ) প্রদক্ষিণ (তথা তওয়াফ ও ছাফা মারওয়া প্রদক্ষিণ তথা ছায়ী) করিয়া তারপর মাথার চুল ফেলিয়া হালাল হইতে।

৯১৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হিজরী সাত সনে কাজা ওমরা আদায় করাকালে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম ওমরা করিলেন; আমরাও তাঁহার সহিত ওমরা করিলাম। মক্কায় আসিয়া হযরত (দঃ) তওয়াফ করিলেন, আমরাও তাঁহার সহিত তওয়াফ করিলাম। অতঃপর হযরত (দঃ) "ছায়ী" তথা ছাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় প্রদক্ষিণে আসিলেন; আমরাও তাঁহার সহিত আসিলাম। আমরা হযরত (দঃ)কে ঘিরিয়া রাখিতাম যেন কোন কাফের হযরত (দঃ)কে কিছু নিক্ষেপ করিতে না পারে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, নবী (দঃ) কি ঐ উপলক্ষে কা'বা শরীফে প্রবেশ করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, না। ঐ ব্যক্তি আরও বলিল, হযরত নবী (দঃ) উম্মুল-মোমেনীন খাদীজা (রাঃ) সম্পর্কে যে বিশেষ সুসংবাদের কথা বলিয়াছেন, তাহাও বর্ণনা করুন। তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, তোমরা খাদীজার জন্য সুসংবাদ শুনিয়া রাখ—বেহেশতের মধ্যে একটি বিশেষ কক্ষের যাহা একটি মতি খনন করিয়া তৈরী করা হইবে; তথায় সুখ শান্তিই বিরাজমান থাকিবে কোন প্রকার কোলাহল বা অশান্তির লেশমাত্র থাকিবে না।

৯২০। হাদীছঃ—আবুবকর (রাঃ) তনয়া আসমার খাদেম আবদুল্লাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আসমা (রাঃ) যখনই (মক্কা শহরস্থিত) "হাজুন"* এলাকা দিয়া গমন করিতেন তখনই বলিতেন—

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

"আল্লাহ তায়ালা আমাদের দরূদ পৌঁছাইয়া দিন তাঁহার রসুলের প্রতি—আল্লাহ তায়ালা আমাদের দরূদ পৌঁছাইয়া দিন (হযরত) মোহাম্মদের প্রতি।" তিনি বলিতেন, এই স্থানেই আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে (বিদায়-হজ্জে)

---

* "হাজুন" মক্কা শহরের একটি মহল্লা। ১৯৫০ ইং সনের হজ্জে তথায় উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছিল; তখনও উহা এই নামে পরিচিত ছিল। নবী (দঃ) বিদায় হজ্জে মক্কায় প্রবেশ করিয়া উক্ত স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং তখন তথায় হযরতের বিশেষ পতাকা উড্ডিন করা হইয়াছিল। বর্তমানে উক্ত স্থানে একটি মসজিদ রহিয়াছে যাহাকে "মসজিদে রায়াহ" বলা হয়। "রায়াহ" শব্দের অর্থ পতাকা; মনে হয়—উল্লেখিত পতাকা স্থলেই মসজিদ তৈরী হইয়াছে, তথায় নফল নামায পড়ার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

অবতরণ করিয়াছিলাম, তখন আমরা সাধারণতঃ জনটনের মধ্যে ছিলাম—আমাদের সম্বল কম ছিল, যানবাহনেরও অভাব ছিল।

আমি এবং আমার ভগ্নি আয়েশা (রাঃ) এবং স্বামী যোবায়ের (রাঃ) এবং অমুক অমুক আমরা (মিকাত—এহরামের নির্দ্ধারিত সীমানা হইতে) ওমরার এহরাম বাঁধিয়া আসিয়া ছিলাম। আমরা বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ (এবং উহারই আনুসঙ্গিক—ছাফা-মারওয়ার ছায়ী) সমাপ্ত করিয়া হালাল—এহরামমুক্ত হইয়াছিলাম। তারপর বিকাল বেলার দিকে হজ্জের এহরাম বাঁধিয়াছিলাম।*

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্মৃতি-চিহ্ন "হাজুন" এলাকায় পৌঁছিলেই আবু বকর (রাঃ)-তনয়া আসমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রাণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্মরণে কাঁদিয়া উঠিত এবং হযরতের প্রতি মহব্বতের অগ্নি তাঁহার প্রাণে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিত। আসমা (রাঃ) তৎক্ষণাৎ সেই স্মৃতিকে এবং সেই স্মৃতি দর্শনের প্রতিক্রিয়াকে দরূদ পাঠে স্বাগত জানাইতেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মহব্বৎ তাঁহার যে কোন উম্মতের অন্তরে থাকিবে তাহার অবস্থা তদ্রুপ হওয়াই নিতান্ত স্বাভাবিক। মক্কা-মদীনায় হযরতের অসংখ্য স্মৃতি ও স্মরণ-স্বাক্ষর চিরবিদ্যমান রহিয়াছে; এতদ্ভিন্ন হযরতের মোবারক নাম, হযরতের হাদীছ, হযরতের বৈশিষ্ট্যাবলী এবং হযরতের যে কোন আলোচনা সবই হযরতের স্মৃতি ও স্মরণ-স্বাক্ষর। প্রত্যেক উম্মতকে সেই সব ক্ষেত্রসমূহে আসমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ভূমিকা ও আদর্শের অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়—

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى حَبِيْبِهٖ صَلَّى اللّٰهُ

عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

হজ্জ বা জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন কালের দোয়া

৯২১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জেহাদ হইতে কিম্বা হজ্জ বা ওমরা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে চলার পথে কোন উচু টিলা অতিক্রম করিলে ঐ স্থানে তিনবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করিতেন, অতঃপর এই দোয়া পড়িতেন—

---

* হজ্জ উপলক্ষে মিকাত হইতে শুধু ওমরার এহরাম বাধিয়া মক্কায় পৌঁছিলে ওমরার কার্য্যদ্বয় আদায় করিলেই চুল ফেলিয়া ওমরার এহরাম খুলিয়া ফেলিতে হয়। তারপর হজ্জের জন্য নূতন এহরাম বাধিতে হয়, উহার সর্বশেষ তারিখ হইল ৮ই জিলহজ্জ; ইহার পূর্বেও এহরাম বাঁধা যায়। আসমা (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে তাঁহাদের এই এহরাম জিলহজ্জের চার কিম্বা পাঁচ তারিখে ছিল।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ.

অর্থ:—আল্লাহ্ ভিন্ন কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই, তিনি এক—তাঁহার কোন শরীক নাই। রাজত্ব ও প্রভুত্ব একমাত্র তাঁহারই এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁহারই জন্য, তিনি সর্বশক্তিমান। আমরা (তাঁহারই কৃপায়) প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হইয়াছি। আমরা নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে তাঁহার দরবারে তওবাকারী ও ক্ষমাপ্রার্থী। আমরা তাঁহার এবাদৎ বন্দেগী ও দাসত্ব শৃঙ্খলে চিরকাল আবদ্ধ থাকিব, তাঁহার বরাবরে চিরকাল সর্বাঙ্গে ও সর্বান্তঃকরণে নত থাকিব।

আমরা চিরকাল আমাদের রক্ষাকর্তা পালনকর্তার গুণগান করিব। তিনি স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছেন যে, তিনি স্বীয় বন্দাকে সাহায্য দান করিয়াছেন এবং শত্রুদলসমূহকে একমাত্র নিজ শক্তি ও ক্ষমতা বলে পরাজিত করিয়া দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা:—হযরত রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপরোক্ত দোয়ার শেষ বাক্য কয়টির মধ্যে বস্তুতঃ একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত ছিল। খন্দকের জেহাদের ঘটনা—আরবের সমস্ত বস্তি ও গোত্রের লোকেরা একত্র হইয়া স্থির করিল যে, প্রত্যেক গোত্র ও বস্তি হইতে বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী যোদ্ধাগণের সমবায়ে একটি বিপুল সংখ্যক সৈন্যদল গঠন করা হইবে। অতঃপর অতর্কিতে এক সঙ্গে সমগ্র মদীনার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া লইয়া আক্রমণ পরিচালনা করা হইবে। এইরূপে মোসলমানদের বিরুদ্ধে ১৫।২০ হাজার শত্রু সেনার এক বিভীষিকাপূর্ণ বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। সারা মদীনায় তখন মোসলমানদের সংখ্যা মাত্র ৩০০০ তিন হাজার। মদীনার শক্তিশালী ও ধনী অধিবাসী ইহুদীরা এত দিন মোসলমানদের মিত্র ছিল, এই সুযোগে তাহারাও শত্রুদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে মোসলমানদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার উদ্দেশ্যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিল। এইরূপে মুষ্টিমেয় নগণ্য সংখ্যক মোসলমান ভিতর ও বাহিরের বিরাট ও শক্তিশালী শত্রুদলের কবলে পড়িয়া তাহাদের শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়া পড়িল।

এইরূপ অসহায় অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদিগকে শুধু রক্ষাই করিলেন না বরং শত্রুদলকে এরূপ বেকায়দায় ফেলিলেন যে, বহিঃশত্রুদল অসহনীয় কষ্ট ক্লেশ ও দুঃখ-যাতনায় পরিবেষ্টিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল এবং গৃহশত্রুদল—ইহুদীরা মোসলমানদের হাতে পরাজিত হইয়া লাঞ্ছিত ও নিশ্চিহ্ন হইল। (ঘটনার বিবরণ ইনশা আল্লাহ তায়ালা

তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইবে।) খন্দক-জেহাদের মূল শত্রু পক্ষ পলায়ণ করিলে রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ বাক্যসমূহ দ্বারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ছফর ও ভ্রমণ অবস্থায় নানা কষ্ট-ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইয়া প্রত্যাবর্তনের সুযোগ লাভ ক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম করুণার প্রতীক ঐ ঘটনার স্মৃতি স্মরণ পূর্বক উহার প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ সমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করার উদ্দেশ্যেই এখানে ঐ বাক্যগুলি শামিল করা হইয়াছে।

হাজীদের আগমন এবং প্রত্যাবর্তনে অগ্রগামী হইয়া সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা

৯২২। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায়-হজ্জে) মক্কায় পৌঁছাকালে আবদুল মোত্তালেব বংশীয় কতিপয় তরুণ তাঁহাকে অগ্রগামী হইয়া সম্বর্দ্ধনা জানায়। নবী (দঃ) স্বীয় বাহনে তাহাদের একজনকে সম্মুখে আর একজনকে পেছনে বসাইয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন।

হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনে বাড়ী উপস্থিত হওয়া

শুধু হজ্জই নহে, বরং সর্বক্ষেত্রেই বিদেশ হইতে আগমনে গভীর রাত্রে বাড়ী না পৌঁছিয়া পারিলে তাহাই উত্তম এবং নবী (দঃ) সেই পরামর্শই দিয়াছেন ; এক হাদীছে তাহা উল্লেখ আছে। হাদীছটি ষষ্ঠ খণ্ডে—كتاب النكاح বিবাহ অধ্যায়ে ইন্‌শা আল্লাহ তায়ালা অনূদিত হইবে। বিদেশ হইতে বাড়ী উপস্থিত হওয়ার উত্তম সময় সকাল বেলা কিম্বা বিকাল বেলা।

৯২৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কার যাত্রাকালে মদীনার অনতিদূরে জুল-হোলায়ফায় (বর্তমান বাবুল) গাছের নিকটস্থ মসজিদ স্থানে (আছর) নামায পড়িয়াছেন। আর মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তনে সেই জুল-হোলায়ফার নিম্ন প্রান্তরে ভোর পর্যন্ত রাত্রি যাপন করিয়াছেন এবং তথায় নামায পড়িয়াছেন।

৯২৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদেশ হইতে গভীর রাত্রে পরিবার-পরিজনে আসিতেন না ; সকাল বেলা কিম্বা বিকাল বেলা আসিতেন।

৯২৫। হাদীছ ঃ—ছাহাবী বরা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের মদীনাবাসীদের (একটি কুসংস্কার খণ্ডন) সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল। মদীনাবাসীরা হজ্জের ছফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহারা স্বীয় ঘরের দরওয়াজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিত না, বরং পশ্চাদ দিকে পথ করিয়া সেই পথে ঘরে প্রবেশ করিত। একজন মদীনাবাসী

ছাহাবী প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘরের সম্মুখ দিকেরই দরওয়াজা দিয়া প্রবেশ করিল; সেজন্য তাহার নিন্দা করা হইল। তাই এই আয়াত নাজেল হইল—

لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى.
وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا

"ঘরের পশ্চাত দিক দিয়া প্রবেশ করা কোন নেক কাজ নহে, পরহেজগারী অবলম্বন করা হইল নেক কাজ, ঘরে প্রবেশ করিতে উহার দরওয়াজা দিয়াই প্রবেশ কর।" (২ পাঃ ৮ রুঃ)

৯২৬। **হাদীছঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বিদেশ ভ্রমণ অতি কষ্টকর; পানাহারে ব্যাঘাত ঘটায়, নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়। অতএব প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলে যথাসত্ত্বর পরিবার-পরিজনে ফিরিয়া আসিবে।

ব্যাখ্যাঃ—কোন নেক কাজের উদ্দেশ্যে বা শরীয়ত সম্মত কোন উত্তম উদ্দেশ্যে বিলম্ব করা প্রয়োজনের মধ্যেই শামিল।

এহরাম বাঁধার পর কাবা শরীফ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে প্রতিবন্ধকের সম্মুখী ব্যক্তি কি করিবে?

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى
يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ.

অর্থঃ—যদি তোমাদের কেহ (হজ্জ বা ওমরার এহরাম বাঁধিবার পর প্রতিবন্ধকের দরুণ কাবা পর্য্যন্ত পৌছিতে) অক্ষম হইয়া পড়ে তবে তাহাকে অবশ্যই পাঠাইতে হইবে একটি সহজসাধ্য কোরবাণীর জানোয়ার এবং যাবৎ ঐ কোরবাণীর জানোয়ার জবেহ হওয়ার নির্দ্ধারিত স্থানে (—হরম শরীফের সীমার ভিতর পৌছিয়া জবেহ হইয়া) না যায় তাবৎ সে ব্যক্তি মাথার চুল মুড়াইতে তথা এহরাম ভঙ্গ করিতে পারিবে না। (২ পাঃ ৮ রুঃ)

আতা (রঃ) নামক প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বলিয়াছেন—শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া বা রোগগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদি যে কোন প্রতিবন্ধকের দরুণ কাবা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে অক্ষম হইলে উক্ত আয়াতের আদেশ কার্য্যকরী হইবে।

৯২৭। **হাদীছঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র ওবায়দুল্লাহ (রঃ) এবং সালেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, উমাইয়া বংশের সিরিয়া কেন্দ্রিক শাসন ক্ষমতার বিরুদ্ধে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) পবিত্র মক্কা নগরীতে ভিন্ন শাসন ক্ষমতা

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উমাইয়া বংশের আমীর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের সময় তাহার প্রতিনিধি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর আক্রমণ চালাইতেছিল; সেই ঘটনা প্রবাহের বৎসর আমাদের পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হজ্জ করিতে উদ্যোগী হইলেন। আমরা তাঁহাকে বলিলাম, এই বৎসর হজ্জ না করিলে কোন ক্ষতি হইবে না; (আপনি এই বৎসর হজ্জ হইতে বিরত থাকুন।) আমাদের আশংকা হয়, আপনি এই বিশৃঙ্খলা ও অশান্তিপূর্ণ অবস্থায় মক্কায় পৌঁছিতে সক্ষম হইবেন না। এতচ্ছ্রবণে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই আশঙ্কা আমাকে বিরত রাখিতে পারিবে না। (কারণ, মক্কা বিজয়ের পূর্বে কাফের শত্রুগণ কর্তৃক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির আশঙ্কা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও) আমারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলাম। হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছিলে পর কাফেররা আমাদিগকে বাধা প্রদান করিল, আমরা কাবা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিলাম না। আমরা সকলেই এহরাম অবস্থায় ছিলাম এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোরবাণীর জানোয়ারও ছিল। (আমরা মক্কায় পৌছিয়া ওমরা আদায় করিতে সক্ষম না হওয়ায় ঐ স্থানেই এহরাম ভঙ্গের ব্যবস্থা করিলাম।) নবী (দঃ) স্বীয় কোরবাণীর জানোয়ার জবেহ করিলেন এবং মাথা মুড়াইয়া এহরাম ভঙ্গ করিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, তোমরা সাক্ষী থাকিও— আমি ইন্‌শা আল্লাহু তায়ালা ওমরা করার দৃঢ় সংকল্প লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিতেছি। যদি কাবা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হই তবে ওমরা আদায় করিব এবং যদি বাধাপ্রাপ্ত হই তবে আমিও ঐরূপই করিব যেরূপ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উপরোক্ত ঘটনার সময় করিয়াছিলেন। অতঃপর জুল-হোলায়ফা তথা মদীনাবাসীদের মিকাতে পৌছিয়া তিনি ওমরার এহরামই বাঁধিয়াছিলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কিছুক্ষণ পর বলিলেন, কাবা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে অক্ষম হইলে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের জন্য একই বিধান রহিয়াছে। (তখন যেহেতু হজ্জের সময় নিকটবর্তী,) তাই আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ওমরার সঙ্গে হজ্জে-কেরাণের নিয়্যত করিলেন।

অতঃপর তাঁহার মক্কায় পৌঁছিতে কোন বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি হইল না। তিনি হজ্জে কেরানের সমুদয় কার্য্যাবলী সমাধা করিয়া ১০ই জিলহজ্জ কোরবাণী করার পর ওমরা ও হজ্জ উভয় এহরাম হইতে মুক্ত হইলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এখানে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন উহা ষষ্ঠ হিজরী সনের ঘটনা। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি মক্কায় প্রবেশ করিয়াছেন

এবং মাথা মুড়াইয়া এহরাম খুলিতেছেন। নবীর স্বপ্ন অকাট্য সত্য—অহী, উহা মিথ্যা হইতে পারে না। মক্কা নগরী তখন রক্ত পিপাসু শত্রু কাফেরদের করতলগত থাকা সত্ত্বেও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং প্রায় পনর শত ছাহাবী তাঁহার সহগামী হইলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া মক্কার অনতিদূরে ১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত হোদায়বিয়া নামক স্থানে* পৌঁছিলে পর তখন মক্কায় পৌঁছিবার সমুদয় চেষ্টা তদবীরই বিফল হয়। অতএব তিনি ওমরা আদায় না করিয়া এহরাম ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন এবং (ঐ ময়দানের কিয়দাংশ যেহেতু হরম শরীফের সীমানাভুক্ত; সুতরাং) সেই স্থানেই কোরবাণীর জন্য আনিত জানোয়ার জবেহ করিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন।

নবীগণের স্বপ্ন অকাট্য সত্য—অহী হইয়া থাকে এবং এই ঘটনায়ও তাহাই ঘটিয়াছিল। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বপ্নে শুধু ইহাই দেখিয়াছিলেন যে, মক্কায় প্রবেশ করিয়াছেন। পরন্তু ইহা কোন সময় বা কোন বৎসর অনুষ্ঠিত হইবে তাহা স্বপ্নে ব্যক্ত হইয়াছিল না। কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বপ্নের অনতিকাল পরেই ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে যাত্রা করায় অনেকেই এই ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন যে, স্বপ্নের মর্ম এই বৎসরই প্রতিফলিত হইবে। তাঁহাদের ধারণা ভুল প্রতিপন্ন হইল বটে, কিন্তু হযরতের মূল স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হওয়ার ব্যবস্থা হইল। এই ঘটনা উপলক্ষে উভয় পক্ষ একটি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হইল এবং চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পরবর্তী বৎসর হযরত (দঃ) ওমরা করিলেন। তৎপরবর্তী বৎসর অষ্টম হিজরী সনে ত মক্কা জয় করিয়া উহার সমুদয় কর্তৃত্বই হস্তগত করিলেন। এইরূপে অহী পরিগণিত স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইল। বিস্তারিত বিবরণ ইনশা-আল্লাহ তায়ালা তৃতীয় খণ্ডে "হোদায়বিয়ার ঘটনা" পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

হজ্জ বা ওমরার এহরাম বাঁধার পর কোন ব্যক্তি মক্কায় পৌঁছিয়া হজ্জ বা ওমরা আদায় করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলে প্রথমতঃ তাহার এই চেষ্টাই করিতে হইবে যে, অন্ততঃ মক্কা শরীফ যাইয়া তওয়াফ ও ছায়ী করার সুযোগ লাভ করিতে পারে কি না। যদি পারে তবে তাহা করিয়া মাথা মুড়াইলে এহরাম মুক্ত হইয়া যাইবে। যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে তাহার জন্য এহরাম হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? এবং কি করিতে হইবে? এই বিষয়ে হানাফী মজহাব মতে কতিপয় মছআলাহ লেখা হইতেছে।

মছআলাহঃ— শুধু হজ্জ বা শুধু ওমরার এহরামে যদি হরমের এলাকা হইতে দূরে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তবে সে এক বৎসর বয়সের ছাগল বা দুই বৎসর বয়সের গরু, মহিষ বা পাঁচ বৎসর বয়সের উট বা ঐরূপ কোন একটি গৃহপালিত পশু হরম শরীফে ক্রয় করার মূল্য কোন আস্থাবান মানুষের মারফৎ হরম শরীফে পাঠাইবে এবং সেই পশুটি হরম শরীফের

এলাকায় জবেহ করার জন্য সম্ভাব্য রকমের তারিখ ও সময় ঐ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দিবে। ঐ ব্যক্তি এই সব বিষয় সম্মত হইয়া মক্কাভিমুখে চলিয়া যাওয়ার পর বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এহরাম অবস্থায়ই অপেক্ষমান থাকিবে। উল্লিখিত পশু জবেহ করার নির্দ্ধারিত তারিখ ও সময় অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর সে স্বীয় এহরাম হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে, ঐ সময় এহরাম ভঙ্গের সাধারণ নিয়ম—মাথা মুড়াইয়া ফেলা উত্তম।

মছআলাহ ঃ—যদি হজ্জে-কেরাণ অর্থাৎ হজ্জ ও ওমরা উভয়ের একত্র এহরামে ঐ অবস্থা হয় তবে উল্লিখিত রকমে দুইটি পশু জবেহ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ—প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন ব্যক্তির জন্য এহরাম হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় উহাই যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে অর্থাৎ একটি পশু হরম শরীফের এলাকায় জবেহ করায় ব্যবস্থা করা *। ইহা ব্যতীত এহরাম মুক্ত হওয়ার আর কোন উপায় নাই, তাই এই ব্যবস্থার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। যদি উহা কোন প্রকারেই সম্ভব না হয় বা ঐ কার্যের জন্য কোন লোক পাওয়া না যায় তবে কোন কোন আলেমের এরূপ মত আছে যে, সাময়িকরূপে প্রতিবন্ধকতার বা সম্ভাব্য স্থানেই একটি পশু জবেহ করিয়া এহরাম মুক্ত হইবে। অতঃপর হরম শরীফে জবেহ করার সুযোগ প্রাপ্তে পুনরায় আর একটি ঐরূপ পশু হরম শরীফে জবেহ করিবে।

মছআলাহ ঃ—উল্লিখিত আকারে পশু জবেহ করিয়া শুধু এহরাম মুক্ত হইবে বটে, কিন্তু পরিত্যক্ত এহরাম নফল বা ফরজ যে কোন প্রকারের হজ্জ বা ওমরার এহরামই হইয়া থাকুক না কেন উহার কাজা অবশ্য অবশ্যই করিতে হইবে, যাহার নিয়ম নিম্নরূপ। যদি শুধু ওমরার এহরাম ছিল তবে উহার কাজা একটি ওমরাই করিতে হইবে। যদি শুধু হজ্জের এহরাম ছিল, চাই ফরজ বা নফল, তবে অন্য বৎসর উহার কাজা করিতে একটি হজ্জ ও একটি ওমরা করিতে হইবে। অবশ্য পরিত্যক্ত এহরাম ফরজ হজ্জের থাকিলে অন্য বৎসর উহা পূরণ করার সময় কাজার নিয়্যত করিবে না। যদি পরিত্যক্ত এহরাম হজ্জে কেরাণ তথা হজ্জ ও ওমরার এহরাম ছিল তবে অন্য বৎসর একটি হজ্জ ও দুইটি ওমরা করিতে হইবে। ইহা হানাফী মজহাবের মছআলাহ ; কোন কোন ইমামের মজহাবে ফরজ হজ্জ না হইলে উহা কাজা করা বাধ্যতামূলক নহে।

---

* ইহা হানাফী মজহাবের সিদ্ধান্ত : অন্য মজহাবে উক্ত পশু জবেহ করা হরম শরীফের সীমার ভিতর নির্দ্ধারিত নহে, বরং প্রতিবন্ধকের স্থানে বা যথায় সম্ভব হয় তথায়ই জবেহ করিবে। ইমাম বোখারী (রঃ) উভয় মজহাবই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, উপরোল্লিখিত হাদীছের ঘটনায় রসুলুল্লাহ (দঃ) যেই ময়দানে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তথায় পশু জবেহ করিয়াছিলেন—অর্থাৎ হোদায়বিয়ার ময়দান উহার এক অংশ হরম শরীফের বাহিরে বটে, কিন্তু অপর অংশ হরম শরীফের সীমার ভিতরেই অবস্থিত।

৯২৮। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (হিজরী ছয় সনে) ওমরা করিতে যাইয়া বাধাপ্রাপ্ত হইলে স্বীয় কোরবাণীর পশু জবেহ করতঃ মাথার চুল ফেলিয়া এহরাম ভাঙ্গিয়া দিলেন। (তখন সব কিছুই তাঁহার জন্য হালাল হইয়া গেল;) তিনি স্ত্রী-ব্যবহারও করিতে পারিলেন। অতঃপর পরবর্তী বৎসর ওমরা আদায় করিলেন।

প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন ব্যক্তিকে মাথার চুল কাটিবার পূর্বে কোরবাণী করিতে হইবে

৯২৯। হাদীছ ঃ—মেছওয়ার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (ষষ্ঠ হিজরী সনের ওমরায় বাধাপ্রাপ্ত হইলে) রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (এহরাম মুক্ত হওয়ার জন্য) মাথার চুল ফেলিবার **পূর্বেই** পশু জবেহ করিয়াছিলেন। নিজেও তিনি তাহা করিয়াছিলেন এবং সঙ্গী ছাহাবীদেরকেও ঐরূপ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

রোগ বা মাথায় উকুনের আধিক্যে চুল ফেলিতে হইলে?

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন—

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ـ

অর্থঃ কোন ব্যক্তি রোগের দরুণ বা মাথায় কষ্টদায়ক বস্তুর আবির্ভাবে (মাথা মুড়াইতে) বাধ্য হইলে (সে এহরামে থাকাবস্থায় মাথা মুড়াইতে পারিবে, কিন্তু তাহাকে এই সুযোগ গ্রহণের) কাফফারা আদায় করিতে হইবে, তথা রোযা রাখিবে বা খয়রাত দান করিবে বা কোরবাণী করিবে। (২ পাঃ ৮ রুঃ)

৯৩০। হাদীছ ঃ—আবছল্লাহ ইবনে মা'কেল (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি কায়া'ব ইবনে ওজরা (রাঃ) ছাহাবীর নিকট বসিলাম এবং তাঁহাকে মাথা মুড়ানোর কাফ্ফারা আদায় করার বিধানযুক্ত (উপরোল্লিখিত) আয়াতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আয়াতের বিধান সকলের জন্য বটে, কিন্তু উহা আমারই অবস্থা দৃষ্টে নাযেল হইয়াছিল। আমি রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এহরাম অবস্থায় ছিলাম; আমার মাথায় অত্যধিক উকুন জন্মিয়া গেল, (আমার মনে হইতেছিল; প্রতিটি চুল আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত উকূনে ভরিয়া গিয়াছে, এমন কি মাথার উকুন আমার নাকে-মুখে ঝরিয়া পড়িতেছিল।) এমতাবস্থায় আমাকে রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত করা হইল। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, তোমার কষ্ট যেরূপ দেখিতেছি তদ্রূপ আমি ভাবিয়াছিলাম না। এই উপলক্ষেই উক্ত আয়াত নাযেল

হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি মাথা মুড়াইয়া ফেল এবং তিনটি রোযা কর কিম্বা প্রতি মিছকীনকে অর্দ্ধ ছা' (এক সের চৌদ্দ ছটাক) হিসাবে ছয়জন মিছকীনকে তিন ছা' পরিমাণ খাদ্য বস্তু (গম) দান কর কিম্বা একটী কোরবাণী (করিয়া দান) কর।

হজ্জের সফরে সংযমশীল হওয়া আবশ্যক

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ -

অর্থ—হজ্জ করাকালীন অর্থাৎ এহরাম অবস্থায় বিশেষরূপে নির্লজ্জ কার্য্য বা কথাবার্তা—এমনকি স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে স্ত্রী-সুলভ ব্যবহার ও কথাবার্তা হইতে এবং অন্যায় অবিচার ও ঝগড়া-বিবাদ হইতে সংযমী থাকিতে হইবে। (২ পাঃ ৯ রুঃ)

এতদ্ভিন্ন ৭৯৫ নং হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে হজ্জের যে ফজীলত—সারা জীবনের গোনাহ মাফ হইয়া যাওয়া; এই ফজীলত হাসিল হওয়ার শর্ত হইল পূর্ণ সংযমশীলতার সহিত হজ্জ সমাপন করা; হজ্জের সময় কোন প্রকার গালাগালি না করা, ফাহেশা কথা না বলা।

এহরাম অবস্থায় বন্যজীব বধ করিলে কাফ্ফারা দিতে হইবে

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ - وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا

فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ

أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ - عَفَا اللَّهُ

عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ - أُحِلَّ لَكُمْ

صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ - وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ

حُرُمًا - وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ -

অর্থ—হে মোমেনগণ! তোমরা এহরাম অবস্থায় কোন বন্যজীব হত্যা করিতে পারিবে না।। তোমাদের কেহ ইচ্ছাকৃত ঐরূপ করিলে বধকৃত জীবের সমপরিমাণ (মূল্যের) কাফ্ফারা দিতে হইবে। সেই পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবেন দুইজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। সেই

পয়সার (দ্বারা একটী জীব ক্রয় করিয়া) জীবটি কোরবাণী (তথা ছদকাহ) স্বরূপ কাবা তথা হরম শরীফের এলাকায় পৌঁছিতে (ও তথায় জবেহ হইতে) হইবে। কিম্বা (ঐ পয়সার দ্বারা ক্রয় করিয়া) মিছকীনদিগকে খাদ্য (প্রতি মিছকীনকে এক সের চৌদ্দ ছটাক হিসাবে গম বা উহার দ্বিগুণ অন্য বস্তু) কাফ্‌ফারারূপে দান করিবে। কিম্বা প্রতি মিছকীনের প্রাপ্যের হিসাবে এক একটি রোযা রাখিবে। এই কাফ্‌ফারা আদায়ের আদেশ এই উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে যেন সে স্বীয় কর্মের কুফল ভোগ করে। (এই বিধান ঘোষিত হইবার পূর্বে) যে যাহা কিছু করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা উহা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। (বিধান ঘোষিত হওয়ার পর) পুনরায় যে ব্যক্তি এরূপ কার্য্যে লিপ্ত হইবে আল্লাহ তায়ালা তাহার শাস্তি বিধান করিবেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান, শাস্তি-বিধানের মালিক।

পানির জীব শিকার করা ও খাওয়া তোমাদের জন্য (এহরাম অবস্থায়ও) হালাল করা হইয়াছে; তোমাদের সকলের—বিশেষতঃ পথিক ও মুছাফিরদের স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে। কিন্তু এহরাম অবস্থায় বন্যজীব হত্যা তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে। সকলে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভয় রাখিও যাঁহার সম্মুখে তোমাদের সকলেরই বিচারের জন্য একত্রিত হইতে হইবে। (৭ পাঃ ৩ রুঃ)

এহরামহীন ব্যক্তির শিকারকৃত বন্যজীবের গোশত এহরামযুক্ত ব্যক্তি খাইতে পারিবে

৯৩১। হাদীছঃ—আবু কাতাদাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন ষষ্ঠ হিজরী সনে ওমরার জন্য (মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলেন তখন আমার পিতা কাতাদাহ (রাঃ)ও তাঁহার সংগী ছিলেন। সকলেই নির্দিষ্ট স্থান জুল হোলায়ফা হইতে এহরাম বাঁধিয়াছিলেন, কিন্তু আমার পিতা (মক্কা পর্য্যন্ত যাইবেন ও ওমরা করিবেন এই বিষয় নিশ্চিত ছিলেন না বলিয়া) এহরাম বাঁধেন নাই। কিছু দূর পথ অতিক্রম করার পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এরূপ একটি সংবাদ পাইলেন যে, একস্থানে কাফের শত্রুদল একত্রিত হইয়া আছে; তাহাদের আকস্মিক আক্রমণের আশঙ্কা হয়। তাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সতর্কতা স্বরূপ একদল লোক সেদিকে পাঠাইয়া দিলেন; তন্মধ্যে আমার পিতাও ছিলেন। আমার পিতা এহরামহীন এবং সঙ্গীগণ এহরামযুক্ত। আমার পিতা বর্ণনা করিয়াছেন—পথিমধ্যে আমার সঙ্গীগণ একটি বন্য গাধা দেখিতে পাইলেন। আমি যখন অনুভব করিলাম যে, আমার সঙ্গীগণ কোন বস্তু দেখাদেখি করিতেছেন, তখন আমি লক্ষ্য করিলাম এবং আমিও গাধাটিকে দেখিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ আমি ঘোড়ায় আরোহণ করিলাম; আমার চাবুকটি আমার হাত হইতে পড়িয়া গেল। সঙ্গীগণকে উহা

উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তাঁহারা বলিলেন, আমরা এহরাম অবস্থায় আছি, তাই শিকারের জন্য আমরা কোন প্রকার সাহায্যই করিতে পারি না। তখন আমি ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া চাবুক উঠাইলাম এবং ঘোড়ায় পুনঃ আরোহণ করিয়া গাধাটির প্রতি ধাবিত হইলাম এবং উহাকে বর্শাঘাতে কাবু করিয়া ফেলিলাম। অতঃপর উহাকে লইয়া সঙ্গীগণের নিকট উপস্থিত হইলাম। কেহ কেহ ইহা খাইতে রাজি হইলেন, কেহ কেহ এহরাম অবস্থায় শিকারের গোশত খাওয়া যায় না ধারণা করিয়া বিরত রহিলেন।

এদিকে আমরা দীর্ঘ সময় রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইতে লাগিলাম, তাই আমি স্বীয় ঘোড়া দ্রুতবেগে হাঁকাইলাম। পথিমধ্যে একজন লোক মারফত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোথায় অবস্থান করিতেছেন তাহার খোজ পাইয়া দ্রুত সেইস্থানে যাইয়া পৌঁছিলাম এবং আরজ করিলাম ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার সঙ্গী—আপনার ছাহাবীগণ আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন. আপনার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহারা আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন, আপনি তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করুন।

অতঃপর আমি বন্য গাধা শিকারের ঘটনা বলিলাম, সঙ্গীগণও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, আবু কাতাদাহ এহরাম বাঁধে নাই, সে একটি বন্য গাধা শিকার করিয়াছিল; আমরা উহা হইতে কিছু খাইয়াছি, অতঃপর আমরা সন্দিহান হইলাম যে, এহরাম অবস্থায় আমরা শিকারের গোশত কিরূপে খাইতে পারি? এই ভাবিয়া অবশিষ্ট গোশত আমরা খাই নাই, সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিয়াছি। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কেহ আবু কাতাদাহকে শিকার করার আদেশ করিয়াছিল কি? বা তাহাকে শিকারের প্রতি ইশারা করিয়াছিল কি? (বা কেহ তাহাকে কোনরূপ সাহায্য করিয়াছিল কি? বা শিকার বধ করিতে কেহ কোনরূপ অংশগ্রহণ করিয়াছিল কি?) সকলেই না, না—বলিয়া উত্তর করিল। তখন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে উহা খাইবার অনুমতি দান করিলেন।

মছআলাহ ঃ—এহরাম অবস্থায় কোন বন্যজীব শিকার করা হারাম, কোন শিকারীকে শিকারের প্রতি ইশারায় দেখাইয়া দেওয়াও হারাম, শিকারের আদেশ করা বা শিকারীকে কোন প্রকার সাহায্য করাও হারাম।

মছআলাহ ঃ—এহরাম অবস্থার ব্যক্তিরা কোন শিকার দেখিয়া হাসা-হাসি করিল যাহাতে এহরামহীন ব্যক্তি শিকার সম্পর্কে বুঝিয়া ফেলিল এবং উহা শিকার করিল— ইহাতে দোষ হইবে না।

মছআলাহ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, গৃহপালিত জীব—উট, বকরী, গাভী, মুরগী ইত্যাদি এহরাম অবস্থায় জবেহ করা জায়েয।

এহরামওয়ালা ব্যক্তি জীবিত বন্যজীব গ্রহণ করিবে না।

৯৩২। **হাদীছ ঃ**—ছায়া'ব ইবনে জাছ্ছামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে পথিমধ্যে একটি (জীবিত) বন্য গাধা হাদিয়া বা উপঢৌকন দিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা গ্রহণ করিলেন না; রসুলুল্লাহ (দঃ) দাতার চেহারার উপর হাদিয়া গ্রহণ না করার প্রতিক্রিয়ার ভাব লক্ষ্য করিতে পারিয়া তাহাকে প্রবোধ দিলেন যে, তোমার হাদিয়া গ্রহণ না করার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা এহরাম অবস্থায় আছি।

এহরাম অবস্থায় এবং হরম শরীফে যে সব জীব বধ করা যায়েজ

৯৩৩। **হাদীছ ঃ**— عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِى قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ اَلْغُرَابُ

وَالْحِدَاَةُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পাঁচ প্রকার জীব আছে যাহা এহরাম অবস্থায়ও বধ করা জায়েজ— (১) কাক, (২) চিল, (৩) ইঁদুর (৪) বিচ্ছু ও কামড়ানের আশংকাময় শ্রেণীর কুকুর।

৯৩৪। **হাদীছ ঃ**— عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَاَةُ

وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পাঁচ প্রকার জীব আছে যাহার প্রত্যেকটিই দুষ্ট প্রকৃতির; উহাদিগকে হরম শরীফের সীমার ভিতরেও বধ করা যায়েজ—(১) কাক, (২) চিল, (৩) বিচ্ছু, (৪) ইঁদুর ও (৫) কামড়ানের আশংকাময় শ্রেণীর কুকুর।

৯৩৫। **হাদীছ ঃ**—হাফছাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পাঁচ প্রকার জীব আছে, যাহা যে কেহই বধ করিতে পারে—তাহাতে গোনাহ হইবে না। কাক, চিল, ইঁদুর, বিচ্ছু এবং কামড়ানের আশংকাময় শ্রেণীর কুকুর।

৯৩৬। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায়-হজ্জের নবম তারিখের রাত্রে) আমরা মিনাস্থিত কোন এক পাহাড়ের গর্তে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে বসিয়াছিলাম ; হঠাৎ তাঁহার প্রতি ছুরা "ওয়াল-মোরছালাত" নাযেল হইল। হযরত (দঃ) ঐ ছুরাটি আমাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করিতেছিলেন এবং আমরা তাঁহার নিকট হইতে উহা মুখস্থ করিয়া লইতেছিলাম, এমতাবস্থায় আমাদের সম্মুখে একটি সর্প বাহির হইয়া আসিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে আদেশ করিলেন, উহাকে বধ কর। সকলেই উহার প্রতি ধাবিত হইল, কিন্তু সর্পটি দ্রুত পলাইয়া রক্ষা পাইল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা যেরূপ উহার দ্বারা কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হও নাই ; তদ্রূপ সেও তোমাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইল না।

ব্যাখ্যা :—আলোচ্য হাদীছ ব্যতীত অন্যান্য হাদীছেও হরম শরীফে এবং এহরাম অবস্থায় সর্প মারার অনুমতি স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। উল্লিখিত জীবসমূহ হরম শরীফে এবং এহরাম অবস্থায় বধ করার অনুমতি স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত আছে। আরও কি কি কষ্টদায়ক দুষ্ট প্রকৃতির জীব হত্যা করা জায়েয তাহা নির্দ্ধারণের মধ্যে ইমামগণের মতভেদ আছে ; তাই বিবেক খাটাইয়া কোন জীব মারিবে না।

হরম শরীফের সীমায় ঘাস-পাতা, তরুলতা, বট-বৃক্ষ কাটিবে না উহার কোন অংশও ছিন্ন করিবে না*

৯৩৭। **হাদীছ :—**আবু শোরাইহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর দিন একটি বিশেষ ভাষণ দান করিয়াছিলেন। ভাষণ দানকালে আমি নিজ চোখে হযরত (দঃ) কে দেখিয়াছি, নিজ কানে তাঁহার সেই ভাষণ শুনিয়াছি এবং বিশেষরূপে স্মরণ রাখিয়াছি।

ভাষণের প্রথমে তিনি আল্লাহ তায়ালার ছানা-ছিফৎ ও প্রশংসা করিয়া বলিলেন— তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিও, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এই মক্কা নগরীকে হরম শরীফ তথা বিশেষ সম্মানিত ও সুরক্ষিত স্থানরূপে সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। মক্কা নগরীর এই বিশেষত্ব কোন মানুষের সাব্যস্তকৃত নহে ; অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ বিচারের দিনের প্রতি বিশ্বাসী হইবে তাহার জন্য কখনও জায়েয বা হালাল হইবে না যে, সে মক্কা নগরীর মধ্যে কোন প্রকার হত্যা-কার্য্য করে বা উহার কোন উদ্ভিদের ক্ষতি সাধন করে। (হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়া দিলেন যে—) কোন ব্যক্তি যদি আল্লার রসুল কর্তৃক যুদ্ধ পরিচালনার ঘটনা দ্বারা নিজের জন্যও ঐরূপ করা জায়েয মনে করিতে প্রয়াস পায়, তবে তাহাকে স্পষ্টরূপে জানাইয়া দিও যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য বিশেষরূপে ঐ অনুমতি দান করিয়াছিলেন, তোমাদের পক্ষে মুহূর্তের জন্যও ঐরূপ অনুমতি দান করেন নাই। আমার জন্য যে অনুমতি দান করা হইয়াছিল

---

* রোপন ও বপন করা বা রোপন ও বপন জাতীয় বৃক্ষে ও উদ্ভিদে এই আদেশ প্রযোজ্য নহে।

তাহাও শুধু নির্দিষ্ট দিনের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, অতঃপর এই নগরীর সেই মহত্ব এবং বিশেষরূপে সম্মানিত ও সুরক্ষিত হওয়া পূর্বের ন্যায় (আমার এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য) বলবৎ হইয়াছে এবং ইহা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। (অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন—) উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের একটি বিশেষ কর্তব্য এই হইবে যে, আমার এই ভাষণের বিষয় বস্তু অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে পৌঁছাইতে থাকে।

মছআলাহঃ—হরম শরীফের কোন বন্যজীবকে তাড়া করা জায়েয নহে। ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাগের্দ একরেমা (রঃ) বলিয়াছেন, হরম শরীফের সীমার মধ্যে কোন পশু পক্ষী কোন স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে থাকিলে তথা হইতে উহাকে তাড়াইয়া দেওয়া জায়েয নহে। (২৪৭ পৃঃ)

মছআলাহঃ—হরম শরীফের সীমার ভিতর লড়াই করা জায়েয নহে।

এহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করা

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবী স্বীয় পুত্রের জন্য তাহার এহরাম অবস্থায় তপ্ত লৌহের দ্বারা দাগ লাগানোর চিকিৎসা-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মছআলাহঃ—এহরাম অবস্থায় সুগন্ধবিহীন যে কোন ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

৯৩৮। হাদীছঃ—ইবনে বোহায়না (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহরাম অবস্থায় 'লাহয়ে-জামাল' নামক স্থানে পৌঁছিয়া (মাথার ব্যথার দরুণ) স্বীয় মাথার মধ্যস্থলে রক্ত মোক্ষণ করিয়াছিলেন।

মছআলাহঃ—যে কোন প্রকারের চিকিৎসাই এহরাম অবস্থায় গ্রহণ করা যায়, কিন্তু সতর্ক থাকিতে হইবে, চুল বা লোম কাটা না পড়ে। চুল বা লোম কাটার আবশ্যক হইলে নির্দ্ধারিত বিধান মতে উহার কাফ্ফারা আদায় করিবে।

এহরাম অবস্থায় বিবাহ করা

৯৩৯। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মাইমুনা (রাঃ)কে এহরাম অবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—বিবাহের শুধু ইজাব-কবুল সম্পন্ন করা এহরাম অবস্থায় জায়েয।

এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ

৯৪০। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ইয়া রসুলাল্লাহ! এহরাম অবস্থায় কিরূপ কাপড় পরিধান করার আদেশ করেন? তদুত্তরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, জামা, পায়জামা, পাগড়ি, টুপি ব্যবহার করিও না এবং যদি কাহারও জুতা না থাকে তবে চামড়ার মোজা পায়ের পৃষ্ঠের উঁচু হাড় এবং দুই পার্শ্বের গিটদ্বয় উন্মুক্ত থাকে এইভাবে উপরের অংশ কাটিয়া ফেলিয়া উহা ব্যবহার করিতে পারিবে। আর এমন বস্তু ব্যবহার করিবে না

যাহাকে জাফরান বা "ওয়ারস" নামক উদ্ভিদ জাতীয় বস্তুর রং স্পর্শ করিয়াছে। (কারণ উক্ত বস্তুদ্বয় সুগন্ধিময়।) নারীগণ বিশেষ পর্দার জন্য সাধারণতঃ মুখের উপর পর্দা (ব্যবহার করে) এবং হাত মোজা (ব্যবহার করিয়া থাকে; এহরাম অবস্থায় সে ঐ সব) ব্যবহার করিবে না।

মছআলাহ ঃ—নারীদের জন্য মুখের উপর যে পর্দা ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে ইহার উদ্দেশ্য ঐরূপ পর্দা যাহা মুখের উপর লাগিয়া থাকে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ "এহরাম অবস্থায় পরিধেয়" পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

এহরাম অবস্থায় গোসল করা

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, এহরাম অবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা সম্বলিত গোসল খানায় গোসল করিতে পারে।*

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) এহরাম অবস্থায় শরীর চুলকানোকে দূষণীয় মনে করিতেন না।×

৯৪১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে হোনাইন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও মেছওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) এর মধ্যে মতানৈক্য হইল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, এহরাম অবস্থায় মাথা ধৌত করা যাইবে। মেছওয়ার (রাঃ) বলিলেন, এহরাম অবস্থায় মাথা ধৌত করা যাইবে না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে আবু-আইউব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট পাঠাইলেন আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, তিনি একটি কূপের নিকট গোসল করিতেছেন এবং তাঁহাকে পর্দা দ্বারা ঘেরাও করিয়া রাখা হইয়াছে। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি বলিলাম, আমি আবদুল্লাহ ইবনে হোনাইন; আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আপনার নিকট এই বিষয় জ্ঞাত হওয়ার জন্য পাঠাইয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহরাম অবস্থায় মাথা কি প্রকারে ধৌত করিতেন। তখন তিনি পর্দার কাপড়টি হাত দ্বারা চাপিয়া একটু নীচু করিয়া দিলেন যেন তাঁহার মাথা আমি দেখিতে পাই। তৎপর এক ব্যক্তিকে তাঁহার মাথার উপর পানি ঢালিতে বলিলেন; সে তাঁহার মাথায় পানি ঢালিয়া দিল। অতঃপর তিনি উভয় হাত দ্বারা সম্মুখের দিক হইতে পিছনের দিকে এবং পিছনের দিক হইতে সম্মুখের দিকে মাথার চুল নাড়া দিলেন এবং বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমি এইরূপ করিতে দেখিয়াছি।

---

* অবশ্য অন্যান্য আলেমগণ এহরাম অবস্থায় শরীর মর্দন করতঃ ময়লা উঠাইয়া ফিটফাটের সহিত গোসল করা মকরূহ বলিয়াছেন।

× অবশ্য লক্ষ্য রাখিবে যে, লোম, চুল যেন ছিঁড়িয়া বা ঝরিয়া পড়িতে না পারে।

এহরামে পরিধানে চাদর না থাকিলে কি করিবে ?

৯৪২। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আরফার মধ্যে যে খোৎবা তথা ভাষণ দিয়াছিলেন উহাতে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, পরিধেয় চাদর না থাকিলে পায়জামা পরিবে এবং জুতা না থাকিলে মোজা পায়ে দিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—জুতা না থাকাবস্থায় চামড়ার মোজা পায়ে দিতে পারিবে, কিন্তু উপরের অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে যাহার বিবরণ পূর্ব পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। তেমনি পরিধেয় চাদর না থাকিলে পায়জামা পরিবে, কিন্তু বিশেষ ধরণের ঢিলা পায়জামা হইলে উহাকে কাটিয়া চাদরের ন্যায় করিয়া লইবে, যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে পায়জামার আকারেই পরিধান করিবে, কিন্তু উহার জন্য ফিদ্‌ইয়া আদায় করিতে হইবে। যেমন ওজর বশতঃ মাথার চুল কামাইতে হইলে ফিদ্‌ইয়া আদায় করার মছআলাহ বর্ণিত হইয়াছে।

এহরাম অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রাখা

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী একরেমা (রঃ) বলিয়াছেন, শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কাবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র পরিধান করিবে, কিন্তু সেই জন্য নির্দ্ধারিত ফিদ্‌ইয়া দিতে হইবে। ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন, ফিদ্‌ইয়া দেওয়ার বিষয়ে অন্য কোন আলেম তাঁহার সঙ্গে একমত হন নাই। অর্থাৎ অন্যান্য সকল আলেমগণের মত এই যে, অস্ত্রশস্ত্র পরিধান করার দরুণ ফিদ্‌ইয়া দিতে হইবে না।

৯৪৩। **হাদীছ ঃ**-বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ষষ্ঠ হিজরী সনে হোদায়বিয়ার প্রসিদ্ধ ঘটনা—) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিলকদ মাসে ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। (মক্কা হইতে মাত্র ১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত "হোদায়বিয়া" নামক স্থানে পৌছিলে পর কাফেররা নবী (দঃ)কে মক্কায় পৌছিতে বাধা দিল। শেষ পর্য্যন্ত) উভয় পক্ষে একটি সন্ধিপত্র লিখিত হইল, যাহার শর্তসমূহের মধ্যে ইহাও ছিল যে, মোসলমানগণ এই বৎসর এই স্থান হইতেই মদীনায় ফিরিয়া যাইবে। আগামী বৎসর ওমরা করার জন্য মক্কায় আসিতে পারিবে, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র খোলা অবস্থায় লইয়া আসিবে না— তরবারী ইত্যাদি কোষবদ্ধ রাখিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রসিদ্ধ হোদায়বিয়ার ঘটনার কিয়দাংশ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ইহার পূর্ণ বিবরণ ইন্‌শা-আল্লাহ তায়ালা তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইবে।

উল্লিখিত হাদীছে বলা হইয়াছে, পর বৎসর মোসলমানগণ তরবারি ইত্যাদি কোষবদ্ধ রাখিয়া মক্কায় প্রবেশ করিবে। ইহা দ্বারা এহরাম অবস্থায় অস্ত্র বহন জায়েয প্রমাণিত হয়।

এহরাম ব্যতীত হরম শরীফের সীমায় প্রবেশ করা

৯৪৪। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় যখন মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন তাঁহার মাথা লোহার টুপী দ্বারা আবৃত ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লিখিত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, মক্কা বিজয়ের সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহরামহীন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার মাথা আবৃত ছিল। এতদ্ভিন্ন ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তখন এহরাম অবস্থায় ছিলেন না।

আলোচ্য মছআলার বিষয়ে ইমাম বোখারীর মত, এই যে, হজ্জ বা ওমরার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে হরম শরীফের সীমার ভিতরে এমনকি মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেও এহরাম বাঁধা আবশ্যক হইবে না, এহরাম শুধু ঐ ব্যক্তিদের জন্য যাহারা হজ্জ বা ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসিবে।

কিন্তু এই মছআলার মধ্যে বিভিন্ন ইমামগণের মতভেদ আছে। হানাফী মজহাব মতে মছআলাহ এই যে, মিকাতের সীমানার বাহিরের কোন লোক যে কোন উদ্দেশ্যে হরম শরীফের সীমার ভিতর প্রবেশ করার ইচ্ছায় যাত্রা করিলে তাহার জন্য মিকাত হইতে ওমরার এহরাম বাঁধিয়া আসা আবশ্যক। ঐরূপ ব্যক্তির জন্য এহরামহীন অবস্থায় মিকাত অতিক্রম করা জায়েয নহে। অবশ্য যাহারা মিকাতের সীমানার ভিতরে অবস্থানকারী তাহারা হরম শরীফে এবং মক্কা নগরীতে বিনা এহরামে প্রবেশ করিতে পারিবে।

উল্লিখিত হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে উহা সম্পর্কে হানাফী মজহাবের আলেমগণ বলেন যে, উহা হযরতের জন্য মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষত্ব স্বরূপ ছিল; যে রূপ হরম শরীফের সীমার ভিতরে এবং মক্কা নগরীতে যুদ্ধ পরিচালনা করার অনুমতি ঐ সময়ে তাঁহার জন্য একটি বিশেষত্ব স্বরূপ ছিল। হযরতের পর অন্য কেহই ঐরূপ করিতে পারিবে না—এই বিষয়টি স্বয়ং হযরত (দঃ) মক্কা বিজয়ের বিশেষ ভাষণে সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন। ৯৩৭ নং এবং আরও একাধিক হাদীছে উহা বর্ণিত আছে।

মছআলাহ না জানায় এহরাম অবস্থায় জামা পরিলে বা সুগন্ধি ব্যবহার করিলে ?

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আতা (রঃ) বলিয়াছেন, ভুলে বা অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি এহরাম অবস্থায় জামা পরিধান করিলে বা সুগন্ধি ব্যবহার করিলে তাহাকে কাফ্‌ফারা বা দম দিতে হইবে না।

এখানে হানাফী মজহাব এবং আরও বহু আলেমের মত ভিন্নরূপ। তাঁহারা বলেন, বর্তমানে শরীয়তের বিধানসমূহ স্থিরিকৃত হইয়া স্পষ্টরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে এবং প্রত্যেক মোসলমানের জন্য উহা শিক্ষা করা ও জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। যদি কেহ উহাতে ত্রুটি করে তবে সে দ্বিগুণ দোষী সাব্যস্ত হইবে। অতএব এহরাম অবস্থায় জামা পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি শরীয়তের বিধান বিরোধী কার্য্যের প্রতিফল ভোগ করা হইতে তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে না, বরং তাহাকে শরীয়তের নির্দেশিত শাস্তি ভোগ স্বরূপ কাফ্‌ফারা বা দম আদায় করিতে হইবে। তদ্রূপ ভুলবশতঃ ঐরূপ করিলেও কাফ্‌ফারা আদায় করিতে হইবে; যেরূপ নামাযের মধ্যে ভুলে কথা বলিলে নামায নষ্ট হয়।

হজ্জের পথে মৃত্যু হইলে

মছআলাহ্‌ঃ—হজ্জ করিতে যাত্রা করিয়াছে, অতঃপর হজ্জ পূর্ণ করার পূর্বেই মরিয়া গিয়াছে-সে ক্ষেত্রে যদি ৯ই জিলহজ্জ উকুফে-আরফা করার পর মৃত্যু হইয়া থাকে তবে তাহার হজ্জ সম্পূর্ণ গণ্য হইবে (৬৬৬ হাদীছ; উক্ত হাদীছের ঘটনায় হযরত (দঃ) মৃত ব্যক্তির হজ্জ পূর্ণ করার আদেশ দেন নাই)। যদিও হজ্জের দ্বিতীয় ফরজ—তওয়াফে-জেয়ারত সে না করিয়া থাকে; তাহার তওয়াফে-জেয়ারতের জন্য কিছুই করিতে হইবে না। অবশ্য যদি সে অছিয়ত করিয়া যাইয়া থাকে তাহার হজ্জ পূর্ণ করার, তবে তওয়াফে জেয়ারতের বদলায় একটি উট বা গরু কোরবাণী করা ওয়াজেব (শামী, ২—৩৩২)। আর যদি উকুফে-আরফার পূর্বে মৃত্যু হয়, এমনকি যদি মক্কায় পৌঁছিয়াও তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে তবে শরীয়তের হুকুমে তাহার হজ্জ হয় নাই বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। সুতরাং যদি সে তাহার হজ্জ করাইবার জন্য অছিয়ত করিয়া থাকে তবে তাহার ওয়ারেছদের কর্তব্য হইবে তাহার সমুদয় পরিত্যক্ত ধন-সম্পদের তৃতীয়াংশ হইতে তাহার জন্য হজ্জে-বদল করান। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের মতে যে পর্য্যন্ত সে পৌছিয়া ছিল তথা হইতে হজ্জে-বদল করাইলেই চলিবে, অতএব যদি সে মক্কায় পৌছিয়া মরিয়াছিল তবে অতি সামান্য খরচে মক্কা হইতে তাহার হজ্জে-বদল করাইলেই যথেষ্ট হইবে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন যে, তাহার সমুদয় ধন-সম্পদের তৃতীয়াংশ যদি তাহার নিজ বাড়ী হইতে হজ্জে-বদলের ব্যয়ে যথেষ্ট হয় তবে অবশ্যই তাহার বাড়ী হইতে হজ্জ করাইতে হইবে যদিও তাহার মৃত্যু মক্কায় পৌঁছিয়া হইয়া থাকে। অন্যথায় তাহার অছিয়তের হজ্জ আদায় হইবে না এবং ওয়ারেছগণ কর্তব্য মুক্ত হইবে না। অবশ্য যদি তাহার ধন-সম্পদের তৃতীয়াংশে বাড়ী হইতে হজ্জের ব্যয় সঙ্কুলান না হয় তবে উহা দ্বারা যথা হইতে সম্ভব তথা হইতেই হজ্জে-বদল করাইবে (ফতহুল-কাদীর, ২—৩১৯)। আলোচ্য মৃত ব্যক্তির হজ্জটি যদি তাহার এই মৃত্যুর বৎসরের পূর্বেই ফরজ হইয়াছিল অর্থাৎ এই বৎসরের পূর্বেই হজ্জ ফরজ হয় পরিমাণ ধনের মালিক সে হইয়াছিল, কিন্তু হজ্জ যাত্রায় সে বিলম্ব করিয়াছিল তবে হজ্জে-বদল

করাইবার অছিয়ত করা তাহার উপর ফরজ হইবে। আর যদি ঐ বৎসরই তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইয়াছিল কিম্বা তাহার উপর হজ্জ আদৌ ফরজ হইয়াছিল না উক্ত হজ্জ তাহার নফল হজ্জ ছিল তবে অছিয়ত করার প্রয়োজন হইবে না। (শামী, ২—৩৩২)

মছআলাহ ঃ—এহরাম অবস্থায় মৃত্যু হইলে হানফী মজহাব মতে তাহার কাফন সাধারণ নিয়মেই করিতে হয়। কোন কোন ইমামের মজহাবে এহরাম অবস্থার ব্যক্তির ন্যায় তাহার মাথা অনাবৃত রাখিতে হয় এবং সুগন্ধিও দেওয়া যায় না ; (২৪৯ পৃঃ)

মৃত ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ করা

৯৪৫। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা "জোহায়না" নামক গোত্রের একটি নারী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, আমার মাতা হজ্জ করিবার মান্নত মানিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি হজ্জ আদায় করিতে পারেন নাই, তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে ; এখন আমি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিতে পারি কি? নবী (দঃ) বলিলেন, হাঁ—তুমি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ আদায় কর। তোমার মাতার উপর কাহারও ঋণ থাকিলে তাহা তুমি কি আদায় করিতে না? তদ্রূপ আল্লার ঋণও আদায় করিয়া দাও। আল্লার ঋণকে অগ্রাধিকার দান করা কর্তব্য।

ভ্রমণে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ করা

৯৪৬। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জ কালে "খাছআম" গোত্রীয় একটি মহিলা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, আমার পিতার উপর এমন অবস্থায় হজ্জ ফরজ হইয়াছে যখন তিনি অতিশয় বৃদ্ধ, যানবাহনের উপর স্থির হইয়া বসিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এমতাবস্থায় আমি তাঁহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিলে তাঁহার হজ্জ আদায় হইবে কি? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—হাঁ (তুমি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ আদায় কর)

মছআলাহ ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা আরও একটি পরিচ্ছেদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, পুরুষের পক্ষে নারী বদলা হজ্জ করিতে পারে।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের হজ্জ

৯৪৭। **হাদীছ ঃ**—ছায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায়-হজ্জ কালে আমার মাতা-পিতা) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আমাকে হজ্জ করাইয়াছেন ; আমার বয়স তখন সাত বৎসর মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— আলোচ্য বিষয়ে আরও স্পষ্টতর হাদীছও বিদ্যমান রহিয়াছে। মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে—একদা এক মহিলা তাহার স্বীয় শিশু ছেলেকে উত্তোলন করতঃ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! এই ছেলের হজ্জ কি শুদ্ধ

হইবে ? রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, হাঁ—শুদ্ধ হইবে এবং (তুমি যে তাহাকে সাহায্য করিবে সে জন্য) তুমিও ছওয়াবের ভাগী হইবে।

মছআলাহ্ঃ—নাবালেগ ছেলে-মেয়ের হজ্জ শুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু বালেগ হওয়ার পর তাহাদের উপর হজ্জ ফরজ হইলে সেই হজ্জ পুনঃ আদায় করিতে হইবে। নাবালেগ অবস্থায় কৃত হজ্জের দ্বারা ফরজ আদয় গণ্য হইবে না।

নারীদের হজ্জ করা

ইব্রাহীম (রঃ) নামক মোহাদ্দেছ স্বীয় পিতার মাধ্যমে পিতামহ বিশিষ্ট তাবেয়ী ইব্রাহীম (রঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু (স্বীয় খেলাফতকালে নবী-পত্নীগণকে (নফল) হজ্জে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যেই হজ্জ তাঁহার জীবনের শেষ হজ্জ ছিল সেই হজ্জের সময় তিনি নবী-পত্নীগণকে হজ্জে যাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুব্যবস্থার জন্য ওসমান (রাঃ) ও আবদুর রহমান (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবীদ্বয়কে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—নবী-পত্নীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সকলেই হজ্জ আদায় করিয়াছিলেন, অতঃপর তাঁহাদের হজ্জ করা নফল ছিল।

হজ্জের ছফর অতি কষ্ট-ক্লেশের ছফর। তদুপরি বড় শঙ্কট এই যে, ইহার আরকান-আহকাম আদায় করার সময় প্রতি পদক্ষেপে ভীষণ ভিড় হইয়া থাকে, যাহা এড়াইবার উপায় নাই। নারী জাতির জন্য যে সব বিধি-নিষেধ শরীয়ত কর্তৃক ফরজ, ওয়াজেব ও হারামরূপে বলবৎ রহিয়াছে, হজ্জের আরকান-আহকাম আদায় করাকালে সে সব বিধি-নিষেধ রক্ষা করিয়া চলা সহজ সাধ্যত মোটেই নহে, সম্ভবপর হওয়াও অতিশয় দুরূহ। এতদ্দৃষ্টে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বীয় খেলাফত কালে নবী-পত্নীগণকে পুনঃ হজ্জে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বিশেষ ব্যবস্থাধীনে অনুমতি দান করেন এবং ওসমান (রাঃ) ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের ন্যায় ব্যক্তিত্বশালী দুইজনের তত্ত্বাবধানে নবী-পত্নীগণের হজ্জে গমণের ব্যবস্থা অনুমোদন করেন।

কিন্তু লক্ষ্য রাখিবেন, এসব কোন্ যমানার কাহিনী ? তেরশত বৎসর পূর্বের কাহিনী এবং মক্কা হইতে মদীনা মাত্র প্রায় তিনশত মাইল ব্যবধানের কাহিনী।

বর্তমানে নারী জাতির যে অবস্থা দাড়াইয়াছে বিশেষতঃ মিশর, সিরিয়া, জাওয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বোম্বাই, গুজরাট, ইউপি, সি-পি, পাঞ্জাব ইত্যাদি স্থানের নারীগণ পবিত্র মক্কা মদীনাতে আসিয়াও যেরূপ বে-পর্দা বেহায়া ও বে-পরওয়াভাবে চলাফেরা করে তাহা দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

নারীদের জন্য পর্দা সর্বস্থানেই ফরজ এবং বে-পর্দাভাবে চলা হারাম। আরও স্মরণ রাখিবেন—পবিত্র মক্কা মদীনায় নেক কার্য্যের ছওয়াব যেরূপ অধিক পাওয়া যায়—এক

রাকাত নামাযে লক্ষ্য রাকাতের ছওয়াব হয়; গোনাহের বেলায়ও ঠিক সেই হিসাব লাগাইতে হইবে। পবিত্র মক্কায় কোন শরীয়ত বিরোধী হারাম কার্য্য করিলে তাহার গোনাহ এবং শাস্তি ভীষণ ও অত্যধিক হইবে। কোরআন শরীফে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন—

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হরম শরীফের মধ্যে আল্লাহদ্রোহিদা ও শরীয়ত বিরোধী কার্য্যকলাপ করিবে আমি তাহাকে ভীষণ আজাব ভোগে বাধ্য করিব। (১৭ পাঃ ১০ রুঃ)

কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরজ হইলে তাহাকে সেই ফরজ আদায় করিতে হইবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, পর্দা ইত্যাদির ব্যাপারে শরীয়তের বিধান অনুসরণ ফরজ। উহার ব্যতিক্রম করিলে তাহা হারাম হইবে এবং পবিত্র মক্কায় হারাম কার্য্য করিলে উহার গোনাহ ও শাস্তি অধিক হইবে। তাই এক ফরজ আদায় করিতে অন্য ফরজের ব্যবস্থাও পূর্ণরূপে বজায় রাখিবে।

অত্যাবশ্যক কার্য্যের জন্য কঠিন পথে যাত্রা করিলে তাহাতে কাহারও দ্বিধা বোধ হয় না। কিন্তু আবশ্যকাতিরিক্ত কার্যের জন্য কঠিন ও আশঙ্কাযুক্ত পথে যাত্রা করিতে দেখিলে দ্বিধা বোধ হওয়া স্বাভাবিক। অতএব মহিলাদের নফল হজ্জে বাধা দেওয়া অহেতুক নহে। তবে হাঁ—যদি স্বামী বা কোন মাহরাম ব্যক্তি যথোপযুক্ত সুব্যবস্থা অবলম্বনের শক্তি সামর্থ ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন হয় এবং সে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে বলিয়া নিশ্চিত হওয়া যায় তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

শেখ সা'দী (রঃ) কত সুন্দর কথাই না বলিয়াছেন—"রাজ দরবারের দান সামগ্রী প্রচুর বটে, কিন্তু গলা কাটা যাওয়ার আশঙ্কাও সমধিক।"

আমাদের দেশীয় মা-বোনদেরে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যেন মক্কা মদীনায় যাইয়া নানা দেশীয় নারীদের শরীয়ত বিরোধী বে-পরোওয়া চাল-চলনের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া না যান। স্মরণ রাখিবেন—শরীয়তের বিধি-বিধান অতি সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়। উহা স্রোতে বহিয়া যাওয়ার মত বস্তু নহে।

৯৪৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোষণা করিলেন, কোন নারী স্বীয় মাহরাম ব্যক্তি (বা স্বামী) কে সঙ্গে না লইয়া কোন ছফরে বা ভ্রমণ যাত্রায় বাহির হইবে না এবং কোন নারীর সন্নিকটে কোন পর-পুরুষ (যে কোন প্রয়োজনে) আসিতে পারিবে না, যদি তাহার সঙ্গে ঐ স্ত্রীলোকটির কোন মাহরাম (বা স্বামী) না থাকে।

এই ঘোষণা শুনিয়া এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ্। অমুক জেহাদের জন্য সংগৃহীত সৈন্যদলের মধ্যে (আমার নাম লেখা হইয়াছে এবং উহাতে যোগদানের জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াছি এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী হজ্জ গমনে ইচ্ছা করিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি স্বীয় স্ত্রীর সহিত হজ্জে গমন কর।

ব্যাখ্যা ঃ—স্বীয় স্ত্রীকে সৎকার্য্যে সৎপথে সহায়তা করা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। আলোচ্য ঘটনার অবস্থা দৃষ্টে রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ব্যক্তির প্রতি স্ত্রীকে হজ্জব্রত পালনের সাহায্যার্থে উপস্থিত জেহাদের সুযোগ গ্রহণ করা মুলতবী রাখার অনুমতি দিলেন। কারণ, নারীদের সম্মুখে বহু বাধা বিপত্তি রহিয়াছে; তাহাদের জন্য যে কোন সময় ইচ্ছাধীনরূপে হজ্জে গমন করা সম্ভব হয় না। পুরুষদের জন্য জেহাদ সাধারণতঃ সেরূপ নহে। এই জন্য স্ত্রীর উপস্থিত সুযোগকে স্বামীর উপস্থিত সুযোগের উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উল্লিখিত হাদীছে নিষিদ্ধ ভ্রমণের দূরত্ব নির্দ্ধারণে তিনটি হাদীছ বর্ণিত আছে। এক হাদীছে একদিন ভ্রমণের উল্লেখ হইয়াছে। আর এক হাদীছে দুই দিনের ভ্রমণ উল্লেখ আছে, কোন কোন হাদীছে তিন দিন ভ্রমণ উল্লেখ হইয়াছে। মুল উদ্দেশ্যের তাৎপর্য্য এই যে, নারীদের জন্য মাহরাম বা স্বামীর সঙ্গ ব্যতীত দুর পথের ভ্রমণে যাত্রা করা নিষিদ্ধ। একদিন ভ্রমণের দূরত্ব হইলেও নিষিদ্ধ এবং দুই দিন ভ্রমণের দূরত্ব হইলে ততোধিক জঘণ্য নিষিদ্ধ, তিনদিন দূরত্ব হইলে একেবারে হারাম।*

আলোচ্য মছআলায় ভ্রমণের ব্যাখ্যা ঐরূপই যেরূপ শরীয়তের অন্যান্য বিধানসমূহে যথা—ছফরে নামায কছর করা ইত্যাদিতে গণ্য। সেমতে তিন দিন তিন রাত্র ভ্রমণের দূরত্ব মাত্র ৪৮ মাইল গণ্য করা হয়।

মছআলাহ ঃ—ঋতুবতী নারী হজ্জের সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিবে; একমাত্র তওয়াফ ঋতু অবস্থায় করিতে পারিবে না। (২২৩ পৃঃ)

---

* প্রখ্যাত আলেম ও মোহাদ্দেছ মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশমীরী (রঃ) বলিয়াছেন, হানাফী মজহাবের সমস্ত কেতাবেই লিখিত আছে, মহিলাদের জন্য (স্বামী বা) মাহরাম ছাড়া ছফর করা নাজায়েয নিষিদ্ধ। কিন্তু আমার মতে মাহরাম ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ তত্বাবধায়কের সহিতও ছফর করিতে পারে—যে ক্ষেত্রে (honesty) সততা ও সাধুতার বিন্দুমাত্র অভাবের আশঙ্কা না থাকে এবং ফেৎনা তথা চারিত্রিক নোংরামির কোন খেয়াল দৃষ্টিরও আদৌ সম্ভাবনা না থাকে। আমার এই মতের সমর্থন অনেক হাদীছেই পাওয়া যায়। গায়েব-মাহরামের সঙ্গে মহিলার ছফরে সাধারণতঃ ঐরূপ কোন নোংরামি বা উহার খেয়াল সৃষ্টির সম্ভাবনা ও অবকাশ থাকে বলিয়াই সচরাচর উহাকে নাজায়েয বা নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে (ফয়জুলবারী, ২—৩৯৭)। অবশ্য ধরা-ছোয়ার প্রয়োজন হইবে—এইরূপ ছফরে স্বামী বা মাহরাম সঙ্গে থাকিতেই হইবে।

হাঁটিয়া কা'বা শরীফে যাওয়ার মান্নত করা

৯৪৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক বৃদ্ধকে দেখিলেন, সে (স্বীয় অক্ষমতার দরুণ) তাহার দুই পুত্রের কাঁধে ভর করিয়া চলিতেছে। নবী (দঃ) তাহার এই যাতনা ভোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পুত্রদ্বয় উত্তর করিল, সে কা'বা শরীফে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়ার মান্নত মানিয়াছে। এতচ্ছ্রবণে নবী (দঃ) বলিলেন, এই বৃদ্ধ স্বীয় আত্মাকে এরূপ যাতনা ভোগে বাধ্য করুক আল্লাহ তায়ালা ইহার প্রত্যাশী নহেন। এই বলিয়া বৃদ্ধকে যানবাহনে আরোহণের আদেশ করিলেন।

৯৫০। হাদীছ ঃ—ওক্‌বা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার ভগ্নী বাইতুল্লাহ শরীফে পায়ে হাঁটিয়া পৌঁছিবার মান্নত করিলেন। (কিন্তু তিনি মোটা শরীর-বিশিষ্টা ছিলেন। এতদূর হাঁটিয়া চলা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, তাই) তিনি আমাকে এই বিষয়টি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করার আদেশ করিলেন। আমি হযরতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, সে পায়ে হাঁটিয়া চলিবে এবং (যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িবে তখন) যানবাহনে আরোহণ করিবে।+

মছআলাহ ঃ—পায়ে হাঁটিয়া মক্কা শরীফে যাওয়ার মান্নত করিলে সহজ সাধ্য হইলে পায়ে হাঁটিয়াই ওমরা বা হজ্জ করা চাই। অবশ্য তাহা না করিলে কিম্বা পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া অসাধ্য হইলে যানবাহনের সাহায্য লইতে পারিবে, কিন্তু এমতাবস্থায় তাহাকে দম আদায় করিতে হইবে।

+ আলহামদু লিল্লাহ। ১৩৭৭ হিঃ ১৯৫৮ ইং হজ্জের সফরে ২১শে জিলহজ্জ ৮ই জুলাই পবিত্র মক্কা নগরীতে মেছফালাহ নামক মহল্লায় হজ্জের পরিচ্ছেদ লেখা শেষ করা হইল।

পবিত্র মদীনার ফজীলত*

মদীনার চতুঃসীমাস্থ এলাকা হরম শরীফ

৯৫১। হাদীছঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِّنْ كَذَا اِلٰى كَذَا

لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلَا يُحْدَثُ فِيْهَا حَدَثٌ مَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ

اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনার এই সীমা (—"আয়ের" নামক পাহাড়) হইতে ঐ সীমা (—ওহুদ পাহাড়ের সংলগ্ন "ছওর' নামক ছোট পাহাড়) পর্য্যন্ত "হরম" পরিগণিত। উহার বৃক্ষাদি কাটা যাইবে না, (ঘাস-পাতা, তরু-লতা, উদ্ভিদ সমূহের ক্ষতি সাধন করা যাইবে না উহার কোন বন্যজীবকে শিকার করা যাইবে না) এবং মদীনার মধ্যে কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার, অশান্তি, ব্যভিচার শরীয়ত বিরোধী কার্য্যকলাপ ও অন্দোলন সৃষ্টি করা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ ও হারাম। যে ব্যক্তি পবিত্র মদীনার এলাকায় এরূপ কার্য্যের সৃষ্টি করিবে (বা এরূপ কার্য্য) সৃষ্টিকারীকে স্থান দিবে (অর্থাৎ তাহার কোন প্রকার সহযোগিতা বা সমর্থন করিবে) তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার ও সমুদয় ফেরেশতাগণের এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর লা'নত ও অভিশাপ।

অর্থাৎ—এরূপ কার্য্য যে করিবে তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অভিশাপের ঘোষণা জারী করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি সেই ঘোষণা অনুসারে আল্লার অভিশাপে পতিত হইবে এবং এরূপ কার্য্যকারীর প্রতি ফেরেশতাগণ সর্বদা অভিশাপ ও বদ-দোয়া করিয়া থাকেন; ফেরেশতাগণের সেই অভিশাপ তাহার উপর পতিত হইবে। আর ঐ ব্যক্তি এমনই জঘণ্য যে, তাহার প্রতি অভিশাপ করা সমগ্র বিশ্ববাসীর আশু কর্তব্য।

৯৫২। হাদীছঃ— عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى لِسَانِىْ قَالَ وَاَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِىْ الْحَارِثَةِ فَقَالَ اُرَاكُمْ يَا بَنِىْ حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِّنَ

الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ بَلْ اَنْتُمْ فِيْهِ ـ

---

* এই অধ্যায়টি ১৯৫৮ ইং সনের হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মদীনায় লেখা হইয়াছে।

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনার সীমানাস্থ এলাকাকে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) "হরম" বলিয়া আমার মারফৎ ঘোষণা করা হইয়াছে।

বনু-হারেছা নামক গোত্র (যাহাদের বসতি ওহদ পাহাড়ের নিকটস্থ ছিল) তাহাদের নিকট একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আসিলেন এবং বলিলেন, আমার ধারণা হইতেছে, তোমরা (মদীনার) হরমের এলাকা হইতে বাহিরে বসতি অবলম্বন করিয়াছ। অতঃপর বলিলেন, না—তোমরা হরমের সীমার ভিতরেই আছ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বিভিন্ন হাদীছে মদীনা শরীফের নির্দ্ধারিত সীমাকে "হরম" বলা হইয়াছে। অনেক ইমামের মতে ওয়াজেব রূপেই উহা হরম শরীফ; যেরূপ মক্কাস্থিত সীমা হরম শরীফ; উভয়ের মছআলাহ সমানই। হানাফী মজহাব মতে মদীনার সীমা "হরম" হওয়ার অর্থ বিশেষ বিশেষ সম্মান ও মান-মর্য্যাদার স্থান। মদীনার বৃক্ষাদি কাটা জায়েয আছে যেরূপ ৮৫৪নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। অবশ্য সাধারণতঃ উহা না কাটাই উত্তম। ৯৫১নং হাদীছের তাৎপর্য্য ইহাই।

৯৫৩। হাদীছ ঃ— عن علي رضي الله تعالى عنه قال

مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ اِلَّا كِتَابُ اللهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيْفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ اِلٰى كَذَا مَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَّلَا عَدْلٌ........

অর্থ—আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তিনি বলিয়াছেন, (হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিশেষরূপে শুধু আমাকে কোন বিষয় জ্ঞাত করাইছেন—এমন) কোন বিষয়—বস্তু আমার নিকট নাই। হাঁ—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হইতে প্রাপ্ত যাহা আমার নিকট আছে তাহা আল্লার কিতাব কোরআন শরীফ এবং একখানা লিপি যাহার মধ্যে শরীয়তের এই কয়েকটি আদেশ ও বিধান লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। (১) পবিত্র মদীনা "আয়ের" নামক পাহাড় হইতে অমুক সীমানা পর্য্যন্ত "হরম" পরিগণিত। মদীনার মধ্যে যে ব্যক্তি কোন অন্যায়-অত্যাচার, অশান্তি বা শরীয়ত বিরোধী কার্য্যকলাপ সৃষ্টি করিবে কিম্বা ঐ কার্য্য অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে কোন প্রকারে সমর্থন করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নত ও অভিশাপ ও সমস্ত ফেরেশতাগণের অভিশাপ বর্ষিত হইবে এবং সে সমগ্র বিশ্ববাসীর অভিশাপযোগ্য হইবে। তেমন ব্যক্তির কোন ফরজ বা নফল এবাদৎ

(আল্লার দরবারে) কবুল ও গ্রহণীয় হইবে না। (২) ইসলামী রাষ্ট্রের বিধান মতে কোন অমোসলমানকে নিরাপত্তা দানের ক্ষমতা ও অধিকার সকল মোসলমানেরই সমান। যে কোন একজন মোসলমান কোন অমোসলেমকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দান করিলে সমস্ত মোসলমানের পক্ষে উহা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য হইবে। যে কোন মোসলমান অন্য এক মোসলমানের প্রদত্ত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিকে ভঙ্গ করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নত ও অভিশাপ এবং ফেরেশতাগণ ও সমগ্র বিশ্ববাসীর লা'নত ও অভিশাপ। ঐ ব্যক্তির কোন ফরজ বা নফল এবাদত আল্লার দরবারে কবুল হইবে না।

(৩) যে কৃতদাস স্বীয় মনিবের পরিচয় গোপন করিয়া অন্য মনিবের প্রতি নিজের সম্বন্ধ প্রকাশ করিবে এবং যে ব্যক্তি স্বীয় পিতার পরিচয় গোপন রাখিয়া অন্য কাহারও প্রতি স্বীয় সম্বন্ধ প্রকাশ করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নত ও অভিশাপ। ঐ ব্যক্তির কোন ফরজ বা নফল এবাদত কবুল হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—বর্তমান যুগের পীর-মুরশিদ নামধারী ভণ্ড ও ধোকাবাজদের একদল লোক বলিয়া থাকে যে, আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট দীন ইসলামের এমন অনেক বিষয়বস্তু ছিল যাহা ছিনা-বছিনা আমরা পাইয়াছি; ঐ সব বিষয়বস্তু কোরআন-হাদীছে ব্যক্ত হয় নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ সব বিষয় বিশেষরূপে আলী (রাঃ)কে জ্ঞাত করিয়া গিয়াছেন, অন্য কাহাকেও তাহা জ্ঞাত করান নাই। বস্তুতঃ এই সকল বে-ঈমানী ধোকাবাজীর কথা পূর্ব হইতে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা কল্পিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এমনকি, আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বর্তমানেও এরূপ কুকথার বিষ লোকদের মধ্যে ছড়াইতেছিল। এইরূপ বিষময় কুকথার বিরুদ্ধে, উহার মুলোচ্ছেদ কল্পে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বারংবার আলোচ্য হাদীছের অস্বীকৃতি-যুক্ত কঠোর বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। এমনকি, এই অস্বীকৃতির উপর তিনি কঠোর ভাষায় শপথ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। বোখারী শরীফ ২১ পৃষ্ঠায় এই হাদীছটি বর্ণিত আছে, সে স্থানে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল—আপনার নিকট রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন লিপি আছে কি? ২২৮ পৃষ্ঠায় আছে, এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, অহী দ্বারা প্রেরিত বিষয়াবলীর কোন বিশেষ বস্তু আপনার নিকট খাছভাবে বিদ্যমান আছে কি? ১০২০ পৃষ্ঠায় আছে, এরূপ প্রশ্ন করিল যে, কোরআন শরীফে নাই বা অন্য কোন মানুষের নিকট নাই এমন কোন বিষয়বস্তু আপনার নিকট আছে কি? মোসলেম শরীফের হাদীছে আরও স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে—একদা এক ব্যক্তি আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আপনার নিকট কি কি বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু চুপি চুপি বলিয়া গিয়াছেন? আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণে

ভীষণ উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কখনও অন্য লোকদের হইতে গোপন রাখিয়া আমার নিকট চুপি চুপি কিছুই ব্যক্ত করেন নাই; হাঁ—কয়েকটি বিষয় তিনি আমাকে লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহা এই লিপির মধ্যে লিখিত আছে। এই বলিয়া তিনি স্বীয় তরবারীর খাপ হইতে একখানা লিপি বাহির করিলেন। লিপিখানার মধ্যে (মূল আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত বিষয় কয়টির সহিত ইহাও) লিখিত ছিল যে—(১) যে ব্যক্তি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও নামের উপর কোন জীবজন্তু জবেহ করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ। (২) যে ব্যক্তি পথ ও রাস্তার চিহ্ন বা জায়গা-জমীনের সীমানার চিহ্ন ইত্যাদি চুরি করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ। (৩) যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ। (৪) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের বিধান ও তরীকা ছাড়া অন্য তরীকা সৃষ্টি করিবে বা ঐরূপ তরীকার আন্দোলনকারীর প্রতি কোন প্রকার সমর্থন রাখিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ।

এতদ্ভিন্ন ঐ লিপির মধ্যে আরও লিখিত ছিল যে, মোসলমান ছোট-বড় ধনী দরিদ্র সকলেরই জানের মূল্য সমান। অর্থাৎ কোন ধনী ব্যক্তি কোন দরিদ্রকে না-হক খুন করিলে বা কোন ভদ্র ব্যক্তি কোন ইতর ব্যক্তিকে না-হক খুন করিলে ঐ ধনী ভদ্র ব্যক্তিকে খুনের বদলে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে। মদীনার হরম শরীফের সীমার বিষয় লিখিত ছিল যে—ঐ সীমার মধ্যে কোন ঘাস-পাতা, তরু-লতার ক্ষতি সাধন করা যাইবে না, উটের আহার্য্য যোগান ব্যতীত কোন গাছ কাটা যাইবে না, কোন মোসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ বিবাদ করার জন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র হাতে লওয়া যাইবে না এবং উহাতে ছিল—বিভিন্ন অঙ্গে ও বিভিন্ন পরিমানে জখম করার শাস্তি ও দণ্ডের বিবরণ এবং কোন কোন প্রকারের খুনের বদলে বিভিন্ন বয়সের যে বহু সংখ্যক উট প্রদান করিতে হয় উহার বিবরণ। এবং উহাতে ছিল—ক্রীতদাস মুক্তি দানের ফজিলত এবং উহাতে এই বিধান লিখিত ছিল যে, (ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রজা নয় এমন) অমোসলেমদের হত্যা করার দায়ে কোন মোসলমানকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে না এবং কোন অমোসলমানকে নিরাপত্তা দান করা হইলে সেই অবস্থায় তাহাকে হত্যা করা যাইবে না।

৯৫৪। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

كَانَ يَقُوْلُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ -

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়া থাকিতেন—মদীনার এলাকায় হরিণ-পাল অবাধে ঘুরা-ফেরা করিতেছে দেখিলে আমি উহাদেরকে কোন ভয়ও দেখাইব না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনার উভয় পার্শ্বস্থ সীমার মধ্যবর্তী এলাকা হরম শরীফ।

মদীনার বৈশিষ্ট্য

৯৫৫। হাদীছ :— ابو هريرة رضى الله تعالى عنه يقول

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَاْكُلُ الْقُرٰى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِىَ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ.

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এমন একটি বস্তিকে স্বীয় বাসস্থানরূপে অবলম্বন করার আদিষ্ট হইয়াছি সে বস্তি অন্যান্য বস্তি সমূহের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে। অনেকে উহাকে "ইয়াছরেব" নামে অভিহিত করে, কিন্তু উহার সুযোগ্য নাম মদীনা। সেই বস্তি অসৎ লোকদিগকে নিজ সীমার ভিতর হইতে বাছিয়া বাহির করিবে যেরূপ কর্মকারের অগ্নি-চুলা লোহা হইতে উহার জং ও মরিচাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা :—বিশ্বের উপর মদীনা শরীফের প্রাধান্য বাহিক দৃষ্টিতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ছাহাবীদের যুগে স্পষ্টতঃই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ সে যুগে মোসলেম জাতি বিশ্বের বুকে সর্বাধিক শক্তিশালী জাতিরূপে খ্যাতি লাভ করিতেছিল এবং তৎকালীন সেরা রাষ্ট্রসমূহ মোসলমানদের ভয়ে কম্পমান ত ছিলই, তদুপরি শেষ পর্য্যন্ত উহার প্রত্যেকটিই মোসলমানদের হস্তে উচ্ছেদ হয়। সেকালে মোসলেম জাতির সম্মুখে মাথা উচু করার কোন শক্তি ও জাতি অবশিষ্ট ছিল না। সেই বিশ্ববিজয়ী মোসলেম জাতির প্রধানতম কেন্দ্র ছিল পবিত্র মদীনা-তাইয়্যেবা।

এতদ্ভিন্ন মর্তবা বা ফজিলতের দিক দিয়া সমগ্র বিশ্বের উপর পবিত্র মদিনার শ্রেষ্ঠত্ব অতি সুস্পষ্ট ও তর্কাতীত। এমনকি সমগ্র নগরী হিসাবে কোন কোন আলেম মক্কা নগরীর ফজিলতের তুলনায়ও মদীনা নগরীর ফজীলতকে আধিক্য প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য মক্কা নগরীর মধ্যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ হরম শরীফের মসজিদ এবং অতি মহান বাইতুল্লাহ শরীফ বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু মদীনা নগরীতেও যে ভূখণ্ডে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সশরীরে অবস্থানরত রহিয়াছেন, বিশেষরূপে সেই ভূখণ্ডকে আল্লাহ তায়ালা কাবা হইতে, বরং আরশ হইতেও অধিক মর্তবা ও ফজীলত দান করিয়াছেন—ইহা আলেমগণের ঐক্যমত পূর্ণ সিদ্ধান্ত। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় প্রভু আল্লাহ তায়ালার নিকট কিরূপ প্রিয় ও মাহবুব ছিলেন,

উল্লিখিত বিষয়টি তাহারই একটি জ্বলন্ত নিদর্শন এবং আলেমগণ সেই হিসাবেই উল্লিখিত বিষয়টির উপর নিজেদের ঐক্যমত স্থাপন করিয়াছেন।

এই হাদীছের মধ্যে মদীনা শরীফের একটি বিশেষত্ব এই বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যে, অসৎ লোকদিগকে নিজ সীমা হইতে বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া দিবে। এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিক্রিয়া পূর্ণরূপে বিকশিত হইবে কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে--যখন দজ্জালের আবির্ভাব হইবে। সেই সময় দাজ্জাল শহরসমূহ প্রদক্ষিণ করিয়া তৎকালীন অধিকাংশ লোকদিগকে নিজ দলে শামিল করিয়া লইবে, কিন্তু সে পবিত্র মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। অবশ্য সে মদীনার নিকটবর্তী এক বস্তিতে আসিবে এবং মদীনার মোনাফেক-কাফের ব্যক্তিরা মদীনা হইতে বাহির হইয়া দজ্জালের দলভুক্ত হইবে; (এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ৯৬২নং হাদীছে বর্ণিত হইবে।) তখনই পবিত্র মদীনার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যটি পূর্ণরূপে বিকশিত হইবে। অবশ্য পবিত্র মদীনার এই বিশেষত্বটি ঐ বিশেষ সময়ের পূর্বেও সময় সময় স্থান বিশেষে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এমনকি, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায়ও এইরূপ ঘটনা ক্ষেত্রবিশেষে ঘটিয়াছে। ৯৬৪নং হাদীছে এক বেদুইনের ঘটনা বর্ণিত হইবে—সে স্বীয় বস্তি ছাড়িয়া মদীনায় আসিয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু পর দিনই সে জ্বরাক্রান্ত হইয়া হযরতের নিকট উপস্থিত হয় এবং সে তাহার ইসলাম ফেরৎ লইবার জন্য হযরতের নিকট বার বার দাবী জানাইতে থাকে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার দাবী প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু সে শেষ পর্য্যন্ত ইসলাম ত্যাগ করতঃ মদীনা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তাহার এই ঘটনার উপর নবী (দঃ) পবিত্র মদীনার আলোচ্য বিশেষত্বেরই উল্লেখ করিয়াছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে পবিত্র মদীনার স্নেহময় কোলে এবং উহার সুশীতল ছায়াতলে স্থান দান করুন। এমনকি, শেষ শয়নের স্থানটুকুও পবিত্র মদীনায়ই দান করুন এবং পবিত্র মদীনা হইতে বিতাড়িত হওয়ার বদ-বখ্‌তি হইতে বাঁচাইয়া রাখুন—আমীন!

تَمَنَّيْتُ مِنْ رَبِّىْ جِوَارَ مَدِيْنَةٍ — فَيَا لَيْتَ لِىْ فِيْهَا ذِرَاعٌ لِمَرْقَدِىْ

মদীনায় স্থান লাভ হউক—ইহাই প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে আমার আকাঙ্খা। আমার সু-নছীব—যদি মদীনায় এক হাত জায়গাও কবরের জন্য আমার ভাগ্যে জুটে।"

رَجَائِىْ بِرَبِّىْ اَنْ اَمُوْتَ بِطَيْبَةٍ — فَاَرْقُدَ فِىْ ظِلِّ الْحَبِيْبِ وَاُحْشَرَ

প্রভুর নিকট আমার আকাঙ্খা—আমার মৃত্যু যেন মদীনা তাইয়্যেবায় হয়; তবেই আমি প্রাণ প্রিয়ের ছায়ায় চির নিদ্রিত থাকিতে এবং তাঁহারই ছায়ায় হাশর ময়দানে যাইতে পারিব।

মদীনার অপর নাম 'তাবাহ'

৯৫৬। হাদীছঃ— عن ابى حميد رضى الله تعالى عنه قال

اَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوْكَ حَتّٰى اَشْرَفْنَا عَلَى

الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هٰذِهِ طَابَةٌ -

অর্থঃ—আবু হোমাইদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তবুকের জেহাদ হইতে ফিরার পথে চলিতেছিলাম। মদীনার নিকটবর্তী পৌঁছিয়া যখন মদীনা দেখা যাইতেছিল তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, ইহা 'তাবাহ' বা 'তায়বাহ'।

ব্যাখ্যাঃ— মদীনার অপর নাম 'তাবাহ' এবং 'তায়বাহ'। উভয় আরবী শব্দেরই আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও উত্তম। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনার প্রতি স্বীয় অনুরাগ ও প্রীতি প্রকাশার্থে উহাকে এইসব নাম দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। কোন কোন হাদীছে বর্ণিত আছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও পবিত্র মদীনাকে এই সব নামে অভিহিত করিয়াছেন।

পবিত্র মদীনার বসবাস ত্যাগ করা দুঃখজনক

৯৫৭। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—(এক সময়) লোকেরা মদীনাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে মদীনায় ভাল অবস্থা বিরাজমান থাকা সত্বেও। এমনকি অবশেষে উহার বাসিন্দা শুধুমাত্র বন্য পশু-পক্ষী যাহারা ঘুরিয়া-ফিরিয়া নিজ নিজ আহার্য্য যোগায় উহারাই থাকিবে। (অর্থাৎ পোষিত পশু-পক্ষীও তথায় থাকিবে না, কারণ পোষণকারী মানুষের অস্তিত্ব তথায় থাকিবে না।) মদীনার প্রতি সর্বশেষ আগন্তুক মোযায়না গোত্রের দুই রাখাল তাহাদের ছাগলপাল হাঁকাইতে হাঁকাইতে মদীনার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতে থাকিবে; বাহিরে থাকিতেই অনুভব করিবে যে, মদীনা জনশূন্য—তথায় বন্য পশু-পক্ষী ভিন্ন আর কিছু নাই। মদীনায় প্রবেশ পথের দারস্থ 'ছানিয়াতুল-বেদা' নামক স্থানে তাহাদের পৌঁছা মাত্রই (কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের শিঙ্গা-ফুঁক আরম্ভ হইয়া যাইবে;) তাহারা তথায় অধঃমুখী পতিত হইয়া মরিয়া থাকিবে।

ব্যাখ্যাঃ—সারা ভূপৃষ্ঠে একটি মানুষ 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণকারী অবশিষ্ট থাকা পর্য্যন্ত কেয়ামত তথা জগতের উপর মহাপ্রলয় আসিবে না; যখন 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণকারী একটি মানুষও সারা জগতে বিদ্যমান থাকিবে না তখনই জগতের ধ্বংস বা মহাপ্রলয়

আসিবে (হাদীছ—মোসলেম শরীফ)। সুতরাং ইহা অবধারিত যে, কেয়ামতের পূর্বক্ষণে সমগ্র জগতে শুধুমাত্র কাফেরদেরই অবস্থান হইবে; কোথাও একটি প্রাণী মোসলমানের অস্তিত্ব থাকিবে না। এমনকি আল্লার ঘরের শহর মক্কায়ও তখন কাফেরই থাকিবে। তাহারা কাবা শরীফের এক একটি পাথর বিচ্ছিন্ন করিয়া কাবা শরীফকে ধ্বংস করিয়া দিবে (হাদীছ—বোখারী শরীফ)। ঐ সময়কালে মদীনায় কি অবস্থা বিরাজ করিবে? যদি তথায় মানুষ থাকে তবে তাহারাও কাফের হইবে এবং সেই অবস্থায় তথায় বর্তমান হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রওজা শরীফ তথা তাঁহার আরাম-কক্ষের সহিত ঐ ব্যবহারের আশঙ্কা অতি সুস্পষ্ট যে ব্যবহার কাফেররা কাবা শরীফের সহিত করিবে বলিয়া হাদীছে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। কাফেররা হযরতের অবমাননার চেষ্টা চিরকালই করিয়া আসিয়াছে। মদীনার ইতিহাসে বিদ্যমান ঘটনা—মক্কা-মদীনা যখন সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী রহমতুল্লাহে আলাইহের শাসন ও হেফাজতে, তখন ইহুদীরা হযরত (দঃ)কে মদীনা হইতে অপহরণের এক জঘন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। তৎকালীন ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট মদীনা শহরের এক নিভৃত কোণে হযরতের রওজা শরীফের অদূরে দরবেশ ছদ্মবেশী দুই ইহুদী নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের ভান ধরিয়া নির্জন বাসস্থান তৈরী করে। তথা হইতে ধীরে ধীরে অতি গোপনে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ করিয়া হযরতের রওজা শরীফের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। উদ্দেশ্য সাধনের অনতিদূরে পৌঁছিলে সুলতান নূরুদ্দীন (রঃ) স্বপ্নে দেখিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) দুইটি লোককে দেখাইয়া বলিতেছেন, এই লোক দুইটি আমাকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। স্বপ্ন হইতে নিদ্রা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সুলতান স্বীয় ওজীরকে ডাকাইয়া এই গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন ব্যক্ত করিলে ওজীর বলিলেন, নিশ্চয় মদীনায় কোন অঘটন ঘটিতেছে। সুলতান তৎক্ষণাৎ ওজীরকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী ত্যাগ করতঃ মদীনায় পৌঁছিলেন। কিন্তু সমস্যা হইল এই যে, স্বপ্নে দেখান ব্যক্তিদ্বয়ের দৃশ্য ত সুলতানের স্মরণ রহিয়াছে; তাহাদের আর কোন পরিচয় জানা নাই; এমতাবস্থায় তাহাদেরকে শহর হইতে কিরূপে খুঁজিয়া বাহির করা যায়। বাদশাহ ওজীরের পরামর্শে বিরাট এক ঘেরাও-এর মধ্যে মদীনায় অবস্থানকারী সকলকে এক সঙ্গে দাওয়াতে সমবেত হওয়ার বাধ্যতামূলক নির্দেশ দিলেন। ঘেরাও-এর ভিতর গমনাগমনের একটি মাত্র পথ রাখা হইল; তথায় বাদশাহ বসিয়া থাকিলেন। প্রত্যেকটি লোককে দেখা হইল; কিন্তু স্বপ্নে দেখা আকৃতি পাওয়া গেল না। বহু জিজ্ঞাসাবাদের পর বাদশাহকে বলা হইল, মদীনায় দুইজন দরবেশ নির্জনে অবস্থান করেন; তাঁহারা জন-সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তাই তাঁহারা এই দাওয়াতে যোগদান করেন নাই। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ তাহাদেরকে উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন। যখন তাহাদেরকে নিয়া আসা হইতেছিল তখন দূর হইতে তাহাদেরকে দেখামাত্র বাদশাহ চিৎকার করিয়া উঠিলেন যে, এই সেই আকৃতি যাহা আমাকে স্বপ্নে দেখান হইয়াছিল। তাহারা সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইল। বাদশাহ ব্যক্তিদ্বয়কে মৃত্যুদণ্ড

দিলেন এবং রওজা শরীফের চতুর্দিক সাধ্য পরিমাণ গভীর গর্ত করিয়া সীসা ভরিয়া দেওয়া হইল। এইভাবে হযরতের রওজা শরীফ ভূগর্ভেও সীসার দেওয়ালে সুরক্ষিত হয়।

শহীদদের পদার্থীয় দেহ অবিকৃত বিদ্যমান থাকে—যাহার বিবরণ তৃতীয় খণ্ড "ওহোদের জেহাদ" পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে। হযরতের সন্নিকটে সমাহিত খলীফা ওমরের কবর দীর্ঘ ৬৮০ বৎসর পরে মসজিদে নববী পুনঃ নির্মাণে খননকালে পায়ের দিকের জমি ধ্বসিয়া পা খুলিয়া গিয়াছিল। খলীফা ওমরের পা তখনও অবিকৃত দেখা গিয়াছে। উপস্থিত বিশিষ্ট তাবেয়ী ওরওয়া (রঃ) শপথের সহিত সে পা খলীফা ওমরের বলিয়া সনাক্ত করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন; বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডের শেষে "হযরতের ও খলীফাদ্বয়ের কবরের বিবরণ" পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দেহ মোবারকের কথা আলোচনার উর্দ্ধে; ইহা কেয়ামত পর্য্যন্ত সর্বাধিক সুরক্ষিত। শহীদের বরযখী-জীবন অপেক্ষা হযরতের বরযখী-জীবন লক্ষ-কোটি গুণ বেশী শক্তিশালী।

সমস্ত জগতে যখন কাফেরই কাফের থাকিবে যাহারা কাবা শরীফকে ছিন্ন ভিন্ন করিবে ঐ সময় তাহারা মদীনায় থাকিলে হযরতের রওজা পাকের সহিত কি করিবে তাহা সহজেই বোধগম্য এবং হযরত (দঃ) তাঁহার রওজায় বরযখী-জীবনে জীবন্ত।

ঐ সময় কাবা শরীফের সুরক্ষণের প্রয়োজন ত থাকিবে না যাহার বিবরণ "কাবা শরীফের বিনাশ সাধন" পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মান-মর্য্যাদা এবং তাঁহার রওজা শরীফের সুরক্ষণ ত কোন মুহূর্তেই নিষ্প্রয়োজনীয় হইতে পারে না, তাই ঐ সময়ের প্রয়োজন নির্বাহের ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা এই নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, ঐ সময় মদীনায় কোন মানুষের বসবাস মোটেই থাকিবে না, সম্পূর্ণ মদীনা এলাকা ঐ কালে জনশূন্য অবস্থায় ভাব-গম্ভীররূপে বিরাজমান থাকিবে। উহার সমুদয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তথা ফল-ফলাদির বাগ-বাগিচা, সেই বাগ-বাগিচার সবুজ-শ্যামলতা উহাতে বন্য পশু-পক্ষীর কোলাহল ইত্যাদি সবই বিরাজমান থাকিবে, থাকিবে না শুধু মানুষের বসবাস। কারণ, আল্লাহ তায়ালার প্রিয় নবীর এলাকায় অবস্থানের উপযোগী তাহার অনুরাগী মোমেন-মোসলমানের অস্তিত্বই তখন ভূপৃষ্ঠে থাকিবে না। আর রসুলের শত্রুদেরকে ত একচ্ছত্র ভাবে তথায় বসবাসের সুযোগ দেওয়া যায় না; সুতরাং ঐ সময় সোনার মদীনা তাহার সোনালী সৌন্দর্য্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ ফল-ফলাদি ও বাগ-বাগিচার বাহক হওয়া সত্ত্বেও উহা সম্পূর্ণ জনশূন্য অবস্থায় থাকিবে। এই অবস্থা ত অকস্মাৎ হঠাৎ একদিনে সম্পন্ন হইয়া যাইবে না, উহার জন্য প্রকৃতি এই ব্যবস্থা করিবে যে, ঐ সময়কাল নিকটবর্তী হইয়া আসিলে কোনরূপ অভাব-অভিযোগ ব্যতিরেকেই মদীনাবাসীরা মদীনা ত্যাগ করিয়া যাইতে আরম্ভ করিবে; যাহার ভবিষ্যদ্বাণী সম্মুখের হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে। মদীনার অধিবাসীগণ মদীনা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং

মদীনার প্রতি নূতন আগন্তুকের আগমণ হইবে না—এইভাবে মদীনা জনশূন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হইবে। সেই কেয়ামতের পূর্বক্ষণের বিশেষ সময় কালের অবস্থারই ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে আলোচ্য হাদীছটিতে*। উল্লিখিত প্রয়োজন সমাধানে যে, আল্লার কুদরতে ঐ সময়ের নিকটবর্তীকালে মদীনাবাসীরা মদীনা ত্যাগ করিয়া যাইতে থাকিবে রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক উহার বর্ণনা দানে তাঁহার আক্ষেপ অনুভাগের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে; তিনি মদীনার প্রতি এতই অনুরক্ত ছিলেন। সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাণের প্রিয় সোনার মদীনা ত্যাগীদের প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দুঃখজনক ভাব কিরূপ হইবে এবং এই শ্রেণীর লোক যে কিরূপ ভাগ্য বিতাড়িত তাহা অতি সুস্পষ্ট। ইহাই ছিল আলোচ্য হাদীছের পরিচ্ছেদের মর্ম।

আয় আল্লাহ! এই নরাধম দীন-হীনকে সদা সোনার মদীনার প্রতি আসক্ত অনুরক্ত রাখিও, মদীনার জিন্দেগীর সুযোগ দান করিও এবং জীবনের শেষ সময় মদীনার আশ্রয়ে থাকিয়া মৃত্যুর পর মদীনার কোলেই কবরের স্থান লাভ করা নছীবে জোটাইও! আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

৯৫৮। হাদীছঃ— عن سفيان بن ابى زهير رضى الله تعالى عنه

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فياتى قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فياتى قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فياتى قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.

অর্থ—ছুফিয়ান ইবনে যোহায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই কথা বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি যে, (এমন এক সময় সম্মুখে আসিতেছে, যখন) ইয়ামান দেশ মোসলমানদের করতলগত হইবে এবং মদীনাবাসী কিছু সংখ্যক লোক (সুখ-স্বাচ্ছন্দের লিপ্সায়) মদীনায় অবস্থান ত্যাগ করতঃ স্বীয় পরিবারবর্গ ও সঙ্গী-সাথীগণকে লইয়া দ্রুতবেগে ইয়ামান দেশে ছুটিয়া আসিবে। কিন্তু মদীনা তাহাদের জন্য অতি উত্তম, অতি উত্তম। হায়—যদি তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকিত!

---

* আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত মদীনা জনশূন্য হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে ইমাম নববী (রঃ) বলিয়াছেন, জগতের আয়ুষ্কালের শেষ দিকে কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এই অবস্থা ঘটিবে। (ফতহুলবারী, ৪—৭২)

এইরূপে সিরিয়া অঞ্চল মোসলমানদের করতলগত হইবে এবং একদল লোক (সুখ-স্বাচ্ছন্দের লালসায়) মদীনায় অবস্থান ত্যাগ করতঃ পরিবারবর্গ ও সঙ্গী-সাথীগণকে লইয়া দ্রুতবেগে সিরিয়ায় ছুটিয়া আসিবে। কিন্তু মদীনা তাহাদের জন্য অতি উত্তম, অতি উত্তম। হায়—যদি তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকিত।

এইরূপে ইরাক দেশ মোসলমানদের করতলগত হইবে। তখন একদল লোক স্বীয় পরিবারবর্গ ও সঙ্গী-সাথীগণকে লইয়া (সুখ-স্বাচ্ছন্দের লিপ্সায়) দ্রুতবেগে মদীনা ত্যাগ করতঃ ইরাকে চলিয়া আসিবে, কিন্তু মদীনা তাহাদের জন্য সর্বোত্তম; হায়—যদি তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকিত।

ব্যাখ্যা :—শেষ যমানায় তথা কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আল্লাহ তায়ালার কুদরতেই মদীনা শহর জনশূন্য হইবে; সেই জন্য দুনিয়ার লিপ্সায় মদীনা ত্যাগ করা দুঃখজনক হইবে না—তাহা নহে। উক্ত হাদীছে উহারই বর্ণনা রহিয়াছে।

মদীনাবাসীকে ধোকা দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতি

৯৫৯। **হাদীছ :**— عن سعد رضى الله تعالى عنه قال سمعت

النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَايَكِيْدُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَحَدٌ اِلَّا انْمَاعَ

كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ -

অর্থ—সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের ক্ষতি ও অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে ফন্দি আটিবে, সে অনিবার্যতঃ এরূপ ধ্বংস হইবে যেরূপ নিমক পানির মধ্যে গলিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

দজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না

৯৬০। **হাদীছ :**— عن ابى بكرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ -

অর্থ—আবু বকরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনায় দজ্জালের প্রভাব প্রবেশ করিতে পারিবে না। যখন দজ্জালের প্রভাব বিস্তার হইবে সেই সময় মদীনা শহরে সাতটি প্রবেশ দ্বার থাকিবে, প্রত্যেক প্রবেশ দ্বারে দুই দুইজন ফেরেশতা পাহারারত থাকিবেন।

৯৬১। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلاَئِكَةٌ

لاَيَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلاَ الدَّجَّالُ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনার প্রতি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন; প্লেগের মহামারী এবং দজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

৯৬২। হাদীছ :— حدث انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ

اِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ اِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّيْنَ

يَحْرُسُوْنَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِاَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللّٰهُ كُلَّ

كَافِرٍ وَّمُنَافِقٍ ـ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দজ্জাল সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করিবে, কিন্তু মক্কা ও মদীনা নগরদ্বয়ে আসিতে পারিবে না; মদীনার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ কাতার বাঁধিয়া পাহারা দিতে থাকিবেন। ঐ সময় মদীনা শহরে পর পর তিনবার ভূমিকম্প হইবে—যদ্দরুন মদীনায় অবস্থানরত প্রত্যেকটি কাফের ও মোনাফেক মদীনা হইতে বাহির হইয়া আসিবে (এবং দজ্জালের দলভুক্ত হইবে)।

৯৬৩। হাদীছ :— ان ابا سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه

قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً عَنِ الدَّجَّالِ

فَكَانَ فِيْمَا حَدَّثَنَا بِهِ اَنْ قَالَ يَاْتِى الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ اَنْ يَّدْخُلَ

نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ يَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِى بِالْمَدِيْنَةِ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ

رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِىْ حَدَّثَنَا عَنْكَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثَهُ فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ اَرَاَيْتَ اِنْ قَتَلْتُ هٰذَا ثُمَّ اَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّوْنَ فِى الْاَمْرِ فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيْهِ فَيَقُوْلُ حِيْنَ يُحْيِيْهِ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ قَطُّ اَشَدَّ بَصِيْرَةً مِنِّى الْيَوْمَ فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ اَقْتُلُهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ ـ

অর্থ— আবু ছায়ীদ খুদ্রী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে দজ্জাল সম্পর্কে সুদীর্ঘ বর্ণনা শুনাইলেন। তাঁহার বয়ানের মধ্যে ইহাও ছিল যে, দজ্জাল (মদীনার উদ্দেশ্যে) যাত্রা করিবে, কিন্তু মদীনার রাস্তায় প্রবেশ করা তাহার জন্য অসাধ্য হইবে। (অপারগ হইয়া) সে মদীনার নিকটবর্তী কোন একটি লোনা জমিনে অবতরণ করিবে। এমতাবস্থায় একজন নেককার সৎলোক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিবেন---আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তুই সেই দজ্জাল যাহার বিষয়ে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে অবহিত করিয়া গিয়াছেন। তখন দজ্জাল স্বীয় সাঙ্গো-পাঙ্গোদেরকে বলিবে, আমি যদি বেটাকে হত্যা করতঃ পুনরায় জীবিত করিতে পারি তবুও কি আমার খোদায়ী দাবীর প্রতি তোমাদের কোন সন্দেহ বাকি থাকিবে? তাহারা সকলেই উত্তর করিবে---না, না। তখন দজ্জাল ঐ লোকটিকে বধ করিয়া (দুই খণ্ড করিয়া) ফেলিবে; অতঃপর জীবিত করিয়া দিবে। ঐ নেককার ব্যক্তি জীবিত হইয়াই বলিয়া উঠিবেন---আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, তুই-ই যে দজ্জাল সেই বিষয়ে বর্তমান সময়ের ন্যায় এত দৃঢ় বিশ্বাস আমার আর কখনও জন্মে নাই। তখন দজ্জাল পুনরায় তাঁহাকে হত্যা করিতে চাহিবে, কিন্তু সেই ক্ষমতা তাহার আর হইবে না।

মদীনা অসৎ লোকদিগকে বাহির করিয়া দেয়

৯৬৪। **হাদীছ ঃ---** عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ

جَاءَ اَعْرَابِىٌّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى الْاِسْلَامِ فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُوْمًا فَقَالَ اَقِلْنِىْ فَاَبٰى ثَلَاثَ مِرَارٍ فَقَالَ الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِىْ خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا ـ

অর্থ---জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার হাতে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করিল। দ্বিতীয়

দিন সে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় দীক্ষা ফেরৎ দেওয়ার দাবী জানাইল। নবী (দঃ) তাহার কথা প্রত্যাখ্যান করিলেন, এইরূপ তিনবার তাহার কথা প্রত্যাখ্যাত হইল। অতঃপর নবী (দঃ) বলিলেন, মদীনা কর্মকারের অগ্নি-চুলার ন্যায়; সে অসৎ লোককে বাহির করিয়া দেয় এবং সৎলোকগণই সেখানে থাকিয়া যায়।

ব্যাখ্যা ঃ—পবিত্র মদীনার এই গুণ ও বৈশিষ্ট্য সর্বদাই বিদ্যমান আছে, অবশ্য ইহ-জগৎ পরীক্ষার স্থল বলিয়া সর্বদা তাহা প্রয়োগ হয় না। পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, এই বিশেষত্বের পূর্ণ বিকাশ দজ্জালের আবির্ভাবের সময় হইবে, যেমন ৯৬২নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সময় এবং ক্ষেত্র বিশেষে সর্বদাই ইহা প্রকাশ পাইতে পারে ও হইয়া থাকে—যেরূপ আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় ঘটিয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন মদীনার এই ভাল-মন্দ বাছাই-এর গুণটির ক্রিয়া ক্ষেত্র বিশেষে শুধু ইহাও হয় যে, মন্দকে মন্দরূপে পৃথক করিয়া প্রকাশ করিয়া দেয়; যদিও তাহারা মদীনায়ই থাকিতে পারে, কিন্তু মন্দরূপে প্রকাশ পাইয়া; ভাল-মন্দে পরিচয়হীন মিশ্রিত রূপে নয়; মন্দ হওয়ার পরিচয়ে চিহ্নিত হইয়া থাকিতে পারে। যেমন—ওহোদ-জেহাদের সময় তিনশত মোনাফেক লোক মোসলমান সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে আসিল এবং একটা জঘন্য ছুতা ধরিয়া মাঝ পথ হইতে ফিরিয়া চলিয়া গেল—যাহাতে সকলের সম্মুখে তাহাদের মোনাফেকী স্পষ্ট হইয়া গেল এবং তাহারা মোনাফেক বলিয়া চিহ্নিত হইয়া গেল। তাহাদের সম্পর্কে নবী (দঃ) মদীনার এই গুণটি উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া এক হাদীছে স্পষ্ট বর্ণনা আছে। হাদীছটি তৃতীয় খণ্ড "ওহোদের জেহাদ" পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে। এই মোনাফেক দল মদীনায়ই বসবাস করিত, কিন্তু মোনাফেক হওয়ার পরিচয় ও চিহ্নের সহিত।

যেহেতু পবিত্র মদীনার এই গুণ ও বিশেষত্ব সর্বদাই বিদ্যমান আছে এবং সময় সময় ক্ষেত্রবিশেষে উহা প্রয়োগও হইয়া থাকে, তাই সকলের আতঙ্কিত ও সতর্ক থাকা আশু কর্তব্য। যেরূপ শক্তিশালী পাহলোয়ান ব্যক্তি যদিও সর্বদা সকলের উপর স্বীয় বল প্রয়োগ করে না, কিন্তু সকলেই তাহার শক্তিমত্তা হইতে সর্বদা আতঙ্কিত ও সতর্ক থাকে।

হে আল্লাহ! আমাদিগকে প্রিয় মদীনায় অবস্থানের সুযোগ ও তৌফিক দান কর; বিশেষতঃ মৃত্যুর পর কবরের স্থানটুকু যেন তথায়ই লাভ হয়—আমীন!

মদীনার জন্য হযরতের দোয়া ও অনুরাগ

৯৬৫। **হাদীছ ঃ**— عن انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ

بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ ـ

অর্থ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া করিয়াছেন—হে আল্লাহ্! মক্কা নগরীর মধ্যে যত বরকত দান করিয়াছ মদীনা নগরীতে উহার দ্বিগুণ বরকত দান কর।

৯৬৬। হাদীছ :— عن انس رضى الله تعالى عنه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ اِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِيْنَةِ اَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَاِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا ـ

অর্থ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আসাল্লামের বিদেশ হইতে ফিরার পথে যখন মদীনার বস্তি দৃষ্টিগোচর হইত তখন হযরত (দঃ) মদীনার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় মহব্বত ও অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া মদীনার প্রতি স্বীয় যানবাহনকে দ্রুত পরিচালিত করিতেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—মদীনা শহরের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় বলিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনার শহরতলী বস্তিহীন করাও পছন্দ করিতেন না। যেরূপ ৪০৩নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

ঈমান মদীনার প্রতি ধাবিত হয়

অর্থাৎ মোসলমান ব্যক্তি যেখানেই বসবাস করুক পবিত্র মদীনার প্রতি তাহার অনুরাগী ও আকৃষ্ট হওয়া এবং সর্বদা সর্বাবস্থায় মদীনার প্রতি তাহার প্রাণে আবেগ ও আকাঙ্খার ঢেউ খেলিতে থাকা ঈমানের একটি বিশেষ নিদর্শন।

৯৬৭। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَأْرِزُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ اِلَى جُحْرِهَا ـ

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় ঈমান মদীনার প্রতি এরূপ আকৃষ্ট ও ধাবিত হইয়া আসিবে যেরূপ সর্প স্বীয় গর্তের প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত হইয়া আসে।

ব্যাখ্যা :—ঈমানের আলো একমাত্র পবিত্র মদীনা হইতেই বিশ্বের কোণে কোণে ছড়াইয়াছে, তাই এই আলো কাহারো অন্তরে বিশ্বের যে কোন স্থানেই থাকুক না কেন সে তাহার কেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত হইবেই। যেরূপ সর্প স্বীয় গর্ত হইতে বাহির

হইয়া যেখানে যত দূরেই চলিয়া যাউক না কেন সে নিশ্চয় স্বীয় কেন্দ্র গর্তের প্রতি আকৃষ্ট হইবেই হইবে। খাঁটী ঈমানের নিদর্শন এই হইবে যে, মোমেন ব্যক্তি স্বীয় ঈমানের প্রতিক্রিয়া ও আকর্ষণে উহার কেন্দ্র পবিত্র মদীনার প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না। যাহার অন্তরে এই আকর্ষণ নাই বুঝিতে হইবে, তাহার অন্তরে খাঁটি ঈমান নাই।

যাবৎ আলো বিতরণকারী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পবিত্র মদীনার ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থানরত ছিলেন তাবৎ এই আকর্ষণের কোন সীমাই ছিল না; যে কোন ব্যক্তি যেখানে যত দূরে ঈমানের আলো লাভ করিয়াছে সে-ই সর্বস্ব ত্যাগ করতঃ মদীনার প্রতি পাগল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, এরূপ ঘটনার শত শত নজীর ছাহাবীগণের ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে।

আলো বিতরণকারী হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যদিও বাহ্যিক মৃত্যুর আবরণে ঢাকিয়া যাওয়ার দরুন সাধারণ দৃষ্টিশক্তির সঙ্কীর্ণ আওতা হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি আল্লাহ তায়ালার কুদরতে বরযখী-জীবনে জীবিত অবস্থায় মদীনার মাটিতে অবস্থানরত আছেন। তদুপরি বেহেশতের বাগান সম্বলিত তাঁহার মসজিদ তথায় বিদ্যমান; যাহার এক নামাযে পঞ্চাশ হাজার নামাযের অধিক ছওয়াব হয়, তদুপরি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বহু নিদর্শন উহাতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় উদিত রহিয়াছে। মদীনার ভিতরে বাহিরে অলিতে-গলিতে প্রিয় নবী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জেন্দেগীর শত শত নিদর্শন এবং ঐ সবের বরকত হাসিল করার সুযোগ আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই এই সোনার মদীনা—প্রাণের প্রিয় শহরের প্রতি মোমেনের প্রাণ আকৃষ্ট ও ধাবিত হইবেই। ঈমানের আলো পবিত্র মদীনা হইতে আসিয়াছে সে কখনও প্রিয় মদীনাকে ভুলিবে না। তাই খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তিও পবিত্র মদীনাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিবে, আজীবন উহার প্রতি ছুটিয়া আসিতে সচেষ্ট থাকিবে।

জগতের বুকে বেহেশতের বাগান সোনার মদীনায়

৯৬৮। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتى ومنبرى روضة من

رياض الجنة ومنبرى على حوضى -

অর্থ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (মসজিদ সংলগ্ন) আমার গৃহ এবং (মসজিদে অবস্থিত) আমার মিম্বার এই

উভয়ের মধ্যবর্তী স্থান ও ভূখণ্ড বেহেশতের বাগান সমূহ হইতে একটি বাগান এবং আমার এই মিম্বার (হাশরের ময়দানে) আমার হাওজে-কাওসারের কিনারায় স্থাপিত হইবে।

● আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ মাযনী (রাঃ) বর্ণিত ৬৩২ নম্বরে অনুদিত হাদীছখানাও ঠিক এই মর্মেই বর্ণিত হইয়াছে।

পাঠক! আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শোকর—আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত বিশিষ্ট মোবারক স্থানে বসিয়াই হাদীছ খানার তরজমা ও অনুবাদ করা হইল।

যেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কা'বা শরীফে অবস্থিত হজরে-আসওয়াদ পাথরখানা বেহেশত হইতে পাঠাইয়াছেন; তিনি স্বীয় মাহবুবের মসজিদে বেহেশতের উদ্যান হইতে একটি খণ্ড আনিয়া দিবেন ইহাতে বৈচিত্রের কি আছে?

স্বীয় অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান, বুদ্ধি, দৃষ্টি ও অনুভবশক্তির সঙ্কীর্ণতা স্মরণ রাখিয়া আল্লার অসীম কুদরতের প্রতি লক্ষ্য করতঃ সুযোগ প্রাপ্তে প্রাণ ভরিয়া বেহেশতের বাগানের স্বাদ গ্রহণ করিবে—সঙ্কীর্ণতার বেষ্টনীতে আবদ্ধ থাকিবে না।

হে আল্লাহ পাক-পরওয়ারদেগার! আমি নরাধমকে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে তুমি স্বীয় কৃপাবলে তোমার মাহবুবের জন্য প্রেরিত বেহেশতের বাগানে প্রবেশের সুযোগ দান করিয়াছ, চিরস্থায়ী আখেরাতেও তুমি তোমার অসীম কৃপাবলেই বেহেশতের মধ্যে স্থান দান করিও। তোমার কৃপা ভিন্ন নরাধমের আর কোন অছিলা নাই। হে খোদা! তোমার প্রেরিত বেহেশতের বাগানে তোমার প্রিয় নবীর দরবারে বসিয়া তোমার নিকট আমার এই আরজ তোমার প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অছিলায় কবুল কর—আমীন!

স্থূল ও বাহ্যিক পারিপার্শিকতায় আবদ্ধ দৃষ্টি, ভাবধারা ও অনুভবশক্তি যদি এই বেহেশতের বাগানকে বাস্তবরূপে উপলব্ধি করিয়া লইতে সক্ষম না হয় তবে দৃঢ়রূপে এতটুকু বিশ্বাস ত নিশ্চয় রাখিবে যে, এই স্থানে এবাদত-বন্দেগী বেহেশতের বিশেষ স্থান ও বাগান লাভে এতই শক্তিমান সহায়ক যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই স্থানকে বেহেশতের বাগান নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাই সুযোগ প্রাপ্তে ঐ স্থানে অধিক এবাদৎ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটী করিবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা হইতে হিজরত করতঃ মদীনায় পৌছিয়া প্রথমে মদীনার সংলগ্ন "কোবা" নামক স্থানে অবতরণ করিলেন এবং তথায় চৌদ্দ দিন অবস্থান করার পর খাস মদীনায় আসিবার মনস্থ করিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দাদার মাতুল বংশ বনী-নাজ্জার গোত্রের লোকগণ জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনার সহিত হযরত (দঃ)কে কোবা হইতে মদীনায় লইয়া

আসিলেন। প্রত্যেকের প্রাণেই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নিজ নিজ বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার জন্য আকাঙ্খার ঢেউ খেলিতেছিল। কিন্তু হযরত (দঃ) সকলকে জানাইয়া দিলেন যে, আমার যানবাহন উটের প্রতি আল্লার আদেশ আছে—আল্লার মর্জি যেই স্থানে সেই স্থানেই সে বসিবে। অবলীলাক্রমে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উট আবু আইয়ুব আনছারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাড়ীর সম্মুখে পৌঁছিয়া বসিয়া পড়িল। হযরত (দঃ) সেই বাড়ীতে অবতরণ করিলেন, অতঃপর মসজিদ তৈরীর ব্যবস্থা করিলেন। আবু আইয়ুব আনছারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাড়ী সংলগ্ন নাজ্জার গোত্রীয় লোকদের একটি খেজুর বাগান মসজিদের স্থানরূপে নির্বাচন করিলেন। তথায় মসজিদ তৈরী হইল। অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবাস গৃহও মসজিদ সংলগ্ন স্থানেই তৈরী হয় এবং সেই আবাস গৃহেই আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার কক্ষের মধ্যে ইহজগতের নির্দিষ্ট জীবনকালের শেষ দিনগুলি নবী (দঃ) অতিবাহিত করেন এবং তথায়ই সমাহিত হইয়া জীবিত অবস্থায়ই এখনও তথায় বাস করিতেছেন। (ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়া-আলা আলিহী ওয়া-আছহাবিহী ওয়া-বারাকা অসাল্লাম)।

উক্ত আবাসগৃহ এবং মসজিদে অবস্থিত মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান সম্পর্কেই আলোচ্য হাদীছটি। ঐ স্থানটি বেহেশতের বাগান-খণ্ড হওয়া আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের লীলা। আমাদের জ্ঞান, বোধশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি অতি নগণ্য ও নেহাৎ সীমাবদ্ধ।

নবীজীর (দঃ) অবতরণ-স্থান—আবু আইয়ুব আনছারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাড়ী কিছুক্ষণ পূর্বে জেয়ারত করিয়া আসিলাম। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবাসগৃহ সম্বলিত বর্তমান মসজিদে-নববীর পূর্ব-দক্ষিণ কোণ বরাবর রাস্তার অপর পারে; বর্তমানে তথায় তিনতলা দালান রহিয়াছে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মিম্বার ঝাউ কাঠের তৈরী ছিল। কালক্রমে উহার বিলুপ্তি ঘটিয়াছে; যেরূপ মানবদেহের বিলুপ্তি ঘটে। পরকালে মানবদের ন্যায় উক্ত মিম্বারও পুনরুত্থানরূপে হাওজে-কাওছারের কূলে স্থাপিত হইবে এবং হযরত (দঃ) উহার উপর উপবেশন পূর্বক হাওজে-কাওছারের পানি পান করাইবেন। আলোচ্য হাদীছের শেষাংশের মর্ম ইহাই।

মদীনার প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগ

৯৬৯। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তাঁহার সঙ্গীগণ সহ) মদীনায় আসিলে পর আবু বকর (রাঃ) এবং বেলাল (রাঃ) জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জ্বরের উত্তাপ যখন অধিক হইত তখন তিনি এই বয়েতটি বলিতেন—

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِىْ اَهْلِهٖ — وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ

"প্রত্যেক মানুষই স্বীয় স্ত্রী-পুত্রবর্গের মধ্যে থাকিয়া আনন্দ উপভোগে লিপ্ত থাকে, অথচ মৃত্যু তাহার নিকটবর্তী—অতি নিকটবর্তী।"

বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জ্বর উপশমে এই বয়েত দুইটি বলিতেন—

اَلَا لَيْتَ شِعْرِىْ هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً — بِوَادٍ وَّحَوْلِىْ اِذْخِرٌ وَّجَلِيْلُ

وَهَلْ اَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ — وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِىْ شَامَةٌ وَّطَفِيْلُ

অর্থাৎ—তিনি মক্কা নগরীর দুই প্রকার তৃণ-লতার নাম উল্লেখ করিয়া অনুতাপের সহিত বলিতেছেন, হায়! পুনরায় এই সব তৃণ-লতার মধ্যে অবস্থানের সুযোগ পাইব কি? এবং মক্কা নগরীর একটি ঝর্ণা বা কূপের নাম উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, ঐ ঝর্ণার পানি পুনঃ পান করিবার সুযোগ পাইব কি? এবং মক্কার নিকটবর্তী দুইটি পাহাড়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, পুনরায় উহা আমার নয়নে দেখিতে পাইব কি?

(মক্কা নগরীর বিচ্ছেদে বেলালের এই ব্যথা ও অশান্তির ভাব লক্ষ্য করতঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা হইতে বিতাড়িত হওয়ায় অনুতপ্ত হইয়া বিতাড়নের ভূমিকায় অগ্রণী মক্কার কতিপয় দুষ্ট কাফেরের নাম উল্লেখ পূর্বক অভিশাপ করিলেন—হে আল্লাহ। শায়বা ইবনে রবিয়া, ওতবা ইবনে রবিয়া এবং উমাইয়া ইবনে খলফ—তাহারা আমাদের মাতৃভূমি হইতে আমাদিগকে বিতাড়িত করিয়া জ্বরের মহামারীর দেশে আসিতে বাধ্য করিয়াছে, তুমি তাহাদের প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ বর্ষণ কর।

অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا

وَفِىْ مُدِّنَا وَصَحِّحْهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا اِلَى الْجُحْفَةِ ـ

"হে আল্লাহ। আমাদের অন্তরে মদীনার প্রীতি ও মহব্বত সৃষ্টি করিয়া দাও, যেরূপ প্রীতি ও মহব্বত মক্কা নগরীর প্রতি ছিল, বরং আরও অধিক। হে আল্লাহ! আমাদের (মদীনার) উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বরকত দান কর এবং মদীনা নগরীকে স্বাস্থ্যকর স্থান করিয়া দাও এবং জ্বরের মহামারী মদীনা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া (মদীনার দূরে) জোহ্‌ফা (নামীয়) বস্তিতে পাঠাইয়া দাও।"

আয়েশা (রাঃ) বলেন, প্রথম যখন মোসলমানগণ মদীনায় আসিয়াছিলেন তখন মদীনা জ্বর ইত্যাদি রোগের মহামারীর স্থান ছিল। কারণ উহার সংলগ্ন "বোত্‌হান" এলাকার পানি দূষিত ছিল, মদীনার আবহাওয়াও দূষিত থাকিত।

পাঠকবর্গ! আল্লাহ তায়ালা মদীনার প্রতি স্বীয় প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দোয়াসমূহ অক্ষরে অক্ষরে কিরূপে পূর্ণ করিয়া দিয়া মদীনাকে সোনার মদীনায় পরিণত করিয়াছেন তাহা চোখে দেখিবার ও ব্যবহারে অনুভব করিবার বস্তু, মুখে বা কাগজে কলমে বুঝাইবার বস্তু নহে।

আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শোকর যে, তিনি এই নরাধমকে অত্র বিষয় বস্তু লেখাকালীন তৃতীয়বার সোনার মদীনায় হাজির হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দোয়ার ফলাফল নয়ন জুড়াইয়া দেখিবার এবং প্রাণ ভরিয়া খাইবার ও অনুভব করিবার সুযোগ দান করিয়াছেন। সবকিছু স্বচক্ষে দেখিয়া এবং স্বজ্ঞানে অনুভব করিয়াই সামান্য ইঙ্গিত স্বরূপ ইহা লিখিলাম।

৯৭০। হাদীছ ঃ—উম্মুল-মোমেনীন হাফ্‌ছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা খলীফা ওমর (রাঃ) এই দোওয়া করিয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ

(صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.)

উচ্চারণ :— আল্লাহুম্মার-যুক্বনী শাহাদাতান ফী-ছাবীলেকা, ওয়াজ্‌আল মৌতী ফী বালাদে রাসুলেকা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম।)

অর্থ—হে আল্লাহ! তোমার রাস্তায় শহীদ হওয়ার সুযোগ আমাকে দান কর এবং আমার মৃত্যু তোমার রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শহরে (পবিত্র মদীনায়) অনুষ্ঠিত কর।

ব্যাখ্যা ঃ—আউফ ইবনে মালেক নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তি একদা স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে শহীদ করা হইয়াছে এবং তিনি শাহাদৎ বরণ করিয়াছেন। এই স্বপ্ন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট ব্যক্ত করা হইলে পর প্রথমে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নৈরাশ্য স্বরে বলিয়া উঠিলেন, শাহাদতের সুযোগ আমি কিরূপে পাইতে পারি? (বর্তমান বিশ্ব-বিজয়ী মোসলেম জাতির সর্বশক্তি-কেন্দ্র) আরব দেশের মধ্যে আমি (খলীফাতুল-মোসলেমীনরূপে) অবস্থান করিতেছি। আমি (বর্তমানে) কোথাও যুদ্ধ-জেহাদে যাই না, সর্বদা মোসলেম জাহানের বেষ্টনীর ভিতর অবস্থান করিতেছি। অতঃপর তিনি এই উক্তির বিপরীত বলিলেন, হাঁ হাঁ—আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিলে এই অবস্থায়ও আমার শাহাদৎ ঘটাইতে পারেন। এই ঘটনার পর হইতেই তিনি উক্ত দোয়া করিয়া থাকিতেন।

মনে হয়—ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দৃষ্টিতে শাহাদৎ নছীব হওয়ার সুসংবাদের আনন্দকে এই আশঙ্কা মলিন ও ঘোলাটে করিয়া দিয়াছিল যে, হায়! প্রাণের প্রিয়

সোনার মদীনার বাহিরে মৃত্যু বরণ করিতে হয় না—কি ? কারণ মোসলেম জাহানের রাজধানী মদীনা—যেখানে সর্বশক্তি মোসলমানদেরই। এমন স্থানে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় খলিফাতুল-মোসলেমীনের শহীদ হওয়ার কোন ব্যবস্থা সম্ভবের আয়ত্বে দেখা যাইতেছিল না, তাই তিনি আতঙ্কিত। শাহাদতের মর্তবা অতি বড় অতি উচ্চ বটে, কিন্তু স্বপ্নে প্রদত্ত এত বড় মর্তবার সুসংবাদেও ওমর (রাঃ) প্রাণের প্রিয় সোনার মদীনায় মৃত্যু নছীব হওয়ার মর্তবা ও স্বাদকে ভুলিতে পারিতেছিলেন না। উভয় নেয়ামতই আল্লাহ তায়ালার বড় দান, তাই তিনি সর্বশক্তিমান মাবুদের দরবারে উভয় নেয়ামত লাভ করার জন্য দরখাস্ত পেশ করা আরম্ভ করিলেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান; তাঁহার রহমতের অন্ত নাই, তিনি ওমরের ন্যায় প্রিয় বান্দাকে বিমুখ করিবেন কেন।

ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইতিহাস সকলেই জ্ঞাত-আছেন যে, তিনি পবিত্র মদীনায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের ভিতরে মেহ্‌রাবের মধ্যে নামাযরত অবস্থায় শাহাদৎ লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় মাহবুব হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আরাম-কক্ষে স্থান লাভ করিয়া স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

السلام عليك يا سيدنا عمر بن الخطاب ـ السلام عليك يا شهيد المحراب ـ السلام عليك يا خليفة رسول الله ـ السلام عليك يا صهر نبى الله المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رضى الله تعالى عنك وارضاك وجعل الجنة مثواك ـ

“হে আমাদের সম্মানিত মহামনীষী ওমর ইবনুল খাত্তাব! আপনার প্রতি সালাম; হে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের মেহরাবে শাহাদৎ বরণকারী! আপনার প্রতি সালাম; হে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খলীফা—স্থলাভিষিক্ত! আপনার প্রতি সালাম।

হে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শ্বশুর! আপনার প্রতি সালাম! আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং আপনাকে সন্তুষ্ট করুন; আর আপনার স্থান বেহেশতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করুন—আমীন!*

---

* আলোচ্য বিষয়টি ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পবিত্র কবর শরীফের নিকটবর্তী স্থানে বসিয়া লেখা হইল, তাই সেই আনুপাতিক আদব ও রীতি অনুসারেই তাঁহার প্রতি সালাম লিখিয়া দেওয়া হইল।

পাঠকবর্গ! ওমর (রাঃ) যে আকাঙ্খা পোষণ করিয়া থাকিতেন এবং যে দোয়া তিনি করিয়া থাকিতেন; ছাহাবা, তাবেয়ীন, তাবয়ে-তাবেয়ীন ও আওলিয়া কেরামগণের মধ্যে বহু মহামনীষী এই আকাঙ্খা ও দোয়া করিয়া গিয়াছেন।

আমি নরাধম আল্লাহ্ তায়ালার হাবীবের মসজিদে বিশিষ্ট স্থান—বেহেশতের বাগানে বসিয়া আল্লার দরবারে এই দোয়া করিতেছি—হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদৎ ও পবিত্র মদীনায় মৃত্যু দান কর এবং পবিত্র জান্নাতুল-বাকির মধ্যে আমাকে দাফন হওয়ার সৌভাগ্য দান কর। হে আল্লাহ্! তোমার প্রিয় নবী হযরত রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লামের অছিলায় আমি নরাধমের এই আরাধনা কবুল কর—আমীন! ×

منى كن في قلبي غرست بطيبة — فاسقي بدمع والدماء لتنجدي

অন্তরে বহু আশা-আকাঙ্খার বীজ ছিল—উহা পবিত্র মদীনায় বপন করিয়াছি। এখন চোখের পানি এবং রক্ত-অশ্রু দ্বারা উহার সিঞ্চন করিব যেন উহাতে ফল আসে।

وهل لذة لي في الدنى ونعيمها — اذا انا ناء من مدينة سيدي

দুনিয়া এবং দুনিয়ার সামগ্রী-সম্ভার কি আমার নিকট স্বাদময় হইতে পারে—যখন আমি আমার মহানের মদীনা হইতে দূরে থাকি?

تمنيت من ربي جوار مدينة — فيا ليت لي فيها ذراع لمرقدي

মদীনার আশ্রয়ই আমি আমার পরওয়ারদেগারের নিকট বিশেষভাবে কামনা করিয়াছি। হায়…! আমার কবরের জন্য মদীনার মধ্যে এক হাত জায়গা আমার ভাগ্যে জুটিবে কি?

رجائي بربي ان اموت بطيبة — فارقد في ظل الحبيب واحشر

আমার প্রভুর দরবারে আমার আকাঙ্খা এই যে, আমার মৃত্যু যেন মদীনায়ে-তায়্যেবায় হয়; তাহা হইলে আমি প্রাণ-প্রিয় হাবীবের ছায়ায় চিরনিদ্রা যাইতে পারিব এবং তাঁহারই ছায়ায় হাশরে যাইতে পারিব।

الهي على باب الحبيب رجوته — فهل انت تعطينيه حتما مقدرا

হে আমার মাবুদ! হাবীবের দরওয়াজায় অর্থাৎ তাঁহার মসজিদে তাঁহার রওজা পাকের নিকটে থাকিয়া তোমার দরবারে এই আকাঙ্খা রাখিলাম; তুমি নিশ্চিতরূপে আমার এই আকাঙ্খার বাস্তবায়ন আমার ভাগ্যে রাখিবা ত?

× ১লা আগষ্ট ১৯৫৮ ইং পবিত্র মদীনা মোনাওয়ারাহ।

একাদশ অধ্যায়

রোযা

রমজান শরীফের রোযা ফরজ

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

অর্থ—হে মোমেনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হইয়াছে, যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হইয়াছিল। রোযা ফরজ করার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যেন মোত্তাকী—খোদাভীরু ও সংযমী হইতে পার।

৯৭১। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (১০ই মহরম—) আশুরার দিনের রোযা নিজে রাখিয়াছেন এবং উক্ত রোযা রাখিবার আদেশও করিয়াছেন; (সে মতে উহা ফরজ ছিল।) অতঃপর যখন রমজানের রোযা ফরজ করা হইল তখন আশুরার রোযা ফরজ হওয়া পরিত্যক্ত হইল।

এই বিষয়ে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ ৮২৯ নম্বরে অনুদিত হইয়াছে।

রোযার ফজীলত

৯৭২। **হাদীছ ঃ**— عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَاِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهٗ اَوْشَاتَمَهٗ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ وَشَهْوَتَهٗ مِنْ اَجْلِىْ اَلصِّيَامُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, রোযা (দোজখের আজাব হইতে বাঁচাইবার পক্ষে) ঢাল স্বরূপ। (ঢাল দুর্বল হইলে শত্রুর আক্রমণ হইতে জীবন রক্ষা করা কঠিন। অতএব প্রত্যেক মোমেনের কর্তব্য, যে সব কারণে রোযা দুর্বল হয় তাহা হইতে বিরত থাকা।) সুতরাং রোযাদার ব্যক্তি গালি-গীবত ইত্যাদি কোন খারাপ কথা মুখে উচ্চারণ করা হইতে বা কোন খারাপ কাজ করা হইতে বিশেষরূপে বিরত থাকিবে। যদি কোন ব্যক্তি তাহার সহিত ঝগড়া-বিবাদ বা গালাগালি করে তবে (তাহার কর্তব্য হইবে—কোন প্রকার প্রতিউত্তর না করিয়া নিজেকে পূর্ণ সংযমী রাখিবে এই ভাবিয়া যে, আমি রোযাদার আমি এরূপ কার্য্য বা কথার প্রতিউত্তর করিতে পারি না; আবশ্যক বোধে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষান্ত করিবার জন্য মুখেও ইহা) প্রকাশ করিয়া দিবে যে, আমি রোযাদার (আমি ঝগড়ায় লিপ্ত হইব না। প্রয়োজন হইলে একাধিক বার এইরূপ বলিবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলেন—যেই আল্লার হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, রোযাদার ব্যক্তি না খাইয়া থাকার দরুণ তাহার মুখে যে বিকৃত গন্ধ সৃষ্টি হয় (মূল্য ও প্রতিদানের দিক দিয়া) উহা আল্লাহ তায়ালার নিকট মেশক ও কস্তুরীর সুগন্ধি অপেক্ষা উত্তম গণ্য হইবে।

(রোযাদারের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ ও তাহার প্রশংসা স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা বলিয়া থাকেন—এই বন্দা) আমার আদেশ পালনার্থে ও আমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় স্বীয় খাদ্য, পানীয় ও কাম-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়াছে। সে মতে রোযা খাছ আমার জন্য—আমার উদ্দেশ্যে। সুতরাং আমিই (আমার মনঃপুত ও মনোমত) উহার যথোপযুক্ত প্রতিদান দিব।

নেক আমলের প্রতিফল দানে সাধারণ নিয়ম এই রাখা হইয়াছে যে, দশগুণ (হইতে সত্তর গুণ পর্য্যন্ত) দেওয়া হইয়া থাকে। (কিন্তু রোযার প্রতিদানের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যার নিয়ম রাখা হয় নাই; রোযার জন্য রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালার এই ঘোষণা, রোযা আমার জন্য; উহার প্রতিদান আমিই দিব।)

ব্যাখ্যা ঃ- রোযাদার ব্যক্তির মুখের বিকৃত গন্ধের বিষয় যাহা বলা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য্য এই যে, দুনিয়াতে রোযার দ্বারা মুখকে দুর্গন্ধযুক্ত করার ফলে বেহেশতে মেশকের খোশবুর চেয়েও উত্তম এবং অধিক মূল্যবান সুগন্ধ রোযাদারের মুখে দান করা হইবে।

রোযার বিষয় আল্লাহ তায়ালা যাহা বলিয়া থাকেন উহার প্রথম বাক্যটি হইল 'রোযা আমার জন্য"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে--যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে সমুদয় এবাদতই আল্লাহ তায়ালার জন্য তাঁহারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে, কিন্তু রোযা এবং অন্যান্য এবাদতের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। তাহা এই যে অন্যান্য এবাদত

সমূহের ক্রিয়া-কলাপ আকার-আকৃতি ও নিয়ম-পদ্ধতি এইরূপ যে, মুখে প্রকাশ না করিয়াও উহার মধ্যে রিয়া তথা লোকদেখানো ভাব সৃষ্টি হইতে পারে এবং অনেক সময় আবেদ তথা এবাদতকারীর অন্তরে, তাহার অনুভূতির অন্তরালে ঐ ভাবটি লুকাইয়া থাকে। সে উহা অনুভব করিতে না পারিলেও অন্ততঃ উহা তাহার ভিতরে থাকে, যদ্দরুণ তাহার নফছ এক প্রকার স্বাদও গ্রহণ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে রোযা এমন পদ্ধতির এবাদত যে, রোযাদার ব্যক্তি নিজ মুখে প্রকাশ না করিলে সাধারণতঃ উহা একমাত্র অন্তর্যামী আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত লোক-সম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার মত নহে। তাই রোযার মধ্যে আল্লার সন্তুষ্টি ব্যতীত নফছের আস্বাদক হওয়ার সুযোগ উহার আকার-আকৃতি ও নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যে নাই। তবে কোন বদ-নছীব যদি মুখে গাহিয়া স্বাদ লাভ করিতে চায় তবে সে কথা স্বতন্ত্র। এই পার্থক্যটির প্রতিই এক হাদীছের বর্ণনায় স্পষ্টরূপে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে—

كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لى وانا اجزى به

"প্রত্যেক এবাদতই এবাদতকারী ব্যক্তির জন্য। (অর্থাৎ প্রত্যেক এবাদতই এইরূপ নিয়ম-পদ্ধতি আকার-আকৃতির যে আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও এবাদতকারীর নফছের আস্বাদক হওয়ার সুযোগ উহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।) পক্ষান্তরে রোযা—উহা একমাত্র আমার জন্য। (অর্থাৎ রোযার নিয়ম-পদ্ধতি আকার-আকৃতি এরূপ যে, আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া এবাদতকারী রোযাদারের নফছের আস্বাদক হওয়ার সুযোগ উহাতে নাই।)

এতদ্ভিন্ন রোযা হইল—খাদ্য, পানীয় ও রতিক্রিয়া হইতে বিরত থাকা; তথা না-করণ কার্য্য যাহা অদৃশ্য আমল। গোপনে পানাহার বা কামস্পৃহা চরিতার্থ করিলে তাহা অন্য লোকে জানিতে পারে না, সুতরাং মানবীয় প্রবৃত্তির অতি লোভণীয় বস্তু পানাহার ও কামস্পৃহাকে চরিতার্থের লোভকে খাঁটীভাবে সংবরণ করার কষ্ট-সহিষ্ণুতা একমাত্র আল্লার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি আসক্তি ব্যতিরেকে কেউ স্বীকার করিতে পারে না। অতএব আল্লাহ বলেন, রোযা একমাত্র আমার জন্য—অর্থাৎ বস্তুতঃ রোযা খাছভাবে আমার ভক্তি ও আসক্তিতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় বাক্যটি হইল "উহার প্রতিদান আমিই দান করিব"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও সমস্ত এবাদতের প্রতিদানই একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দান করিবেন; তিনিই "مالك يوم الدين—প্রতিফল দান দিবসের একচ্ছত্র মালিক"; এবং সর্বক্ষেত্রেই কর্ম অনুপাতে প্রতিফল বহুগুণে বেশী দেওয়া হইবে। কিন্তু প্রত্যেক নেক কার্য্যের প্রতিফল দানের ব্যাপারেই কর্ম ও কর্মফল উভয়ের মধ্যে আনুপাতিক হিসাব ও নিয়মের একটি

ধারা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই প্রবর্তন করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহা স্বীয় বাণী ও রসূলের মারফত ব্যক্তও করিয়া দিয়াছেন যে, প্রতি নেক কাজে দশগুণ হইতে সাত শত গুণ পর্য্যন্ত বা ততোধিক গুণ নেকী ও তাহার প্রতিফল দেওয়া হইবে।

রোযার প্রতি আল্লাহ তায়ালার স্বীয় আদর, প্রীতি ও অনুরাগ প্রকাশার্থে ঘোষণা করেন যে, উহার প্রতিদান আমি দয়ালু অফুরন্ত খাজানার মালিক নিজ ইচ্ছা, অভিরুচি ও তৃপ্তি পরিমাণ মনঃপূত ও মনোমতরূপে দান করিব—যাহার মধ্যে কোন নিয়ম বা আনুপাতিক হিসাবের সীমাবদ্ধতা থাকিবে না। কি দিব ? কত দিব ? তাহা আমিই জানি।

● আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঝগড়া-বিবাদ বারণ করা ইত্যাদি উত্তম উদ্দেশ্যে যদি নিজের রোযাকে অন্যের নিকট প্রকাশ করে তবে তাহা দোষণীয় নহে। (২৫৫ পৃঃ)

৯৭৩। হাদীছ ঃ— عن سهل رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَقُوْمُوْنَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ ـ

অর্থ—সাহল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (বিভিন্ন বেহেশত এবং সেই) বেহেশতের (বিভিন্ন প্রবেশ দ্বার ও ফটক সমূহের মধ্যে প্রত্যেকটিই বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত) একটি ফটকের (এবং উহার এলাকাস্থ বেহেশতটির) নাম হইল "রাইয়্যান"। পরকালে সেই ফটক দ্বারা একমাত্র ঐ মোমেনগণ প্রবেশ করিতে পারিবে যাঁহারা (দুনিয়াতে) রোযার অভ্যস্ত ও অনুরাগী ছিলেন।* অন্য কেহ ঐ ফটকে প্রবেশ করিতে পারিবে না। রোযাদারগণকে বিশেষরূপে আহ্বান করা হইবে এবং তাঁহারা (সেই ফটকের প্রতি) অগ্রসর হইবেন, অন্য কেহ উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। রোযাদারগণ উহাতে প্রবেশ করার পর উহাকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে ; অন্য কেহই উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

---

* "রাইয়্যান শব্দের আভিধানিক অর্থ পিপাসামুক্ত। রোযাদারগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভোগ করতঃ রোযা রাখিয়াছিল, সেই আমলের স্মরণে উহার প্রতিদানে সুখের বাসস্থানকে এই নামে নামকরণ করা হইয়াছে।

৯৭৪। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيْلِ اللهِ نُوْدِىَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَاعَبْدَ اللهِ هٰذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلٰوةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا عَلٰى مَنْ دُعِىَ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِّنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি এক জোড়া জিনিস আল্লার রাস্তায় দান করিবে তাহাকে বেহেশতের যতগুলি গেট আছে প্রত্যেকটি গেট হইতে ডাকা হইবে—হে আল্লার খাছ বন্দা! (এদিকে আসুন;) এইটি ভাল।

অতঃপর যাঁহারা আহ্‌লে-ছালাত হইবেন তথা যাঁহাদের নামাযের সঙ্গে বেশী মহব্বত এবং বৈশিষ্ট্য ছিল—অর্থাৎ যাঁহারা ফরজ এবাদৎ সমূহ আদায় করিয়া অতিরিক্ত নফল নামায পড়িতে বেশী ভালবাসিতেন তাঁহাদিগকে বাবোছ্‌-ছালাত তথা নামায-গেট হইতে ডাকা হইবে। যাঁহারা আহলে-জেহাদ হইবেন অর্থাৎ জেহাদ বেশী ভালবাসিতেন তাঁহাদিগকে বাবোল-জেহাদ তথা জেহাদ-গেট হইতে ডাকা হইবে। যাঁহারা আহলে-ছিয়াম হইবেন, অর্থাৎ যাঁহারা অন্যান্য এবাদৎ ফরজ পরিমাণ আদায় করিয়া অতিরিক্ত নফল রোযা করিতে বেশী অনুরাগী ছিলেন তাঁহাদিগকে বাবোর-রাইয়্যান তথা রাইয়্যান নামক গেট হইতে ডাকা হইবে। যাঁহারা আহলে-ছদকা হইবেন অর্থাৎ দান-সাহায্যকারী তাঁহাদিগকে বাবোছ্‌-ছদকা তথা দান-গেট হইতে ডাকা হইবে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে এই বর্ণনা শ্রবণ করিয়া আবু বকর ছিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! একজন লোককে সমস্ত গেট হইতে ডাকা হউক, ইহার প্রয়োজন ত নাই, কিন্তু (আপনি যেরূপ বলিয়াছেন,

প্রকৃত প্রস্তাবেই কি সেইরূপে) কোন লোককে সমুদয় গেট হইতে ডাকা হইবে? নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, হাঁ—সেইরূপও হইবে এবং আশা করি, আপনি ঐ দলেরই একজন হইবেন।

ব্যাখ্যা ঃ—এখানে তিনটি বিষয়ের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা আবশ্যক।

(১) আল্লার রাস্তায় দান করার তাৎপর্য্য (২) এক জোড়া জিনিসের তাৎপর্য্য (৩) এবং বেহেশতের গেট সমূহের বিষয় উক্তি "এইটি ভাল" ইহার তাৎপর্য্য।

● আল্লার রাস্তায় দান করার অর্থ আল্লার দীন জারী করার এবং দীন জারী রাখার যে কোন কাজে দান করা। আল্লার দীন জারী করাতে বাধা দেয় যে কাফের শত্রুগণ তাহাদের সঙ্গে জেহাদ ও যুদ্ধ পরিচালনা কার্য্যে হউক বা আল্লার দীন শিক্ষাদান কার্য্যে হউক বা মৌখিকভাবে কিম্বা লিখিত আকারে আল্লার দীন প্রচার করার কাজে হউক। আল্লার দীন অর্থে আল্লার রসুল যাহা কিছু আল্লার দরবার হইতে আনিয়া মানব জাতির মুক্তি ও মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে দান করিয়াছেন—কোরআন আকারে বা হাদীছ আকারে তথা রসুলের কথা ও কার্য্য দ্বারা কোরআনের ব্যাখ্যা আকারে। যেহেতু দীন জারী করার মধ্যে দীনের সব শাখাই অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং আল্লার দীন জারী করার কাজে সাহায্যকারী ও দানকারীকে সব গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। এবাদৎ সমূহের ফরজ পরিমাণ আদায়ের পর নফল পর্য্যায়ে যাহার যে প্রকার এবাদতের প্রতি মহব্বত এবং অধিক অনুরাগ ছিল তাহাকে সেই সংশ্লিষ্ট গেট হইতে আহ্বান করা হইবে।

নামাযের প্রতি যাহার অধিক মহব্বত, অধিক অনুরাগ ও বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাকে নামায-গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। দান-ছাখাওয়াত, খয়রাত, যাকাতের প্রতি এবং খেদমতে-খাল্‌ক ও পরোপকারের প্রতি যাহার অধিক অনুরাগ, মহব্বত ও বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাকে যাকাত-গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। রোযার প্রতি যাহার বেশী মহব্বত এবং অধিক অনুরাগ ও বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাকে রোযার দরওয়াজা—রাইয়্যান নামক গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। জেহাদের প্রতি যাহার বেশী মহব্বত ছিল অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিতে যে অধিক অনুরাগী ছিল তাহাকে জেহাদ-গেট হইতে আহ্বান করা হইবে।

এইরূপে যেই ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এবং বরাবর আল্লার নিকট তওবা এস্তেগফার করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বেশী ভালবাসিত তাহাকে বাবোত-তওবা তথা তওবা-গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। যে ব্যক্তি স্বীয় অধীনস্থ ত্রুটিকারীকে ক্ষমা করিতে এবং ক্রোধ দমন করিয়া রাখিতে অধিক অভ্যস্ত ছিল তাহাকে বাবোল-কাযেমীনাল-গয়য, অল আফীনা আনিন্নাছ তথা ক্রোধ দমনকারী ক্ষমাকারীদের গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। যে ব্যক্তি সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার শোকর ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

অধিক পরিমাণে করিয়া থাকিত এবং কষ্ট-ক্লেশ অবস্থায়ও ছবর ও ধৈর্য্যধারণ করতঃ শান্ত, সন্তুষ্ট ও তুষ্ট থাকিত তাহাকে বাবোর্-রাযীন তথা তুষ্ট ও শান্তদের গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। বেহেশতের এই আটটি গেট বা দরওয়াজার বিষয়ই হাদীছে উল্লেখ আছে।

● এক জোড়া জিনিস নিজের তহবিল হইতে বাহির করিয়া দান করার অর্থ এই যে, প্রত্যেক বারই যখন দান করে—যে কোন জিনিসই দান করুক না কেন, তখন একটি মাত্র জিনিসই দান করে না, বরং এক জোড়া জিনিস দান করে। যেমন—এক জোড়া কাপড়, এক জোড়া ঘোড়া, এক জোড়া ঢাল-তলওয়ার ইত্যাদি। এবং প্রত্যেক বারই পূর্বের দানের কথা ভুলিয়া গিয়া বর্তমানের একবারের সঙ্গে ভবিষ্যতের আরও একবারকে মিলাইয়া জোড়া বানাইবার নিয়ত ও আশা রাখে। দানকারীর জন্য পূর্বকৃত দান ভুলিয়া যাওয়াই অধিক ভাল এবং আগামীতে আরও এইরূপ দান করিবে এই আশা ও নিয়্যত করাই অধিক ফজিলতজনক। কিন্তু দান গ্রহীতার জন্য ইহার বিপরীত অর্থাৎ পূর্বের কিঞ্চিৎ দানও জীবনে কখনো ভুলিয়া যাওয়া চাই না এবং ভবিষ্যতে পুনঃ পুনঃ দান গ্রহণের আশা বা ইচ্ছা মনে পোষণ করা চাই না।

● বেহেশতের গেট ও দরওয়াজা সমূহের প্রত্যেকটির বিষয় এই উক্তি যে, "এইটা ভাল" ইহার অর্থ এই যে, বেহেশত সবই ভাল, সেখানে মন্দের নাম-নিশানও নাই, কিন্তু যে ফেরেশতা যেই গেট ও দরওয়াজার তত্ত্বাবধায়ক তিনি সেইটিকেই সবচেয়ে ভাল মনে করিতেছেন এবং এই অনুসারেই ইহা বলিতেছেন।

রমজান মাসের মর্য্যাদা

৯৭৫। হাদীছঃ— يقول ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ اَبْوَابُ

السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন রমজান মাস আরম্ভ হয় তখন হইতে উর্দ্ধ জগতের (তথা রহমতের) দরওয়াজা সমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়, (সেমতে বেহেশতের দরওয়াজাসমূহও খুলিয়া দেওয়া হয়) এবং জাহান্নামের সমুদয় দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং (অধিক দুষ্ট, নেতৃস্থানীয়) শয়তানগুলিকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ব্যাখ্যাঃ—আলোচ্য রেওয়ায়েতে উর্দ্ধ জগতের দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়ার উল্লেখ হইয়াছে। অন্য এক রেওয়ায়েতে রহমতের দরওয়াজা খোলার উল্লেখ আছে এবং এক রেওয়ায়েতে

বেহেশতের দরওয়াজা খোলার উল্লেখ আছে। সব রেওয়ায়েতের মূল তাৎপর্য্য একই। রমজান মাসে বিশেষরূপে অতি মাত্রায় এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের বিশেষত্ব লক্ষ্য না করিয়া সর্বদা আল্লার রহমত নাযেল হইতে থাকে। তাই আকাশে আল্লার রহমত-বাহক ফেরেশতা নাযেল হওয়ার দরওয়াজাসমূহ সর্বদা খোলা থাকে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রধান কেন্দ্র বেহেশতের দরওয়াজাসমূহ রমজান মাসের সম্মানার্থে খুলিয়া রাখা হয়।

● রমজান মাসের বিশেষত্ব হিসাবে জগদ্বাসীর প্রতি যেরূপ রহমত নাযেল করার ব্যবস্থা রাখা হয় তদ্রূপ রহমতের বিপরীত আল্লাহ তায়ালার গজব ও আজাবের কারণ তথা শয়তানী আন্দোলন ও কার্য্যকলাপ কম করার ব্যবস্থাও করা হয় যে—বড় বড় শয়তানগুলিকে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান। শয়তানী আন্দোলন ও কার্য্যকলাপকে সমূলে উচ্ছেদ করার ইচ্ছা করিলে মুহূর্তের মধ্যে তিনি তাহা করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে জাগতিক জীবনের পরীক্ষার উদ্দেশ্য পণ্ড হয়, তাই আল্লাহ তায়ালা তাহা করেন না। এই জন্যই ইবলিসের সাধারণ অনুচরবৃন্দ এবং মানুষের আকৃতিতে শয়তান প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গ এবং মানুষের নফছে-আম্মারা তদুপরি এগার মাস শয়তানী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া প্রভৃতির সক্রিয়তা বন্ধ করা হয় না। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা রমজান মাসের সম্মানার্থে স্বীয় বন্দাগণকে বিশেষ সুযোগ প্রদানার্থে নেতৃস্থানীয় বড় বড় শয়তানগুলিকে আবদ্ধ করিয়া দেন। যদ্দরুণ আল্লার প্রতি ধাবিত হওয়ার পথ ধরা সহজ হইয়া যায়। মানব যেন এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় না হারায় সেজন্য করুণাময় আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে একজন ফেরেশতা পবিত্র রমজান মাসে আল্লার বন্দাদিগকে প্রতি দিন এই আহ্বান জানাইতে থাকেন, يا باغى الخير اقبل ويا باغى الشر اقصر "হে সত্যান্বেষী সুপথের পথিক! (এই পবিত্র রমজানের সুবর্ণ সুযোগে) দ্রুত সম্মুখপানে অগ্রসর হও, উন্নতি লাভ কর। হে কু-পথগামী! (হেলায় এই সুযোগ হারাইও না। এই পবিত্র রমজানে স্বীয় আত্ম-সংশোধন ও পবিত্রতা লাভে সচেষ্ট হও এবং কু-কার্য্য হইতে) ক্ষান্ত হও, সতর্ক হও।"

অর্থাৎ—যেহেতু পবিত্র রমজান মাসে আল্লাহ তায়ালার রহমতের দরওয়াজাসমূহ সর্বদা খোলা থাকে, রহমত লাভ করা সহজ সুলভ হয়; তাই এই সুযোগের প্রতিটি মুহূর্তকে স্বীয় উন্নতির সম্বলরূপে গ্রহণ কর। আপন জীবনের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হও, অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর, যেরূপ কোন ব্যবসায়ী স্বীয় ব্যবসায়ের জন্য মৌসুম, সুযোগ ও হাট-ঘাট, মেলা বা প্রদর্শনীকে উন্নতির বিশেষ সহায়ক ও সম্বলরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে রমজান মাসে অসত্যের ও কু-পথের বড় বড় আন্দোলনকারীরা আবদ্ধ রহিয়াছে, কু-পথ হইতে ফিরিয়া আসা ও কু-কার্য্যকে ত্যাগ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে, অসংখ্য বাধা-বিপত্তির উপশম হইয়াছে, ফিরার পথের বেড়াজাল সমূহের লাঘব ঘটিয়াছে।

এই সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারাইও না, এই সোনালী সময়কে চৈতন্যহীন অবস্থায় অতিবাহিত করিও না। সুযোগের সদ্ব্যবহার কর, অতীত জীবনের অন্ধকারময় পথে আর অগ্রসর হইও না, থাম। এই সুযোগেই পশ্চাদে পরিত্যক্ত আলোর পথে ফিরিয়া আস।

আল্লাহ তায়ালা কত মেহেরবান করুণাময়! স্বীয় বন্দাদিগকে সুযোগ দান করিয়া সেই সুযোগের ঘোষণা এবং আহ্বানও জানাইয়া দিতেছেন। শুধু এক দুই বার নয়, বরং সুযোগের প্রতিটি দিনেই এই আহ্বান আসিতে থাকে। যাঁহাদের রুহানী শ্রবণশক্তি আছে, তাঁহারা সরাসরি সেই আহ্বান শুনিতে পারেন। যাহারা সেই স্তরে পৌঁছিতে পারে নাই, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে সত্য রসুলের মারফৎ সেই আহ্বানের সংবাদ পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

পরীক্ষাক্ষেত্রের অনুপযুক্ত—পরীক্ষা-বিষয়ে পরীক্ষার্থীর স্বায়ত্বশাসিত স্বাধীনতাকে খর্বকারী—বাধ্য-বাধকতামূলক ব্যবস্থা ব্যতীত পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বন্দাদের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছেন। কোন ব্যক্তি যদি এসব ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ না করিয়া স্বীয় ভ্রষ্টতাকেই আঁকড়াইয়া থাকে তবে তাহার পক্ষে এসব সুযোগের কোন মূল্যই হইবে না।

রোযা অবস্থায় মিথ্যার লিপ্ত হওয়ার বিষময় ফল

৯৭৬। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ

لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কার্য্য পরিত্যাগ না করিবে ঐ ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার কোনই মূল্য আল্লার নিকট নাই।

ব্যাখ্যা:—এই হাদীছের উদ্দেশ্য মিথ্যাবাদীকে রোযা পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া নহে। বরং মিথ্যাবাদীকে মিথ্যা পরিত্যাগ করতঃ রোযার পূর্ণ সুফল লাভ করার প্রতি আহ্বান করাই এই হাদীছের একমাত্র উদ্দেশ্য। যেরূপ কোন চিকিৎসক স্বীয় রোগীকে ঔষধ প্রদান করতঃ সতর্ক করিয়া দিয়া থাকে যে—অমুক অমুক কু-পথ্য ব্যবহার করিলে ঔষধ ব্যবহারে কোন ফল হইবে না। এই সতর্কবাণী শুনিয়া যদি ঐ সকল কু-পথ্যকেই আঁকড়াইয়া থাকে এবং নিষ্ফল মনে করিয়া ঔষধ ব্যবহারে বিরত থাকে তবে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য।

রোযাদারের আনন্দ

৯৭৭। হাদীছ :— يقول ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...... لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন······যাহারা রোযা রাখিয়া থাকে তাহাদের জন্য আনন্দ উপভোগের বিশেষ দুইটি সুযোগ রহিয়াছে। প্রথমতঃ—এফ্‌তার করার সময়। দ্বিতীয়তঃ—যখন স্বীয় পালন-কর্তার নিকট উপস্থিত হইবে তখন রোযার (প্রতিফল প্রত্যক্ষরূপে দেখা ও উপভোগ করার) দরুন সে আনন্দিত হইবে।

ব্যাখ্যা :—প্রথম আনন্দের কারণ স্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালার তৌফিক দানে রোযা পূর্ণ হইয়াছে, এখন আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত সামগ্রী উপভোগ করার অনুমতি লাভ হইয়াছে। এই প্রথম আনন্দেরও দুইটি সুযোগ রহিয়াছে। প্রথম হইল প্রতিদিন এফতারের সময় যখন ঘরে আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। দ্বিতীয় হইল যখন সমগ্র রমজান মাসের রোযা সম্পূর্ণ করিয়া দীর্ঘকালের জন্য এফতার করা হয় অর্থাৎ ঈদুল-ফেতরের দিনে; যখন ঘরে-বাহিরে, পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে, সমগ্র দেশময় ও সমগ্র মোসলেম জাতির ভিতরে বাহিরে আনন্দ উল্লাসের স্রোত বহিয়া যায়। নারী-পুরুষ, শিশু-যুবক, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সকলের মুখেই হাসি-খুশীর ঢেউ খেলিয়া থাকে।

দ্বিতীয় আনন্দ—ইহাই স্থায়ী এবং পূর্ণ ও আসল আনন্দ। উহা লাভ হইবে যখন পরজগতে যাইয়া আল্লাহর দরবার হইতে তাঁহারই বিঘোষিত الصوم لى وانا اجزى به "রোযা আমার বস্তু, উহার প্রতিদানে আমি আমার মনঃপুত ও মনোমত প্রতিফল দান করিব" এই প্রতিফল লাভ করিবে।

যৌন উত্তেজনা রোধে রোযা

৯৭৮। হাদীছ :— قال عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه

كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ -

অর্থ—আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী ছিলাম। তিনি বলিলেন, যাহার বিবাহ করার সামর্থ আছে, তাহার বিবাহ করা কর্তব্য। কারণ, বিবাহ চক্ষুর দৃষ্টিকে সংযত রাখিতে এবং যৌন উত্তেজনাকে প্রশমিত রাখিতে বিশেষ সহায়ক হয়। যে ব্যক্তি অপারক; বিবাহের (খরচ ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের) সামর্থ্য রাখে না তাহার কর্তব্য হইবে রোযা রাখিয়া যাওয়া—ধারাবাহিক রোযা রাখিয়া যাওয়া। ধারাবাহিক রোযার দ্বারা তাহার কাম-রিপুর দমন সাধিত হইবে, যৌন উত্তেজনার উপশম হইবে।

চাঁদ দেখার উপর রোযা ও ঈদ নির্ভরশীল

বিশিষ্ট ছাহাবী আম্মার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে (অর্থাৎ ২৯শে শা'বান চাঁদ দেখার কোন প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও শুধু সম্ভাবনা সূত্রে) রমযানের রোযা রাখিবে, সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবাধ্য গণ্য হইবে।

৯৭৯। হাদীছঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهٗ ـ

অর্থ—আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজানের আলোচনা করতঃ বলিলেন, যাবৎ (রমজানের) চাঁদ দেখা (প্রমাণিত) না হয় তাবৎ রোযা রাখিও না। তদ্রূপ যাবৎ (শওয়ালের) চাঁদ দেখা (প্রমাণিত) না হয় রোযা পরিত্যাগ করিও না। যদি (নুতন) চাঁদ প্রকাশিত না হয় তবে (রোযা রাখা না রাখার ব্যাপারে ত্রিশ দিনে মাসের) হিসাব গ্রহণ করিতে হইবে।

৯৮০। হাদীছঃ— عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ لَيْلَةً فَلَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ ـ

অর্থ—আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন মাস উনত্রিশ দিনেও হইয়া থাকে, কিন্তু (শা'বানের উনত্রিশ তারিখে) চাঁদ না দেখা পর্য্যন্ত রোযা রাখিও না। যদি (সেই দিন) চাঁদ প্রকাশ না হয় তবে ত্রিশ দিনের গণনা পূর্ণ কর।

৯৮১। হাদীছ :— يقول ابن عمر قال النبى صلى الله عليه وسلم

اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَخَنَسَ الْاِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, রোযার মাস কোন সময় উনত্রিশ দিনেও হয় এবং এইরূপে ইশারা করিয়া দেখাইয়াছেন—উভয় হাতের আঙ্গুল সমূহ উন্মুক্ত করিয়া তিনবার দেখাইয়াছেন, কিন্তু তৃতীয়বার একটি আঙ্গুল আবদ্ধ রাখিয়াছেন।

৯৮২। হাদীছ :— يقول ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ فَاِنْ غُبِّىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন, তোমরা (রমজানের) চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখ এবং (শওয়ালের) চাঁদ দেখিয়া রোযা পরিত্যাগ কর। যদি (রমজানের) চাঁদ (শা'বানের ২৯ তারিখে) প্রকাশ না হয় তবে (শা'বানের) গণনা ৩০ দিন পূর্ণ কর।

৯৮৩। হাদীছ :— عن ابى بكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيْدٍ رَمَضَانُ وَذُوا الْحِجَّةِ

অর্থ—আবু বকরাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দুই ঈদের দুই মাস অর্থাৎ রমজান মাস ও জিলহজ্জ মাস (কোন অবস্থাতেই) অসম্পূর্ণ গণ্য হয় না।

ব্যাখ্যা :—রমজান মাস প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মাসই অতি ফজিলতের মাস। জিলহজ্জ মাসও তদ্রূপ; ইহার প্রথম দশ দিন ত বিশেষ ফজিলতের আছেই, সম্পূর্ণ মাসেরও অপেক্ষাকৃত ফজিলত আছে। এই মাসদ্বয়ের ফজিলত ত্রিশ দিন হইলে যেরূপ উনত্রিশ দিন হইলেও তদ্রূপ। উনত্রিশ দিন হইলে এইরূপ ধারণা করা ভুল হইবে যে, এ বৎসর এই মাস অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

বর্তমান যুগে রমজান মাস উনত্রিশ দিনের হইলে কোন কোন লোককে এই বলিয়া অনুতাপ করিতে শুনা যায় যে, এবার আমাদের রমজান পূরা হইল না। এরূপ উক্তি ও অনুতাপ আলোচ্য হাদীছের পরিপন্থী, এরূপ করা চাই না।

৯৮৪। হাদীছ :— عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِىْ مَرَّةً

تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلَاثِيْنَ -

অর্থ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে বহু লোক বিদ্যাহীন নিরক্ষর আছে এবং হইবে—যাহারা লেখা-পড়া এবং (নক্ষত্রের ভ্রমণ ও তিথির) হিসাব-নিকাশ হইতে অজ্ঞ। অতঃপর হযরত (দঃ) ইশারা করিয়া দেখাইলেন--মাস কোন সময় উনত্রিশ দিনের হয় এবং কোন সময় ত্রিশ দিনেও হয়।

ব্যাখ্যা :—শরীয়তের অধিকাংশ বিষয় চাঁদের হিসাবের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে, কারণ চাঁদ অতিশয় স্পষ্ট ও উজ্জল দীপ্তিমান বস্তু এবং এরূপ প্রকাশ্য পরিবর্তনশীল যে, বিশেষ কোনও হিসাব-নিকাশ বা দৃষ্টির অগোচর বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর না করিয়া উহার দ্বারা মাসের হিসাব নির্ধারিত করা যায়। উহার হিসাব সর্ব-সাধারণের জন্য সহজ সাধ্য এবং অকাট্য। তাই চাঁদের হিসাবের উপরই ইসলামের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম স্থাপন করা হইয়াছে, কারণ উম্মতের মধ্যে অনেক লোক শিক্ষা-দীক্ষাহীন হইবে যাহারা লেখা-পড়া হিসাব-কিতাব হইতে অজ্ঞ। অদৃশ্য সূক্ষ্ম হিসাব নিকাশের উপর শরীয়তের হুকুম স্থাপন করা হইলে অধিকাংশের জন্যই তাহা সহজ সাধ্য হইত না।

রমজানের চাঁদ দেখার পূর্বেই রোযা আরম্ভ করা নিষিদ্ধ

৯৮৫। হাদীছ :— عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَوْيَوْمَيْنِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ

رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, খবরদার! কোন ব্যক্তি রমজানের চাঁদ দৃষ্ট হওয়ার এক দুই দিন পূর্ব হইতে রোযা রাখা আরম্ভ করিবে না। হাঁ—যদি কোন ব্যক্তির স্থিরকৃত ও রোযায় অভ্যস্ত দিন ঐরূপ তারিখে হয়, তবে সে ঐ দিন রোযা রাখিতে পারে। (যেমন কোন ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতি ও শুক্রবারের রোযা রাখায় অভ্যস্ত। ঘটনাক্রমে কোন সপ্তাহের এই দুইটি বার রমজানের এক দুই দিন পূর্বে আসিল, সেই ব্যক্তি ঐ দিনের রোযা রাখিতে পারিবে।)

রমজানের রাত্রে পান-আহার ইত্যাদি জায়েয

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন—

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ـ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ـ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ـ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ

অর্থ—রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী ব্যবহার করা জায়েয ও হালাল করা হইল। স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের অভীপ্সা, অনুরাগ ও গার সম্পর্ক এরূপ যেন পরস্পর একে অন্যের পরিবেশ পোষাক, (যদ্দরুণ) তোমাদের (কাহারও কাহারও সেই আকর্ষণের ফলে শরীয়ত বিরোধী) নিজের ক্ষতিকারক কার্য্যে পতিত হওয়ার ঘটনা আল্লাহ তায়ালা জ্ঞাত হইয়াছেন। তাই তিনি দয়াপরবশ হইয়া তোমাদের তওবা কবুল করিয়াছেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন (এবং শরীয়তের বিধান বদলাইয়া দিয়াছেন)। এখন হইতে তোমরা (রমজানের রাত্রে) স্ত্রীদের সহিত সহবাস করিতে এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত ভাগ্যানুপাতিক বস্তু (সন্তান) লাভের চেষ্টা করিতে পার। (২ পাঃ ৭ রুঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—ইসলামের প্রাথমিক যুগে রোযার নিয়ম ও বিধান এই ছিল যে, নিদ্রামগ্ন হওয়ার মুহূর্ত্ত হইতেই রোযা আরম্ভ হইয়া যাইত। অর্থাৎ পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইয়া যাইত। ফলে কোন কোন ছাহাবীর দ্বারা এরূপ ঘটনা ঘটিয়া গেল যে, তারাবীহ ইত্যাদি হইতে অবসর হইয়া অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে আসিতে তাহার স্ত্রীর নিদ্রা আসিয়া গেল। কিন্তু বাড়ী পৌঁছিয়া সে স্বীয় স্ত্রীর নিদ্রামগ্নতাকে বৃথা অজুহাত মনে করতঃ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্ত্রী-সহবাস করিল, অথচ স্ত্রীর নিদ্রামগ্ন হওয়ার দরুণ তাহার রোযা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থায় তাহাকে সহবাসে বাধ্য করা শরীয়ত বিরোধী কার্য্য ছিল। তাই এইরূপ ঘটনা অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ পরে শীতল মস্তিষ্কে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করার পর ভীষণ অনুতপ্ত হইয়া নিজে নিজেও তওবা করিলেন এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারেও ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। এইরূপ ঘটনার উপরই উল্লিখিত আয়াত নাযেল হইল এবং চিরতরে শরীয়তের বিধান এই বিষয়ে সহজ করিয়া দেওয়া হইল যে, ছোবেহ-ছাদেক না হওয়া পর্য্যন্ত নিদ্রামগ্ন হওয়ার পরও পানাহার এবং স্ত্রী-সহবাস জায়েয এবং ছোবেহ-ছাদেক হইতে রোযা আরম্ভ হইবে।

৯৮৬। হাদীছ :—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের উপর (রোযা ফরজ হওয়ার প্রাথমিক যুগে) এই বিধান বলবৎ ছিল যে, কোন রোযাদার এফ্‌তারের সময় উপস্থিত হওয়ার পর এফ্‌তারের বস্তু সম্মুখে রাখিয়া এফ্‌তার করার পূর্ব মুহূর্তে নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলে সে পরবর্তী দিবসের সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কোন প্রকার পানাহার করিতে পারিত না। (কারণ, রাত্রের যে কোন অংশের নিদ্রা হইতে পরবর্তী দিবসের সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত রোযার সময় নির্দ্ধারিত ছিল।)

কায়েস ইবনে ছেরমা আনছারী (রাঃ) নামক (এক বৃদ্ধ) ছাহাবী রোযাদার ছিলেন। এফ্‌তারের সময় উপস্থিত হইলে পর তিনি গৃহে আসিয়া স্বীয় স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়ার কোন বস্তু আছে কি? স্ত্রী বলিল, উপস্থিত কিছুই নাই, কিন্তু আমি চেষ্টা করিয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে যাইতেছি। কায়েস ইবনে ছেরমা (রাঃ) সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত অবস্থায় বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার চক্ষুদ্বয় নিদ্রামগ্ন হইয়া গেল। এদিকে তাঁহার স্ত্রী (কিছু খাদ্য বস্তুর ব্যবস্থা করিয়া) উপস্থিত হইলে পর তাঁহাকে নিদ্রাবস্থায় দেখিয়া অনুতাপ করতঃ বলিল, আপনার ত কিসমত কাটা গিয়াছে। (নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া স্ত্রী তাঁহাকে খাদ্য গ্রহণে অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি আল্লাহ ও আল্লার রসূলের তথা শরীয়তের আদেশ লঙ্ঘনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতঃ কোন কিছু না খাইয়া দ্বিতীয় দিনের রোযা রাখিয়া দিলেন।) দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরে তিনি বেহুশ—অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করা হইল। এইরূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন শরীফের আয়াত নাযেল হইল যাহার অংশ বিশেষ এই—

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ

"এবং রমজানের রাত্রে তোমরা পানাহার করিতে পার যাবৎ কালো রেখা (রাত্রের অন্ধকার) শেষ হইয়া সাদা রেখা (প্রভাতের আলো) উদিত না হয়।"

৯৮৭। হাদীছ :—আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন কোরআন শরীফে অবতারিত এই আয়াতটি আমি পাঠ করিলাম—

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ

এবং خَيْط "খায়েত" শব্দের অভিধানিক অর্থ হইল—সূতা বা তাগা। যে অনুসারে আয়াতের অর্থ হয়—"তোমরা রমজানের রাত্রে পানাহার করিতে পার যাবৎ সাদা সূতা কাল সূতা হইতে পৃথক হইয়া দৃষ্ট না হয়"। তাই আমি একটি সাদা তাগা এবং একটি কাল তাগা আনিয়া তাগাদ্বয়কে আমার বালিশের নীচে রাখিয়া দিলাম এবং রাত্রির

অন্ধকারে উহাদের প্রতি বারবার দেখিতে লাগিলাম, রাত্রের অন্ধকার পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়া দিনের আলো আসিবার পূর্ব পর্য্যন্ত তাগাদ্বয়ের পূর্ণ পার্থক্য উপলব্ধি করা যাইতে ছিল না; (এবং আমি সেহেরী খাওয়াও ক্ষান্ত করিতেছিলাম না।) ভোর বেলা আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, হে বুদ্ধিমান! এখানে الخيط الابيض "আল খায়তুল আবয়্যাজু"— সাদা তাগার উদ্দেশ্য প্রভাতের আলো রেখা এবং "আল-খায়তুল আছওয়াদ"—কাল তাগার উদ্দেশ্য হইল রাত্রের অন্ধকার রেখা। অর্থাৎ যাবৎ রাত্রের অন্ধকার বিলুপ্ত হইয়া প্রভাতের আলো-রেখা—ছোবহে-ছাদেক উদিত না হয় তাবৎ তোমরা পানাহার করিতে পারিবে।

৯৮৮। **হাদীছঃ**—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথমে যখন—

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

নাযেল হইল তখন مِنَ الْفَجْرِ বাক্যটি—(যদ্বারা الخيط الابيض "সাদা তাগা"-এর উদ্দেশ্যের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, উহার উদ্দেশ্য "প্রভাত" উহা) নাযেল হইয়াছিল না, তাই সাধারণ লোকদের মধ্যে অনেকেই الخيط الابيض ও الخيط الاسود-এর আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী রোযার সময় একটি সাদা তাগা এক পায়ে এবং একটি কাল তাগা অপর পায়ে বাঁধিয়া রাখিল। যাবৎ সাদা তাগা ও কাল তাগা পৃথকরূপে দৃষ্ট না হইত তাবৎ তাহারা পানাহার করিত। তাহাদের এই ভুল ধারণা দূর করার জন্য পরে من الفجر বাক্যটি নাযেল হয়, অর্থাৎ الخيط الابيض সাদা তাগার উদ্দেশ্য প্রভাত বা ছোবহে-ছাদেক। অতঃপর তাহারা বুঝিতে পারিল যে, সাদা ও কাল তাগার উদ্দেশ্য যথাক্রমে প্রভাতের আলো অর্থাৎ ছোবহে-ছাদেক ও রাত্রির অন্ধকার।

তাহাজ্জুদ নামাযের আজান সেহেরী খাওয়ার প্রতিবন্ধক নহে

৯৮৯। **হাদীছঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বেলাল (রাঃ) ছোবহে-ছাদেকের (ঘন্টাখানেক) পূর্বে—রাত্রি বাকি থাকাবস্থায় তাহাজ্জুদ নামাযের উদ্দেশ্যে আজান দিয়া থাকিতেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে জ্ঞাত করিয়া দিলেন যে, যাবৎ আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে-মাকতুম আজান না দেয় তাবৎ তোমরা পানাহার করিতে পার। কারণ, সে-ই ফজরের আজান দিয়া থাকে। (তাঁহার পূর্বে বেলাল (রাঃ) যে আজান দেন, উহা তাহাজ্জুদ নামাযের আজান হইত)।

বিলম্বে সেহেরী খাওয়া

৯৯০। **হাদীছঃ**—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার ঘরে সেহেরী খাইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ফজরের নামাযে শরীক হওয়ার জন্য আমাকে দ্রুতবেগে যাইতে হইত।

সেহেরী খাওয়া ও ফজর নামাযের মধ্যকার ব্যবধান

৯৯১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) একদা বর্ণনা করিলেন, আমরা এমন সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সেহেরী খাইয়াছি যে, সেহেরী শেষ করিয়াই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আনাছ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ফজরের নামাযের আজান ও সেহেরী শেষ করার মধ্যে কি পরিমাণ ব্যবধান ছিল? তিনি বলিলেন—কোরআন শরীফের পঞ্চাশটি আয়াত (সাধারণরূপে) তেলাওয়াত করা যায় এই পরিমাণ সময় ছিল।

সেহেরী খাওয়া ওয়াজেব না হইলেও উহাতে বরকত লাভ হয়

৯৯২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিরতি না ঘটাইয়া লাগালাগি রোযা রাখিলেন। (অর্থাৎ এফতার, সেহেরী এবং রাত্রের কোন অংশে কোন প্রকার পানাহার না করিয়া পর পর কতিপয় রোযা রাখিলেন।) ছাহাবীগণও এইরূপ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য এরূপ করা অত্যাধিক কষ্টকর হইল। তাই নবী (দঃ) তাঁহাদিগকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আপনি ত এরূপ করিয়া থাকেন। নবী (দঃ) বলিলেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়—আমাকে (আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হইতে) পানাহার (-এর শক্তি) দান করা হইয়া থাকে।

৯৯৩। হাদীছ ঃ— قال انس رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা সেহেরী খাও; কারণ সেহেরী খাওয়ার মধ্যে বরকত লাভ হইবে।

দিনের বেলায় রোযার নিয়্যত করিলে?

উম্মুদ-দরদা (রাঃ) স্বীয় স্বামী—বিশিষ্ট ছাহাবী আবু দারদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার অভ্যাস ছিল—তিনি (সকাল বেলা নাস্তার সময় বাড়ী আসিয়া) জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমাদের নিকট কিছু খাদ্য বস্তু তৈয়ার আছে কি? যদি বলিতাম, কিছুই নাই, তবে তিনি বলিতেন—তাহা হইলে আমি (নফল) রোযার নিয়্যত করিয়া নিলাম।

আবু তালহা (রাঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হোজায়ফা (রাঃ) ও এইরূপ করিতেন।

৯৯৪। **হাদীছ ঃ**—সালামাতুবনুল আকওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা (১০ই মহরম) আশুরার দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে এই ঘোষণা প্রচারের আদেশ করিয়া পাঠাইলেন—তোমাদের যে ব্যক্তি ছোবহে-ছাদেক হওয়ার পর কিছু পানাহার করিয়াছে (তাহার রোযা হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও) সে বাকি দিন পানাহার হইতে বিরত থাকিবে এবং যে ব্যক্তি এখন পর্য্যন্ত পানাহার করে নাই, সে রোযার নিয়্যত করিয়া লইবে (অদ্য আশুরার দিন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে)।

ব্যাখ্যা ঃ—ঘটনা এই ছিল যে, একবার জিলহজ্জ মাসের ২৯ তারিখে মহররমের চাঁদ সম্পর্কে সঠিক প্রমাণ পাওয়া যাইতে ছিল না। যেই দিনকে মহররমের নয় তারিখ ধারণা করা হইতেছিল ; সেই দিনের কিছু অংশ কাটিয়া যাওয়ার পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এরূপ প্রমাণ উপস্থিত হইল যদ্বারা তিনি ঐ দিনকে দশ তারিখ আশুরার দিন বলিয়া সাব্যস্ত এবং উল্লিখিত ঘোষণা প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। কারণ, সেকালে রমজানের রোযা ফরজ হইয়াছিল না, বরং আশুরার রোজা ফরজ ছিল। বর্তমানে রমজানের রোযার ব্যাপারে উল্লিখিত বিধানই বলবৎ আছে।

মছআলাহ ঃ—নফল ও রমজানের নিয়্যত দিনের বেলা করা যায়। কিন্তু তাহা অবশ্যই সেহেরীর শেষ সীমা হইতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্য ভাগের পূর্বে হইতে হইবে। অন্ততঃ দ্বিপ্রহরের পূর্বে হইলেও কোন কোন আলেমের মতে রোযা শুদ্ধ হইবে।

রোযাদার ব্যক্তির জানাবত অবস্থায় প্রভাত করা

৯৯৫। **হাদীছ ঃ**—উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) ও উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-সালামা (রাঃ) উভয়েই এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন কোন সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তাহাজ্জুদের পর) স্বীয় স্ত্রী ব্যবহার করায় জানাবত অবস্থায় ছোবহে-ছাদেক হইয়া যাইত। অতঃপর গোছল করিতেন এবং (ফজরের নামায পড়িতেন ও) রোযা রাখিতেন।

রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সহিত দাম্পত্য-সুলভ ভালবাসা ও আসক্তির আচার-ব্যবহার করা

৯৯৬। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (স্বীয় স্ত্রীকে) রোযা অবস্থায় চুম্বন করিতেন এবং এক সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করিতেন (অতঃপর আয়েশা (রাঃ) সাধারণ লোকদিগকে হুশিয়ার করার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে,) নবী (দঃ) স্বীয় প্রবৃত্তিকে আয়ত্বাধীনে রাখিতে যেরূপ সক্ষম ছিলেন অন্য কেহ তদ্রূপ সক্ষম নহে।

ব্যাখ্যা ঃ—রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সহিত একমাত্র সহবাস ব্যতীত অন্য রকম আচার-ব্যবহারের অনুমতি আছে বটে, কিন্তু আয়েশা (রাঃ) যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন

যে—সাধারণ লোক স্বীয় প্রবৃত্তিকে আয়ত্বে রাখিতে সক্ষম হয় না, সুতরাং পূর্ব হইতেই সাবধান ও সতর্ক থাকা আবশ্যক। প্রয়োজনবোধে এক বিছানায় অঙ্গাআঙ্গি ভাবে শোওয়া অথবা চুম্বন করা হইতে বিরত থাকিবে।

৯৯৭। **হাদীছ** ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা সত্য যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রোযা অবস্থায় এক স্ত্রীকে চুম্বন করিয়াছেন; ইহা বর্ণনা করিয়া আয়েশা (রাঃ) হাসিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রসিদ্ধ আছে, আয়েশা (রাঃ) হইতে ইসলামের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মছলা-মাছায়েল বর্ণিত। আল্লাহ তায়ালাও তাঁহাকে সুযোগ দিতেন বেশী; নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আয়েশার বিছানায় অহী যত আসে অন্যত্র তত আসে না। আয়েশা (রাঃ) উম্মতকে মছলা-মাছায়েল পৌঁছাইতেও অত্যধিক তৎপর ছিলেন।

রোযাদারের জন্য স্ত্রীকে চুম্বন করা রোযা ভঙ্গকারী নহে এই মছআলাহটি হযরতের প্রত্যক্ষ ঘটনার দ্বারা প্রমাণ ও বর্ণনা করায় আয়েশা (রাঃ)কে তাঁহার লজ্জাবোধ বাধা দেওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু বিরত রাখিতে পারে নাই। আপন ভাগিনাকে শিক্ষা দান সুযোগে শালীনতার সহিত তিনি উহা প্রকাশ করিয়া ছাড়িয়াছেন।

রোযা অবস্থায় গোসল করা

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রোযা অবস্থায় একটি কাপড় ভিজাইয়া (ঠাণ্ডার জন্য) উহাকে শরীরের উপর রাখিয়াছেন।

শা'বী (রঃ) রোযা অবস্থায় হাম্মাম খানায় (গোসল করার জন্য) গিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রোযা অবস্থায় (আবশ্যক বশতঃ) কোন বস্তুকে জিহ্বা দ্বারা চাখা ও আস্বাদন করাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। (কিন্তু গলার ভিতরে উহার কিঞ্চিৎ অংশও প্রবেশ করিলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। সুতরাং অতি প্রয়োজন ও বিশেষ সতর্কতা ছাড়া এইরূপ করিবে না।)

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, রোযা অবস্থায় কুলি করা বা যে কোন উপায়ে শীতলতা গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, রোযার সময় শরীরে বা মাথায় তৈল ব্যবহার করা এবং মাথা আচড়ান চাই। (অর্থাৎ রোযার সময় এলোমেলো ভাবে থাকা ভাল নয়)।

আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার একটি পাথরের তৈরী টব আছে। উহাতে পানি ভরিয়া রাখি এবং রোযা অবস্থায় বিশেষ উত্তাপ অনুভব করিলে আমি উহাতে নামিয়া শীতলতা হাসিল করিয়া থাকি।

মছআলাহ :—চুম্বন করায় বা উভয়ের অঙ্গাআঙ্গী করায় বা শুধু ধরা-ছোয়ায় যদি বীর্য্য বাহির হইয়া যায় তবে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে, এমনকি যদি দুই জন পুরুষ বা দুইজন নারীর মধ্যেও পরস্পর ঐরূপ হয়। তদ্রূপ হস্তমৈথুনেও বীর্য্য বাহির হইলে রোযা ভঙ্গ হইবে। (শামী, ২—১৪২)

মছআলাহ :—কোন প্রকার ধরা-ছোয়া ব্যতিরেকে শুধু কল্পনা করায় বা দৃষ্টি করায় যদিও গুপ্ত অঙ্গের প্রতিই দৃষ্টি হউক—উহাতে বীর্য্য বাহির হইলেও রোযা ভঙ্গ হয় না; রোযা চালু রাখিতেই হইবে। যেরূপ বীর্য্যপাত ব্যতিরেকে চুম্বন বা অঙ্গাআঙ্গী করায় রোযা ভঙ্গ হইবে না, রোযা চালু রাখিতে হইবে। (শামী)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রথম মছআলায় রোযা ভঙ্গ হওয়ায় উহার শুধু কাজাই করিতে হইবে; কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। কিন্তু একদিন ঐরূপে রোযা ভঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও পুনঃ রোযা ভঙ্গের পরওয়া না করিয়া ঐরূপে রোযা ভঙ্গের কাজ করিলে সে ক্ষেত্রে কাফ্‌ফারাও আদায় করিতে হইবে। (শামী, ২—৪৫)

আনাছ (রাঃ) হাছান বছরী (রাঃ), ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) তাঁহারা রোযা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করাকে দোষণীয় মনে করিতেন না।

৯৯৮। **হাদীছ :**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজান মাসে কোন দিন (অনিচ্ছাকৃত) স্বপ্নদোষের দরুণ নয়, বরং ইচ্ছাকৃত (ছোবেহ্‌-ছাদেকের পূর্বে স্ত্রী ব্যবহারের দরুণ) জানাবত অবস্থায় রাত্রি ভোর করিয়াছেন এবং তৎপর গোছল করিয়া রোযা রাখিয়াছেন।

রোযা অবস্থায় ভুলবশতঃ পানাহার করা

আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, নাকে পানি দেওয়ার সময় অনিচ্ছাকৃত ভাবে পানি গলায় চলিয়া গেলে রোযা ভঙ্গ হইবে না। (ইহা কোন কোন আলেমের অভিমত। কিন্তু হানাফী মজহাব মতে মছআলাহ এই :—রোযা স্মরণ থাকা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত ভাবেও গলার ভিতর পানি চলিয়া গেলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে।)

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, হঠাৎ মাছি হলকুমের ভিতর চলিয়া গেলে রোযা ভঙ্গ হইবে না।

হাসান বছরী (রঃ) ও মোজাহেদ (রঃ) বলিয়াছেন, ভুল বশতঃ স্ত্রী-সহবাস করিলেও রোযা ভঙ্গ হইবে না।

৯৯৯। **হাদীছ :**— عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

اِذَا نَسِىَ فَاَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভুলে পানাহার করিলে (তাহার রোযা ভঙ্গ হইবে না ;) সে ঐ রোযা পূর্ণ করিবে। কারণ, এই পানাহার আল্লাহর তরফ হইতে হইয়াছে। (অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত ভাবে হয় নাই, সুতরাং দোষণীয়ও হয় নাই।)

রোযা অবস্থায় মেছওয়াক করা

আমের ইবনে রবীয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে রোযা অবস্থায় মেছওয়াক করিতে দেখিয়াছি—অসংখ্য বার যাহার গণনা নাই।

শুষ্ক বা কাঁচা তাজা ও পানিতে ভিজা ইত্যাদি সব রকম মেছওয়াক দ্বারাই রোযা অবস্থায় মেছওয়াক করা যায়।

ইবনে সিরীন (রঃ) বলিয়াছেন, কাঁচা ডালের মেছওয়াক করায় রোযার কোন ক্ষতি হয় না। কোন ব্যক্তি বলিল, উহার ত আস্বাদ আছে। তিনি বলিলেন, পানিরও ত আস্বাদ আছে, অথচ তুমি রোযাবস্থায় কুল্লি করিয়া থাক (২৫৮ পৃঃ)।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রোযা অবস্থায় দিনের প্রথম ও শেষ উভয় দিকেই মেছওয়াক করিতেন (২৫৭ পৃঃ)। তিনি বলিয়াও থাকিতেন, রোযাদার দিনের প্রথম ও শেষ উভয় ভাগেই মেছওয়াক করিতে পারে ; তবে মেছওয়াক করার থুথু গিলিবে না। আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, যদি থুথু গিলিয়া ফেলে তবে রোযা ভঙ্গ হইবে বলি না। (ফতহুলবারী, নোসখার বোখারী ২—১২৪ পৃঃ)। কাতাদাহ (রঃ) ও আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, (মেছওয়াক করা) থুথু গিলিতে পারে। অবশ্য যদি মেছওয়াকের কুচি খসিয়া থাকে এবং উহা নগণ্য না হয় তবে উহা গিলিবে না, উহা অবশ্যই ফেলিয়া দিবে (ফতহুলবারী, ২—১২৮ পৃঃ)।

রোযা অবস্থায় নাকে পানি দেওয়া

নাকের ছিদ্রের শুধু বহিরাংশে পানি দেওয়াতে দোষ নাই ; অজুর মধ্যে নাকে পানি দেওয়ার আদেশ অনেক হাদীছেই উল্লেখ আছে এবং সেখানে রোযা-বেরোযার পার্থক্য করা হয় নাই। অবশ্য যথাসাধ্য ছিদ্রের উপর অংশেও পানি পৌছাইতে তৎপর হওয়ার আদেশ বর্ণনার হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, রোযাদার তাহা করিবে না। (ফতহুলবারী, ২—১২৯)।

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, নাকের ভিতর ঔষধ বা তৈলের ফোটা বহাইলে উহা যদি নাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, উহার কিঞ্চিৎ অংশও হলকুম বা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত না ছড়ায় তবে রোযার পক্ষে ক্ষতিকর হইবে না।

অবশ্য সাধারণতঃ মস্তিষ্কে পৌঁছাইবার জন্যই তৈল বা ঔষধ নাকে ঢালা হইয়া থাকে এবং অতি সহজে ও অবিলম্বেই উহা হলকুম ও মস্তিষ্ক পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, তাই ফেকার কেতাবসমূহে কোন প্রকার বিভক্তি ছাড়াই বলা হইয়া যে, নাকের মধ্যে ঔষধ

বা তৈল ঢালিলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে এবং সাধারণভাবে তাহাই প্রযোজ্য, অবশ্য যদি সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হইয়া উহা নাকের সীমা অতিক্রম না করার ব্যবস্থা করা হয় তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা এবং সে ক্ষেত্রে রোযা ভঙ্গ না হওয়া বস্তুতঃই সুস্পষ্ট।

কানে ঔষধ বা তৈল বহাইলে তদ্রূপই রোযা ভঙ্গ হইবে। কিন্তু অনিচ্ছায় হঠাৎ কানের ভিতর পানি প্রবেশ করিলে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। অবশ্য নিজে কানের ভিতর পানি প্রবেশ করাইলে রোযা ভঙ্গ হওয়া সম্পর্কে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু রোযা ভঙ্গ হওয়ার মতামতই অগ্রগণ্য ও অধিক বিধেয় (ফতোয়া কাজিখান, ফতহুল-কাদীর ২—৭৩)।

আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, কুল্লির পানি মুখ হইতে ফেলিয়া দিয়া তারপর থুথু গিলিলে রোযার ক্ষতি হইবে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে মুখে পানির অংশ অতি নগণ্যই থাকে। যাহা থাকে তাহা মুখে লাগিয়া থাকা অংশ মাত্র ; উহাতে রোযার ক্ষতি হইবে না।

"গোন্দ" নামীয় এক প্রকার বস্তু যাহা শত চিবাইলেও কোন রস বা স্বাদ নির্গত হয় না এবং উহার কোন অংশও ছিন্ন হয় না—যেরূপ "রবার"; সাধারণতঃ মহিলারা উহা চিবাইয়া থাকে। আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, রোযা অবস্থায় উহা চিবাইয়া থুথু গিলিলেও রোযা ভঙ্গ হইবে বলি না, কিন্তু ঐরূপ করা নিষিদ্ধ।

রমযানে স্ত্রী-সহবাস ইত্যাদি রোযা ভঙ্গকারী কার্য্য করিলে

আবু হোরায়রা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসের একদিন কোন প্রকার ওযর বা অসুস্থতা ব্যতীত রোযা ভঙ্গ করিবে, সে ঐ একদিন রোযা ভঙ্গের ক্ষতি এক যুগ রোযা রাখিয়াও পূরণ করিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য এই যে, রমযানের এক একটি রোযা এমনই অমূল্য রত্ন যে, উহা হেলায় হারাইলে তাহার ক্ষতিপূরণ দীর্ঘ এক যুগের রোযার দ্বারাও হইতে পারিবে না। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, উহার কাযা করিতে হইবে না। কাযা এবং কাফ্ফারার মছআলাহ শরীয়তে যাহা নির্দ্ধারিত আছে তদনুসারে তাহা করিতে হইবে। যেমন কোন সাধারণ ব্যক্তি কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে, তখন সকলেই এই কথা বলিবে যে, এই ব্যক্তির ন্যায় হাজার জনকে ফাঁসি দিলেও মৃত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ হইতে পারে না। কিন্তু ইহার অর্থ কখনও এইরূপ হইবে না যে, আদালত কর্তৃক নির্দ্ধারিত শাস্তি হইতে আসামি অব্যাহতি পাইয়া যাইবে।

১০০০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত অনুতাপের সহিত আরজ করিল "এই বদনছীব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।" হযরত (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে ? সে আরজ করিল, আমি রমযানের রোযার মধ্যে স্ত্রী-সহবাস করিয়া ফেলিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি একজন ক্রীতদাস আজাদ করার

ক্ষমতা আছে? সে আরজ করিল—না। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, একাধারে দুই মাস রোযা রাখিতে সক্ষম হইবে কি? সে আরজ করিল—না। তারপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ষাট জন মিছকীনকে খানা দেওয়ার সামর্থ তোমার আছে কি? সে আরজ করিল না। এই প্রশ্নোত্তরের পর কিছু সময়ের মধ্যেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এক বড় পাত্র ভরা খেজুর (কাহারও পক্ষ হইতে ছদকা স্বরূপ) উপস্থিত হইল। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, এই খেজুরগুলি তুমি লইয়া যাও এবং স্বীয় গোনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ ছদকা করিয়া দাও। তখন সে আরজ করিল—ইহা কি আমার চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্তকে দান করিব? ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এই নগরীর চতুঃসীমার ভিতরে আমার পরিবারবর্গ হইতে অধিক অভাবগ্রস্ত কোনও পরিবার নাই। এতচ্ছ্রবণে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় স্বভাবগত মৃদু হাসি হইতে কিঞ্চিৎ অধিক হাসিয়া উঠিলেন। (কারণ, তিনি ঐ ব্যক্তির মতলব বুঝিতে পারিয়াছিলেন)। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আচ্ছা,—ইহা তোমার পরিবারবর্গকেই খাইতে দাও।

ব্যাখ্যা ঃ—সাধারণতঃ মছআলাহ এই যে, কাফ্ফারার বস্তু নিজ পরিবারকে দিলে কাফ্ফারা আদায় হইবে না। অবশ্য স্বীয় পরিবারবর্গ যদি অনাহারী হয় তবে কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে পরিবারবর্গের খাদ্যের ব্যবস্থা করিবে এবং কাফ্ফারা জিম্মায় থাকিবে। সুযোগ পাইলেই ঐ কাফ্ফারা আদায় করিবে।

এই হাদীছ দ্বারা এই মছআলাহও বুঝা যায় যে, ছদকাহ এবং দান সূত্রে প্রাপ্ত বস্তু দ্বারাও রোযার কাফ্ফারা আদায় করা যায়।

রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করা বা বমি আসা

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, বমি আসিলে রোযা ভঙ্গ হইবে না। কোন বস্তু ভিতর হইতে বাহির হওয়ার দরুণ রোযা ভঙ্গ হয় না, বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিলে রোযা ভঙ্গ হয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও এইরূপ বলিয়াছেন।

মছআলাহ ঃ—বমি যদি ইচ্ছাকৃত না হয়—অনিচ্ছায় সৃষ্ট উদবেগের কারণে হয় তবেই উহাতে রোযা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু বুট বা ছোলার এক দানা পরিমাণ অংশও ঐ বমির ইচ্ছাকৃত গলধঃ করিলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর ইচ্ছাকৃত উপায়ে বমি করিলে সেই বমি করায়ও রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে—কাযা করিতে হইবে; কাফ্ফারা দিতে হইবে না (শামী, ২—১২৫)।

ইবনে ওমর (রাঃ) রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিতেন। কিন্তু পরে তিনি রোযা অবস্থায় দিনের বেলা রক্তমোক্ষণ করা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আবশ্যক হইলে রাত্রে করিতেন। (কারণ, ইহার দ্বারা রোযা অবস্থায় দুর্বলতা আসার আশঙ্কা থাকে)। আবু মুছা (রাঃ) (রোযা অবস্থায় দুর্বলতা আশঙ্কায়) রক্তমোক্ষণ রাত্রে করিতেন।

সায়াদ (রাঃ), যায়েদ ইবনে ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং উম্মে-সালামা (রাঃ) রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়াছেন। আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সম্মুখে রক্তমোক্ষণ রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় হইয়াছে, তিনি নিষেধ করেন নাই।

কোন কোন ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রক্তমোক্ষণ কার্য্য সম্পাদন করে এবং যাহার রক্তমোক্ষণ করা হয় উভয়েরই রোযা ভঙ্গ হইয়া যায়।

এই বর্ণনা যদি হাদীছরূপে ছহীহ হয় তবে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রোযা অবস্থায় এরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকা চাই। ইহাতে রোযা ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে। কেননা যাহার রক্তমোক্ষণ করা হয় তাহার দুর্বলতা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে এবং যে রক্তমোক্ষণ কার্য্য সম্পাদন করে সে মুখের সাহায্যে উহা করিয়া থাকে বলিয়া তাহার রোযা ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে।

অবশ্য যদি কাহারও পূর্ণ আস্থা থাকে যে, তাহার রক্তমোক্ষণ করা হইলে কোনও দুর্বলতা আসিবে না এবং রোযার উপর কোন প্রতিক্রিয়া হইবে না, তবে রোযা অবস্থায়ও সে রক্তমোক্ষণ করিতে পারে।

১০০১। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহরাম অবস্থায় এবং রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়াছেন।

১০০২। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ত্তমানে আপনারা রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ অসঙ্গত গণ্য করিতেন কি? তিনি বলিলেন, না—অবশ্য যে ক্ষেত্রে দুর্বলতা সৃষ্টির আশঙ্কা হয়।

সফর অবস্থায় রোযা রাখা বা না রাখা

১০০৩। হাদীছঃ ইবনে-আবী-আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক সফরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে বলিলেন, বিশ্রামের জন্য অবতরণ কর এবং আমার জন্য শরবত তৈয়ার কর। ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, (এফতারের সময় হয় নাই) সূর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে দ্বিতীয়বার ঐরূপ আদেশ করিলেন; সে ব্যক্তি পুনঃ ঐ উক্তিই করিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তৃতীয়বার তাহাকে ঐ আদেশ করিলেন। এইবার সে অবতরণ করিল এবং শরবত তৈয়ার করিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহা পান করতঃ (এফতার) করিলেন এবং (পূর্ব দিকে) ইশারা করিয়া বলিলেন, ঐ দিক হইতে যখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে দেখ তখন মনে কর, রোযাদারের এফতারের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

১০০৪। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হামযা-ইবনে-আমর আছলামী (রাঃ) নামক ছাহাবী যিনি অনেক বেশী রোযা রাখায় অভ্যস্ত ছিলেন; তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, আমি অধিক রোযা রাখিয়া থাকি; সফরের অবস্থায়ও কি রোযা রাখিব? নবী (দঃ) বলিলেন, ইচ্ছা করিলে না-ও রাখিতে পার।

বাড়ীতে অবস্থানকালে রমযান আরম্ভ হওয়ায় কয়েক দিন রোযা রাখিয়া সফরে বাহির হইলেও সফরে রোযা ভঙ্গের অনুমতি থাকিবে

১০০৫। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের জন্য রমজান মাসে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং পথিমধ্যে তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। যখন মক্কার নিকটবর্তী 'কাদিদ' নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন তিনি রোযা পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীগণও রোযা পরিত্যাগ করিল।

মছআলাহ :—ছোবেহ-ছাদেক তথা রোযা আরম্ভ হওয়ার মুহূর্তে বাড়ীতে অবস্থানরত থাকিয়া অতঃপর সফরে বাহির হইলেও ঐ দিনের রমযানের রোযা রাখা ফরয, সফরের জন্য ঐ দিনের রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নহে।

পক্ষান্তরে ছোবেহ-ছাদেকের পূর্বে সফরে বাহির হইয়া পড়িলে সফর অবস্থায় থাকার দরুণ রোযা কাযা করার অনুমতি আছে। কিন্তু সফর অবস্থায়ও দিনের প্রথম দিকে একবার রমযানের রোযার নিয়্যত করিয়া লইলে তৎপর সফরের দরুন ঐ দিনের রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নহে। অবশ্য জেহাদের সফর হইলে তাহার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। কারণ, জেহাদের সম্মুখীন অবস্থায় দুর্বলতার আশঙ্কায় রোযা ভঙ্গ করা যায়।

উল্লিখিত হাদীছের ঘটনাটি জেহাদের সফরই ছিল।

১০০৬। হাদীছ :—আবুদ্-দারদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (জেহাদের) এক সফরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তখন গ্রীষ্মের উত্তাপ অতি ভীষণ ছিল। এমনকি, মাথার উপর অন্ততঃ হাত রাখিয়া ছায়া গ্রহণ করিতে মানুষ বাধ্য হইতেছিল। (তখন রমযান মাস ছিল, কিন্তু) আমাদের মধ্যে একমাত্র নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ব্যতীত আর কেহই রোযাদার ছিল না।

সফর অবস্থায় অধিক কষ্টের রোযা নিষিদ্ধ

১০০৭। হাদীছ :—জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সফরে ছিলেন; এক স্থানে জনতার ভিড় এবং এক ব্যক্তির উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা দেখিতে পাইলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন এখানে কি ব্যাপার ঘটিয়াছে? সকলেই আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! এক

রোযাদার ব্যক্তির বেহুশ হওয়ার ঘটনা। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছিলেন— ليس من البر الصيام فى السفر "সফর অবস্থায় (এরূপ অসহণীয় কষ্টের মধ্যে) রোযা রাখা নেক কাজ গণ্য নহে।"

১০০৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সফর করিয়া থাকিতাম। সফর অবস্থায় রোযাদারগণ রোযা ভঙ্গকারীগণকে কোন প্রকার দোষারোপ করিতেন না এবং রোযা ভঙ্গকারীগণও রোযাদারগণকে দোষারোপ করিতেন না।

১০০৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মক্কা বিজয় উপলক্ষে) মদীনা হইতে মক্কার দিকে যাত্রা করিলেন; তিনি রোযা রাখিয়াছিলেন। যখন 'ওছফান' নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন পানি আনিবার আদেশ করিলেন এবং সকলকে দেখাইয়া পানি পান করিলেন; মক্কায় পৌঁছা পর্য্যন্ত তিনি আর রোযা রাখিলেন না। এই ঘটনা রমজান মাসে ঘটিয়াছিল।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিতেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সফর অবস্থায় রোযা রাখিয়াছেন এবং ভঙ্গও করিয়াছেন।

সামর্থবান লোককে রমযানের রোযা রাখিতেই হইবে

রমযানের রোযা ফরয হওয়ার প্রাথমিক অবস্থায় নূতন নূতন অনেকের রোযা অতিশয় কঠিন বোধ হইত। তাই তখন সাময়িক ভাবে এই অনুমতি ছিল যে, রোযা রাখিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও রোযা না রাখিয়া প্রতি রোযার পরিবর্তে এক জন মিসকিনকে দুই ওয়াক্ত খানা খাওয়াইয়া দিবে। কোরআন শরীফের আয়াত—

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ

ইহার অর্থ কোন কোন মোফাচ্ছের উক্ত বিষয়ের উপরই স্থাপিত করিয়াছেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) এই বিষয়ে সকলকে সতর্ক করার জন্য আলোচ্য পরিচ্ছেদটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের ঐক্যমতপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, উক্ত মছআলাহ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল, কিন্তু উহা ঐ সময়েই রহিত হইয়া গিয়াছিল এবং কোরআন শরীফের একাধিক স্থানে উক্ত মছআলার রহিতকরণ মূলক আদেশ বিদ্যমান আছে। যথা—

(১) وان تصوموا خير لكم অর্থাৎ প্রথমে তোমাদিগকে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখা বা রোযা না রাখিয়া (তৎপরিবর্তে) ফিদ্‌ইয়া (এক মিসকীনের খোরাক) দানের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, এখন তোমাদের জন্য রোযা রাখাই সাব্যস্ত করিয়া দেওয়া হইল।

● বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে-আবী-লাইলা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বহু সংখ্যক ছাহাবী আমাদের অনেকের নিকট এই বিবরণ দান করিয়াছেন যে, রমযান শরীফের এক মাসের রোযা ফরয হওয়ার আয়াত নাযেল হইলে উহা লোকদের নিকট কঠিন বোধ হইল; তখন এই অনুমতি দেওয়া হইল যে, শক্তিমান ব্যক্তিও রোযা না রাখিয়া প্রতিদিন এক মিসকীনকে দুই ওয়াক্ত খাওয়াইয়া দিতে পারে। পরে এই অনুমতি রহিত ও প্রত্যাহার করা হয় এই আয়াত দ্বারা—وان تصوموا خير لكم "তোমাদের জন্য রোযা রাখাই অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করা হইল।" সেমতে শক্তিমান সকলেই নির্দ্ধারিতরূপে রোযা রাখার আদিষ্ট হইল।

(২) فمن شهد منكم الشهر فليصمه অর্থাৎ পূর্বে রোযা না রাখিয়া ফিদইয়া দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু এখন আদেশ করা হইতেছে যে, "রমযানের মাস উপস্থিত হইলে রোযা রাখিতেই হইবে।"

ইহার সমর্থনে ইমাম বোখারী (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং ছালামাতুবনুল-আক্‌ওয়া (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণের বর্ণনাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত অনুমতি যে রহিত হইয়া গিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

১০১০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা রহিয়াছে যে, তিনি فدية طعام مسكين আয়াত তেলাওয়াত করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, এই আয়াতের মর্ম (فمن شهد منكم الشهر فليصمه—"রমযান মাস উপস্থিত হইলে রোযা রাখিতেই হইবে" আয়াত দ্বারা) মনছুখ তথা রহিত ও প্রত্যাহৃত হইয়া গিয়াছে।

১০১১। হাদীছ ঃ—* ছালামাতুবনুল আকওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যখন এই আয়াত নাযেল হইল—وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين তখন যাহার ইচ্ছা হইত সে রোযা না রাখিয়া ফিদইয়া আদায় করিয়া দিত। পরে পরবর্তী আয়াত নাযেল হইয়া উক্ত আয়াতের মর্মকে মনছুখ তথা রহিত ও প্রত্যাহৃত সাব্যস্ত করিয়া দিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—তফছীরের বিধান শাস্ত্রে একটি বিধান রহিয়াছে যে, কোরআনের কোন আয়াতের আদেশ বা মর্ম সম্পর্কে কোন ছাহাবী উহা মনছুখ বলিয়া উক্তি করিলে তাহা রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে প্রাপ্ত বলিতে হইবে। এই সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং ছালামাতুবনুল-আকওয়া (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের উক্তি নবী (দঃ) হইতে বর্ণিত দুইটি হাদীছ গণ্য হইবে।

---

* এই হাদীছ খানার ইঙ্গিত ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদে দিয়াছেন। পূর্ণ হাদীছখানা ৬৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন।

রমযানের ক্বাযা রোযা আদায় করার নিয়ম

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, কাহারও উপর কতিপয় রোযা ক্বাযা থাকিলে দুই একটি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে উহা আদায় করিতে পারিবে।

সায়ীদ ইবনুল মোছাইয়েব (রঃ) বলিয়াছেন, জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন নফল রোযা রাখা—যাহা অতি ফজীলতের রোযা; কাহারও উপর রমযানের রোযা ক্বাযা থাকিলে সে ঐ সময় নফলের পরিবর্তে রমযানের ক্বাযা রোযা আদায় করিবে।

ইব্রাহীম নখ্য়ী (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযানের ক্বাযা রোযা আদায় করিতে এতদুর বিলম্ব করিয়াছে যে, দ্বিতীয় রমযান উপস্থিত হইয়া গিয়াছে, এই বিলম্বের দরুণ তাহার কোনও কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে না।

আবু হোরায়রা (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ঐরূপ বিলম্বের দরুণ প্রতি রোযার ক্বাযা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে (এক মিছকীনের খোরাক) কাফ্ফারাও দিতে হইবে।

১০১২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সময় সময় আমার উপর রমযানের ক্বাযা রোযা বাকী থাকিয়া যাইত। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য আমার কর্তব্য পালনে কোন সময় বাধার সৃষ্টি না হয়—উহার জন্য সর্বদা আমার প্রস্তুত থাকার দরুণ ঐ ক্বাযা রোযা আদায় করিতে বিলম্ব হইয়া যাইত; শা'বান মাসে উহা আদায় করিতাম।

হায়েয অবস্থায় পরিত্যক্ত রোযার ক্বাযা করিতে হইবে

বিশিষ্ট তাবেয়ী আবুয্যেনাদ (রঃ) বলিয়াছেন, শরীয়তের বিধান অনেক সময় সাধারণ জ্ঞান এবং যুক্তির উর্দ্ধেও দেখা যাইতে পারে, কিন্তু ইসলামের প্রতি স্বীকৃতি দানের পর উহাকে লঙ্ঘন করার কোন উপায় থাকিতে পারে না। যথা—হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত রোযার ক্বাযা আদায় করিতে হয়, কিন্তু নামাযের ক্বাযা করিতে হয় না।

এই প্রসঙ্গে প্রথম খণ্ডে "হায়েজ অবস্থায় কাযা নামায পড়িতে হইবে না"—পরিচ্ছেদে অনূদিত ১২৫ নং হাদীছ খানা বিশেষ অনুধাবন যোগ্য; তথায় আলোচ্য বিষয়ের সুন্দর যুক্তিও বর্ণিত হইয়াছে।

ক্বাযা রোযা আদায় করার পূর্বে মৃত্যু ঘটিলে

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, (সম্পূর্ণ রমজান মাসের রোযা কাযা রাখিয়া কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে) ত্রিশ ব্যক্তি এক একটি করিয়া রোযা রাখিলে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে উহার ক্বাযা আদায় হইয়া যাইবে।

১০১৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি ক্বাযা রোযা বাকি রাখিয়া মরিয়া গেলে তাহার উত্তরাধিকারীগণ তাহার পক্ষ হইতে সেই রোযা আদায় করিবে।

১০১৪। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার মাতার মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহার উপর এক মাসের রোযা কাযা রহিয়াছে। আমি কি তাহার পক্ষ হইতে উহা আদায় করিতে পারি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার হক আদায় করিয়া দেওয়া আশু প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা ঃ—ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং অধিকাংশ আলেমগণের মতে আলোচ্য হাদীছ সমুহে বর্ণিত উত্তরাধিকারি কর্তৃক রোযা আদায় করার নিয়ম-পদ্ধতি এই যে, ফিদইয়া তথা প্রতি রোযার পরিবর্তে এক মিছকিনকে দুই ওয়াক্ত পেট ভরিয়া খাওয়াইবে বা ছদকায়ে-ফেতের পরিমাণের বস্তু বা উহার মূল্য গরীবকে প্রদান করিবে।

এফ্‌তারের সঠিক সময়

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) সূর্য্য-গোলক অস্তমিত হইলেই এফ্‌তার করিতেন।

১০১৫। হাদীছ ঃ— عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَاَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ ٥

অর্থ—ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন; এই (পূর্ব) দিক হইতে যখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে থাকে এবং ঐ (পশ্চিম) দিক হইতে দিন চলিয়া যায় তথা সূর্য্য অস্তমিত হইয়া যায় তখনই রোযাদারদের এফ্‌তারের সময় উপস্থিত হইয়া যায়।

সময় উপস্থিত হওয়ার পর এফ্‌তারে বিলম্ব না করা

১০১৬। হাদীছ ঃ— عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ۔

অর্থ—সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাবৎ মোসলমানগণ এফ্‌তার করার মধ্যে বিলম্ব না করিয়া সময়মত যথাসত্বর এফ্‌তার করিবে তাবৎ তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গল বিরাজমান থাকিবে।

এফ্‌তার করার পর সূর্য্য দেখা গেলে

১০১৭। হাদীছ ঃ— আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দুহিতা আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা এফ্‌তার করিলাম। এফ্‌তার করার পর সূর্য্য পূনরায় দেখা গেল। হাদীছ বর্ণনাকারীণীকে জিজ্ঞাসা করা হইল, এই ঘটনার দিনের রোযার কাযা আদায়ের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল কি? তিনি বলিলেন, এমতাবস্থায় কাযা হইতে অব্যাহতি আছে কি?

অপ্রাপ্ত বয়স্কদের রোযা রাখা

ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতকালে এক ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইল—সে রমজান মাসে দিনের বেলায় শরাব পান করিয়াছিল। ওমর (রাঃ) তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—আমাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও রোযা রাখিয়া থাকে। অতঃপর তাহার প্রতি ৮০টি বেত্রাঘাত ও নির্বাসনের আদেশ দিলেন।

১০১৮। হাদীছ ঃ—রুবাইয়্যে বিন্‌তে মোয়া'ওয়েজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার মোহাররমের দশ তারিখ আশুরার দিনটি পূর্ব হইতেই সন্দেহযুক্ত ছিল। কিন্তু দিন আরম্ভ হওয়ার পর ঐ দিনই আশুরার দিন বলিয়া প্রমাণিত হইল। অতঃপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দিনের প্রথম ভাগেই মদীনাবাসীদের মহল্লা সমূহে খবর পাঠাইয়া দিলেন যে, (অদ্যকার দিন আশুরার দিন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাই) যে ব্যক্তি সন্দেহের দরুন রাত্র হইতে রোযার নিয়্যত না করিয়া রোযাহীন প্রভাত করিয়াছে (তথা পানাহার করিয়াছে) তাহার কর্ত্তব্য হইবে এই দিনের অবশিষ্টাংশ পানাহার হইতে বিরত থাকা এবং যে ব্যক্তি রোযা রাখিয়াছে সে তাহার রোযা পূর্ণ করিয়া লইবে।

হাদীছ বর্ণনাকারীণী ছাহাবিয়া বর্ণনা করেন (আশুরার রোযার প্রতি এরূপ তাকিদ দেখিয়া) সর্বদা এই রোযাটি আমরা রাখিতাম এবং আমাদের ছেলে-মেয়েদিগকেও রাখাইতাম। এমনকি, এই উদ্দেশ্যে আমাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য তুলা দ্বারা খেলনা তৈয়ার করিয়া রাখিতাম; খাওয়ার জন্য কাঁদিলে ঐ খেলনা তাহাদিগকে খেলিবার জন্য দিতাম—যেন খেলায় দিন কাটিয়া গিয়া এফ্‌তারের সময় উপস্থিত হইয়া যায়।

রোযা রাখিয়া সূর্য্যাস্তের পরে—রাত্রে পানাহার করা চাই

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—ثم اتموا الصيام الى الليل "ছোবহে-ছাদেকের পর হইতে পরবর্তী রাত্র আসা পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর"। ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইল যে, শুধুমাত্র রাত্রি আসা পর্য্যন্তই রোযা রাখার আদেশ; অতঃপর রাত্রেও পানাহার ত্যাগ করতঃ রোযা রাখার বিধান শরীয়তে নাই।

রাত্রিকালের পানাহার ত্যাগ করতঃ লাগালাগি একাধিক রোযা রাখা হইতে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, এরূপ করিলে অনর্থক অধিক কষ্ট ভোগ হইয়া থাকে, তাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহা নিষেধ করিয়াছেন।

শরীয়ত কর্তৃক নির্দ্ধারিত নিয়ম পদ্ধতি ব্যতীত নিজের তরফ হইতে কোন নিয়ম অবলম্বনে কষ্ট ভোগ করাকে মকরূহ ও অপছন্দনীয় গণ্য করা হইয়াছে।

১০১৯। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُوَاصِلُوْا قَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ

لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ اِنِّىْ اُطْعَمُ وَاُسْقٰى .

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা (রাত্রিকালেও অনাহারী থাকিয়া) লাগালাগি রোযা রাখিও না। ছাহাবীগণের মধ্যে কেহ আরজ করিলেন, আপনি ত ঐরূপ রোযা রাখিয়া থাকেন! নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আমার সহিত তোমাদের তুলনা চলে না; আমাকে পানাহার (-এর শক্তি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) প্রদান করা হয়।

১০২০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দয়াপরবশ হইয়া মধ্যে ইফতার না করিয়া লাগালাগি রোযা রাখিতে নিষেধ করিলেন। লোকেরা বলিল, আপনি ঐরূপ লাগালাগি রোযা রাখিয়া থাকেন! হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি ত তোমাদের ন্যায় না। আমার রাত্রি এইভাবে অতিবাহিত হয় যে, আমাকে পানাহার (-এর শক্তি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) দান করা হয়।

১০২১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (রাত্রিকালেও অনাহারী থাকিয়া) লাগালাগি রোযা রাখা হইতে একাধিকবার সকলকে নিষেধ করিলেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি ত ঐরূপ রোযা রাখিয়া থাকেন! তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, আমার ন্যায় তোমাদের মধ্যে কে আছে? আমার পালনকর্তা আমাকে রাত্রি বেলায় (বিশেষরূপে) পানাহার (-এর শক্তি) দান করিয়া থাকেন। তোমরা সহজ-সাধ্যের আমলে সচেষ্ট থাক।

কোন কোন ছাহাবী বেশী ছওয়াবের আকাংখায় ঐরূপ রোযা হইতে বিরত থাকিলেন না। তখন হযরত (দঃ) ঐরূপ লাগালাগি রোযা রাখা আরম্ভ করিলেন—একদিন চলিল, দুই দিন চলিল অতঃপর ঈদের চাঁদ উঠিয়া পড়িল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, যদি ঈদের চাঁদ বিলম্বে উঠিত তবে আমি আরও কিছুদিন পর্য্যন্ত

রোযা চালাইয়া যাইতাম। যাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দেখাদেখি লাগালাগি রোযা রাখিতেছিল তাহাদিগকে শায়েস্তা করার জন্য হযরত (দঃ) এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সেহেরীর সময় পর্য্যন্ত রোযা রাখা

১০২২। **হাদীছ ঃ**—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা বলিলেন, তোমরা (অনাহারে রাত্রি কাটাইয়া) লাগালাগি রোযা রাখিও না। যদি কাহারও ঐরূপ করার বিশেষ আকাংখা হয় তবে সেহেরীর সময় পর্য্যন্ত রোযা রাখিতে পার। লোকেরা বলিল, আপনি ত অনাহারে লাগালাগি রোযা রাখিয়া থাকেন! তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি ত তোমাদের ন্যায় নহি; আমার রাত্রি এইভাবে কাটে যে, আমাকে আহার (-এর শক্তি) দানকারী বিদ্যমান থাকে।

বন্ধুকে নফল রোযা ভঙ্গের কসম দেওয়া

১০২৩। **হাদীছ ঃ**—আবু হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সালমান (রাঃ) এবং আবুদ-দরদা (রাঃ) উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন। একদা সালমান (রাঃ) স্বীয় বন্ধু আবুদ-দরদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। (আবুদ-দরদা (রাঃ) বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন না।) সালমান (রাঃ) স্বীয় বন্ধু আবুদ-দরদার স্ত্রীকে বিশ্রী ময়লা কাপড় পরিহিতা অবস্থায় দেখিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এরূপ বিশ্রী কাপড় পরিধান কর কেন? সে উত্তর করিল, আপনার বন্ধু আবুদ-দরদা দুনিয়ার কোন সম্বন্ধই রাখেন না। (অর্থাৎ আমার পরিপাটির প্রয়োজনই নাই।) ইতিমধ্যেই আবুদ-দরদা (রাঃ) বাড়ী পৌছিলেন এবং স্বীয় বন্ধু সালমান (রাঃ)কে দেখিয়া খানা তৈয়ার করিলেন এবং তাঁহাকে খাদ্য গ্রহণের অনুরোধ করিলেন। সালমান (রাঃ) আবুদ-দরদা (রাঃ)কে তাঁহার সঙ্গে আহার করিতে বলিলে তিনি বলিলেন, আমি রোযা রাখিয়াছি। সালমান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমি আপনাকে আল্লাহ্ তায়ালার কসম দিয়া বলিতেছি—রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলুন। আপনি আহার না করিলে আমিও আহার করিব না। আবুদ-দরদা (রাঃ) বন্ধুর কথায় (নফল) রোযা ভাঙ্গিয়া খাদ্য গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর যখন রাত্রি হইল আবুদ-দরদা (রাঃ) রাত্রের প্রথম ভাগেই তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সালমান (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, এখন ঘুমাইয়া পড়ুন। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। পুনরায় তাহাজ্জুদের জন্য উঠিলেন এইবারও সালমান (রাঃ) তাঁহাকে ঘুমাইয়া পড়িতে বলিলেন। যখন রাত্রির শেষ ভাগ উপস্থিত হইল তখন সালমান (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, এখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠুন। তখন উভয় বন্ধুই তাহাজ্জুদের নামায আদায়

করিলেন। অতঃপর সালমান (রাঃ) আবুদ দরদা (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—আপনার উপর আপনার পালনকর্তার হক আছে, আপনার উপর আপনার আত্মার হক আছে এবং আপনার স্ত্রীরও হক আছে, (আপনার মেহমানেরও হক আপনার উপর আছে। অতএব আপনি কোন দিন রোযা রাখুন, কোন দিন রোযাহীনও থাকুন এবং কিছু সময় তাহাজ্জুদ নামায পড়ুন, কিছু সময় ঘুমাইয়া থাকুন এবং স্বীয় স্ত্রীর নিকটও থাকুন। এইরূপে) আপনি প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করুন।

আবুদ-দরদা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির হইয়া সালমান (রাঃ)-এর সম্পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, সালমান ঠিকই বলিয়াছে।

শা'বান মাসে রোযা রাখা

১০২৪। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একাধারে (নফল) রোযা রাখিতে থাকিতেন, এমনকি আমাদের ধারণা হইত, তিনি (শীঘ্র) রোযা ত্যাগ করিবেন না। আবার রোযাহীন চলিতে থাকিতেন, এমনকি আমাদের ধারণা হইত তিনি (শীঘ্র) রোযা রাখিবেন না। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে রমযান শরীফ ব্যতীত কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখিতে দেখি নাই এবং শা'বান মাসের ন্যায় এত বেশী (নফল) রোযা অন্য কোন মাসে রাখিতে দেখি নাই।

১০২৫। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শা'বান মাসের ন্যায় এত অধিক (নফল) রোযা অন্য কোন মাসে রাখিতেন না। তিনি শা'বান মাসের প্রায় সম্পূর্ণই রোযা রাখিতেন।

তিনি স্বীয় উম্মতকে পরামর্শ দানে বলিতেন, (নফল) আমল তোমাদের জন্য যে পরিমাণ সহজ-সাধ্য হয় উহা সেই পরিমাণই অবলম্বন করিবে। আল্লাহ তায়ালা (বেশী আমলের) ছওয়াব দানে অপারগ হইবেন না, কিন্তু (বেশী আমল অবলম্বন করিলে শেষ পর্য্যন্ত) তোমরাই উহা হইতে অক্ষম হইয়া পড়িবে।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নফল নামায ঐ পরিমাণই পছন্দ করিতেন যে পরিমাণ সর্বদা আদায় করা যায়—যদিও উহা পরিমাণে কম হয়। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাধারণ অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি কোন সময় নামায পড়িলে (শুধু দুই-একদিন পড়িয়াই উহা ত্যাগ করিতেন না, বরং) সর্বদা ঐ সময় নামায আদায় করিতেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নফল রোযা রাখার নিয়ম

১০২৬। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমযান ব্যতীত কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখিতেন না।

নবী (দঃ) একাধারে রোযা রাখিয়া যাইতেন, এমনকি প্রত্যেকেই ধারণা করিত যে, তিনি (শীঘ্র) রোযা ত্যাগ করিবেন না। আবার রোযাহীন চলিতে থাকিতেন, এমনকি ধারণা হইত যে, তিনি (শীঘ্র) রোযা রাখিবেন না।

১০২৭। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একাধারে রোযা ছাড়া আরম্ভ করিতেন, এমনকি আমরা ভাবিতাম, এই মাসে তিনি রোযা রাখিবেন না। আবার একাধারে রোযা রাখা আরম্ভ করিতেন, এমনকি আমরা ভাবিতাম, এই মাসে তিনি রোযা ছাড়িবেন না।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তুমি রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদ নামায পড়িতে দেখার ইচ্ছা করিলে তাহাও দেখিতে পাইবে এবং নিদ্রা অবস্থায় দেখার ইচ্ছা করিলে তাহাও দেখিতে পাইবে।

১০২৮। হাদীছঃ—হোমায়েদ (রঃ) নামক তায়েবী বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রোযার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, একই মাসের মধ্যে তাঁহাকে রোযা অবস্থায় দেখিতে ইচ্ছা করিলে তাহাও দেখিতে পারিতাম এবং রোযাহীন দেখিতে ইচ্ছা করিলে তাহাও দেখিতে পারিতাম। (অর্থাৎ হযরত (দঃ) প্রতি মাসের কিছু দিন রোযা রাখিতেন এবং কিছু দিন রোযাহীন কাটাইতেন।) রাত্রে তাঁহাকে তাহাজ্জুদ রত দেখিতে চাহিলে তাহাও দেখিতে পাইতাম এবং নিদ্রাবস্থায় দেখিতে চাহিলে তাহাও দেখিতে পাইতাম। (অর্থাৎ রাত্রের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ পড়িতেন এবং কিছু অংশ নিদ্রায় কাটাইতেন।) কোন প্রকার সিল্ক বা রেশম রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাত অপেক্ষা অধিক কোমল পাই নাই। কোন প্রকার মুশ্‌ক-কস্তুরী বা আম্বর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুগন্ধের তুলনায় অধিক সুগন্ধ পাই নাই।

নফল রোযা রাখিতে দেহের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে

১০২৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল-আছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আমাকে বিশিষ্ট কুলীন বংশের একটি মেয়ে বিবাহ করাইয়াছিলেন। তিনি সর্বদা পুত্রবধুর খোঁজ-খবর লইয়া থাকিতেন; তাহাকে তাহার স্বামী সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিতেন। পুত্রবধূ তাহার স্বামী (তথা আমার সম্পর্কে) বলিত, মানুষ হিসাবে তিনি খুবই ভাল মানুষ; তবে আমার বিছানায়ও আসেন না, আমার পর্দায়ও হাত লাগান না—যাবৎ তাঁহার নিকট আসিয়াছি এই অবস্থাই চলিয়াছে। আমার পিতা বহুবার এই অভিযোগ শুনিলেন; একদা তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উহার আলোচনা করিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, তাহাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও।

এতদ্ভিন্ন আমি বলিয়া থাকিতাম, আল্লার কসম—যত কাল বাঁচিয়া থাকি প্রতি দিন রোযা থাকিব এবং প্রতি রাত্র নামাযে দাঁড়াইয়া কাটাইব। এই কথার সংবাদও নবী (দঃ)কে

জ্ঞাত করাইল। তদুপরি আমি যে, সর্বদা রোযা রাখি এবং সারা রাত্র নামায পড়ি—এই খবরও নবী (দঃ) পাইলেন। তারপর নবী (দঃ) আমার নিকট লোক পাঠাইলেন অথবা আমিই হযরতের খেদমতে পৌছিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, সংবাদ পাইয়াছি—তুমি সর্বদা রোযা রাখিয়া থাক, রোযা একদিনও ছাড় না এবং সারা রাত্র নামায পড়িয়া থাক, নিদ্রা যাও না। আমি আরজ করিলাম, জি-হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, এইরূপ করিলে তোমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে, জীবনী শক্তি লোপ পাইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি সারা বৎসর রোযা রাখে তাহার রোযা যেন হয়ই না। (কারণ, সর্বদা রোযা রাখা শরীয়তে অপছন্দনীয়।) হযরত (দঃ) আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি রোযা কিভাবে রাখিয়া থাক? আরজ করিলাম, প্রতি দিন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কোরআন কিভাবে পড়—(কত রাত্রের তাহাজ্জুদে কোরআন খতম করিয়া থাক?) আরজ করিলাম, প্রতি রাত্রে এক খতম করি। নবী (দঃ) ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নাকি বলিয়া থাক, আল্লার কসম—যতদিন বাঁচি প্রতি দিন রোযা রাখিব, সারা রাত্র নামাযে দাঁড়াইয়া কাটাইব। আমি আরজ করিলাম, আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ—আমি ইহা বলিয়াছি।

(এইরূপে একদিন আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) নিজে হযরতের খেদমতে হাজির হইলে হয়ত মোটামুটি কথাবার্তা এবং সংক্ষিপ্ত নছিহত করণ হইল। অতঃপর বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করিয়া আর একদিন স্বয়ং হযরত (দঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ছাহাবীর গৃহে তশরীফ আনিলেন (ফতহুলবারী ৪—১৭৭)। যাহার বিবরণে) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আমার রোযার আধিক্যের চর্চ্চা হইলে একদা হযরত (দঃ) আমার গৃহে তশরীফ আনিলেন। আমি হযরতের জন্য একটি গাও-তাকিয়া উপস্থিত করিলাম, যাহা খাজুর-ছোবরা ভর্তি চামড়ার তৈরী ছিল। হযরত (দঃ) মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন এবং তাকিয়াটি হযরতের ও আমার মধ্যস্থলে থাকিল। (দুই দিনের সর্বমোট কথোপকথন এবং হযরতের নছিহত নিম্নরূপ ছিল—)

হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি ঐরূপ করিও না, তুমি উহা নির্বাহ করিতে পারিবে না। তোমার লক্ষ্য রাখা উচিৎ তোমার উপর তোমার চক্ষুদ্বয়ের হক আছে, তোমার উপর তোমার জানের হক আছে, তোমার উপর তোমার দেহের হক আছে, তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার উপর তোমার বালবাচ্চা আত্মীয়-স্বজনের হক আছে, তোমার উপর তোমার মেহমানের হক আছে। তুমি বয়স বেশী পাইতে পার; (বৃদ্ধ বয়সে এত অধিক এবাদৎ চালাইয়া যাইতে সক্ষম হইবে না।) অতএব তুমি কিছু দিন রোযা রাখ এবং কিছু দিন রোযাহীন থাক; (রাত্রে) কিছু সময় নামায পড় এবং কিছু সময় নিদ্রা যাও।

(তদুপরি হযরত (দঃ) ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রত্যেকটি বিষয়ের সহজ পরিমাণের পরামর্শ দিলেন। রোযা সম্পর্কে বলিলেন—) প্রতি মাসে তিনটি করিয়া (নফল) রোযা রাখ; নেক কাজে প্রতিটায় দশ নেকী; অতএব (তিনে ত্রিশ এই হিসাবে) প্রতি মাসে তিন রোযাই সারা বৎসরের রোযার ন্যায় হইয়া যাইবে। তোমার জন্য কি প্রতি মাসে তিন রোযা যথেষ্ট নয়? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি আরও অধিক সক্ষম, হযরত (দঃ) বলিলেন, পাচটি। আমি বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, সাতটি। আমি বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, নয়টি। আমি বলিলাম ইয়া রসুলাল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, এগারটি! এইভাবে আমি কঠোর আমল অবলম্বন করিতে চাহিলাম; অগত্যা আমাকে কঠোর আমলের অনুমতি দেওয়া হইল। এক পর্য্যায়ে হযরত (দঃ) বলিয়াছিলেন, একদিন রোযা, দুইদিন রোযাহীন। আমি বলিলাম, আমি আরও বেশী সক্ষম; হযরত (দঃ) বলিলেন, প্রতি সপ্তাহে তিন রোযা। আমি আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিলাম; আমাকে কঠোর ব্যবস্থার অনুমতি দেওয়া হইল— আমি বলিলাম, আরও বেশী পরিমাণে আমি সক্ষম; হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লার নবী দাউদ (আঃ)-এর রোযা রাখ। জিজ্ঞাসা করিলাম, দাউদ (আঃ)-এর রোযা কিরূপ ছিল? হযরত (দঃ) বলিলেন, বৎসরের অর্দ্ধেক; উহা সর্বোত্তম রোযা। জিজ্ঞাসা করিলাম, উহা কিরূপ? হযরত (দঃ) বলিলেন, দাউদ (আঃ) একদিন রোযা রাখিতেন, একদিন রোযাহীন থাকিতেন। (এইভাবে তিনি রোযার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তিও অক্ষুন্ন রাখিতেন, ফলে আল্লার রাস্তায় জেহাদের পূর্ণ শক্তিমান থাকিতেন—) শক্রর মোকাবিলা হইলে কখনও পশ্চাদপদ হইতেন না।

এইভাবে বাড়াইতে বাড়াইতে হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমিও একদিন রোযা রাখ একদিন রোযাহীন থাক। আমি আরজ করিলাম, হে আল্লার নবী! ঐরূপ জেহাদের গুণ আমি কোথা হইতে পাইব। (রোযার মধ্যেই) আরও অধিক ও উত্তম ব্যবস্থার শক্তি আমার আছে; হযরত (দঃ) বলিলেন, উহা হইতে উত্তম আর কোন স্তর নাই! নবী (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি সদা রোযা রাখে (উহা এতই অপছন্দনীয় যে,) সে যেন রোযা রাখে নাই—এই কথা নবী (দঃ) দুইবার বলিলেন।

(রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাযের পরিমাণ সম্পর্কে) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, দাউদ (আঃ)-এর তাহাজ্জুদ নামায আল্লার নিকট সর্বাধিক মাহবুব ও পছন্দনীয়। দাউদ(আঃ) অর্ধ রাত্র ঘুমাইতেন, অতঃপর রাত্রের তৃতীয়াংশ পরিমাণ তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেন, তারপর আবার ষষ্ঠাংশ পরিমাণ ঘুমাইতেন (৪৮৬ পৃঃ)।

(কোরআন শরীফ খতম সম্পর্কে) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, (তাহাজ্জুদ নামাযে কোরআন শরীফ ধীরে ধীরে এবং সারা

রাত্রের স্থলে অল্প পড়িবে—এক মাসে একবার কোরআন শরীফ খতম করিবে। আমি আরজ করিলাম, আমার আরও অধিক সামর্থ আছে। সেমতে হযরত (দঃ) কোরআন খতমের সময়ের পরিমাণ কমাইতে কমাইতে সর্বশেষে বলিলেন, তিন রাত্রে খতম করিবে। কিন্তু পরে আবার বলিয়াছেন, কোরআন সাত রাত্রে একবার খতম করিবে, ইহা অপেক্ষা অধিক (তাড়াতাড়ি এবং বেশী) পড়িবে না (৭৫৬ পৃঃ)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বৃদ্ধ বয়সে আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, আমার জন্য কতই না ভাল হইত যদি আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহজ করার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া নিতাম। আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, দুর্বল হইয়া গিয়াছি, (যে কঠোর আমলের অনুমতি আমি চাহিয়া লইয়াছিলাম উহা নির্বাহ করা এখন আমার জন্য অতি কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে।

বৃদ্ধ বয়সে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, কোরআন শরীফের সপ্তমাংশ যাহা শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদে পড়িবেন তাহা দিনের বেলা ইয়াদ করিয়া পরিবারের কাহাকেও শুনাইতেন যেন রাত্রে সহজে পড়িতে পারেন। রোযার ব্যাপারেও যদি (অধিক দুর্বলতা অনুভবের কারণে) শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন বোধ করিতেন তবে (একদিন পর একদিন রোযা না রাখিয়া) ধারাবাহিক কয়েকদিন রোযাহীন থাকিতেন, কিন্তু একদিন পর একদিন রোযার হিসাবে ঐ দিনগুলিতে পরিত্যক্ত রোযার সংখ্যা গণিত রাখিতেন এবং পরে ঐ পরিমাণ সংখ্যা ধারাবাহিক রোযা রাখিয়া পূর্ণ করিতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ইহা অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন যে, নবী (দঃ) তাঁহাকে যে পরিমাণ এবাদৎ বন্দেগীর উপর রাখিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন সেই পরিমাণের কিঞ্চিতও ছাড়িবেন (৭৫৫ পৃঃ)।

ব্যাখ্যাঃ—ছাহাবীগণের প্রত্যেকের প্রচেষ্টা ছিল, দ্বীন ও এবাদতের যে অবস্থা ও পরিমাণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে অবলম্বন করিয়াছিলেন হযরতের তিরোধানের পরও যেন সেই অবস্থা ও পরিমাণ অক্ষুন্ন থাকে, উহাতে বিন্দুমাত্র নিম্নগতি না আসে। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই নফল এবাদৎ অবলম্বন করতঃ সর্বদা নির্বাহ করিয়া চলার প্রচেষ্টা উত্তম প্রচেষ্টা। হাদীছ শরীফে আছে—নফল এবাদৎ ঐ পরিবাণ উত্তম যাহা সর্বদা নির্বাহ করা হয়। এই প্রচেষ্টার লক্ষ্যেই হযরত (দঃ) নফল এবাদতের পরিমাণে সহজ পন্থা অবলম্বনের জন্য ছাহাবীগণকে তাকিদ করিতেন। কারণ, সহজ ও কম পরিমাণের এবাদতও উক্ত প্রচেষ্টার পন্থায় বেশীতে পরিণত হয়।

এই আলোচনায় ইহা সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, উল্লিখিত হাদীছে এবাদৎ কম করার যে শিক্ষা ও পরামর্শ রহিয়াছে তাহা একমাত্র সর্বদার অভ্যাসরূপে নফল এবাদত অবলম্বন করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষ যাহারা আবদুল্লাহ ইবনে আমর

রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় বজ্রকঠিন শপথ তুল্য অভ্যাস অবলম্বন করা ত দূরের কথা কোন স্তরেই নফল এবাদতের অভ্যাসই হয় না, বরং সাময়িক মনের কোন গতির প্রভাবে বা সুদিন সুরাত্রির সুযোগে নফল এবাদৎ করা ভাগ্যে জুটিয়া থাকে—এইরূপ ক্ষেত্রের জন্য উক্ত শিক্ষা ও পরামর্শ নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে সাময়িক উচ্ছাসকে উত্তম সুযোগ গণ্য করিয়া উহার ধাক্কায় যতদুর অগ্রসর হওয়া যায় এবং যত অধিক সুযোগ গ্রহণ করা যায় তাহাই সৌভাগ্যের অবলম্বন পরিগণিত হইবে।

তদ্রূপ যাঁহারা পবিত্র কোরআনের অর্থ বুঝিতে সক্ষম তাঁহাদের বিশেষ কর্তব্য নামাযে বা সাধারণ রূপে কোরআন তেলাওয়াত করিতে অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং পবিত্র কোরআনের মর্মকে উপলব্ধি ও গ্রহণ করিয়া উহার ভাবে ভাবান্তরিত হইয়া পাঠ করা। তাহাতে নিশ্চয়ই পঠনের গতি ধীর ও মন্থর হইবে। উল্লিখিত হাদীছে কোরআন তেলাওতের পরিমাণে যে পরামর্শ রহিয়াছে তাহা একমাত্র এই দৃষ্টির ভিত্তিতেই। অতএব যাহারা অর্থ বুঝিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত তাহাদের জন্য এই পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যকীয় নহে, কিন্তু তাহাদিগকেও শুদ্ধ এবং স্পষ্টরূপে পড়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, অন্যথায় পবিত্র কোরআনের লা'নত ও অভিশাপগ্রস্থ হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই ঘটনা ছাহাবীগণের মধ্যে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। অনেকেই অধীর হইয়া তাঁহার এই হাদীছ শুনিবার জন্য আসিতেন; তিনিও হযরতের অমোঘ আদর্শের শিক্ষাটিকে অনেক ক্ষেত্রেই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি পূর্ণ বিবরণটি খণ্ড খণ্ডরূপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন খণ্ড তাহাও নিজ ভাষায় ব্যক্ত করিতেন; ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে বাক্য রচনায় কিম্বা বিবরণ ধারায় গরমিলের ধারণা জন্মে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিবরণের সমষ্টির মধ্যে মোটেই কোন গরমিল নাই। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বিভিন্ন বর্ণনার হাদীছ সমূহ বোখারী (রঃ) ১৫৪, ২৬৫, ৪৮৫, ৭১৬, ৭৮৩, ৯০৫ ও ৯২৮ পৃষ্ঠায় সর্বমোট ১৮ স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব সমষ্টির অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে একত্রে করা হইয়াছে।

কাহারও সাক্ষাতে যাইয়া তাহার খাতিরে নফল রোযা ভঙ্গ করা আবশ্যক নহে

১০৩০। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (আমার মাতা) উম্মে-ছোলায়েমের গৃহে তশরীফ আনিলেন। উম্মে-ছোলায়েম তৎক্ষণাৎ কিছু খুরমা ও মাখন উপস্থিত করিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, মাখন ও খুরমা স্ব স্ব পাত্রে রাখিয়া দাও; আমি রোযা রাখিয়াছি। অতঃপর নবী (দঃ) গৃহের এক কিনারায় দাঁড়াইয়া নফল নামায পড়িলেন এবং উম্মে-ছোলায়েম ও

তাঁহার গৃহবাসীদের জন্য দোয়া করিলেন। উম্মে ছোলায়েম আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার এক জন বিশেষ প্রিয় পাত্র আছে। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন সে কে? উম্মে ছোলায়েম বলিলেন, আপনার আজ্ঞাবহ খাদেম—আনাছ।

(আনাছ (রাঃ) বলেন—) তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার জন্য ইহ-পরকালের সমুদয় কল্যাণ, মঙ্গল ও উন্নতির দোয়া করিলেন এবং এই দোয়াও করিলেন—হে আল্লাহ। আনাছকে ধনে-জনে বাড়াইয়া দাও। সেই দোয়ার বরকতেই আমি মদীনা-বাসীদের মধ্যে অন্যতম ধনী এবং আমার বড় মেয়ে উমায়মা বলিয়াছে, যে বৎসর হাজ্জাজ বছরার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসে সেই বৎসর পর্য্যন্ত আমার ঔরসজাত মৃত সন্তানের সংখ্যা একশত কুড়িরও অধিক ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—উম্মে-ছোলায়েম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার এতীম ছেলে ছিলেন আনাছ (রাঃ)। মাতা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দ্বারা স্বীয় এতীম পুত্রের জন্য দোয়া করাইলেন। সেই দোয়া অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইল। উহারই দুইটি নমুনা আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বর্ণনায় এখানে উল্লেখ হইয়াছে। ধনের দিক দিয়া তাঁহার অসাধারণ উন্নতি লাভ হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে, সাধারণতঃ খেজুর গাছে বৎসরে একবার ফল আসিয়া থাকে, কিন্তু আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেজুর বাগানের গাছ সমূহে প্রতি বৎসর দুইবার ফল আসিত। জনের দিক দিয়া আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে এরূপ উন্নতি দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ৮০।৮২ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার জীবিত ছেলে-মেয়ে পৌত্র-পৌত্রির সংখ্যা প্রায় একশত ছিল এবং শুধু ঔরসজাত সন্তানের সংখ্যা মৃত এক শত কুড়িরও অধিক ছিল। এই বয়সের পরে তিনি আরও প্রায় ১০।১৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।

প্রতি মাসের শেষভাগে রোযা রাখা

১০৩১। হাদীছ ঃ—ইমরান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি (তোমার অভ্যাসানুরূপ) গত শা'বান মাসের শেষভাগে রোযা রাখ নাই? ছাহাবী উত্তর করিলেন না, ইয়া রাসুলাল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, তবে উহার পরিবর্তে দুইটি রোযা করিয়া নিও।

ব্যাখ্যা ঃ—ব্যক্তিগত নফল এবাদত বন্দেগীতে সাধারণতঃ এই পদ্ধতি অতি সুফলদায়ক হয় যে, এবাদত সমূহের মধ্য হইতে স্বীয় শক্তি ও সামর্থানুযায়ী কিছু পরিমাণ এবাদত স্বীয় অভ্যস্ত করিয়া লওয়া চাই। অতঃপর সেই অভ্যাসকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করা চাই। এরূপ করিলে নফছ ও শয়তান সেই মানুষকে অলসতা অবহেলা বা অমনো-যোগিতার মধ্যে ফেলিবার সুযোগ পায় না এবং কোন প্রকার ছুতা-নাতার আড়ালে

তাহাকে এবাদত হইতে মাহরুম রাখিতে সক্ষম হয় না। এই উদ্দেশ্যেই এবাদত-বন্দেগীর উন্নতিকামীগণ নফল এবাদতের কিছু পরিমাণকে স্বীয় অজিফারূপে নির্দিষ্ট করিয়া নেন। এমনকি, যদিও নফল এবাদতের কাযা আদৌ আবশ্যকীয় নহে তবুও তাঁহারা এরূপ করেন যে, যদি কোন দিন কোন সময় ঐ অজিফা ও নির্দিষ্ট এবাদত কোন বিশেষ কারণে সময় মত আদায় করা না যায়, তবে উহাকে অন্য সময় আদায় করিয়া লন। ইহাতে নফছ-শয়তান কর্তৃক অবহেলা, অমনোযোগিতা ও অলসতা টানিয়া আনার ছিদ্রপথ বন্ধ থাকে। যেমন হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত যে, কাহারও তাহাজ্জুদ বা রাত্রের কোন অজিফা কোন দিন ছুটিয়া গেলে দ্বিপ্রহরের পূর্বে উহা আদায় করিয়া নিবে। এরূপ আরও অনেক নজীর বিদ্যমান আছে। বোধ হয় এই উদ্দেশ্যেই শা'বান মাসের শেষভাগে নফল রোযা নিষিদ্ধ হওয়ার সাধারণ নিয়ম হইতে প্রতি মাসের শেষ ভাগে রোযা রাখার অভ্যস্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। যাহার বিবরণ ৯৮৫ নং হাদীছে বর্ণিত আছে।

আলোচ্য হাদীছের ঘটনাটি এই শ্রেণীরই একটি ঘটনা। ঐ ছাহাবী স্বীয় অজিফা স্বরূপ এই অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, প্রতি মাসের শেষ ২।৩ দিন নফল রোযা রাখিতেন। শা'বান মাসের শেষভাগে সাধারণতঃ নফল রোযা নিষিদ্ধ হইলেও পূর্বাপর মাসসমূহের শেষভাগে নফল রোযা রাখায় অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে উহা নিষিদ্ধ নহে। আলোচ্য ঘটনায় ঐ ছাহাবী যে কারণেই হউক শা'বান মাসে স্বীয় অভ্যস্ত রোযা আদায় করেন নাই; তাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে স্বীয় অজিফা বহাল রাখার প্রতি তৎপরতা শিক্ষাদানার্থে এই পরামর্শ দিলেন যে, অন্য মাসে এই রোযা আদায় করিয়া লও।

মছআলাহঃ—আইয়্যামে বীজ তথা প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখাও বিশেষ ফজিলতের আমল। এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রথম খণ্ডে অনূদিত ৬২৩ নং হাদীছখানা বয়ান করিয়াছেন।

শুধু শুক্রবার রোযা রাখার অভ্যাস নিষিদ্ধ

১০৩২। হাদীছ ঃ—মোহাম্মদ ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জাবের (রাঃ)কে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি শুক্রবার রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ—শুধুমাত্র শুক্রবার দিন বিশেষ করিয়া রোযা রাখা নিষেধ করিয়াছেন।

১০৩৩। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَصُوْمُ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

اِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ اَوْ بَعْدَهُ۔

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যেন বিশেষ করিয়া শুধু শুক্রবার রোযা না রাখে, যাবৎ না উহার সঙ্গে পূর্বে বা পরে আরও এক দিনের রোযা রাখে।

১০৩৪। হাদীছ ঃ—উম্মুল-মোমেনীন জোয়ায়রিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা শুক্রবার দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার নিকট তশরীফ আনিলেন, আমি সেদিন রোযা রাখিয়াছিলাম। তিনি (তাহা জানিতে পারিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গতকল্যও রোযা রাখিয়াছিলে কি? আমি উত্তর করিলাম—না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আগামীকল্য রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণ কর কি? আমি আরজ করিলাম—না। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, এরূপ অবস্থায় তুমি অদ্যকার রোযা ভাঙ্গিয়া ফেল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশানুক্রমে তিনি রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—শয়তান বড় চতুর ও দূরদর্শী। যাহাকে দীনদার পরহেজগার দেখে তাহাকে সেই পথেই ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করিয়া থাকে। শরীয়তের বিধানে যে কার্য্য-বিধি বিদ্যমান নাই, শুধু মনগড়ারূপে উহাকে আঁকড়াইয়া ধরা যদিও সেই কার্য্য-বিধি ভাল কাজ সংশ্লিষ্ট হয় তবুও এরূপ করা দ্বীন-ইসলামের মূলে ভীষণ আঘাত হানার একটি চিরাচরিত সূত্র ও ছিদ্রপথ। এই সূত্র ও ছিদ্রপথেই পূর্বেকার নবীগণের শরীয়তের মধ্যে তাহ্‌রীফ বা পরিবর্তন ও বিকৃত করণ ঘটিয়াছিল। তাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শরীয়তের মধ্যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা হইয়াছে যে, কোন প্রকারে যেন ঐ সূত্র ও ছিদ্রপথের অবকাশ সৃষ্টি হইতে না পারে।

আলোচ্য পরিচ্ছেদের মছআলাহটি সেই বিশেষ দৃষ্টিরই একটি প্রতিক্রিয়া। শুক্রবার দিনটি দ্বীন-ইসলাম ও শরীয়তের মধ্যে ফজীলতের দিনরূপে ধার্য্য হইয়াছে এবং উহার মধ্যে এবাদৎ করায় বিশেষ ছওয়াব আছে। কিন্তু এই দিনের জন্য বিশেষ এবাদৎ যাহা শরীয়ত কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা হইল জুমার নামায। যেরূপ রমযান শরীফের জন্য বিশেষ এবাদৎ ফরজ রোযা ও তারাবীহ এবং আশুরা, আরাফার তারিখ, শাওয়াল মাসের ছয় দিন, প্রতি মাসের আইয়্যামে-বীজ ইত্যাদি অনেক অনেক দিনে নফল রোযা বিশেষ এবাদতরূপে প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু শুক্রবারের জন্য নফল রোযা শরীয়ত কর্তৃক বিশেষ এবাদতরূপে প্রবর্তিত হয় নাই। এমতাবস্থায় নফল রোযাকেও জুমার নামাযের ন্যায় শুক্রবার দিনের বিশেষ এবাদতরূপে গণ্য করা দ্বীন-ইসলাম ও শরীয়তকে বিকৃত করণের একটি পদক্ষেপ বৈ আর কি বলা যাইতে পারে? যদি কেহ ঐরূপ কোন ধারণা অন্তরে স্থান না দিয়া শুক্রবারের রোযা অবলম্বন করে তবুও তাহা নিষেধ করা হইবে। কারণ, আন্তরিক ধারণা দৃষ্টিগোচর হয় না, কার্য্যক্রমের প্রতিই বাহ্যিক দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া থাকে। তাই বিশেষরূপে শুক্রবার দিন রোযা রাখিলে ঐ ধারণারই সূত্রপাত হইবে এবং সাধারণ্যে তাহার কার্য্যের দ্বারা ঐ ধারণা বিস্তার লাভ করিবে। তদুপরি শয়তান তাহার

দ্বারা আরও নহু স্থানে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করাইবার ছিদ্রপথ পাইয়া বসিবে এবং ধাপে ধাপে দ্বীন ও শরীয়তকে বিকৃত করার সুযোগ করিয়া দিবে।

বলাবাহুল্য শরীয়ত ও দ্বীন-ইসলামের দৃষ্টিতে শুক্রবার দিনের বিশেষত্ব ও ফজীলত বিদ্যমান আছে। সেই বিশেষত্ব ও ফজীলতের ভিত্তিতেই উপরোল্লিখিত ধারণা বিস্তারের আশঙ্কা উজ্জ্বল ও প্রবল হইয়া উঠে। অন্যান্য দিনের যেহেতু সেই বিশেষত্ব ও ফজীলত নাই, তাই সে স্থলে ঐ ধারণা বিস্তারের আশঙ্কা অতি দুর্বল। যেরূপ কোন ব্যক্তির মধ্যে যোগ্যতা, বিশেষত্ব ও প্রাধান্য থাকিলেই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কার প্রতি দৃষ্টি ও লক্ষ্য করা হয়। আর যে ব্যক্তির মধ্যে সেই বিশেষত্ব নাই তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করা হয় না।

অবশ্য শুক্রবার দিন বিশেষ ফজীলতের দিন, ঐ দিন রোযা রাখার অভিলাষ জন্মিলে তাহা পূরণ করারও ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে যে, উহার পূর্বে বা পরে আরও এক দিনের রোযা সংযোগ করিবে, যাহাতে উল্লিখিত ধারণা জন্মিবার সূত্র নিপাত হইয়া যায়। আলোচ্য পরিচ্ছেদের হাদীছে ইহারই নির্দেশ রহিয়াছে।

কোন দিন ও বারকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করা

১০৩৫। হাদীছ :—আলকামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সপ্তাহের কোন দিন ও বারকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করিতেন কি? তিনি বলিলেন, না। হযরতের অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি স্বীয় (স্থিরকৃত) আমলের প্রতি পাবন্দী ও স্থিতিশীলতা অবলম্বন করিতেন। তাঁহার ন্যায় আমল করার সামর্থ কাহারও আছে কি?

ব্যাখ্যা :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সপ্তাহের কোন দিন ও বারকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করিতেন না, সাধারণতঃ তাঁহার অভ্যাস ইহাই ছিল। অবশ্য কোন কোন হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সপ্তাহের মধ্যে এই দুই দিন প্রত্যেকের আমল-নামা (ইল্লিয়ীনের—নেককারদের আমল-নামা রাখার স্থানের প্রতি) উঠানো হয়। আমি ভালবাসি যে, আমি রোযা অবস্থায় আমার আমল-নামা উঠানো হউক।

ইয়াওমে-আরাফা ৯ই জিলহজ্জের রোযা

১০৩৬। হাদীছ :—উম্মুল মোমেনীন মাইমুনাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায়হজ্জে) আরফার দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রোযা সম্পর্কে লোকদের দ্বিধাবোধ হইল। আমি দুধের পেয়ালা হযরতের নিকট পাঠাইয়া দিলাম; নবী (দঃ) তখন আরফার ময়দানের বিশেষ স্থানে অবস্থানরত ছিলেন। নবী (দঃ) ঐ দুগ্ধ প্রকাশ্যে পান করিলেন, উপস্থিত লোকগণ তাহা অবলোকন করিয়াছিল।

মছআলাহঃ—৯ই জিলহজ্জকে ইয়াওমে-আরফা বলা হয়, কারণ সেদিন হাজীগণ আরফার ময়দানে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই দিনের রোযা বিশেষ ফজিলত ও ছওয়াবের রোযা। কিন্তু হাজী—যাহারা আরফার ময়দানে উপস্থিত আছেন তাহাদের জন্য ঐ দিনের রোযা সুন্নত নহে।

মছআলাহঃ—আলোচ্য ফজীলতের রোযাটি বিশ্বের প্রত্যেক অঞ্চলে তথায় জিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা হিসাবে ৯ তারিখের জন্য সাব্যস্ত। মক্কা শরীফের ৯ তারিখ তথা প্রকৃত আরাফার দিনকে অন্য অঞ্চলে সাব্যস্ত করিলে তাহা ভুল হইবে। এবং ঐ হিসাবে অন্য অঞ্চলে চাঁদ দেখা অনুসারে ৯ তারিখ ভিন্ন অন্য তারিখে রোযা রাখিলে এই ফজীলত লাভ হইবে না।

ঈদের দিন রোযা রাখা

১০৩৭। হাদীছঃ—আবু ওবাইদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এক ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলাম। আমীরুল-মোমেনীন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুইটি দিনে রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন—রমযানের রোযার শেষে ঈদের দিন এবং কোরবানীর গোশত খাওয়ার ঈদের দিন।

১০৩৮। হাদীছঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই কার্য্যগুলি নিষেধ করিয়াছেন—রোযার ঈদের দিনে এবং কোরবানীর দিনে রোযা রাখা, চাদর এরূপে গায়ে দেওয়া যে, হাত বাহির করা কষ্ট সাধ্য হইয়া পড়ে, (লম্বা) জামার নীচে পায়জামা ইত্যাদি অন্য কোন কাপড় না থাকা অবস্থায় হাঁটু খাড়া করিয়া এইরূপে বসা যে, তলদেশ উন্মুক্ত থাকে। আর ফজর ও আছর নামায পড়ার পর (নফল) নামায পড়া।

১০৩৯। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পক্ষ হইতে) দুই প্রকার রোযা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে—রোযার ঈদের দিনের রোযা ও কোরবানীর ঈদের দিনের রোযা এবং দুই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হইয়াছে—ক্রেতা কর্তৃক ক্রয় বস্তু হাতে ছোয়াকে এবং বিক্রেতা কর্তৃক ক্রয় বস্তু ক্রেতার উপর নিক্ষেপ করাকে বাধ্যতামূলক ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করা।

অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের অধিকার খর্বকারক সূত্রে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ।

১০৪০। হাদীছঃ—যিয়াদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ-ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি

যদি কোন বিশেষ দিনের রোযা রাখার—যেরূপ নির্দিষ্ট সোমবার রোযা রাখার মান্নত করে এবং ঐ দিন ঈদের দিন হইয়া পড়ে তবে সে কি করিবে? ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন আল্লাহ তায়ালা মান্নত পূরণ করার আদেশ করিয়াছেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদের দিনে রোযা নিষেধ করিয়াছেন। (শরীয়তের উভয় আদেশ-নিষেধকেই রক্ষা করিতে হইবে।)

মছআলাহঃ—এইরূপ মান্নতের দ্বারা রোযা ওয়াজেব হইবে, কিন্তু ঈদের দিন রোযা রাখিবে না, ঈদের পর অন্য কোন দিন রোযা আদায় করিবে।

মছআলাহঃ—কোরবানীর ঈদের দিনের পরে ১১, ১২, ১৩ই জিলহজ্জ এই তিন দিন রোযা রাখায় মতভেদ আছে। হানফী মজহাব মতে এই তিন দিনেও রোযা নিষিদ্ধ। এই দিনে রোযার মানত অন্য দিনে আদায় করিতে হইবে।

আশুরার—মোহরমের দশ তারিখের রোযা

১০৪১। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আশুরার দিন বলিলেন, কেহ ইচ্ছা করিলে এই দিন রোযা রাখিতে পারে।

১০৪২। হাদীছঃ— عن حميد انه سمع معاوية يقول سمعت

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

صِيَامَهُ وَاَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ

অর্থ—মোয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—এই যে আশুরার দিন, এই দিনের রোযা তোমাদের উপর আল্লাহ তায়ালা ফরজ করেন নাই বটে, কিন্তু আমি এই দিন রোযা রাখিব। যাহার ইচ্ছা হয় সে এই রোযা রাখিতে পারে এবং কাহারও ইচ্ছা হইলে এই রোযা ছাড়িতেও পারে।

১০৪৩। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় আসিয়া ইহুদীগণকে আশুরার রোযা করিতে দেখিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এই রোযা কি উদ্দেশ্যে? তাহারা বলিল, এই দিনটি বিশেষ বরকতের দিন, এই দিন আল্লাহ তায়ালা বনী-ইস্রাইলকে তাহাদের শত্রু ফেরাউনের কবল হইতে মুক্তি দান করিয়াছিলেন। (আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করণার্থে এবং সেই মহান নেয়ামত স্মরণার্থে) মুছা আলাইহেচ্ছালাম এই দিন রোযা রাখিয়াছিলেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, মুছা আলাইহেচ্ছালামের সহযোগিতার জন্য আমরা অধিক আগ্রহশীল। এই বলিয়া নবী (দঃ) (পূর্বের ন্যায়) এই দিনের রোযা রাখিলেন এবং সকলকে রোযা রাখিতে আদেশও করিলেন।

১০৪৪। **হাদীছ ঃ—**আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহুদিরা আশুরার দিন ঈদের দিনের ন্যায় আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান করিত (এবং উহার সম্মানার্থে রোযা রাখিত)। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোসলমানগণকে আদেশ করিলেন, তোমারও এই দিনের রোযা রাখ।

১০৪৫। **হাদীছ ঃ—**ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আশুরার দিনে এবং রমজান মাসের রোযাকে যেরূপ অগ্রাধিকার ও ফজিলত দান করিয়া থাকিতেন, অন্য কোন দিনকে বা অন্য কোন মাসকে এরূপ ফজিলত দান করিতে আমি দেখি নাই।

১০৪৬। **হাদীছ ঃ—**ছালামা-ভুবনুল-আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 'আসলাম' গোত্রের এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন, লোকদের মধ্যে প্রচার করিয়া দাও, (অদ্যকার দিন আশুরার দিন নয় ধারণা করিয়া) যাহারা পানাহার করিয়াছে তাহারা দিনের বাকি অংশ রোযার ন্যায় অনাহারে কাটাইবে। যাহারা এখনও পানাহার করে নাই, তাহারা রোযা রাখিবে; অদ্যকার দিন আশুরার দিন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—রমজান মাসের রোযা ফরজ হওয়ার পূর্বে আশুরার দিনের রোযা এই উম্মতের জন্য নবী (দঃ) ফরজ রূপে আদেশ করিয়াছিলেন; এই তথ্য আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ৮২৯ নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছের নির্দেশটি ঐ সময়েরই। আশুরার রোযা ফরজ হওয়া রহিত হইয়া যাওয়ায় এই আদেশও রহিত হইয়া গিয়াছে।

পাঠকবর্গ! আশুরার দিন মোহাররম চাঁদের দশ তারিখ, তাই কেহ ধারণা করিতে পারে যে, ইমাম হোসাইন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাহাদতের হৃদয় বিদারক ঘটনার সঙ্গে আশুরার রোযার কোন সম্পর্ক রহিয়াছে। এরূপ ধারণা ভিত্তিহীন ও অজ্ঞতা-প্রসুত। কারণ, ঐ ঘটনা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার বহু পরে ঘটিয়াছে, অথচ এই আশুরার রোযা নবী (দঃ) স্বয়ং রাখিয়াছেন এবং ইসলামের প্রথম যুগ হইতেই মোসলমানগণকে এই রোযা রাখার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন, বরং তাঁহারও বহু পূর্বে মুছা আলাইহেচ্ছালাম কর্তৃক এই রোযা রাখাও প্রমাণিত হইয়াছে, বরং ইহারও বহু পূর্বে নুহ (আঃ) ও এই দিনের রোযা রাখিয়াছিলেন। কারণ, মহাতুফান ও প্লাবন হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার তরী এই দিনই 'জুদী' পর্বতের উপর দাঁড়াইয়াছিল।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু

● রমযান আরম্ভের চাঁদ এবং রমযান শেষ হওয়ার চাঁদ দেখায় তৎপর হইবে (২৫৫ পৃঃ)। ইসলামের বিশেষ ফরজ—রোযা ইহার উপর নির্ভরশীল।

● রমযান শরীফের রোযা শুধু কেবল গতানুগতিক ভাবে রাখিবে না, বরং আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ঈমানের তাগিদে আল্লার আদেশের আনুগত্য এবং আল্লাহ ও রসুলের বর্ণিত ছওয়াব লাভের প্রেরণা এবং ফরজ আদায়ের নিয়্যতকে অন্তরে উপস্থিত রাখিয়া প্রতিটি রোযা আরম্ভ করিবে। (২৫৫ পৃঃ)

● নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমযান মাসে (রূহানী ও বাহ্যিক উভয় প্রকার দানে) অধিক দানশীল হইতেন (২৫৫ পৃঃ)। অতএব রমযান মাসে বাহ্যিক দান-খয়রাতে এবং আল্লার বন্দাদের মধ্যে দ্বীন বিতরণে অধিক তৎপর হওয়া সুন্নত।

● ঝগড়া প্রতিরোধ এবং গালিগালাজ বারণ করার জন্য এরূপ বলা যে, আমি রোযা আছি—দোষনীয় নহে। (২৫৫)

● পানি বা সহজসাধ্য যে কোন বস্তু দ্বারাই ইফতার করা যায়। (২৬৩ পৃঃ) এমনকি অগ্নিস্পর্শে তৈরী বস্তু দ্বারাও ইফতার করা যায়। (১০০৩ নং হাদীছের ঘটনায় রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাতুর সরবৎ দ্বারা ইফতার করিয়াছিলেন।) জব ইত্যাদির ছাতু তৈরী করিতে প্রথমে উহাকে আগুনে ভাজা করিতে হয়। অগ্নিস্পর্শ বিহীন বস্তু শুধু পানি হইলেও উহা দ্বারাই ইফতার করা উত্তম।

● নফল রোযা রাখিতে মেহমানের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, দেহের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পরিজনের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সর্বদা রোযা রাখা নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয়। নফল রোযার আধিক্যের সর্বশেষ সীমা হইল—একদিন অন্তর অন্তর রোযা রাখা; দাউদ আলাইহেচ্ছালামের নফল রোযার রীতি ইহাই ছিল (২৬৫ পৃঃ)। এই বিষয় কয়টি একই হাদীছে প্রমাণ করা হইয়াছে; হাদীছটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। নফল নামায-রোযা ও কোরআন শরীফ তেলাওয়াত সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে নীতি নির্ধারনী পরামর্শও উক্ত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীছটির বিস্তারিত ও সুদীর্ঘ অনুবাদ ১০২৯ নম্বরে হইয়াছে।

তারাবীর নামায

১০৪৭। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রাত্রে উহার বিশেষ নামায (অর্থাৎ তারাবীর নামায—এই অর্থ সমস্ত ইমামগণের সিদ্ধান্ত। বোখারী শরীফের শরাহ আইনী ও মোসলেম শরীফের শরাহ নববী দ্রষ্টব্য।) ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া আদায় করিবে তাহার পূর্ববর্তী সব গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মোহাদ্দেছ ইবনে শেহাব যোহরী (রঃ) উক্ত হাদীছ উল্লেখ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে তারাবীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়া এবং উহার ফজিলত বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত করা হইয়াছে, উহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

গ্রহণ করা হইত না। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ কালেও তারাবীর নামাযের অবস্থা ঐরূপই ছিল। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতের প্রথম দিকেও ঐ অবস্থাই ছিল। (কারণ তখন লোকগণ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই অধিক বন্দেগী করিত।)

একদা ওমর (রা:) রমযান শরীফের রাত্রে মসজিদে আসিলেন এবং দেখিতে পাইলেন লোকগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তারাবীর নামায পড়িতেছেন—কেহ কেহ একাকী পড়িতেছেন, কাহারও সঙ্গে কিছু সংখ্যক লোক জমাআত করিয়া পড়িতেছেন। এতদৃষ্টে ওমর (রা:) এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, সকলকে সমবেতভাবে এক ইমামের পেছনে নামায পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং ইহা উত্তম হইবে। অতঃপর সেই ইচ্ছাকে তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রয়োগ করিলেন—সকলকে প্রধানতম কারী উবায়ী-ইবনে-কায়াব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত সমবেতভাবে নামায পড়ার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অতঃপর আর একদিন তিনি মসজিদে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, সকলে সমবেতভাবে এক ইমামের সঙ্গে তারাবীহ পড়িতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, যদিও ইহা একটি নূতন ব্যবস্থা কিন্তু অতি উত্তম ব্যবস্থা।

অতঃপর তিনি বলিলেন, (যদিও ইহা উত্তম, কিন্তু) রাত্রের প্রথম ভাগের নামায হইতে শেষ ভাগের নামায উত্তম।

(ওমর (রা:) রাত্রির শেষ ভাগে তাহাজ্জুদের সময় তারাবীর নামায পড়াকে অগ্রাধিকার দান করিতেন এবং তিনি নিজে তাহাই করিতেন।) সাধারণতঃ অন্য সকলে তারাবীর নামায রাত্রের প্রথম ভাগে পড়িয়া থাকিতেন।

১০৪৮। **হাদীছ:**—আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা রমযানের মধ্যে গভীর রাত্রে বাহির হইয়া মসজিদে গেলেন এবং নামায পড়িতে লাগিলেন; কতেক লোক তাঁহার সঙ্গে নামাযে শরীক হইল। ভোর হইলে পর সকলের মধ্যেই এই বিষয় চর্চা হইল, তাই দ্বিতীয় দিন আরও অধিক লোকের সমাবেশ হইল এবং তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িল। ঐ দিন ভোরে আরও অধিক চর্চা হইল এবং তৃতীয় রাত্রে আরও অধিক লোক সমবেত হইল; ঐ দিনও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদে আসিয়া নামায পড়িলেন এবং উপস্থিত সকলেই তাঁহার সহিত একত্রে জমায়াতে নামায পড়িল। চতুর্থ রাত্রিতে লোকের সমাগম এত অধিক হইল যে, মসজিদের মধ্যে সঙ্কুলান সম্ভব হইল না; (কিন্তু ঐ দিন রসুলুল্লাহ (দঃ) সেই নামাযের জন্য মসজিদে আসিলেন না।) যখন ফজর নামাযের সময় উপস্থিত হইল তখন হযরত (দঃ) মসজিদে আসিলেন, ফজরের নামাযান্তে সকলকে সম্বোধন করিয়া খোৎবা পাঠে ভাষণ দান করিলেন এবং বলিলেন—তোমাদের উপস্থিতি আমার অজ্ঞাত রহে নাই। কিন্তু আমি আশঙ্কা করিতেছিলাম যে, (এই বিশেষ নামাযটির

প্রতি এত অধিক আগ্রহ দৃষ্টে) উহা তোমাদের উপর ফরজ করিয়া দেওয়া হইতে পারে। সে অবস্থায় (ফরজ নামাযের প্রতি প্রযোজ্য আবশ্যকীয় বিষয় সমূহ, যেমন—সর্বদা পাবন্দীর সহিত আদায় করা, সুখে-দুঃখে, রোগে-শোকে কখনও অবহেলার অবকাশ না থাকা; সর্বদা উহার প্রতি পূর্ণ তৎপরতা অবলম্বন করা ইত্যাদি এই সুদীর্ঘ নামাযের ক্ষেত্রে বজায় রাখিয়া চলিতে) তোমরা অক্ষম হইয়া পড়িবে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহজীবন পর্য্যন্ত (রমযানের বিশেষ নামায তারাবীর) অবস্থা এইরূপই রহিল (যে, উহার বাধ্যবাধকতার প্রতি তৎপরতা অবলম্বিত হয় নাই)।

ব্যাখ্যা :—উল্লিখিত দুইটি হাদীছের দ্বারা তারাবীর নামাযের ইতিবৃত্ত প্রকাশ পাইল যে—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই নামাযের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। উহার অনেক অনেক ফজিলত বর্ণনা করিয়াছেন, স্বয়ং উহা পড়িয়াছেন, অন্য লোকদিগকে তাঁহার সহিত জমায়াতরূপে শরীফ হওয়া সমর্থন করিয়াছেন। অবশ্য উহার প্রতি পূর্ণ তৎপরতা সর্বদা চালাইয়া যান নাই বটে, তাহা বিশেষ কারণাধীন ছিল। কারণটি উপরোল্লিখিত হাদীছে ব্যক্ত হইয়াছে যে, এই নামাযের প্রতি পূর্ণ তৎপরতা প্রদর্শনে আশঙ্কা আছে উহা ফরজ করিয়া দেওয়ার। সেই কারণ তিনি সর্ব সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এবং ইহাও অতি সুস্পষ্ট যে, সেই কারণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবন-কাল পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহার পরে সেই কারণের আদৌ কোন সম্ভাবনা নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণের পর অহী চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়, নূতনভাবে কোন বিষয় ফরজ হওয়ার অবকাশ নাই। ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফতের প্রথম অংশে প্রথম খলীফা আবু বকর (রাঃ)-এর ন্যায় বিভিন্ন বড় বড় সমস্যায় পতিত ছিলেন। উহা অতিক্রমে শান্তি ও শৃঙ্খলার সুযোগ পাইয়া যখন তিনি কতিপয় মছআলাহ ও বিষয়ে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন, তখন এই তারাবীর প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক বর্ণিত আশঙ্কা দূরীভূত হওয়া দৃষ্টে তারাবীর জন্য ইমাম নির্দিষ্ট করিলেন, রাকাত সংখ্যা ২০ সাব্যস্ত করিলেন এবং জমায়াতের ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে তারাবীর প্রতি পূর্ণ তৎপরতা প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তৎকালীন সোনালী যুগে বিদ্যমান হাজার হাজার ছাহাবীগণও আমীরুল-মোমেনীন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই ব্যবস্থা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করিলেন। ছাহাবীগণের এজমার দ্বারা এই বিষয়টি সাব্যস্ত হইয়া গেল।

তারাবীর নামাযের রাকাত-সংখ্যা :

ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফী, ইমাম আহমদ প্রমুখগণ এক বাক্যে তারাবীর নামায ২০ রাকাত বলিয়াছেন। ইমাম মালেক হইতে ২০ এবং ৩৬ উভয় সংখ্যাই বর্ণিত আছে, অনেকে ২০ রাকাতের বর্ণনাকে অগ্রগণ্য বলিয়াছেন। সেমতে তারাবীর নামায ২০ রাকাত হওয়াকে এজমা বলা হয়। (আওজাযুল-মাছালেক দ্রষ্টব্য)।

কলুষমুক্ত বিবেকে চিন্তা করিয়া বলুন—মদীনার ইমাম মালেক, মক্কার ইমাম শাফী, দশ লক্ষ হাদীছের হাফেজ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সহ ইমাম আবু হানীফা—সকলের একই সিদ্ধান্ত যে, তারাবীর নামায ২০ রাকাত হইতে কম নহে—এই সিদ্ধান্ত কিরূপ শক্তিশালী এবং বিশ্ব-বরণ্য ইমামগণের ঐক্যমত পূর্ণ; এইরূপ সিদ্ধান্তের মূল্য কি হইতে পারে তাহা বিবেকের নিকটই জিজ্ঞাসা করুন।

এতদ্ভিন্ন বিশিষ্ট তাবেয়ী মোহাদ্দেছ আ'তা (রঃ) যাহার মৃত্যু ৮০ বৎসর বয়সে; নবীজীর মাত্র ১০৫ বৎসর পরে। ছাহাবীগণের যুগের এই মহাদ্দেছ তাঁহার দীর্ঘ ৮০ বৎসরের পূর্ণ জীবনে তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত বস্তুরূপে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—আমি সকল লোকদেরকেই দেখিয়াছি, তাঁহারা (জমাতের সহিত) বেতেরের সঙ্গে (তারাবীর নামায) ২০ রাকাতই পড়িতেন (ইবনে-আবী শায়বা)।

এই মহাত্মন মোহাদ্দেছ দীর্ঘ জীবনে যাহাদিগকে দেখিয়াছেন—তাঁহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী বা তাঁহাদেরই শাগির্দান—তাবেয়ী ছিলেন।

সুধী পাঠক! এক শ্রেণীর লোক হাদীছের নাম লইয়া আস্ফালন দেখায়। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন—হাদীছ নিঃসন্দেহে সকলের উর্দ্ধে; সেই জন্য এক শ্রেণীর সাধারণ মানুষ হাদীছের যে অর্থ বুঝিবে এবং সাব্যস্ত করিবে তাহাও কি বিশ্ব-বরণীয় ইমামগণের এবং ছাহাবী ও তাবেয়ী—তথা নবীজি হইতে শিক্ষা গ্রহণকারী এবং তাঁহার নিকটতম যুগের জ্ঞানীগণের বুঝ ও সাব্যস্তের উর্দ্ধে হইবে? আর যদি তাহারা পূর্ববর্তী কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুসরণের দাবী করে তবে বিশ্ব-বরণীয় ইমামগণের অনুসরণ ত্যাগ করিয়া, বরং তাঁহাদের কুৎসা গাহিয়া এমন লোকদের অনুসরণ করা বোকামী নয় কি যাহারা আমাদের তুলনায় লক্ষ-কোটি গুণ উর্দ্ধের হইলেও ঐ বিশ্ব-বরণীয় ইমাম ও আলেমগণ অপেক্ষা হাজার গুণ নিম্নে?

এতদ্ভিন্ন পূর্ববর্তী ইমাম ও আলেমগণের অধিকাংশই তারাবীর নামায ২০ রাকাত বলিয়া গিয়াছেন। এই সত্য শুধু আমাদের কথা নহে, ছেহাহ্-ছেত্তা তথা হাদীছের সর্বশ্রেষ্ঠ ছয় কেতাবের এক কেতাব তিরমিযী শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

واكثر اهل العلم على ما روى عن على وعمر وغيرهما من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وقال الشافعى وهكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة

ইমাম তিরমিযী (রঃ) তারাবীর রাকাত-সংখ্যায় মতভেদ ব্যক্ত করিতে যাইয়া বলেন—"আলী (রাঃ), ওমর (রাঃ) এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্যান্য ছাহাবীগণ হইতে প্রাপ্ত বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া অধিকাংশ আলেমগণ ২০ রাকাতের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। ছুফিয়ানে ছৌরী, ইবনুল মোবারক এবং ইমাম শাফীর সিদ্ধান্তও

ইহাই। ইমাম শাফী আরও বলিয়াছেন যে, আমি আমাদের দেশ মক্কা এলাকায় ইহাই পাইয়াছি যে, লোকগণ তারাবীর নামায ২০ রাকাতই পড়েন।

এতদ্ভিন্ন তারাবী ২০ রাকাত হওয়ার পক্ষে হাদীছের প্রমাণও যথেষ্ট রহিয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে, হাদীছের বিধান-শাস্ত্রের ধারা আছে যে, সীমা বা সংখ্যা নির্ণয়ে কোন ছাহাবীর কার্য্যে বা কথায় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নাম উল্লেখ না থাকিলেও উহাকে নবী করীমের শিক্ষা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

তারাবী ২০ রাকাত হওয়ার পক্ষে সাতটি হাদীছ প্রমাণরূপে বিদ্যমান আছে। একটি হাদীছ স্পষ্টতঃ স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমল ও ক্রিয়ারূপে বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) রমযান মাসে ২০ রাকাত তারাবী এবং বেতের পড়িতেন।

আর তিনটি হাদীছ খলীফা ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি তারাবীর সুব্যবস্থা করার সাথে উহা ২০ রাকাত পড়ারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

একটি হাদীছ আলী (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রমযান মাসে কোরআন বিশেষজ্ঞগণকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে নির্দ্ধারিত করিলেন ২০ রাকাত তারাবী পড়াইবার জন্য।

একটি হাদীছ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রমযান মাসে ২০ রাকাত তারাবী এবং তিন রাকাত বেতের পড়িতেন।

একটি হাদীছ উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি মদীনা শরীফে রমযান মাসে ২০ রাকাত নামায পড়ার ইমামতী করিতেন।

এই সমস্ত হাদীছ অনেক অনেক হাদীছের কেতাবে বর্ণিত রহিয়াছে। এই হাদীছ সমুহ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীগণও স্বীকার করে যে, ইহার কোনটিই জাল বা মিথ্যা নহে। অবশ্য তাহারা হইাতে দুই রকম দোষ বাহির করিয়া থাকে। কোনটি সম্পর্কে ত শুধু এতটুকু দোষ যে, উহার ছনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আছে। অর্থাৎ পরম্পরা রাবী বা বর্ণনাকারীগণের মধ্যে এরূপ আছে যে, এক রাবী অপর রাবী হইতে সরাসরি শোনেন নাই—কোন মাধ্যমে শুনিয়াছেন।

বিরুদ্ধবাদীদের জানা উচিৎ, ঐ রাবীদ্বয় উভয়ে পূর্ণ বিশ্বস্ত হইলে হাদীছ-পরীক্ষা শাস্ত্রের বিধান মতে ঐ হাদীছ গ্রহণীয় বটে। এবং আলোচ্য হাদীছ সমুহের ঐ অবস্থা ক্ষেত্রে উভয় রাবী পূর্ণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হওয়া প্রমাণিত রহিয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকার দোষ এই বাহির করে যে, কোন কোন হাদীছের ছনদে কোন রাবী বা বর্ণনাকারী দুর্বল আছে।

এই সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের জানা উচিৎ—হাদীছ পরীক্ষা-শাস্ত্রের বিধান রহিয়াছে যে, দুর্বল রাবী সম্বলিত কতিপয় হাদীছ একত্রিত ও এক মর্মে বর্ণিত হইলে তাহা গ্রহণীয় হইবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে সাতটি হাদীছ একত্রিত—একই মর্মে তথা তারাবী ২০ রাকাত হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে; ইহা অবশ্যই গৃহীত হইবে।

উক্ত সত্যকে এড়াইবার জন্য বিরুদ্ধবাদীরা বলিয়া থাকে যে, তাহাদের নিকট ৮ রাকাত তারাবীর পক্ষে দোষ-ত্রুটি বিহীন একটি হাদীছ রহিয়াছে। হাদীছখানা বোখারী শরীফেই আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে—প্রথম খণ্ডে ৬০৮ নম্বরে অনূদিত। উক্ত হাদীছকে ৮ রাকাতওয়ালারা জঘন্য রকমের কারচুপির সহিত ছাটকাট করিয়া এইরূপে প্রকাশ করে যে, আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল—নবী (দঃ) রমযানের রাত্রে কিরূপ নামায পড়িতেন ? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, এগার রাকাতের বেশী পড়িতেন না।” বিরুদ্ধবাদীরা বুঝাইতে চাহে যে, এই এগার রাকাতে বেতের তিন রাকাত আর তারাবী আট রাকাত।

বিরুদ্ধবাদীদের ভয় করা উচিৎ; উক্ত হাদীছে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার উত্তরটা পূর্ণ আকারে প্রকাশ করা হইলে তাহাদের ধাঁধা ও কারচুপি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে এবং ধামাচাপার আবরণ খুলিয়া যাইবে। পূর্ণ উত্তর ছিল এই—

ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة

“আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, নবী (দঃ) রমযানে এবং গায়রে-রমযানে তথা রমযান ছাড়া অন্য সময়েও এগার রাকাতের বেশী পড়িতেন না।”

লক্ষ্য করুন! আয়েশা (রাঃ) স্বীয় উক্তিতে গায়রে-রমযান—রমযান ছাড়া অন্য সময়ের রাত্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং অনিবার্য্যতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য এমন নামায সম্পর্কে এগার রাকাত বলা যাহা রমযান এবং রমযান ছাড়া অন্য সময়ও পড়া হইয়া থাকে। তারাবী কি রমযান ছাড়া অন্য সময় পড়া হয় ? অতএব এই হাদীছের উদ্দেশ্য তারাবীর নামায হইতে পারেই না। ইহার উদ্দেশ্য রাত্রের ঐ নামায যাহা রমযান ছাড়াও পড়া হয়—তাহা হইল তাহাজ্জুদ-নামায। আয়েশা (রাঃ)কে রাত্রের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। সাধারণতঃ তাহাজ্জুদকেই রাত্রের নামায বলা হয়, তাই আয়েশা (রাঃ) উত্তর দিয়াছেন, নবী (দঃ) তাহাজ্জুদ-নামায রমযানে ও গায়রে-রমযানে একই রকম—বেতের সহ এগার রাকাত পড়িতেন। তাহাজ্জুদ-নামাযের পরিমাণ তিনি রমযানে বেশী করিতেন না। আলোচ্য হাদীছের এই তাৎপর্য্যই ইমাম বোখারী (রঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি তাহাজ্জুদ অধ্যায়ে ১৫৪ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদ দিয়াছেন—“রমযানে ও গায়রে-রমযানে নবীজির তাহাজ্জুদ” উক্ত পরিচ্ছেদে তিনি এই হাদীছখানাই উল্লেখ করিয়াছেন।

খাছ তাহাজ্জুদ ভিন্ন রমযানের রাত্রে সর্বমোট নামায এগার রাকাতে সীমাবদ্ধ হওয়া—ইহা ত আয়েশা (রাঃ) বলিতেই পারেন না। কারণ, স্বয়ং আয়েশা (রাঃ) রমযান মাসে নবীজির অভ্যাস সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন—'রমযান আসিলেই আল্লার দরবারে দোয়া ও কান্নাকাটায় নবীজির চেহারার রং পরিবর্তিত হইয়া যাইত এবং তাঁহার নামাযের পরিমাণ অনেক বেশী হইয়া যাইত (বায়হাকী)।

আর তাহাজ্জুদ ও তারাবী উভয় নামাযকে যে, বিরুদ্ধবাদীরা একই নামায বলে ইহা ত নিতান্তই অবান্তর। বোখারী (রাঃ)ও নামায-অধ্যায়ে তাহাজ্জুদের বয়ান রাখিয়াছেন; আর তারাবীর জন্য রোযা-অধ্যায়ে ভিন্ন বয়ান রাখিয়াছেন। এমনকি মিশরীয় ছাপার বোখারী শরীফে তারাবী-নামাযের শিরোনামা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আকারে রহিয়াছে। বলা হইয়াছে, "তারাবীর নামাযের অধ্যায়"। তারাবীর নামাযকে পরিচ্ছেদ আকারে বর্ণনা করা হয় নাই।

এই সুদীর্ঘ আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল যে, আলোচ্য হাদীছখানা ছহীহ্ বটে, কিন্তু তারাবীর নামাযের সঙ্গে দূরের কোন সম্পর্কও ইহার নাই।

আট রাকাতওয়ালাগণ অন্য দুইটি হাদীছও পেশ করিয়া থাকে। একটি ওমর (রাঃ) সম্পর্কে যে, তিনি বেতের সহ এগার রাক.ত পড়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

পাঠকবর্গ! স্মরণ রাখিবেন—তারাবীর রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে ওমর (রাঃ) হইতে তিন জনের বর্ণনা হাদীছের কেতাবে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দুই জন ২০ রাকাত বলিয়াছেন; আর একজন দুই রকম বলিয়াছেন—২০ রাকাত এবং ৮ রাকাত।

এমতাবস্থায় এই বর্ণনাকারীর ৮ রাকাত বর্ণনার উপর নির্ভর করা যায় কি?

আর একখানা হাদীছ নবী (দঃ) সম্পর্কে জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ হাদীছ খানার ছনদ দোষী এবং নিতান্তই দুর্বল—ইহা যথাস্থানে প্রমাণিত আছে। অথচ ইহার সমর্থনে আর কোন হাদীছ নাই; অতএব এই দুর্বল ছনদের হাদীছটি গ্রহণযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে ২০ রাকাত সম্পর্কে সাত খানা হাদীছ রহিয়াছে।

লাইলাতুল-ক্বদরের ফজিলত

আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়ে একটি বিশেষ ছুরা নাযেল করিয়াছেন—

إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ

مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ.

سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

অর্থ—তোমরা জানিয়া রাখিও, আমি এই পবিত্র কোরআনকে ক্বদরের রাত্রে নাযেল করিয়াছি; লাইলাতুল-ক্বদর কিরূপ ফজিলতের রাত্র তাহা জান কি? লাইলাতুল-ক্বদর হাজার মাস অপেক্ষা অধিক উত্তম। সেই রাত্রে ফেরেশতাগণ এবং জিব্রাইল (আঃ) আল্লার আদেশানুক্রমে (দুনিয়ার বুকে) অবতরণ করিয়া থাকেন—সমস্ত কমের মঙ্গল ও কল্যাণ লইয়া। সেই রাত্রটি প্রভাত পর্য্যন্ত শান্তিই শান্তি।

লাইলাতুল-ক্বদরের সম্ভাব্য সময়

১০৪৯। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় ছাহাবী স্বপ্নে লাইলাতুল-ক্বদরকে রমযানের শেষ সাত দিনের মধ্যে দেখিয়াছেন বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের স্বপ্ন (বিভিন্ন রকম হইলেও) এই বিষয়ে এক দেখিতেছি যে, লাইলাতুল-কদর রমযানের শেষ সাত দিনে অবস্থিত। সেমতে উহার অভিলাষী ব্যক্তি যেন উহাকে রমযানের শেষ সাত দিনের মধ্যে পাইবার চেষ্টা করে।

১০৫০। হাদীছ:— عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ٥

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমরা লাইলাতুল ক্বদরকে রমযানের শেষ দশ দিনের বে-জোড় রাত্র সমূহে তালাশ কর।

১০৫১। হাদীছ:—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করিতেন এবং বলিতেন, তোমরা লাইলাতুল-ক্বদরকে রমযানের শেষ দশ দিনে তালাশ কর।

১০৫২। হাদীছ:— عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ الْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى تَاسِعَةٍ تَبْقٰى

فِى سَابِعَةٍ تَبْقٰى فِى خَامِسَةٍ تَبْقٰى ٥

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা লাইলাতুল ক্বদরকে রমযানের শেষ দশ দিনে তালাশ কর—একুশ তারিখে, তেইশ তারিখে এবং পঁচিশ তারিখে।

ব্যাখ্যা:—লাইলাতুল-ক্বদরকে তালাশ করার অর্থ উহার সম্ভাব্য তারিখ সমূহে বিশেষরূপে এবাদত-বন্দেগীর প্রতি তৎপর হওয়া এবং যথাসাধ্য এবাদত-বন্দেগী করতঃ রাত্রি যাপন

করা। উহার বিশেষ সম্ভাব্য সময় রমযান মাসের কুড়ি তারিখের পর হইতে মাসের শেষ পর্য্যন্ত; তন্মধ্যে ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখগুলি অন্যতম। বিভিন্ন হাদীছ সূত্রে এতদূরই প্রমাণিত হয়। লাইলাতুল-কদরের উদ্দেশ্যেই রমযানের শেষ দিনগুলির এ'তেকাফ করা হইয়া থাকে।

রমযানের শেষ দশ দিনে এবাদতে বিশেষ তৎপরতা

১০৫৩। হাদীছ:— عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَاَحْيَا لَيْلَهُ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ ○

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রমযানের শেষ দশ দিন আরম্ভ হইলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অধিক এবাদত-বন্দেগীর জন্য তৎপরতা অবলম্বন করিতেন এবং এবাদত বন্দেগীতে রাত্র যাপন করিতেন, পরিবারবর্গকেও তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ (করতঃ এবাদত-বন্দেগীর প্রতি ধাবিত) করিতেন।

এ'তেকাফের বয়ান

১০৫৪। হাদীছ:—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করিতেন।

১০৫৫। হাদীছ:—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় জীবনে প্রতি বৎসর রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করিতেন। তাঁহার ওফাতের পর তাঁহার স্ত্রীগণও ঐরূপ এ'তেকাফ করিয়াছেন।

এ'তেকাফ অবস্থায় বাড়ী আসিবে না

১০৫৬। হাদীছ:—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদে এ'তেকাফরত অবস্থায় স্বীয় মাথা আমার প্রতি ঝুকাইয়া দিতেন; আমি তাঁহার মাথা আচড়াইয়া দিতাম, অথচ আমি তখন ঋতু অবস্থায় থাকিতাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) (মল-মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি) মানবীয় আবশ্যক ব্যতীত এ'তেকাফ অবস্থায় মসজিদ হইতে বাড়ী আসিতেন না।

রাত্রে এ'তেকাফের মান্নত মানিলে?

১০৫৭। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট প্রকাশ করিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে

এই মান্নত করিয়াছিলাম যে, আমি হরম শরীফের মসজিদে (একদিন) এক রাত্র এ'তেকাফ করিব। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম তাঁহার মান্নত পূর্ণ করার পরামর্শ দিলেন।

মছআলাহ্ঃ—হানফী মজহাব মতে শুধু এক রাত্রি এ'তেকাফ করার মান্নত করিলে সেই মান্নত ওয়াজেব হয় না। অবশ্য নফলরূপে তাহা করিয়া নেওয়া উত্তম। কিন্তু একাধিক রাত্রের সংখ্যা উল্লেখ করিয়া—যেমন দুই, তিন বা চার রাত্রের এতেকাফ করার মান্নত করিলে উক্ত রাত্র সমুহ উহার দিন সহ এবং রোযার সঙ্গে এ'তেকাফ করা ওয়াজেব হইবে; রাত্র আগে দিন পরে হিসাব ধরিতে হইবে (ফতওয়া কাজিখান)। অবশ্য যদি মান্নতে স্পষ্টরূপে নিয়্যত থাকে যে, দিন নয়—শুধু রাত্রেই এ'তেকাফ করিব তবে সেই মান্নত ওয়াজেব হইবে না। কিন্তু যদি এক বা ততোধিক দিনের এ'তেকাফের মান্নত করে এবং স্পষ্টরূপে নিয়্যত করে যে, শুধু দিনেই এ'তেকাফ করিব রাত্রে নয়, তবে সেক্ষেত্রে মান্নত ওয়াজেব হইবে এবং রোযার সহিত শুধু দিনে এ'তেকাফ করিতে হইবে। ঐরূপ স্পষ্ট নিয়্যত না করিলে দিনের সহিত ঐ সংখ্যক রাত্রেরও এ'তেকাফ করিতে হইবে এবং রাত্র দিনের পূর্বে ধরিতে হইবে। (ফতওয়া আলমগিরী)

এ'তেকাফ করিতে মসজিদে জায়গা ঘেরাও করা

১০৫৮। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করিতেন এবং আমি তাঁহার জন্য মসজিদে তাবুর ন্যায় করিয়া একটু স্থানকে ঘেরাও করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতাম। তিনি ফজর নামাযান্তে সেই ঘেরাও-এর ভিতর প্রবেশ করিতেন (এবং তথায় এবাদত বন্দেগী করিতেন।) একবার আয়েশা (রাঃ) স্বয়ং নিজেও এ'তেকাফ করার জন্য ঐরূপ ঘেরাও তৈরীর অনুমতি চাহিলেন; নবী (দঃ) তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর হাফছা রাজিয়াল্লাহু আনহাও ঐরূপ ঘেরাও তৈরীর অনুমতি চাহিলেন, আয়েশা (রাঃ) তাহার জন্য অনুমতি আনিয়া দিলেন, তিনিও তৃতীয় আর একটি ঘেরাও তৈয়ার করিলেন। জয়নাব (রাঃ) উহা দেখিতে পাইয়া তিনি চতুর্থ আর একটি ঘেরাও তৈয়ার করিলেন। ভোরবেলা নবী (দঃ) মসজিদের মধ্যে চারটি ঘেরাও দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এসব কি? তখন পূর্ণ ঘটনা তাঁহাকে অবগত করান হইল। হযরত (দঃ) (ঘেরাও সমূহের দ্বারা মসজিদ পরিপূর্ণ হইয়া নামাযীদের অসুবিধা সৃষ্টির আশঙ্কা পূর্বক স্বীয় ঘেরাও ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং) বলিলেন—(মসজিদে নামাযীদের অসুবিধা করিয়া) তাহারা নেকী হাসিল করিতে চায়? এই বলিয়া এ'তেকাফ ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি পরবর্ত্তী শাওয়াল মাসে পুনঃ দশ দিনের এ'তেকাফ করিলেন।

এ'তেকাফরত স্বামীর সহিত স্ত্রীর সাক্ষাৎ

১০৫৯। **হাদীছঃ**—উম্মুল-মোমেনীন ছফিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে মসজিদে উপস্থিত হইলেন; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তখন রমজানের শেষ দশ দিনে মসজিদের মধ্যে এ'তেকাফরত ছিলেন। উভয়ে কিছু সময় কথাবার্তা বলার পর ছফিয়া (রাঃ) ঘরে ফিরার জন্য দাঁড়াইলেন; সঙ্গে সঙ্গে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও দাঁড়াইলেন এবং ছফিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সঙ্গে মসজিদের দরওয়াযা পর্যন্ত আসিলেন। তথায় নিকটস্থ পথে দুইজন মদীনাবাসী ছাহাবী কোথাও যাইতেছিলেন; তাঁহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সালাম করিলেন (এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে থাকা অবস্থায় তাঁহারা সম্মুখে পড়িয়া যাওয়ায় লজ্জাবোধে দূরে সরিয়া পড়ার জন্য দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন।) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইও না (দাঁড়াও এবং এখানে আস)। আমার সঙ্গস্থ মহিলাটি আমারই স্ত্রী—ছফিয়া। (ছাহাবীদ্বয় অনুভব করিতে পারিলেন যে, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে একজন নারীর সঙ্গে দেখিয়া শয়তানের ধোকায় ও কারসাজিতে কোন কুধারণার বশীভূত হইয়া স্বীয় দীন-ঈমান বরবাদ করিয়া বসি না-কি—এই আশঙ্কায় রসুলুল্লাহ (দঃ) এই উক্তি করিয়াছেন। তাই) তাঁহারা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, ছোবহানাল্লাহ·· ইয়া রসুলাল্লাহ! (আমরা আপনার প্রতি কোন কুধারণার বশীভূত হইতে পারি কি?) রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাঁহাদের জন্য পাহাড়তুল্য মনে হইল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, উপস্থিত তোমাদের অন্তরে কোন কু-ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে সেই ধারণা নয়, কিন্তু জানিয়া রাখিও, শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় চলিতে সক্ষম। (তাই আশঙ্কা আছে যে, শয়তান তোমাদের অন্তরে কোন কু-ধারণা সৃষ্টি করে না-কি—উহারই পথ বন্ধ করিয়া দিলাম।)

রমযানের কুড়ি দিন এ'তেকাফ করা

১০৬০। **হাদীছঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) সাধারণতঃ প্রতি রমযানে দশ দিন এ'তেকাফ করিতেন। কিন্তু যেই বৎসর তিনি ইহকাল ত্যাগ করিবেন, সেই বৎসর তিনি কুড়ি দিন এ'তেকাফ করিয়াছিলেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

- ঋতুবতী স্ত্রী এ'তেকাফরত স্বামীর খেদমতে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে।
- এ'তেকাফ অবস্থায় শরীর বা অঙ্গ ধৌত করা যায় (২৭২ পৃঃ)। কিন্তু উহার জন্য কিম্বা সাধারণ গোসল করার জন্য মসজিদ হইতে বাহির হইতে পারিবে না। ফরজ গোসলের

জন্য বাহির হইতে হইবেই। সাধারণ গোসলের প্রয়োজন হইলে পেশাব-পায়খানার জন্য বাহির হওয়ার সুযোগে সেই পথেই অল্প সময়ে গোসল করিতে পারে। কিন্তু সেই অবস্থায়ও গোসলের জন্য অন্যত্র যাওয়া কিম্বা শরীর মর্দনে বা কাপড় ধোয়ায় বিলম্ব করা জায়েয নহে।

● নারীদের জন্য এ'তেকাফ করা জায়েয (হাদীছ ১০৫৮ দ্রষ্টব্য)। উক্ত হাদীছে হযরতের বিবিগণের মসজিদে এ'তেকাফ করার উল্লেখ আছে। প্রথম খণ্ড ২২ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের পরে নামাযের জন্যও নারীদের মসজিদে উপস্থিতি নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ'তেকাফের জন্য মসজিদে অবস্থান ত আরও গুরুতর। সেমতে নারীদের এ'তেকাফের ব্যবস্থা হইল—গৃহাভ্যন্তরে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকিলে সে স্থানে; আর ঐরূপ নামাযের নির্দিষ্ট স্থান না থাকিলে গৃহাভ্যন্তরে কোন একটি স্থানকে এ'তেকাফের জন্য সাময়িকরূপে নির্ধারিত করিয়া লইবে (হেদায়াহ্, ফতহুল-কাদীর)। তথায় মসজিদে অবস্থানের ন্যায়ই অবস্থান করতঃ এ'তেকাফ উদযাপন করিবে; পর্দা দ্বারা ঘেরাও করিয়া একাগ্রতার সহিত এবাদত বন্দেগীরত থাকিবে।

● এ'তেকাফরত ব্যক্তি তাহার সম্পর্কে সন্দেহ ভঞ্জনে কথাবার্তা বলিতে পারে (২৭৩ পৃঃ)। অর্থাৎ এ'তেকাফ অবস্থায় প্রয়োজনীয় কথা বলায় দোষ নাই।

● এ'তেকাফরত ব্যক্তি কোন কাজের প্রয়োজনে (মসজিদ হইতে বাহির হইয়া নয়,) মসজিদের দরওয়াজা পর্যন্ত আসিতে পারে। (২৭২ পৃঃ)

● এসতেহাজাগ্রস্তা মহিলাও এ'তেকাফ করিতে পারে (২৭৩ পৃঃ)। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়—যে অবস্থাকে শরীয়তে ওজরগণ্য করা হইয়াছে, যেমন কাহারও প্রস্রাব ঝরার ব্যধি আছে সে মসজিদে এ'তেকাফ করিতে পারে। অবশ্য মসজিদকে কোন রকম অপবিত্র করা হইতে অবশ্যই পূর্ণ সতর্ক থাকিতে হইবে এবং উহার জন্য সুব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

● এ'তেকাফ সমাপ্তির পরবর্তী রাত্রি মসজিদে যাপন করিয়া ভোর বেলায় মসজিদ হইতে বাহির হওয়া (২৭৩ পৃঃ)। এস্থানে একটি সুন্দর বিষয় অনুধাবন যোগ্য—সাধারণতঃ এ'তেকাফ সমাপ্তির পরবর্তী রাত্রিটি ঈদের রাত্রি। ঈদের রাত্রকে এবাদৎ বন্দেগীতে যাপন করার বিশেষ ফজিলত হাদীছে বর্ণিত আছে। সুতরাং যদি এ'তেকাফ সমাপ্ত করিয়া ঐ রাত্রিটিও ঐ সঙ্গে মসজিদেই উদযাপন করিয়া আসে তবে সেই বিশেষ ফজিলতও হাসিল হয়।

● শাওয়াল মাসে তথা রমযান ছাড়া অন্য মাসেও এ'তেকাফ করা যায় (২৭৩ পৃঃ)। বিশেষতঃ রমযানে এ'তেকাফ আরম্ভ করিয়া কোন কারণে উহা ত্যাগ করিলে একদিনের এ'তেকাফ ওয়াজেবরূপে এবং অতিরিক্ত মোস্তাহাবরূপে কাজা করিতে হয়; সেই কাজা এ'তেকাফ রমযান ছাড়া অন্য মাসে করা যায়।

● রোযাবিহীনও (নফল) এ'তেকাফ করা যায় (২৭৪ পৃঃ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এ'তেকাফ তিন প্রকার—ওয়াজেব, সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ, নফল। মান্নতের এ'তেকাফ ওয়াজেব—যাহা এক দিনের কম হয় না। রমযানের শেষ দশ দিনের এ'তেকাফ সাধারণ ভাবে রাখা সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ কেফায়াহ্। মান্নত এবং এই দশদিন ছাড়া অন্য সময়ের এ'তেকাফ নফল।

হানফী মজহাব মতে ওয়াজেব এবং সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ এ'তেকাফের জন্য রোযা শর্ত; রোযা ব্যতিরেকে উহা আদায় হইবে না, এমনকি মান্নতের সময় যদি উল্লেখও করে যে, রোযাবিহীন দুই দিনের এ'তেকাফ করিব তবুও ঐ এ'তেকাফ রোযার সহিত করিতে হইবে। নফল এ'তেকাফ যাহা অল্প সময়ের জন্যও হইতে পারে উহা রোযা ছাড়াই শুদ্ধ হইবে।

● অমোসলেম থাকাবস্থায় এ'তেকাফের মান্নত থাকিলে মোসলমান হইয়া উহা আদায় করা উত্তম (২৭৩ পৃঃ)। অন্যান্য নেক আমলের মছআলাহ্ও এইরূপই।

● এ'তেকাফ আরম্ভ করিয়া উহা ভঙ্গ করিলে কি করিতে হইবে?

মছআলাহ্ :—যদি এ'তেকাফ মান্নতকৃত ছিল এবং মান্নত ছিল নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের—যেমন, পনর দিনের কিম্বা অনির্দিষ্ট এক মাসের সে ক্ষেত্রে উক্ত সংখ্যক দিনের বা যে কোন এক চন্দ্র মাসের এ'তেকাফ রোযার সহিত একটানা ভাবে রাখিতে হইবে। উহা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এমনকি সর্বশেষ দিনও যদি পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এ'তেকাফ ভঙ্গ হয় তবে পুনরায় প্রথম হইতে উক্ত সংখ্যক বা এক মাসের এ'তেকাফ আদায় করিতে হইবে। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট মাস যেমন মহররম মাসের এ'তেকাফ মান্নত করিয়াছিল; সে ক্ষেত্রেও ঐ এক মাস একটানাভাবে এ'তেকাফ করা ওয়াজেব; কিন্তু যদি উহার কোন দিন এ'তেকাফ ভঙ্গ হয় তবে শুধু ভঙ্গকৃত দিনের এ'তেকাফ কাজা করিলেই চলিবে (ফতহুল-কাদীর)। যদি সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ তথা রমযানের শেষ দশ দিনের এ'তেকাফের নিয়্যত করিয়া এ'তেকাফে বসে এবং পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এ'তেকাফ ভঙ্গ করে তবে ঈদের পর পুনরায় দশ দিনের এ'তেকাফ করা উত্তম। অন্ততঃ একদিনের এ'তেকাফ কাজা করা ওয়াজেব।

তদ্রূপ যদি নফল রূপেও নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের অথবা এক দিনেরই এ'তেকাফের নিয়্যত করিয়া এ'তেকাফ আরম্ভ করার পর উহা পূর্ণ করার পূর্বে এ'তেকাফ ভঙ্গ করে সে ক্ষেত্রেও একদিনের এ'তেকাফ কাজা করা ওয়াজেব হইবে (ফতওয়া-কাজিখান)। অবশ্য যদি পূর্ণ দিনের নয়, বরং কম সময়ের এ'তেকাফের নিয়্যত করিয়া থাকে সে ক্ষেত্রে কোন কাজা করিতে হইবে না।

● এ'তেকাফরত ব্যক্তি মসজিদে থাকিয়া স্বীয় মাথা নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে (২৭৩ পৃঃ)। অর্থাৎ স্বীয় অবস্থান মসজিদে অক্ষুন্ন রাখিয়া শুধু কেবল কোন অঙ্গ মসজিদের বাহির করা, এমনকি স্বীয় গৃহ মসজিদ সংলগ্ন থাকিলে কোন অঙ্গকে সেই গৃহে প্রবেশ করিলে দোষ হইবে না।

দ্বাদশ অধ্যায়

তেজারত বা ব্যবসা-বাণিজ্য

ভুমিকা—

ইউরোপবাসী বা হিন্দু পণ্ডিতগণ ধর্মের যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকে, তাহা আমরা ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ আমাদের ধর্মের বেলায় কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। তাহারা ধর্ম শব্দ ব্যবহার করে অতি সঙ্কীর্ণ অর্থে। তাহারা বলে, মানুষ আল্লার অস্তিত্ব স্বীকার করিবে এবং আল্লাহকে রাজি ও সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু সময় তাঁহার ধ্যান করিবে বা তাঁহার নাম জপিবে, গুন-কীর্তন করিবে বা তাঁহার নামে কোন ভোগ দিবে বা কোন অনুষ্ঠান করিবে—ধর্ম বলিতে শুধু এইটুকুই বুঝায় এবং ধর্মীয় প্রয়োজন ও প্রক্রিয়া এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মানুষের নিকট হইতে ধর্ম আর কিছু চায় না এবং ধর্ম মানুষকে অন্য আর কিছুর জন্য বাধ্যও করে না। কিন্তু আমরা ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ 'ধর্ম' শব্দ ব্যবহার করি ব্যাপক অর্থে। আমাদের অকাট্য বিশ্বাস ও আকিদা এই যে, মানুষের জীবনে যতগুলি পর্য্যায়, যতগুলি স্তর আছে—সর্ব পর্য্যায়ে, সর্বস্তরে আল্লার নিকট আত্মসমর্পণ করতঃ আল্লার আনুগত্যের ভিতর দিয়া জীবন-যাপন করা এই ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হইল ধর্মের তাৎপর্য্য।

ধর্মের এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা মানবের নিমিত্ত স্বীয় মনোনীত ধর্মকে 'ইসলাম' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

'ইসলাম' শব্দের অর্থ—گردن نهادن بطاعت "সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতে আত্মসমর্পণ করা।" মানব তাহার জীবনের প্রতিটি স্তরে আল্লার দাসত্ব এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে অর্থাৎ আল্লার বাণী কোরআন ও আল্লার রসুল বা প্রতিনিধি হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত আইন-কানুন ও আদর্শ তথা শরীয়ত অনুযায়ী স্বীয় জীবনকে সীমাবদ্ধাকারে পরিচালিত করিবে ইহাই হইল ইসলাম ধর্মের মূল বস্তু ও তাৎপর্য্য। তাই ইসলাম ও শরীয়তের প্রভাব মানব জীবনের প্রতিটি স্তরেই বিস্তার লাভ করিবে।

যাহারা ইসলামকে শুধু মাত্র এবাদৎ-বন্দেগী ও উপাসনার নিয়ম-কানুন সম্বলিত মনে করিয়া থাকে বস্তুতঃ তাহারা ইসলামের শব্দার্থটুকুও বুঝিতে পারে নাই। তাহারা উহার আভিধানিক অর্থের আওতাভুক্তি হইতেও বঞ্চিত রহিয়াছে।

মানুষ ইতর প্রাণী নহে। মানুষ একদিকে তাহার স্রষ্টার অতি আদরের প্রতিনিধি বা খলীফা—ফেরেশতার চেয়েও অধিক ঊর্দ্ধে তাহার আসন। আর অন্য দিকে সে সামাজিক জীব। সেই হেতু তাহার বিবাহ-শাদীর প্রয়োজন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন, ন্যায় বিচার ও সুশাসনের প্রয়োজন আছে। সে আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহকারী। মানুষের জীবন ছয়টি স্তরে বিভক্ত।

ছয় স্তরে বিভক্ত জীবন-বিশিষ্ট মানবের ইহ-পরকালীন কল্যাণবাহক পূর্ণ জীবন-ব্যবস্থারূপে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা 'ইসলাম ধর্মকে' মনোনীত করিয়াছেন, ইহা মানুষের মনগড়া ইযম বা মতবাদ নহে। সুতরাং 'ইসলামের' তফসিল ও অনুশাসন ছয় ভাগে বিভক্ত। বলা বাহুল্য—ইসলাম তথা আল্লাহতে পূর্ণ আত্মসমর্পণ বিকাশের জন্য স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে পথ ও নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান নির্ধারিত করিয়াছেন, উহাকেই বলা হয় 'শরীয়ত'। 'শরীয়ত' শব্দের অর্থও রাজপথ। অতএব শরীয়তও ইসলামের ন্যায় ছয় ভাগে বিভক্ত।

(১) প্রথম বিভাগ—আকিদা, মতবাদ ও বিশ্বাস শ্রেণীর—যে সব বিশ্বাস ও শপথের উপর মানব স্বীয় কর্মজীবনের ভিত্তি স্থাপন করিবে। মানব কোন সাধারণ ইতর-প্রাণী নিকৃষ্ট জীব নহে। মানব সর্বশ্রেষ্ঠ জীব; স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন অন্য কাহারও অধীনতা বা দাসত্ব সে স্বীকার করিয়া নিতে পারে না। সারা বিশ্ব তাহার অধীন; সে শুধু এক বিশ্বপতির অধীন; অন্য কাহারও অধীন সে নহে। মানবের দেহ নশ্বর ও মরণশীল বটে, কিন্তু তাহার আত্মা অবিনশ্বর, অমর, চিরস্থায়ী।

ইসলামের মূল এই যে, হে মানব! তোমার একজন সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, বিধানকর্তা আছেন। তাঁহার অধীনে তাঁহার বিধানে তুমি স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ খেলাফত পাইয়াছ। এই খেলাফতের দায়িত্ব পালনের বিধান সমূহ তিনি পবিত্র কোরআনের ভিতর দিয়া এবং উহা ছাড়া আরও অসংখ্য অহীর মাধ্যমে হযরত মোহাম্মদ—রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মারফত তোমাকে দান করিয়াছেন। যদি তুমি খেলাফতের দায়িত্ব পালন না কর আল্লার নির্ধারিত সীমা-রেখা লঙ্ঘন কর, তবে তুমি পাপী হইবে। আর যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া খেলাফতের হক পালন কর তবে তোমার পূণ্য বা ছওয়াব হইবে। পাপ পুণ্য বিচারের জায়গা এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া নহে। উহার একটা পৃথক জগৎ নির্ধারিত আছে। উহার নাম আখেরাত বা পরকাল। পরকালে পাপের শাস্তির জন্য দোযখ এবং পুণ্যের পুরস্কারের জন্য বেহেশত নির্ধারিত আছে। মোটামুটি এই বিশ্বাস কয়টি ভিত্তি করিয়া মানুষের জীবন গঠিত ও পরিচালিত হইলে দুনিয়াতে শান্তি আসিতে পারে। কাজেই মানুষের সর্বাগ্রে এই কয়টি সত্য বিশ্বাস অন্তরে স্থাপন পূর্বক এইগুলির উপর শপথ করিয়া তাহার জীবন যাত্রা শুরু করিতে হইবে। এইসব মতবাদ বা আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ও মৌখিক শপথ গ্রহণ সম্বন্ধীয় বিষয় সমূহ ঈমানের অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় বিভাগ- এবাদৎ বন্দেগী বা রুহানিয়ত ও আধ্যাত্মিক শ্রেণীর। মানুষ যেহেতু আবিলতাপূর্ণ দুনিয়াতে বাস করে, তাই সে দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলিয়া যায়, তাহার আত্মা ময়লাযুক্ত হইয়া পড়ে। মানব যাহাতে সৃষ্টিকর্তাকে ভুলিয়া না যায়, তাহার আত্মা যাহাতে ময়লাযুক্ত হইয়া না পড়ে সেই জন্য এবং তাহার রূহানিয়তকে নির্মল ও উন্নত করার ও রাখার জন্য দৈনিক অন্ততঃ পাঁচবার স্বীয় সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ অনুসারে তাঁহার প্রদর্শিত নিয়ম অনুসারে তাঁহাকে স্মরণ এবং তাঁহার সমীপে আত্ম-নিবেদন করিতে হইবে। সংযম অভ্যাসের নিমিত্ত অন্ততঃ এক মাস দিবাভাগে রোযা রাখিতে হইবে। যাহা কিছু অর্থ উপার্জন করিবে উহার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং উৎপন্নের দশ ভাগের এক ভাগ বা বিশ ভাগের এক ভাগ সৃষ্টিকর্তার নামে দীন-দুঃখী সৃষ্টজীবকে দান করিতে হইবে। তাঁহার নাম ও বিধানকে দুনিয়াতে চালু রাখার ও প্রাধান্য দান করার জন্য আজীবন জীবনপণ চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহার গ্রন্থ এবং তাঁহার রসুলের জীবনের আদর্শগুলি সর্বদা গভীরভাবে অধ্যয়ন (study) ও প্রচার করিতে হইবে। এইসব কার্য্যক্রমগুলিই এবাদৎ বন্দেগী বা রূহানিয়ত নামে অভিহিত। নামায, যাকাৎ, হজ্জ ও রোযার অধ্যায় সমূহে উহা বর্ণিত হইয়াছে এবং জেহাদের অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

(৩) তৃতীয় বিভাগ—এক্‌তেছাদিয়াত তথা অর্থ-ব্যবস্থা—বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, শ্রম ইত্যাদি কিভাবে পরিচালিত করিবে? সে সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত সীমা নির্দ্ধারণকারী বিধান অনুসারে চলিতে হইবে, নিজের খাহেশ মতে চলা যাইবে না।

(৪) চতুর্থ বিভাগ—আখ্‌লাকিয়াত তথা আচার-ব্যবহার বা স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধীয়। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে এবং সৃষ্টজীবের সঙ্গে আচার ব্যবহারের বেলায় সদাচারী মিতাচারী হইতে হইবে।

(৫) পঞ্চম বিভাগ—মোয়াশারাত বা সমাজ-ব্যবস্থা; পরিবারবর্গকে কিরূপে গঠন ও উন্নত করিতে হইবে? পরিবার নিয়া কিরূপে চলিতে হইবে? সমাজে ছোট-বড়, গরীব-ধনী, আপন-পর, নর-নারী পথিক-বিপদগ্রস্ত এদের কাহার সঙ্গে কি ব্যবহার করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যে ব্যবস্থা দিয়াছেন উহার তুলনায় অধিক ভাল ব্যবস্থা আর হইতে পারে না।

(৬) ষষ্ঠ বিভাগ—ছিয়াছিয়াত তথা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা; শাসন কিভাবে করিতে হইবে? বিচার পদ্ধতি কি হইবে? শাসনকর্তা এবং শাসিতদের মধ্যে সম্পর্ক কি হইবে? শাসনকর্তা নিয়োগের ধারা কি হইবে? আদর্শ কি হইবে? ইত্যাদি সম্পর্কে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার যে বিধান আছে উহার তুলনায় উত্তম বিধান আর নাই।

তৃতীয় বিভাগীয় বিষয় সমূহই আলোচ্য অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। অবশিষ্ট বিষয়সমূহ মূল কিতাবের পরবর্তী খণ্ডসমূহে বর্ণিত হইবে।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে কতিপয় আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যদ্দারা প্রমাণিত হয় যে, মানব জীবনের সমুদয় বিভাগের ন্যায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহেরও নীতি-নির্দ্ধারক এবং তৎসম্পর্কে বৈধ-অবৈধের সীমা প্রতিষ্ঠাতা হইলেন একমাত্র সর্বাধিকারী বিধানকর্তা আল্লাহ তায়ালা—অর্থাৎ তাঁহার বাণী কোরআন শরীফ তাঁহার প্রেরিত প্রতিনিধি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথা শরীয়ত।

১। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—احل الله البيع وحرم الربو "আল্লাহ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসা বাণিজ্যকে হালাল ও বিধেয় অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার আইন ও বিধান-সম্মত ঘোষনা করিয়াছেন এবং সুদ প্রথাকে হারাম ও নিষিদ্ধ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার আইন বিরোধী ও বিধান বহির্ভুত ঘোষণা করিয়াছেন।"

এই আয়াত দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, ক্রয়-বিক্রয় প্রথা হালাল—জায়েয বা শরীয়ত অনুমোদিত, আর সুদ হারাম এবং বিধি বহির্ভুত। সুদ লভ্যাংশযুক্ত আদান-প্রদান হওয়ায় উহা ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় মনে হয়, তবুও জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, আল্লাহ তায়ালা উহাকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

সুদ এবং ক্রয়-বিক্রয় বস্তুদ্বয় বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাহারও নিকট এক পর্য্যায়ের মনে হইলেও আল্লাহ কর্তৃক হারাম ও হালাল ঘোষিত হওয়ার পর উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে। ইসলামের প্রতিক্রিয়া ও মোসলমান ব্যক্তির কার্য্য হইবে সেই ব্যবধানের পরিপ্রেক্ষিতে হারাম ঘোষিত সুদকে বর্জনীয় এবং হালাল ঘোষিত ক্রয়-বিক্রয়কে গ্রহণীয় মনে করা এবং সেই অনুসারে আমল করা। আল্লার বান্দা হইয়া যদি কেহ ঐ বিরাট ব্যবধানকে ব্যবধান মনে না করে তবে সে বস্তুতঃ জ্ঞানশূন্য পাগল বিবেচিত হইবে এবং তাহার বিবেক-বুদ্ধির উপর নফছ ও শয়তানের ভূত ছওয়ার হইয়াছে বলিতে হইবে।

আজ তাহারা নিজকে যুক্তিবিদ জ্ঞানী মনে করিলেও আখেরাতে তাহাদের পাগলাকৃতি ও ভুতাক্রান্ত প্রকৃতি প্রকাশিত হইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰو لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰو. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰو.

অর্থ—যাহারা সুদ গ্রহণ করিয়া থাকে তাহারা (কবর হইতে) ঐ উম্মাদ পাগলের ন্যায় উঠিবে যাহাকে জ্বিন-ভুতের আছরে উম্মাদ করিয়া দিয়াছে। কারণ, তাহারা এরূপ

বলিয়া থাকিত যে, ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুদ একই পর্য্যায়ের। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্য ও তেজারতকে আল্লাহ তায়ালা করিয়াছেন হালাল এবং সুদকে করিয়াছেন হারাম। (৩ পারা ৬ রুকু)

হালাল-হারামের বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কাফেররা স্বার্থান্ধ হইয়া সাধারণ মানুষের চোখে ধুলা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলিত, ব্যবসায়ের মধ্যেও যেমন পাঁচ মণ ধান ৫০'০০ টাকায় ক্রয় করিয়া ৬০'০০ টাকায় বিক্রি করিলে ১০'০০ টাকা লাভ হয়; তদ্রূপ ৫০'০০ টাকা নগদ একজনকে ধার দিয়া তাহার উপকার করিয়া তাহার নিকট হইতে ৫৫'০০ টাকা গ্রহণ করিলে ৫'০০ টাকা লাভ হয়; এমতাবস্থায় ইহা কতই না বেখাপ্পা কথা যে, ৫০'০০ টাকায় ১০'০০ টাকা লাভ করা ত জায়েয ও হালাল, অথচ ৫০'০০ টাকায় ৫'০০ টাকা লাভ করা হারাম, নিষিদ্ধ ও অপবিত্র আর আইন বিরোধী। যেমন একজন বলে, একটা বাঘেরও চারখানা পা একটা গরুরও চারখানা পা, বরং গরুর আরও দুইখানা শিং আছে এতদসত্ত্বে কেন বলা হয় যে, খবরদার—বাঘের কাছে যাইও না, বাঘের গোশত খাইও না, উহা হারাম ও অখাদ্য, কিন্তু গরুর কাছে যাইতে নিষেধ করা হয় না; উহার দ্বারা হাল চাষ করা হয়, উহার গোশত সুখাদ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ঠিক এইরূপেই সুদ ত মানুষ জাতিকে খাইয়া সর্বনাশ করে, আর ব্যবসা জাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করে। কিন্তু তাহারা সুদ আর ব্যবসাকে একই রকমের মনে করিত। ইহা পাগলের উক্তি নয় কি? যেরূপ বাঘ ও গরুকে একই পর্য্যায়ের গণ্য করা। তাহারা সাধারণ মানুষের চোখের থেকে সুদের অপকারিতা ও নৃশংসতার দিকটা এবং ব্যবসায় লাভ-লোকসানের চিন্তার দায়িত্ব গ্রহণ ও শ্রমকরণের দিকটা লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। ইহাও তাহাদের পাগলামি। এই জন্যই কেয়ামতের মাঠে তাহাদিগকে প্রথমে ত পাগলের আকারে উঠান হইবে, তারপরে যেহেতু সুদের দ্বারা তাহারা লোকের রক্তশোষণ করিত, সেই জন্য অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির নিয়মানুসারে রক্তের নদীর মধ্যে আটক করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

২। আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

ধারে ক্রয় বা বিক্রয় করার ক্ষেত্রে যাহার উপর পাওনা থাকে তাহার হইতে লিখিত একরারনামা গ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ দানে পবিত্র কোরআনের সর্বাধিক দীর্ঘ আয়াত "আয়াতে মোদায়ানাহ" বিদ্যমান আছে (৩ পাঃ ৭ রুঃ)।। উল্লেখিত আয়াত-খণ্ড উহারই অংশবিশেষ। ইহাতে বলা হইয়াছে, ক্রয়-বিক্রয় ছোট হউক বা বড় হউক ধারে হইলে উহা লিখিতে অবহেলা করিও না—"অবশ্য পরস্পর নগদ লেন-দেনের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়

হইলে" সে ক্ষেত্রে না লেখায় দোষ নাই; কিন্তু এই ক্ষেত্রেও ক্রয়-বিক্রয়কালে সাক্ষী রাখার পরামর্শ তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

● পশুর ক্রয়-বিক্রয়ে বয়নামা এবং সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে ক্যাশমেমোর প্রচলন ইহা হইতেই। লেখার ব্যবস্থা অতীতকালে দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে লেখার স্থলে সাক্ষীর কথা বলা হইয়াছিল; বর্তমানে সাক্ষী অপেক্ষা লেখা সহজ, তাই ক্যাশ-মেমোর প্রচলন হইয়াছে।

৩। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

ব্যাখ্যাঃ—শুক্রবার দিন জুমার নামাযের প্রতি আহ্বান তথা আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির লিপ্ততা ত্যাগ করতঃ নামাযের প্রতি ধাবিত হওয়ার আদেশ করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলেন "অতঃপর যখন নামায শেষ হইয়া যাইবে তখন তোমরা এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়িতে পারিবে এবং আল্লার নেয়ামত উপার্জনে লিপ্ত হইতে পারিবে। কিন্তু এই অর্থ উপার্জনের সময়েও এবং কর্ম-ক্ষেত্রেও অধিক পরিমাণে আল্লার জিকর করিবে, তবেই উন্নতি লাভ করিতে এবং কামিয়াবি হাসিল করিতে সক্ষম হইবে।" (২৮পাঃ ১২রুঃ)

এই আয়াতের দ্বারাও ক্রয়-বিক্রয়ের তথা ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি, বরং আদেশ প্রমাণিত হইল। কারণ, উহাও আল্লার নেয়ামত উপার্জনের একটি পথ। কিন্তু ইহাও প্রমাণিত হইল যে, শরীয়তের আদেশ-নিষেধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহা করিতে হইবে। যেমন—জুমার নামাযের আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা বন্ধ করার আদেশ করা হইয়াছে। তদুপরি আল্লার জিকর তথা আল্লার আদেশ পালনের প্রতিবন্ধক রূপে ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত ও মগ্ন হইবে না।

৪। আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"হে মোমেনগণ! তোমরা পরস্পর একে অন্যের কোন মাল গ্রাস করিও না। হাঁ—পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসা তথা ক্রয়-বিক্রয় সূত্রে গ্রহণ কর। (৫ পাঃ ১০ রুঃ)

১০৬১। হাদীছঃ—আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা যখন মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদীনায় পৌঁছিলাম তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে

অসাল্লাম আমার এবং মদীনাবাসী সায়াদ ইবনে রবী'র মধ্যে মোয়াখাত অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করিয়া দিলেন। আমার সেই ভ্রাতা সায়াদ (রাঃ) এরূপ উদার ছিলেন যে, তিনি আমাকে বলিলেন, মদীনাবাসীদের মধ্যে আমি অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি। আমার ধনের অর্দ্ধাংশ আপনাকে দান করিতেছি। এবং আমার দুই স্ত্রী আছে, আপনি যাহাকে পছন্দ করিবেন আপনার জন্য আমি তাহাকে ত্যাগ করিব, ইদ্দতের পর আপনি তাহাকে বিবাহ করিবেন।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) (ভ্রাতার এই অসীম উদারতার শুকরিয়া আদায় পূর্বক দোয়া করিয়া) বলিলেন—আপনার ধনের আবশ্যক আমার হইবে না; এখানে ব্যবসা কেন্দ্র কোন বাজার আছে কি? ভ্রাতা বলিলেন, 'কায়নুকা' নামক একটি বাজার আছে। ভোর বেলায় আবদুর রহমান (রাঃ) সেই বাজারে চলিয়া গেলেন এবং ঐ দিনের ব্যবসায়ের লাভ দ্বারা কিছু পনির ও ঘৃত ক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। এইরূপে প্রতিদিন ভোরে তিনি সেই বাজারে যাইয়া ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিলেন। (কিছু দিনের মধ্যেই তিনি অনেক টাকার মালিক হইয়া এবং টাকা-পয়সা উপার্জন করিয়া বিবাহ করিয়া নিলেন।) একদা তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীরে (নব-বধুর ব্যবহৃত) রঙ্গীন সুগন্ধির চিহ্ন দেখা যাইতে ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শাদী করিয়াছ কি? তিনি উত্তর করিলেন—জী, হাঁ। জিজ্ঞাসা করিলেন—কাহাকে? তিনি বলিলেন; মদীনার এক মহিলাকে। জিজ্ঞাসা করিলেন—মহরানা কত দিয়াছ? তিনি বলিলেন, এক দানা পরিমাণ স্বর্ণ। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, একটি বকরি জবেহ করিয়া হইলেও অলিমার (বিবাহের দাওয়াতের) ব্যবস্থা কর।

১০৬২। **হাদীছ ঃ—**ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—"ওকাজ", "মাজান্নাহ" ও "জুল-মাজায" নামক কয়েকটি প্রসিদ্ধ মৌসুমী বাজার বা মেলা ছিল; (হজ্জের মৌসুমে উহা অনুষ্ঠিত হইত।) অন্ধকার যুগ হইতেই ঐগুলি প্রচলিত ছিল, উহাতে বহু ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। ইসলামের যুগে ছাহাবীগণ ঐসব বাজারে ব্যবসা করা গোনাহ মনে করিলেন। তখন এই আয়াত নাযেল হইল—

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَّبِّكُمْ

"তোমরা স্বীয় পালনকর্তার নেয়ামত উপার্জনে তৎপর হইবে, (যদিও হজ্জের মৌসুমে হয়) তাহাতে কোন গোনাহ হইবে না।"

এতদ্ভিন্ন প্রথম খণ্ডের ৯৩ নং হাদীছখানা এস্থানে উল্লেখ হইয়াছে। এই সব হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) দেখাইয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে

ছাহাবীগণ ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন এবং কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় নাই ; অতএব উহা জায়েযের অন্তর্ভুক্ত। আর ইহারই আকৃতি সুদ—উহা হারাম।

হালাল-হারামের বাছ-বিচার আবশ্যক

১০৬৩। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِى

الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আফসোস করিয়া বলিয়াছেন, এমন এক সময় আসিবে, যখন মানুষ ধন-দৌলত হাসিল করার মধ্যে কোন বাছ-বিচার করিবে না—যে, হালাল সূত্রে হাসিল হইল, না—হারাম সূত্রে হাসিল হইল। (নবী (দঃ) স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করিয়াছেন যে—তোমরা ঐরূপ হইও না।)

অর্থাৎ কেয়ামত তথা মহাপ্রলয়ের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে যে, নানা প্রকার অন্যায় ও কুকর্মের সৃষ্টি হইবে। উহার মধ্যে একটি অন্যায় সৃষ্টি হইবে এই যে, মানুষ ধন-দৌলত হাসিল করায় এতই মোহগ্রস্ত ও লোভ-লালসায় অন্ধ হইয়া পড়িবে যে, হালাল-হারামের কোন বাছ-বিচার করিবে না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করিয়াছেন যে, তোমরা সেরূপ করিও না যদিও তোমাদের সেই স্রোতের বিরুদ্ধে চলিতে কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) কতিপয় বিশেষ জরুরী বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন। প্রথম তিনি বলিয়াছেন, দলীল-প্রমাণের দিক দিয়া শরীয়তে "হালাল" অতি সুস্পষ্ট জিনিষ। তদ্রূপ "হারাম"ও অতি সুস্পষ্ট জিনিষ। এই দুইটি পর্যায় ও স্তরের মধ্যবর্তী তৃতীয় একটি পর্য্যায়ও আছে ; উহা হইল—সন্দেহজনক পর্য্যায় ; অর্থাৎ উহাকে হারামও সাব্যস্ত করা যায় না ; সেইরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই, আবার হালালও সাব্যস্ত করা যায় না, উহারও কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই। এই তথ্য প্রমাণে প্রথম খণ্ডের ৪৭ নং হাদীছখানা উল্লেখ হইয়াছে। সন্দেহজনক পর্যায়ের অনেক কিছু ফেকা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যাহাকে শরীয়তে "মক্রূহ" বলা হইয়াছে। উহা ভিন্ন অনেক ক্ষেত্রে ইমাম ও আলেমগণের মতভেদের দরুণও বিভিন্ন বিষয় বা বস্তুকে সন্দেহজনক সাব্যস্ত করা হয়। এতদ্ভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে দৈনন্দিন এরূপ অনেক কিছু পেশ আসে যাহা সম্পর্কে হালাল বা হারাম হওয়া স্থিররূপে সাব্যস্ত করা যায় না। এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) "সন্দেহজনক" হওয়ার সংজ্ঞা নিরূপণেরও চেষ্টা করিয়াছেন

—যাহার সারমর্ম এই যে, সংশয় ও দ্বিধা জন্মিবার স্বাভাবিক হেতু ও কারণ বিদ্যমান থাকে এইরূপ বিষয় ও বস্তুকে সন্দেহজনক পর্য্যায়ের গণ্য করা হইবে। যেমন প্রথম খণ্ডে ৭৪ নং হাদীছে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে—একজন ছাহাবী এবং তাঁহার স্ত্রী সম্পর্কে একটি মহিলা সাক্ষ্য দিল যে, আমি তোমাদের উভয়কে আমার দুগ্ধ পান করাইয়াছি; অর্থাৎ তোমরা উভয়ে দুধ ভাই-বোন; তোমাদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না। বহু খোজাখুজির পরও এই সাক্ষীর কোন সহযোগী পাওয়া গেল না। ঐ ছাহাবী মক্কা হইতে প্রায় ৩০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মদীনায় পৌছিলেন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, এরূপ কথা উত্থাপিত হওয়ার পর কিভাবে তুমি তাহাকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করিবে? ঐ ছাহাবী সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিলেন; অন্যত্র তাহার বিবাহ হইল।

উল্লিখিত ঘটনায় উক্ত স্বামীর জন্য ঐ স্ত্রী হারাম সাব্যস্ত হয় না। কারণ ঐ মহিলা তাহার দুধ-বোন হওয়ার গ্রহণীয় সাক্ষী ছিল না। দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষের সঙ্গে দুইজন নারী সাক্ষ্যদাতা হইলে উহা হয় গ্রহণীয় সাক্ষী। কিন্তু অসম্পূর্ণ হইলেও ঐ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট একটি সাক্ষী ছিল, এই কারণে তথায় স্বাভাবিক ভাবেই সংশয় ও দ্বিধা জন্মে—যাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া হযরত নবী (দঃ) ঐ স্ত্রীকে ত্যাগ করার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন।

অপর একটি ঘটনা—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, আমার বিছানার উপর পতিত খোরমা (শুষ্ক খেজুর) দেখিতে পাই, কিন্তু (জানা-শুনা ব্যতিরেকে) উহা আমি খাই না; এই আশঙ্কায় যে, উহা ছদকা-খয়রাতের খোরমা হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্টির স্বাভাবিক হেতু ও কারণ বিদ্যমান আছে যে, ঐ খোরমা ছদকা-খয়রাতের হইতে পারে; যেহেতু হযরতের গৃহে ছদকা-খয়রাতের খোরমা আসিয়া থাকিত; হযরত (দঃ) উহা গরীবদিগকে দিয়া দিতেন। নবীর জন্য ছদকা-খয়রাত খাওয়া জায়েয নহে।

আর এক হাদীছে আছে—একদা পথে পতিত একটি খোরমা দেখিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা ছদকা হওয়ার আশঙ্কা না হইলে আমি নিজেই উহা উঠাইয়া খাইতাম (যেন আল্লার নেয়ামতের অপচয় না হয়)। এক্ষেত্রেও সংশয়ের স্বাভাবিক কারণ বিদ্যমান আছে যে, উহা ছদকা-খয়রাতের হইতে পারে; যেহেতু সচরাচর ছদকা-খয়রাতের খোরমা লইয়া লোকেরা এই পথে যাতায়াত করিয়া থাকিত; তাই ঐ সংশয় ও সন্দেহ স্বাভাবিক।

উল্লিখিত হাদীছদ্বয় বর্ণনা করিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন, (হারাম হইতে ত বাঁচিতে হইবেই, অধিকন্তু) সন্দেহজনক বিষয় এবং বস্তু হইতেও বাঁচিতে হইবে।

অতঃপর বোখারী (রঃ) আর একটি পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, সন্দেহজনক হওয়া এবং অছওয়াছাহ (অমুলক দ্বিধা) ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ। উভয়ের হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন—সন্দেহজনক

জিনিষ পরিহার করিতে হইবে; অছওয়াছাহজনক জিনিষ পরিহার করার মোটেই প্রয়োজন নাই। উভয়ের পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট। সন্দেহজনক বলা হইবে ঐ ক্ষেত্রে যে স্থানে সংশয় ও দ্বিধা জন্মিবার স্বাভাবিক হেতু ও কারণ বিদ্যমান আছে। আর যে ক্ষেত্রে সংশয় ও দ্বিধা জন্মিবার স্বাভাবিক হেতু ও কারণ নাই সেই ক্ষেত্রে দ্বিধা সৃষ্টি হইলে উহাকে "অছওয়াছাহ" বলা হইবে। ইহার সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত নিয়ের হাদীছটিতে উল্লেখ হইয়াছে—

১০৬৪। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, কতিপয় ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! লোকেরা আমাদের নিকট জবাইকৃত গোশত বিক্রি করার জন্য নিয়া আসে। আমরা জানি না—তাহারা জবেহ করার সময় "বিছমিল্লাহ" বলিয়াছে কি-না। তদুত্তরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা বিছমিল্লাহ বলিয়া উহা খাও।

ব্যাখ্যা ঃ—এক্ষেত্রে বিছমিল্লাহ বলা সম্পর্কে সংশয়ের স্বাভাবিক হেতু ও কারণ নাই; যেহেতু জবেহ করার সময় মোসলমান ব্যক্তির বিছমিল্লাহ না বলা অস্বাভাবিক। অতএব উহার ভিত্তিতে সৃষ্ট সংশয় ও দ্বিধার পাত্র "সন্দেহজনক" ও পরিহার্য্য গণ্য হইবে না, বরং "অছওয়াছাহজনক" গণ্য হইবে যাহা পরিহার্য্য নয়, বরং অছওয়াছাহ পরিহার্য্য। পক্ষান্তরে পথে পতিত খোরমা সম্পর্কে ছদকা-খয়রাত হওয়ার আশঙ্কা তদ্রূপ নহে, কারণ ছদকা-খয়রাতের খোরমা লইয়া যেই পথে যাতায়াত ও চলাচল হয় ঐ পথে উহার এক-দুইটি পতিত হওয়া নেহায়েত স্বাভাবিক। অতএব উহার ভিত্তিতে সৃষ্ট সংশয় ও দ্বিধার ক্ষেত্র "সন্দেহজনক" গণ্য হইবে এবং পরিহার্য্য হইবে। হযরতের বিছানায় পতিত খোরমা সম্পর্কে ছদকা-খয়রাত হওয়ার আশংকাও তদ্রূপই। কারণ, ছদকা-খয়রাতের খোরমা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য লোকেরা হযরতের গৃহে দিয়া যাইত; এতদ্ভিন্ন লোকদের অনেক অনেক ছদকা-খয়রাতের খোরমা গরীবদের মধ্যে বিতরণে হযরত (দঃ) বিশেষভাবে জড়িত হইতেন; হযরতের কাপড়-চোপড়ে জড়াইয়া এক-দুইটা খোরমা চলিয়া আসা এবং বিছানায় পতিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, অতএব উহার ভিত্তিতে সৃষ্ট সংশয় ও দ্বিধার ক্ষেত্র "সন্দেহজনক" ও পরিহার্য্য গণ্য হইবে। ৭৪ নং হাদীছের ঘটনায় ত সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্টির কারণটা স্বাভাবিক হওয়া অতি সুস্পষ্ট। সাক্ষীর সংখ্যা পূর্ণ না হওয়ায় সাক্ষ্য গৃহীত না হওয়া একটি শরীয়তী বিচারনীতির বিধানগত ব্যাপার, উহা হইলে ত অকাট্য হারামই সাব্যস্ত হইত। অসম্পূর্ণ কিন্তু সুস্পষ্ট সাক্ষ্যে অন্ততঃ সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্টি হওয়া ত নিতান্ত স্বাভাবিক। সুতরাং উহার ক্ষেত্র ত "সন্দেহজনক" এবং পরিহার্য্য সাব্যস্ত হইবেই।

সারকথা এই যে, যেক্ষেত্রে সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্টির হেতু ও কারণ স্বাভাবিক বিষয় হইবে সে ক্ষেত্রকে সন্দেহজনক ও পরিহার্য্য গণ্য করা হইবে, আর যে ক্ষেত্রে সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্টির হেতু ও কারণ স্বাভাবিক নহে সে ক্ষেত্রকে অছওয়াছাহজনক গণ্য করা হইবে—উহা পরিহার্য্য নহে।

যেরূপ কোন দালানের ছাদ যদি বেশী ফাটা হয়, কড়ি-বরগা বিনষ্ট ও দুর্বল হয় এবং সেই কারণে ছাদ পতিত হওয়ার আশঙ্কা করা হয় এই আশঙ্কার কারণে সৃষ্ট সংশয় ও দ্বিধার ক্ষেত্র সন্দেহজনক গণ্য হইবে এবং ঐ গৃহ পরিহার্য্য হইবে। পক্ষান্তরে ছাদ যদি ভাল ও মজবুত থাকে, উহার কড়ি-বরগাও অক্ষত থাকে সে ক্ষেত্রে যদি আশঙ্কা করা হয়—হইতে পারে ছাদ পড়িয়া যায় না কি; এইরূপ আশঙ্কার কারণে সৃষ্ট সংশয় ও দ্বিধা "অছওয়াছাহ" গণ্য হইবে এবং ইহার ক্ষেত্র মোটেই পরিহার্য্য হইবে না।

১০৬৩ নং হাদীছে ব্যবসা-বাণিজ্যে হারামকে পরিহার করার তাকিদ করা হইয়াছে; ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লিখিত পরিচ্ছেদ সমুহের ইঙ্গিতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, হারামের ন্যায় সন্দেহজনক ক্ষেত্রকেও পরিহার করিতে হইবে। অতঃপর কতিপয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন যে, হারাম ও সন্দেহজনক ক্ষেত্রকে পরিহার করিয়া সব রকম জিনিসের ব্যবসাই করা যায়। এবং দেশ-বিদেশে এমনকি সুকঠিন সামুদ্রিক ছফর করিয়া বিদেশে যাইয়াও ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায়। এরই মধ্যে এক পরিচ্ছেদে বোখারী (রঃ) পবিত্র কোরআনের একটি বিশেষ আয়াত উল্লেখ করিয়া গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আয়াতটি এই—

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ـ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ـ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

প্রকৃত ও খাঁটি মোমেনদের একটি বিশেষ অবস্থার বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন— "এমন সব লোক যে, তাহারা ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্য করে, কিন্তু সেই লিপ্ততা তাহাদিগকে আল্লার জিকর ও আল্লার ইয়াদ হইতে এবং (আল্লার হুকুম পালন তথা) নামায সুষ্ঠুরূপে আদায় করা হইতে, যাকাত প্রদান করা হইতে গাফেল উদাসীন ও অমনযোগী করিতে পারে না। (বাণিজ্যে লিপ্ততার সময়েও) তাহাদের অন্তরে ভয় জাগ্রত থাকে কেয়ামতের হিসাবের দিনের—সেই দিন ভীষণ আতঙ্কের দরুন মানুষের প্রাণ থর থর কাঁপিতে থাকিবে এবং চক্ষুদ্বয় উলটিয়া যাইবে। (ঐ দিনের অনুষ্ঠান হইবে) এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ তায়ালা লোকদিগকে তাহাদের ভাল আমলের পুরস্কার দান করিবেন এবং তাহাদের আমল অপেক্ষাও অধিক দান করিবেন নিজ রহমতে। (নামায, যাকাত আল্লার জিকর ইত্যাদিতে ব্যবসার উন্নতি ব্যহত হয় না; সর্বপ্রকার উন্নতি আল্লাহ তায়ালার হাতে;) আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন অসংখ্য ও বে-হিসাবরূপে রিজিক দিয়া থাকেন। (১৮ পাঃ ১১ রুঃ)

ইমান বোখারী (রঃ) উল্লিখিত আয়াতের আলোচনা দ্বারা সতর্ক করিয়াছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল ও জায়েয বটে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে—উহা যেন কোন ক্ষেত্রেই আল্লার ইয়াদ হইতে এবং নামায, যাকাত ইত্যাদি হইতে গাফেল উদাসীন ও অমনোযোগী করিতে না পারে—মোসলমান মাত্রেরই এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

● বিশিষ্ট তাবেয়ী কাতাদাহ্ (রঃ) বলিয়াছেন, আমরা মোসলমান সমাজের অবস্থা এই পাইয়াছি যে, তাঁহারা ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, কিন্তু যখনই তাঁহাদের সম্মুখে আল্লার নির্দেশিত কোন নির্দেশ আসে তখন ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় তাঁহাদিগকে আল্লার স্মরণ হইতে অমনোযোগী রাখিতে পারে না; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আল্লার নির্দেশ পালন করতঃ উহা আল্লার হুজুরে পেশ করেন।

উক্ত বিবরণের সমর্থনে বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ তফছীরকার হাফেজ ইবনে হজর (রঃ) ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি একদা বাজারে ছিলেন; নামাযের জমাত খাড়া হওয়া নিকটবর্তী হইলে লোকেরা নিজ নিজ দোকান-পাট বন্ধ করিয়া মসজিদে চলিয়া গেলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ লোকদের প্রশংসায় বলিলেন, এই শ্রেণীর লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়াই কোরআনের আয়াত নাযেল হইয়াছে; এই বলিয়া তিনি উপরোল্লিখিত আয়াত তেলাওয়াত করিলেন। (ফতহুল বারী, ৪—২৩৮)

ব্যবসায়ীদের বিশেষভাবে দান-খয়রাত করা চাই

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ...... وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ـ

"হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লার নামে খরচ কর ঐ সব হালাল মাল হইতে যাহা তোমরা কামাই কর এবং ঐ সব হইতে যাহা আমি তোমাদের জন্য জমিন হইতে জন্মাইয়া থাকি। আর উহার নিকৃষ্টটার প্রতি যাইও না যে, আল্লার রাস্তায় খরচ করিতে শুধু নিকৃষ্ট বস্তুই খরচ কর, অথচ ঐরূপ নিকৃষ্ট বস্তু তোমাকে দেওয়া হইলে তুমি একমাত্র চোখ বুজিয়াই উহা গ্রহণ করিতে পার—সন্তুষ্টির সহিত তুমি উহা গ্রহণ করিবে না। স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অপ্রত্যাশী প্রশংসিত। শয়তান তোমাদিগকে ভয় দেখায়—(দান-খয়রাতে) ধন কম হইয়া যাওয়ার এবং তোমাদিগকে পরামর্শ দেয় অবাঞ্ছিত কাজ করার, আর আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করার এবং রহমত দানের প্রতিশ্রুতি শুনাইয়া থাকেন। আল্লার ভাণ্ডার অসীম এবং তিনি সর্বজ্ঞ।" (৩ পাঃ ৫ রুঃ)

হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! বেচা-বিক্রি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে বেহুদা কথা এবং অনাবশ্যক কসমের অবতারণা হইয়া থাকে; অতএব ব্যবসার সঙ্গে দান-খয়রাতকে জড়াইয়া রাখিও। (মেশকাত ২৪৩)

রিজিক কোশাদাহ হওয়ার আমল

১০৬৫। হাদীছ :— عن انس رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُبْسَطَ لَهُ

رِزْقُهُ اَوْيُنْسَاَ فِىْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তির আকাঙ্খা থাকে যে, তাহার খাওয়া পরায় স্বাচ্ছন্দ্য ও ধন-সম্পদে প্রশস্ততা লাভ হউক এবং তাহার মৃত্যুর পরেও তাহার সুনাম বাকি থাকে তাহার কর্তব্য হইবে আত্মীয়দের সহিত সুষ্ঠুরূপে আত্মীয়তা বজায় রাখিয়া চলা।

নিজ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করা

১০৬৬। হাদীছ :— عن المقدام ان النبى صلى الله عليه وسلم قال

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَاِنَّ نَبِىَّ اللهِ

دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ـ

অর্থ—মেকদাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও জন্য স্বহস্তে উপার্জিত খাদ্য গ্রাস অপেক্ষা উত্তম খাদ্য বস্তু আর কিছু হইতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট পয়গাম্বর দাউদ (আঃ) নিজ হস্তের উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

এখানে ৭৭৩ এবং ৭৭৪ নং হাদীছদ্বয়ও উল্লেখ হইয়াছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে কোমল ব্যবহার করা উচিত

১০৬৭। হাদীছ :— عن جابران رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرٰى وَاِذَا اقْتَضٰى ـ

অর্থ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—সেই লোকের উপর আল্লাহ তায়ালার রহমত বর্ষিত হওয়া সুনিশ্চিত যে ব্যক্তি বিক্রয়, ক্রয় এবং স্বীয় প্রাপ্যের তাগাদা করা কালে লোকের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করে।

সক্ষম খাতককে সময় দেওয়া

১০৬৮। হাদীছ :—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের পূর্বেকার উম্মতের এক ব্যক্তির রূহ—আত্মা ফেরেশতাগণ কবজ করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন বিশেষ নেক আমল তুমি করিয়াছ কি ? সে বলিল, আমি আমার ব্যবসা ক্ষেত্রে সক্ষম খাতকদেরকেও সময় ও অবকাশ দিতাম, তাহার ওজর আপত্তি গ্রহণ করিতাম। আর অক্ষম খাতকদেরকে মাফ করিয়া দিতাম। এতদ শ্রবণে ফেরেশতাগণও তাহার সহিত তাহার দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য না করার ব্যবহার করিলেন।

অক্ষম খাতককে মাফ করিয়া দেওয়া

১০৬৯। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَاِذَا رَاَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهٖ تَجَاوَزُوا عَنْهُ

لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যবসায়ী ব্যক্তি ছিল—সে লোকদিগকে বাকী ও ধার দিয়া থাকিত। যদি কোন ব্যক্তিকে দেখিতে যে, তাহার জন্য দেনা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে তবে স্বীয় কর্মচারীগণকে আদেশ করিত, এই ব্যক্তিকে মুক্তি ও রেহাই দান কর, এই অছিলায় আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে মুক্তি ও রেহাই দিতে পারেন। ফলে সত্যই আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে মুক্তি ও রেহাই দান করিয়াছেন।

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই সরলতা ও সত্যবাদিতা আবশ্যক গোপন হিলা বা ধোঁকাবাজী করা চাই না

আদ্দা ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার নিকট হইতে ক্রীতদাস ক্রয় করিয়াছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে এইরূপ বায়নামা সম্পাদন করিয়াছিলেন : এই এই বিবরণের ক্রীতদাসটিকে মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খালেদের পুত্র আদ্দার নিকট হইতে ক্রয় করিলেন—মোসলেম ব্যক্তিদ্বয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে—যেখানে উভয় পক্ষের প্রদত্ত বস্তুর মধ্যে কোন প্রকার গোপনীয় দোষ থাকে না, ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না।

● কোন কোন বেপারী ও দালাল ব্যক্তি স্বীয় আস্তাবল (ঘোড়ার ঘর) কে ঐ সমস্ত স্থানের নামে নামকরণ করিয়া রাখিত যে স্থানের ঘোড়া উত্তম ও প্রসিদ্ধ। যেমন কেহ স্বীয় ঘোড়ার ঘরকে 'খোরাসান' বা 'সিজিস্তান' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানের নামে নামকরণ

করিত ; অতঃপর ঐ সকল আস্তাবল হইতে স্বদেশজাত ঘোড়া সমূহকে বিক্রয় জন্য বাজারে উপস্থিত করিয়া ক্রেতাদিগকে এইরূপে প্রলুব্ধ করিত যে, এই ঘোড়া সবেমাত্র খোরাসান বা সিজিস্থান হইতে আনা হইয়াছে অর্থাৎ এই পশু ঐ প্রসিদ্ধ নামের স্থান হইতে নূতন আমদানী করা হইয়াছে। ক্রেতাগণ এই ঘোড়াকে ঐসব নামের সুপ্রসিদ্ধ দেশ ও স্থানের মনে করিয়া উহার প্রতি আকৃষ্ট হইত ; বস্তুতঃ উহা ঐ দেশ বা ঐ স্থানের নহে, বরং এই নামে নামকৃত বিক্রেতার নিজস্ব আস্তাবল হইতে আনীত দেশী ঘোড়া। এইরূপে ধোকা দিয়া মিথ্যা এড়াইবার ফন্দি করা হইত।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইব্রাহীম নখয়ী রহমতুল্লাহ আলাইহের নিকট উল্লিখিত উপায় অবলম্বনের মছআলাহ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উহাকে অতিশয় জঘন্য ও ঘৃণিত না-জায়েয (হারাম) বলিয়া উক্তি করিলেন।

● ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন মানুষের জন্য এরূপ করা জায়েয ও হালাল নহে যে, স্বীয় বিক্রয় বস্তু—পণ্যের মধ্যে দোষ ত্রুটি জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সে উহা প্রকাশ না করে।

১০৭০। হাদীছঃ— عن حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ

صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا

(فَعَسٰى اَنْ يَّرْبَحَا رِبْحًا وَ) مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

অর্থ—হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাবৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা পূর্ণরূপে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়া না লয় (জবান না দিয়া ফেলে) তাবৎ উভয় পক্ষের লওয়া-না-লওয়া ; দেওয়া না-দেওয়ার ক্ষমতা ইচ্ছাধীন থাকে। (কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হইয়া যাওয়ার পর এক তরফারূপে জবান ফিরাইয়া লওয়ার ক্ষমতা থাকে না—আদান-প্রদান বাধ্যতামূকক হইয়া যায়। এমতাবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে) যদি উভয় পক্ষ সততা অবলম্বন করে এবং স্বীয় বস্তুর দোষ ত্রুটি গোপন না রাখিয়া প্রকাশ করিয়া দেয় তবে সেই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বরকত ও মঙ্গল হইবে। পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা-বিক্রেতা স্বীয় বস্তুর দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, মিথ্যার আশ্রয় নেয় সেই ক্রয়-বিক্রয়ে বাহ্যিক দৃষ্টিতে হয়ত লাভ দেখিবে, কিন্তু উহাতে বরকত ও মঙ্গলের চিহ্নও থাকিবে না।

আলোচ্য হাদীছের উক্ত ব্যাখ্যানুযায়ী এই মছআলাহ প্রমাণিত হইবে যে, বিক্রেতা স্বীয় বস্তুর কোন মূল্য নির্দিষ্ট করিয়াছে, কিন্তু এখনও ক্রেতা উহা গ্রহণ করে নাই,

এমতাবস্থায় বিক্রেতা স্বীয় বাক্য প্রত্যাহার করিতে পারে। তদ্রূপ—ক্রেতা কোন মূল্য নির্দ্ধারণ করিলে বিক্রেতা কর্তৃক উহা গ্রহণের পূর্বে ক্রেতা স্বীয় বাক্য প্রত্যাহার করিতে পারে। উভয় পক্ষ হইতে গ্রহণের পরে উহা বাধ্যতামূলক হইয়া যায় এক তরফাভাবে কোন পক্ষ তাহার কথা প্রত্যাহার করিতে পারিবে না। কিন্তু উভয় পক্ষের একে অপরের কথা গ্রহণ এক বৈঠকে হইতে হইবে, নতুবা নহে—ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী মছআলাহরূপে বর্ণিত হইতেছে।

আলোচ্য হাদীছের অন্য একটি ব্যাখ্যাও করা হয় যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষ ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করার পরেও যাবৎ তাহারা স্থান পরিবর্তন করিয়া পৃথক হইয়া না যায়—কথাবার্তা সাব্যস্ত হওয়ার স্থানেই বিদ্যমান থাকে তাবৎ উভয় পক্ষের ঐ ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করার ক্ষমতা থাকে।

উল্লিখিত অবস্থায় অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়ার পরও ঐ স্থানে থাকা পর্য্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করার ক্ষমতা ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে বাধ্যতামূলক অর্থাৎ এক পক্ষ উহা ত্যাগ করিলে অপর পক্ষ তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে উক্ত ক্ষমতা বাধ্যতামূলক নহে বরং সৌজন্যমূলক। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়ার পর উভয় পক্ষ ইহা গ্রহণ করিতে বাধ্য, নতুবা মানুষের মুখের বাক্যের কোন মূল্যই থাকে না। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হইয়া এখনও বিলম্ব হয় নাই, বরং এখনও উভয় পক্ষ ঐ স্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে, এমতাবস্থায় এক পক্ষ ঐ ক্রয়-বিক্রয় হইতে ফিরিয়া যাইতে চাহিলে অপর পক্ষকে উহা মানিয়া লওয়া উচিত; মানুষের মধ্যে পরস্পর এতটুকু সৌজন্য ভাব বিদ্যমান না থাকিলে 'মানুষ' নামের অবমাননা হইবে।

মছআলাহ ঃ—বিক্রেতা তাহার বস্তুর মূল্য ১০ টাকা বলিয়াছে ক্রেতা আট টাকা বলিয়াছে, বিক্রেতা তাহাতে স্বীকৃতি দেয় নাই, অতঃপর ক্রেতা কথাবার্তার স্থান ত্যাগ করার পর বিক্রেতা ঐ বস্তু আট টাকা মূল্যে প্রদান করিতে রাজি হইয়া তাহাকে ডাকে; এমতাবস্থায় ক্রেতা ঐ বস্তু তাহার স্বীকৃত আট টাকা মূল্যেও গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে না। এক পক্ষ কোন মূল্য বলিলে বাধ্যতামূলকভাবে ঐ মূল্য গ্রহণ করার সুযোগ অপর পক্ষের জন্য শুধুমাত্র ঐ সময় পর্য্যন্ত থাকে যাবৎ উভয় পক্ষ কথাবার্তার স্থানে ও অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। ইজাব ও কবুলের পূর্বে কোন পক্ষে ঐ স্থান বা অবস্থা ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার (ক্রয়-বিক্রয়ের) সমস্ত কথাবার্তা ও স্বীকৃতি ভঙ্গ হইয়া যায়।

বর্তমানে শহর, বন্দর, হাট-বাজারের দোকানদারগণ এই মছআলাহ জানে না বলিয়া উক্ত অবস্থায় ক্রেতা স্বীয় স্বীকৃত মূল্যে ক্রয় করা প্রত্যাখান করিলে তাহার প্রতি অসৌজন্য বরং জঘন্য ব্যবহার প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহা নিতান্তই শরীয়তের বরখেলাফ মস্ত বড় অন্যায় ও গোনাহ।

ভাল-মন্দে মিশ্রিত দ্রব্য বিক্রি করা

মছআলাহ:—কাহাকেও ধোঁকা দিয়া নয়, বরং প্রকাশ্যে ভাল-মন্দ মিশ্রিত দ্রব্য বিক্রি করা জায়েয আছে।

১০৭১। **হাদীছ:**—আবু সায়ীদ খুদরী (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, (জাতীয় ধন-ভাণ্ডার বাইতুল-মাল হইতে) আমাদিগকে ভাতা দেওয়া হইত মিশ্রিত খোরমা। আমরা উহার দুই ধামা (ভাল খোরমা) এক ধামার বিনিময়ে বিক্রি করিতাম। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এক জাতীয় বস্তুর বিনিময়ে (পরিমাণে বেশকম করা—) এক ধামার বিনিময়ে দুই ধামা প্রদান করা বা এক দেহরামের বিনিময়ে দুই দেহরাম প্রদান করা জায়েয নহে।

ব্যাখ্যা:—একই জাতীয় বস্তু ভাল-মন্দের পার্থক্য হইলেও পরস্পর বিনিময়ে পরিমাণের বেশকম করিলে তাহা সুদ ও হারাম গণ্য হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি সমতা রক্ষা করার উদারতা কার্য্যকরী করা না যায় তবে সরাসরি উক্ত বস্তুদ্বয়ের বিনিময় করিবে না, বরং একটাকে নগদ মূল্যে বিক্রয় করিয়া সেই নগদ মূল্য দ্বারা অপরটা ক্রয় করিবে—এই-ভাবে ভিন্ন ভিন্ন খরিদ-বিক্রয়ের অনুষ্ঠান করিবে। সম্মুখে এই মছআলার বিবরণ আসিতেছে।

সুদ নিষিদ্ধ, বর্জনীয় ও হারাম*

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۔

---

* সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিধানকর্তা আল্লাহ তায়ালার অকাট্য বাণী কোরআন শরীফে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত প্রতিনিধি বিশ্ব-নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছুন্নত—হাদীছ শরীফে সুদ প্রথাকে স্পষ্ট হারাম ঘোষণা করত: যে সব কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে এবং সুদের পরিণামে যে সব কুফল ও কঠিন শাস্তির বর্ণনা দান করা হইয়াছে, এতদব্যতীত মোসলমান জনসাধারণের অন্তরে সুদের যে ঘৃণ্য রূপ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সবের পরিপ্রেক্ষিতে সুদের যে বাস্তব রূপ পরিস্ফুটিত ও প্রকটিত হয় মানবীয় জ্ঞানের যুক্তি ও মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত বিজ্ঞানে রচিত শত শত কারণ ও হেতু বর্ণনা করিয়া সুদের সেই বাস্তব রূপের কিয়দংশও প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

অর্থ—হে ঈমানদারগণ। তোমরা সুদ গ্রহণ করিও না (সুদ কত জঘন্য প্রথা যে, সময়ের দীর্ঘতার সঙ্গে সঙ্গে) উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া কত কত গুণ বাড়িয়া যায়। (এমনকি ঋণ গ্রহীতাকে সর্বহারা পর্য্যন্ত করিয়া দেয়।) তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর; ইহাতেই তোমাদের উন্নতি ও সাফল্য নিহিত রহিয়াছে এবং দোযখকে ভয় কর, উহা হইতে বাঁচিবার চেষ্টা কর; বস্তুতঃ দোযখ আল্লাহ-বিরোধী কাফেরদের জন্য তৈরী হইয়া রহিয়াছে। (তোমরা আল্লার বিরোধীতা এড়াইয়া জীবন যাপন করিলেই দোযখ হইতে রক্ষা পাইতে সক্ষম হইবে।) এবং আল্লাহ ও আল্লার রসুলের আনুগত্য অবলম্বন কর, ইহাতে তোমাদের প্রতি আল্লার করুণা ও দয়া হইবে। (৪ পাঃ ৫ রুঃ)

শরীয়তে হারাম ঘোষিত বিষয়-বস্তু সমূহের প্রতি নজর করিলে এই বাস্তব তথ্যটির আরও বহু নজীর পাওয়া যাইবে। যেমন যেনা বা ব্যভিচার, ইহা যে স্তরের ঘৃণ্য এবং ইহ-পরকালে যেরূপ কঠোর শাস্তির কারণ এবং সর্বসাধারণের অন্তরে ইহার যে ঘৃণ্যরূপ বিদ্যমান, সেই সবের পরিপ্রেক্ষিতে যেনার যে বাস্তব রূপ রহিয়াছে, শুধু যুক্তির দ্বারা যেনার সেই বাস্তব রূপ উদ্ভাসিত হইতে পারে না।

লক্ষ্য করুন। কেবলমাত্র মৌখিক কয়েকটি স্বীকৃতিমুলক বাক্য উচ্চারণ ও কতিপয় সামাজিক রছম-রেওয়াজ পুরণ করা ব্যতীত বিবাহিতা নারী ও অবিবাহিতা নারীর মধ্যে শুধু যুক্তির দ্বারা কি পার্থক্য উদঘাটন করা যায় যদ্দ্বারা স্ত্রীসহবাস হইতে যেনার পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া যেনার জঘণ্যতা ও ঘৃণ্য কদর্য্যতার বাস্তবরূপের এক শতাংশও প্রকাশ পায়?

বলা বাহুল্য—লাগামহীন পৈশাচিক যুক্তি অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত রূপও ধারণ করিয়া বসে। যেমন জনৈক পাপিষ্ঠ নরপিশাচ নগ্ন যুক্তিবাদী নিজ মাতার সহিত ব্যভিচার করিত এবং ইহার সমর্থনে এই যুক্তির অবতারণা করিত যে, যে দ্বার ও পথ বহিয়া আমার সম্পূর্ণ শরীর বাহির হইয়াছে, সেই দ্বার ও পথে আমার শরীরের একটি অংশ মাত্র পুনঃ প্রবেশ করিবে ইহা দোষনীয় কেন?

অন্য এক হতভাগা যুক্তিবাদী নরপশু স্বীয় যুবতী মেয়ের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইত এবং এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিত যে, আমি নিজ পরিশ্রম ও ব্যয়ভার বহনের দ্বারা বৃক্ষ রোপণ করিয়াছি, উহাতে ফল ধরিয়াছে এবং উহা পাকিয়াছে এখন উহাকে উপভোগ করার অধিকারী আমি ভিন্ন অন্য কেহ কেন হইবে?

মানবতা ও সৃষ্টিকর্তার শাসনতন্ত্র তথা শরীয়তের নির্দেশ ইত্যাদি কোন কিছুর ধার না ধারিয়া শুধু যুক্তি তর্কের এহেন তীক্ষ্ণ হাতিয়ার কি আছে, যদ্দ্বারা উপরোক্ত নগ্ন যুক্তিবাদীদের ঘৃণ্য যুক্তি খণ্ডন পুর্বক তাহাদের কুকার্য্যের বাস্তব স্বরূপ উদঘাটন করা যায়?

অতএব যে কোন বিষয় বর্জনীয় বা গ্রহণীয় এবং ঘৃণ্য বা উত্তম হওয়ার উপলব্ধি করা উপলক্ষে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধানকর্তা ও মানবের জীবন যাত্রার নীতি নির্দ্ধারণের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার প্রতিনিধি রসুলের তথা শরীয়তে নিষেধাজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি করাই সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম ও সর্বাধিক নিরাপদ পন্থা। বস্তুতঃ মানব রচিত জাগতিক শাসনতন্ত্রকেও অনুরূপ মর্য্যাদা দেওয়া হইয়া থাকে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক ঘোষিত শাসনতন্ত্রকে ততটুকু মর্য্যাদা দানে কুণ্ঠিত হওয়া বড়ই অনুতাপের বিষয়।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—...... الذين يأكلون الربو পূর্ণ আয়াত ও উহার অর্থ আলোচ্য অধ্যায়ের প্রারম্ভে উল্লিখিত প্রথম আয়াতের বিবরণে বর্ণিত আছে।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ - فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

অর্থ—হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের লেন-দেন ও সংশ্রব যাহা কিছু বাকি আছে সব পরিত্যাগ কর যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও। তোমরা এই আদেশ অনুযায়ী কাজ না করিলে আল্লাহ্ ও আল্লার রসুলের পক্ষ হইতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা শুনিয়া রাখ। (৩ পাঃ ৬ রুঃ)

ঐরূপেই বাঘ, ভাল্লুক, হাতী, শৃগাল, কুকুর, শূকর ইত্যাদি হারাম হওয়া এবং গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদির হালাল হওয়া এতদ্‌ভিন্ন পশু-পক্ষীর গলগণ্ডের চারটি রগ আল্লার নামে কাটিলে তাহা হালাল হওয়া এবং অন্য উপায়ে বধকৃত হারাম হওয়া ইত্যাদি বহু নজীরই বিদ্যমান আছে। এই বক্তব্যের তাৎপর্য ইহা নহে যে, হারাম বস্তু ও বিষয় সমূহের বর্জনীয় হওয়ার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ ও হেতু থাকে না। অবশ্যই কারণ ও হেতু থাকে বটে, কিন্তু শুধু যুক্তি বা বিজ্ঞান রচিত কারণ ও হেতুর উপর নির্ভর করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হারাম বস্তুর বাস্তব রূপ আংশিক রূপেও উদ্ভাসিত না হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। যেরূপ দশ মণ ওজনের কোনও বস্তুকে এক তোলা পরিমিত পাথর দ্বারা পরিমাপ করিলে উহার ওজনের বাস্তব পরিমাণ কখনই প্রকাশ পাইবে না। সুতরাং হারাম বিষয়-বস্তু সমূহের বর্জনীয়তা ও ঘৃণাস্পদতাকে সর্বদা আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত নীতি ও নিষেধাজ্ঞার মাপকাঠিতে পরিমাপ করিবে শুধু যুক্তির মাপকাঠিতে নহে। এবং অমোসলেমদের মোকাবিলায় আমরা সর্বপ্রথমে ধর্মের সত্যতার চ্যালেঞ্জের পথ গ্রহণ করিব।

অবশ্য যুক্তি সঙ্গত কোনও কারণ উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে উহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে, কিন্তু কেবলমাত্র সেই কারণের উপর হারাম বিষয় বস্তুর বর্জনীয়তা ও ঘৃণাস্পদতা নির্ভর করিবে না। এবং সেই কারণের তুলনায় উহার পরিমাপও করা হইবে না। যেরূপ—সুদ হারাম হওয়ার বিষয় বলা হইয়া থাকে যে, একদিকে এক গরীব অন্ন-বস্ত্রের অভাবে কোন এক ধনাঢ্যের নিকট হইতে কিছু টাকা ধার আনে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন সামান্য জায়গা জমি, ঘর বাড়ীটুকু পর্যন্ত বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করে। অপরদিকে ঐ দুরাচার স্বীয় আসল টাকার উপর সুদের হিসাব যোগ করিতে থাকে। এমনকি অবশেষে দেনার দায়ে গরীবের সর্বস্ব গ্রাস করিয়া নেয়। এহেন মানবতা বিরোধী নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার প্রশ্রয় দেওয়ার ন্যায় নৃশংস ও ধর্দর্য্য কার্য্য কি হইতে পারে? ইসলামের ন্যায় শাশ্বত সনাতন ধর্মে এরূপ কার্য্যের অনুমতি থাকিতে পারে না।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

অর্থাৎ যদি তোমরা ঐ আদেশ অনুসরণ না কর তবে প্রমাণিত হইবে যে, তোমরা আল্লাহ-রসুলের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী দলভুক্ত হইয়াছ; ইহার ভয়াবহ পরিণতি কি হইবে তাহা তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰو وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ.

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা সুদকে ধ্বংস করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্দ্ধিত করেন। আল্লাহ তায়ালা কোন বিদ্রোহী পাপীকে পছন্দ করিবেন না। (৩পা: ৬রু:)

ব্যাখ্যা:—সুদকে ধ্বংস করার পরলৌকিক পর্য্যায় ত অতিশয় সুস্পষ্ট। তদুপরি সুদে অর্জিত মালের দ্বারা অনুষ্ঠিত নেক কার্য্যের উপর কোনও ছওয়াব ও ফলাফল প্রতিফলিত হইবে না এবং আখেরাতে সুদখোর ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ইহজগৎ যেহেতু পরীক্ষার স্থল—নেকী বদী উভয়ের সুযোগ প্রাপ্তির স্থান; তাই কোন কোন সময় উক্ত আয়াতের তথ্যের বিপরীত অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু সাধারণত: তাহা ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। প্রায়শ: এইরূপ দেখা যায়, মোসলমান সুদের দ্বারা উন্নতি লাভ করিলেও অচিরেই তাহার ধ্বংস সাধিত হয়।

সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে এই ধরণের যুক্তি ও কারণ উল্লেখ করা হইলে তাহা উপেক্ষা করা হইবে না বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ রূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নতুবা শয়তানের ধোকায় পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা অধিক। প্রথম এই যে, মানবীয় জ্ঞান ও মানব মস্তিষ্কের চিন্তার চাষ দ্বারা সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে যেসব যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক কারণ রচিত হয় বা হইতে পারে, সুদ হারাম হওয়ার সমুদয় বাস্তবিক কারণ ও হেতু উহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ—এরূপ ধারণা কখনও অন্তরে স্থান দিবে না। শয়তান এরূপ ধারণায় পতিত করার জন্য নিশ্চয় চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহার ফাঁদে কখনও পড়িবে না। বরং দৃঢ়ভাবে এই কথা মনে গাঁথিয়া রাখিবে যে, ঐ সব যুক্তির কারণ ও হেতু ব্যতীত আরও কারণ আছে, যাহা আলেমুল-গায়েব সর্বজ্ঞ, আলীম ও হাকীম—সর্বজ্ঞানী ও বিজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা প্রথম হইতেই জ্ঞাত ছিলেন যদ্দরুন তিনি স্বীয় বাণী ও প্রতিনিধির মারফৎ ভয়ঙ্কর উক্তি ও কঠোর ভাষায় সুদকে হারাম ঘোষণা করিয়াছেন।

এই বিষয়টি কোন বেখাপ্পা কথা নহে বরং বাস্তব সত্য। কারণ মানবের জ্ঞান-বিন্দু অতি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং বলিয়াছেন, "শুধু বিন্দুবৎ জ্ঞানই তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে।" অতএব, আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে যে সব রহস্য, কারণ ও হেতু রহিয়াছে, আমাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান-বিন্দুতে সে সবের সঙ্কুলান হইতে পারে না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে তাহা এই যে, কোরআন-হাদীছে সুদ হারাম বলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর উহা শরীয়ত তথা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

দান-খয়রাতকে বর্দ্ধিত করার পরলৌকিক পর্য্যায়ের তথা ছওয়াব বর্দ্ধিত করার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত অনেক অনেক আয়াতে ও হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে, যথা—পবিত্র কোরআন ৩ পারা ৪ রুকুতে আছে, একটি ধান বা গমের বীজ হইতে এক গুচ্ছ ধান বা গম গাছ জন্মে যাহার মধ্যে কতকগুলি ছড়া হয়, এক এক ছড়ায় শত শত ধান বা গম হয় এইরূপে এক একটি বস্তু দান-খয়রাত করাতে বহু বহু ছওয়াব লাভ হইবে। একাধিক হাদীছে এরূপও বর্ণিত আছে যে, এক একটি খোরমা দান করায় আখেরাতে পাহাড় তুল্য ছওয়াব লাভ হইবে।

একটি আইনরূপে গণ্য রহিয়াছে। এমতাবস্থায় কোন যুক্তি বা বিশ্লেষণের দ্বারা ঐ আইনকে বিকৃত বা খণ্ডন করার অধিকার কাহারও নাই। ইহা একটি ন্যায় সঙ্গত যুক্তিযুক্ত অনস্বীকার্য্য শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদা। উদাহরণ স্বরূপ যেমন—হয়ত রেলওয়ে কোম্পানী আইন করিয়া দিয়াছে যে, প্রত্যেক যাত্রী পঁচিশ সের ওজনের আসবাবপত্র নিজ সঙ্গে বিনা ভাড়ায় বহন করিতে পারিবে। কোন কাবুলি ব্যক্তি যদি এক-দেড় মণ ওজনের আসবাবপত্র সঙ্গে বহন করতঃ টিকেট মাষ্টারের সঙ্গে এইরূপ যুক্তির অবতারণা করে যে, পঁচিশ সেরের আইন বাঙ্গালী লোকদের জন্য করা হইয়াছে, যেহেতু তাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল—সাধারণতঃ পঁচিশ সেরের অধিক তাহারা নিজে বহন করিতে সক্ষম হয় না; তাই রেলওয়ের আইনে এই পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। আমরা কাবুলী অতি শক্তিশালী—আমরা সাধারণতঃ নিজে এক দেড় মণ বহন করিতে সক্ষম; তাই আমাদের জন্য অধিক সুযোগ হওয়াই বাঞ্ছনীয়; এমতাবস্থায় কাবুলি ব্যক্তির এইরূপ যুক্তির দ্বারা কি কোম্পানীর আইন বদলিয়া যাইবে? তাহা কখনও সম্ভব নহে।

সুদকে হারাম ও নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে বর্তমান যুগের ব্যাংকিং (Banking) ব্যবস্থা বিশেষরূপে প্রতিবন্ধক হইয়া দাড়ায়।

যদিও ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা; কিন্তু অমোসলেম জাতি কর্তৃক উহা প্রণীত হওয়ায় উহা সুদের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ব্যাংকিং ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করিতে ইচ্ছুক নহি, কিন্তু যাহারা এরূপ বলিতে চায় যে, সুদ ব্যবস্থা ব্যতীত ব্যাঙ্ক চলিতে পারে না—তথা ইসলামী আইন ও বিধানে ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনার কোনও সুনির্দিষ্ট পন্থা নাই; আমরা কঠোর ভাষায় তাহাদের এই ভুল ধারণার বিরোধীতা করিব এবং এই ধারণাকে ভিত্তিহীন ও অজ্ঞতা প্রসূত আখ্যায়িত করিব।

অর্থনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামে এমন এমন ব্যবস্থাও রহিয়াছে যে ব্যবস্থায় ও পন্থায় উন্নত ধরণের এবং অধিক কল্যাণমূলক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত করা যায়। বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ডে এই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করা হইয়াছে। আনন্দের বিষয়—আমরা তথায় যে ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছি উহার বিস্তারিত বিবরণ একটি পুস্তিকা আকারে দেখিতে পাইলাম। মিশরীয় এরাবিক ব্যাঙ্কের জনৈক অভিজ্ঞ কর্মচারী "আলীউল-জাউজী" কর্তৃক আরবী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ ঐ পুস্তিকায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মূল প্রবন্ধটি মিশরীয় আরবী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রঃ) কর্তৃক অনূদিত হইয়া বিগত ২৪।৪।৬০ বাংলা তারিখের "দৈনিক আজাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমানে ত বাংলাদেশে ও আরবদেশ সমূহে এবং পাকিস্তানে ইসলামী ব্যাঙ্কই উন্নত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ইহজগতেও দান-খয়রাতের দ্বারা বরকত, মঙ্গল ও ধনে-জনে উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। অনেক সময় সেইরূপ উন্নতি দেখা যায় না, কিন্তু দান-খয়রাতের দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যতের অনেক বিপদ-আপদ কাটিয়া যায়।

সুদখোরের শাস্তি সম্পর্কে ৭২১ নং হাদীছের অংশবিশেষ লক্ষণীয়।

সুদ দাতা ও গ্রহীতা এবং সুদের সাক্ষী ও লিখক প্রত্যেকেই গোণাহের ভাগী

১০৭২। **হাদীছ:—** عن عون بن ابى جحيفة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَأَيْتُ أَبِى اشْتَرٰى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَاٰكِلَ الرِّبٰو وَمُوْكِلَهٗ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ۔

অর্থ—আবু জোহায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার পিতাকে দেখিলাম, তিনি একটি ক্রীতদাস ক্রয় করিয়া আনিলেন। ক্রীতদাসটির রক্তমোক্ষণ (সিঙ্গা লাগান) কার্য্যে দক্ষতা ছিল, (তাহার নিকট সেই কার্য্যের যন্ত্রপাতিও ছিল। আমার পিতা সেই সব যন্ত্রপাতি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।) আমি আমার পিতাকে ঐসব ভাঙ্গিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিম্নে বর্ণিত তিন প্রকারের অর্থ উপার্জন নিষিদ্ধ করিয়াছেন—(১) রক্তমোক্ষণ কার্য্য দ্বারা অর্থ উপার্জন করা। (২) কুকুর বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ উপার্জন করা। ক্রীতদাসীকে ব্যাভিচারে লিপ্ত করিয়া অর্থ উপার্জন করা। এতদ্ভিন্ন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিগণের প্রতি লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন—(১) যে ব্যক্তি মানুষের শরীরে সুচী বিদ্ধ করিয়া চিত্র অঙ্কনের কার্য্য ও ব্যবসা করে। (২) যে ব্যক্তি স্বীয় শরীরে ঐ চিত্র-অঙ্কন গ্রহণ করে। (৩) যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করে। (৪) যে ব্যক্তি সুদ প্রদান করে। এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছবি প্রস্তুতকারীর প্রতি লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা:—রক্তমোক্ষণ কার্য্য তথা সিঙ্গা লাগান একটি অতিশয় নিম্নস্তরের এবং ঘৃণিত কার্য্য। অন্য ব্যক্তির শরীরের বদ-রক্ত মুখে টানিয়া বাহির করা—যাহা চোখে দেখিলেও অতিশয় ঘৃণার উদ্রেক হয়। মোসলমান পাক পবিত্র ও সম্মানিত জাতি, তাহাদের জন্য এরূপ ব্যবসা অবলম্বন করা উচিৎ নহে।

কুকুর ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি একটি বিশেষ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণিত হইবে।

এই হাদীছের মধ্যে আরও একটি বিশেষ মছআলাহ বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমান যুগেও অনেককে এরূপ করিতে দেখা যায় যে, হাতের উপর বা শরীরের নানা স্থানে এক প্রকার সূঁচযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে চামড়া চিরিয়া স্বীয় নাম বা অন্য কিছু অঙ্কন করে বা জীব-জন্তু, লতা-পাতার ছবি আঁকিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিজ শরীরে ইহা গ্রহণ করে এবং যে ব্যক্তি এই কার্য্য ও ব্যবসা করিয়া থাকে, উভয়ের প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন।

সুদের ব্যাপারে এই হাদীছে দাতা ও গ্রহীতার প্রতি লা'নত ও অভিশাপ উল্লেখ হইয়াছে, মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের সাক্ষী এবং সুদের দলিল লিখক ইত্যাদি সকলের প্রতি লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন।

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় কসম খাওয়া

১০৭৩। **হাদীছঃ**—আবদুল্লা ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার বিক্রয়-বস্তু বাজারে উপস্থিত করিল; অন্য এক মোসলমান ব্যক্তি উহা ক্রয় করার জন্য আসিল; তখন বিক্রেতা তাহাকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কসম খাইয়া বলিল, আমার এই বস্তুটির এত মুল্য বলা হইয়াছে—অথচ উহার ঐ মুল্য বলা হয় নাই। তখন ঐরূপ মিথ্যা কসম খাওয়ার বিষময় ফল বর্ণিত হইয়া এই আয়াতটি নাযেল হয়—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ..... وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অর্থ—যাহারা (মিছামিছি) আল্লার নিকট ঠেকা থাকিবে বলিয়া এবং আল্লার নামের কসম খাইয়া দুনিয়ার সামান্য ধন অর্জন করিবে, আখেরাতে তাহাদের ভাগ্যে কিছুই জুটিবে না এবং আল্লার রহমতের বাণী, রহমতের দৃষ্টি তাহারা পাইবে না এবং আল্লাহ তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না। (অর্থাৎ তাহাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন না) এবং তাহাদের জন্য ভীষণ যাতনাদায়ক আজাব প্রস্তুত রহিয়াছে। (৩ পাঃ ৬ রুঃ)

১০৭৪। **হাদীছঃ**— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْحَلْفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ

مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মিথ্যা কসম বিক্রয়-বস্তুকে চালু করিয়া দেয় বটে, কিন্তু (ধন-দৌলত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের) বরকত ও উন্নতি মুছিয়া ফেলে।

মছআলাহ ঃ—ব্যবসা-বাণিজ্যে মিথ্যা কসম খাওয়া মস্ত বড় গোনাহ ত আছেই, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সত্য কসম খাওয়াও মকরূহ। (ফতহুল বারী)

দোষী বস্তু ক্রয় করিয়া ক্রেতা যদি উহা রাখায় সম্মত হয় তবে রাখিতে পারে

১০৭৫। **হাদীছ ঃ**—আম্‌র ইবনে দীনার (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের এখানে এক ব্যক্তি ছিল "নাওয়াছ" নামের। তাহার একটি উট ছিল সদা-তৃষ্ণা রোগগ্রস্ত (যে রোগকে সংক্রামক ও ছোঁয়াচে গণ্য করা হয়)। ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ উটটি উক্ত ব্যক্তির অংশীদারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া নিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে ঐ ব্যক্তি অংশীদারের নিকট আসিল এবং সেই উটটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। অংশীদার বলিল, উহা বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছি; সে জিজ্ঞাসা করিল, কাহার নিকট বিক্রি করিয়াছ? অংশীদার ক্রেতা ব্যক্তির আকৃতি বর্ণনা করিলে সে বলিল, তোমার সর্বনাশ! তিনি ত ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)। তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমার অংশীদার সদা-তৃষ্ণা রোগগ্রস্ত একটি উট আপনার নিকট বিক্রি করিয়াছে; সে আপনাকে চিনিতে পারে নাই। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, তা হইলে উটটি তুমি ফেরত নিয়া যাও! ঐ ব্যক্তি যখন উটটি ফেরত লইয়া রওয়ানা হইল তখন তিনি বলিলেন, উটটি থাকিতে দাও। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার উপর আস্থা স্থাপন করিলাম। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যধি ছোঁয়াচে ও সংক্রামক নাই।

রক্তমোক্ষণ ব্যবসা করা

১০৭৬। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু-তায়্যবাহ্ (নামক এক গোলাম পেশাদারী রক্তমোক্ষণকার) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রক্তমোক্ষণ করিয়াছিল। হযরত (দঃ) তাহাকে এক ধামা খোরমা দেওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন এবং তাহার মালিককে সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহার উপর উপার্জনের বোঝা কিছু কম করিতে।

১০৭৭। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রক্তমোক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং রক্তমোক্ষণকারকে তাহার পারিশ্রমিক দিয়াছেন। যদি সেই কাজের পারিশ্রমিক হারাম হইত তবে হযরত (দঃ) উহা দিতেন না।

খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা

১০৭৮। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে দেখিয়াছি, যাহারা বাজার-বন্দর হইতে অগ্রসর হইয়া এবং বাহিরে যাইয়া আমদানীকারকদের নিকট হইতে লট বা সমষ্টি হিসাবে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া নেওয়ার ব্যবস্থা করিত নবী (দঃ) তাহাদের প্রতি লোক পাঠাইয়া দিতেন—যাহারা

তাহাদিগকে বাধা দান করিত, তাহারা যেন তাহাদের ক্রয়-বস্তু ক্রয়-স্থল হইতে বহন করতঃ বাজার-বন্দরে ঐ বস্তুর বিক্রয়কেন্দ্রে তাহাদের প্রকাশ্য দোকানে উপস্থিত না করিয়া ক্রয়স্থলেই বিক্রয় না করে। এমনকি এই বাধা-নিষেধের ব্যতিক্রম করিলে তাহাদের প্রতি বেত্রদণ্ডের শাস্তিও প্রয়োগ করা হইত। (হাদীছটি ২৮৬ পৃষ্ঠায় এবং ২৮৯ পৃষ্ঠায় দুইবার উল্লেখিত হইয়াছে, সমষ্টির অনুবাদ হইল)।

ব্যাখ্যা ঃ—দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা মানুষের কষ্ট হউক, ইহা প্রতিরোধের প্রতি শরীয়তে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। জনসাধারণের কষ্টের এই যাঁতাকল সাধারণতঃ দুইটি কারণে অতি সহজে সৃষ্টি হইয়া থাকে। এক হইল—পুঁজিপতিগণ কর্তৃক পণ্যদ্রব্য গোপন ও গুদামজাত করতঃ বাজার-বন্দরের সাধারণ বিক্রয় কেন্দ্রে ও প্রকাশ্য দোকানে পণ্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করার দ্বারা। আর এক হইল—সাধারণ বিক্রয় কেন্দ্রে সাধারণ দোকানদার ও সাধারণ বিক্রেতাদের নিকট পণ্য দ্রব্য পৌছিবার পূর্বেই পুঁজিপতিগণ কর্তৃক পণ্যের সমষ্ঠি হস্তগত করার দ্বারা। কারণ, এই পন্থায় জনসাধারণের নিকট পণ্যদ্রব্য পৌছিতে অধিক হাত বদল হয়, ফলে অনিবার্য্যই পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আলোচ্য হাদীছে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির উভয় পথে বাধার সৃষ্টি করা হইয়াছে। একে ত ক্রয়-স্থলে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ক্রয়স্থলে বিক্রয় না করিয়া তথা হইতে বহন করিতে হইলেই বিরাট ঝামেলা আসিয়া যায়; পুঁজিপতিগণ উহাকে ভয় করে। তাহারা ত চায় শুধু টাকার জোরে হাত বদলের মাধ্যমে সিংহ ভাগ লাভ লুটিয়া নিয়া আসা। টাকার জোরে শুধু মাত্র হাত-বদলের মাধ্যমে লাভ করার সুত্র বন্ধ করার জন্য সরাসরিভাবে হাদীছে নিশেধ করা হইয়াছে—পণ্যদ্রব্য সাধারণ বাজারে পৌছিবার পুর্বে অগ্রগামী হইয়া কেহ ক্রয় করিবে না। বিস্তারিত বিবরণ ১০৯৩ ও ১০৯৪ নং হাদীছের বর্ণনায় আসিতেছে।

আর এক হইল—ক্রয়কৃত পণ্য সাধারণ বাজারে প্রকাশ্যে দোকানে উপস্থিত করিয়া বিক্রয় করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলেই আর গুদামজাত ও পণ্যদ্রব্যের গোপন ভাণ্ডার সৃষ্টির সুযোগ থাকিবে না যদ্দারা কৃত্রিম অভাবের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধির সর্বপ্রধান কারণ—এই গুদামজাত করার এবং গোপন ভাণ্ডারে পণ্য জমা রাখার বিরুদ্ধে বিভিন্ন হাদীছে অনেক কঠোর বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। যথা—

১। পণ্যদ্রব্য গুদামজাত যে-ই করিবে সে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে।

২। যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করিয়া মোসলমানদিগকে কষ্টে ফেলিবে, পরিণামে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কুষ্ঠরোগে এবং দারিদ্রে পতিত করিবেন।

৩। যে ব্যক্তি পণ্য আমদানী করিয়া লোকদের অভাব মিটায় সে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিবে, আর যে পণ্য গুদামজাত করে তাহার প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হইবে।

৪। যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিন গুদামজাত করিয়া রাখিবে তাহার সম্পর্ক আল্লাহ হইতে এবং আল্লার সম্পর্ক তাহার হইতে ছিন্ন হইয়া যাইবে।

৫। যে ব্যক্তি পণ্য গুদামজাত করিবে এই উদ্দেশ্যে যে, জনসাধারণ মোসলমানকে এই সুত্রে মুল্য বৃদ্ধির ফাঁদে ফেলিবে সে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। (ফতহুল বারী ৪—২৭৭)

প্রকাশ থাকে যে, মুল্য বৃদ্ধির ফাঁদরূপে পণ্য গুদামজাত করণ হারাম এবং উহা সম্পর্কে উল্লিখিত হাদীছ সমূহে কঠোর বাণী রহিয়াছে। যেমন—উল্লিখিত ২ ও ৫ নং হাদীছে উহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে স্বাভাবিক ব্যবসারূপে পণ্য গুদামজাত করিলে এবং অভাব দেখা দিলে সাধারণ লাভে বাজারে পণ্য ছাড়িয়া দিলে সে ক্ষেত্রে কোন দোষ নাই।

ক্রয় বা বিক্রয় নাকচ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ

মছআলাহ ঃ—ক্রেতা বা বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্তের মধ্যে এবং পরেও এক পক্ষ অপর পক্ষের অনুমতিক্রমে স্বীয় চুক্তি তথা ক্রয় বা বিক্রয় নাকচ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিতে পারে। যথা—এরূপ বলিতে পারে যে, তিন দিন পর্য্যন্ত ক্রয় বা বিক্রয় ভঙ্গ করার অধিকার আমার থাকিবে। এই ক্ষেত্রে অধিকার সংরক্ষণকারী পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি ছাড়াই ক্রয় বা বিক্রয় নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ভঙ্গ করিয়া দিতে পারে। ইহাকে পরিভাষায় খেয়ারে-শর্ত বলা হয়।

১০৭৯। হাদীছ ঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِيْ بَيْعِهِمَا

مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْيَكُوْنَ الْبَيْعُ خِيَارًا.........

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে যাবৎ ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণরূপে সাব্যস্ত না করে তাবৎ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন না করার অধিকার উভয় পক্ষেরই থাকে। (কিন্তু উভয় পক্ষ কর্তৃক ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়া ফেলার পর উভয়ের আদান-প্রদান বাধ্যতামূলক হইয়া যায়।) অবশ্য চুক্তি নাকচ করার ক্ষমতা সংরক্ষণের সহিত ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হইয়া থাকিলে—(সে ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়ার পরও বাধ্যতামূলক হয় না; ক্ষমতা সংরক্ষণকারী চুক্তি ভঙ্গ করিয়া দিতে পারে।)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কোন বস্তু ক্রয় করিতে উহা তাঁহার মনঃপুত হইলে যথা-সত্তর বিক্রেতার সহিত কথা সম্পূর্ণ রূপে সাব্যস্ত করিয়া চলিয়া আসিতেন। (২৮৩ পৃঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আলোচ্য হাদীছটির অন্য আর এক ব্যাখ্যাও করা হয়, বিস্তারিত বিবরণ ১০৭০ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

"খেয়ারে-শর্ত" বা চুক্তি নাকচের ক্ষমতা সংরক্ষণ সম্পর্কে অনেক মছআলাই ফেকা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। বোখারী (রঃ) এখানে দুইটি মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন—

● চুক্তি ভঙ্গের ক্ষমতা সংরক্ষণ কত দিন মেয়াদের হইতে পারে ?

এই ব্যাপারে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু প্রচলন ও ফৎওয়া ইহাই যে, উভয়ের মধ্যে যতদিনের মেয়াদ নির্দ্ধারিত হইবে ততদিন সেই ক্ষমতা থাকিবে। অবশ্য সর্বদার জন্য ঐরূপ রাখিলে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিই অশুদ্ধ হইবে। (আলমগীরী, ৩—৩৫)

● যদি নির্দ্ধারিত কোন মেয়াদের উল্লেখ না করিয়া চুক্তিভঙ্গের ক্ষমতা রাখে তবে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে কি ?

উত্তর :—ঐ অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত বলিয়া পরিগণিত হইবে না, (ফলে যে কোন পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি ব্যাতিরেকেই উক্ত ক্রয়-বিক্রয় নাকচ করিয়া দিতে পারে।) অবশ্য যাহার পক্ষে ক্ষমতা সংরক্ষিত ছিল সে যদি উক্ত ক্ষমতা পরিত্যাগ করে কিম্বা সে ক্রয় বস্তুর ব্যাপারে এমন কোন কাজ করে যাহা ক্রয়-চুক্তি গ্রহণ করা বুঝায় বা চুক্তি ভঙ্গের পূর্বে সে মরিয়া যায় তবে সে ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত বলিয়া গণ্য হইবে। (আলমগীরী, ৩ – ৫৩)

ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্তের বৈঠকেই কোন পক্ষ তাঁহার কথা হইতে ফিরিয়া যাইতে চাহিলে সেই অধিকার তাহার থাকিবে

উল্লেখিত ১০৭৯ নং হাদীছের এক অর্থ এই মছআলাহ বর্ণনায়ই করা হইয়া থাকে এবং সেই সূত্রে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং বিশিষ্ট কতিপয় তাবেয়ী ও ইমাম শাফেয়ী (রঃ) উক্ত অধিকারকে বাধ্যতামূলক বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ প্রত্যেক পক্ষই অপর পক্ষের অসম্মতি ক্ষেত্রেও উক্ত অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে। অবশ্য বিক্রয় সম্পাদনের পর যদি এক পক্ষ অপর পক্ষকে বলে, "সম্মতি দিন" অপর পক্ষ বলিল, "সম্মতি দিলাম" ইহার পর আর ঐ অধিকার থাকে না। পরবর্তী পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) এই মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মুল আলোচ্য অধিকারকে সৌজন্যমূলক বলিয়া থাকেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আমাদের দেশে এই ব্যাপারে বিশেষতঃ ক্রেতা ফিরিয়া গেলে অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হইয়া থাকে; ইহা অতি জঘন্য।

যে জিনিষ এখনও হস্তগত হয় নাই উহা বিক্রি করা নিষেধ

১০৮০। হাদীছ ঃ— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه

অর্থ—আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন খাদ্যবস্ত স্বীয় হস্তাধীনে ও আয়ত্তে আনিবার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

১০৮১। হাদীছ ঃ—আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেহ কোন খাদ্যবস্ত ক্রয় করিলে বিক্রেতার নিকট হইতে উহা উস্থল করিয়া লওয়ার পূর্বে বিক্রি করিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছের মূল উদ্দেশ্য একটি প্রসিদ্ধ মছআলাহ। মছআলাটি এই—এমন কোন বস্ত যাহা এখনও তোমার হস্তাধীন ও নিজ আয়ত্তে আসে নাই উহার বিক্রয় শুদ্ধ হইবে না। এমনকি তুমি এক মণ চাউল বা একটি গাভী বা এক খান কাপড় ক্রয় করিয়াছ এবং উহার মূল্যও পরিশোধ করিয়াছ, কিন্তু বিক্রেতা এখনও উহা তোমাকে অর্পণ করে নাই এবং তুমি এখনও উহা গ্রহণ কর নাই; এমতাবস্থায় তোমার জন্য উহা বিক্রয় করা দুরুস্ত হইবে না।

মূল হাদীছের মধ্যে খাদ্য বস্তর উল্লেখ থাকিলেও উক্ত মছআলাটি খাদ্যবস্ত এবং অন্য সকল প্রকার বস্তর ব্যাপারেই প্রযোজ্য।

কোন বস্ত ক্রয় করিলে উহা উস্থল করা ও হস্তগত করার যে সঙ্কীর্ণ অর্থ সাধারণতঃ বুঝা যায় যে, উহা স্বীয় মুষ্টিবদ্ধ করা—এক্ষেত্রে উহা উদ্দেশ্য নহে। এক্ষেত্রে হস্তগত ও উস্থল করার অতি প্রশস্ত অর্থ উদ্দেশ্য; যাহার বিস্তারিত বিবরণ ফেকা শাস্ত্রে রহিয়াছে। বিশেষতঃ প্রত্যেক জিনিষের—যেমন, বাড়ী-ঘর আর গরু ঘোড়া ইত্যাদি হস্তগত করার আকার বিভিন্ন। নিম্নে কতিপয় মছআলার উদ্ধৃতি দেওয়া হইল যদ্দারা হস্তগত করার অর্থের প্রশস্ততা অনুমিত হয়; যথা—

● কোন বস্তর ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করার পর বিক্রেতা উক্ত বস্তকে ক্রেতার হস্তগত করার জন্য মুক্ত করিয়া ও বলিয়া দিলেই সর্বসম্মতরূপে উহা হস্তগত বলিয়া গণ্য হইবে। এমনকি যদি এমতাবস্থায় ঐ পণ্যবস্ত বিক্রেতার ঘরেই থাকে তবুও উহা হস্তগতই গণ্য হইবে (আলমগীরী, ৩—২২)। ● একটি পাখী বিক্রেতার দীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত গৃহে উড়ন্ত অবস্থায় রহিয়াছে কিন্ত ঘর আবদ্ধ; দরওয়াজা না খুলিলে উহা বাহির হইতে পারে না; এমতাবস্থায় ক্রেতাকে উহা ধরিয়া নেওয়ার অনুমতি দিয়া দিলেও সে ক্ষেত্রে উহা

হস্তগত বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য ঘরের দরওয়াজা বাতাসে খুলিয়া যাওয়ায় পাখী বাহির হইয়া গেলে ক্রেতার মূল্য দিতে হইবে না। ক্রেতা কর্তৃক দরওয়াজা খোলার কারণে পাখী বাহির হইলে তাহাকে অবশ্যই মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে (আলমগীরী, ৩—২৪)। নির্দ্ধারিত পরিমাণ পণ্য ক্রয় সাব্যস্ত করিয়া ক্রেতা বস্তা বা পাত্র দিয়াছে, বিক্রেতা সেই বস্তায় বা পাত্রে উক্ত পণ্য রাখিলেই সেক্ষেত্রে হস্তগত করা সাব্যস্ত হইবে। এমনকি ক্রেতার অসাক্ষাতে রাখিলে সে ক্ষেত্রেও হস্তগত করা গণ্য হইবে (ঐ ২৫ পৃঃ)। গুদামে রক্ষিত পণ্য বিক্রয় করিয়া ক্রেতার হস্তে গুদামের চাবি অর্পণ পূর্বক পণ্য নেওয়ার অনুমতি দিলেই সেক্ষেত্রে হস্তগত করা গণ্য হইবে, এমনকি এখনও উহা মাপিয়া ওজন না করিরা থাকিলেও ঐ ক্ষেত্রে শুধু চাবি গ্রহণ করাই হস্তগত করা গণ্য হইবে। (ঐ ২২ পৃঃ) ● মাঠে চরা অবস্থায় একটি গরু বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়া ক্রেতাকে গরু দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ঐ আপনার গরু, নিয়া যান; ইহাতেই হস্তগত করা সাব্যস্ত হইবে (শামী ৪—৫৮)। অবশ্য উহা নিকটে না থাকায় উহা পর্যন্ত পৌছিতে সম্ভব হওয়ার পূর্বেই যদি উহা বিনষ্ট হইয়া যায় তবে ক্রেতার মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে না (আলমগীরী, ৩—২৫)।

একজনের পক্ষ হইতে ক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালীন অন্য জনের কথা বলা নিষিদ্ধ

১০৮২। হাদীছ :— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ ـ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এক মোসলমান ভাইয়ের পক্ষ হইতে ক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালীন অন্য কেহ কথা চালাইবে না—ঐরূপ করা জায়েয নয়।

১০৮৩। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِىْ إِنَائِهَا ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন—(১) গ্রাম্য ব্যক্তিগণ খাদ্যবস্তু তরিতরকারী ইত্যাদি শহরে বিক্রয় করার জন্য নিয়া আসিলে শহরস্থিত দোকানদারগণ

বাজার দর উচু রাখার উদ্দেশ্যে নিজেদের হস্তে ঐ গ্রাম্য ব্যক্তিদের চিজ-বস্তু বিক্রয় করিতে চায়, ইহা নিষিদ্ধ। (২) প্রকৃত ক্রেতাদেরে প্রতারণার উদ্দেশ্যে ক্রেতা সাজিয়া পণ্যের মূল্য অধিক বলা (যেন প্রকৃত ক্রেতা এই ভাবিয়া যে, বিক্রেতা যখন এই পরিমাণ মূল্যে সম্মত হয় না তখন আমি আরও কিছু বেশী মূল্য বলি—এইরূপে প্রতারিত হইয়া ক্রেতা অধিক মূল্য বলিয়া বসে এবং বিক্রেতা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া যায়; এরূপ অসদুপায় অবলম্বন করা) নিষিদ্ধ। (বর্তমানে শহরে-বন্দরে অসাধু দোকানদারগণ এই উদ্দেশ্যে স্বীয় সাঙ্গ-পাঙ্গ জোটাইয়া রাখে; এরূপ কার্য্য হারাম, শরীয়তী আইনে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানের ও শায়েস্তা করার বিধান আছে)। (৩) কোন মোসলমান ভ্রাতা কর্তৃক ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালীন সেই স্থানে অন্য কাহারও ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলা নিষিদ্ধ। (৪) কোন মোসলমান ভ্রাতা কর্তৃক কোথাও বিবাহের কথাবার্তা চলাকালীন সেই স্থানে অন্য কাহারও বিবাহের প্রস্তাব দান করা নিষিদ্ধ। (৫) স্বামীর সর্বস্ব একা ভোগ করার অভিলাসে এক স্ত্রী বা ভাবী স্ত্রী কর্তৃক অন্য স্ত্রীর তালাক দাবী করা নিষিদ্ধ।

নিলাম প্রথায় বিক্রয় করা

১০৮৪। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তির একটি ক্রীতদাস ছিল; (সেই ব্যক্তি অত্যধিক দরিদ্র হওয়া সত্বেও) তাহার মৃত্যুর পর ক্রীতদাসটি আজাদ হইয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ করিল। অতঃপর সে অত্যন্ত দুরবস্থায় ও দুর্দশায় পতিত হইল। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (স্বীয় বিশেষ অধিকার বলে তাহার ঐ কথা রদ করতঃ) সেই ক্রীতদাসটিকে বিক্রয় করার জন্য (নিলাম প্রথায়) বলিলেন—আমার নিকট হইতে এই ক্রীতদাসটিকে কে ক্রয় করিবে? তখন নোয়াইম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) উহাকে ক্রয় করিলেন, নবী (দঃ) ক্রীতদাসটিকে তাহার নিকট অর্পণ করিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য বিষয়ে আরও অধিক স্পষ্ট হাদীছ বর্ণিত আছে—আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসী একজন ছাহাবী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা চাহিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঘরে কোন বস্তু নাই কি? সে উত্তর করিল (মেষ, ছাগল ইত্যাদির লোম দ্বারা বুনান) একটা মোটা চাদর আছে, (শীতকালে) আমি উহার এক অংশ গায়ে দেই আর এক অংশ বিছাইয়া থাকি এবং

* শরীয়তের পরিভাষায় এরূপ ঘোষণাযুক্ত ক্রীতদাসকে 'মোদাব্বার' বলা হয়। সাধারণ নিয়মে মছআলাহ এই যে, ঐরূপ ক্রীতদাসকে বিক্রয় করা চলে না, বরং মনিবের মৃত্যুর পর সে মুক্ত ও আজাদ হইয়া যায়। আলোচ্য ঘটনায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার বিশেষ অধিকার বলে তাহা বাতিল করিয়া উহা বিক্রয় করিয়াছিলেন।

একটি বাটি আছে যাহাতে পানি পান করিয়া থাকি। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, ঐ বস্তুদ্বয় আমার নিকট উপস্থিত কর। ছাহাবী তাহাই করিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বস্তুদ্বয়কে নিজ হস্তে লইয়া বলিলেন, আমার নিকট হইতে কে এই বস্তু দুইটি ক্রয় করিবে? এক ব্যক্তি আরজ করিল, আমি এই বস্তু দুইটিকে এক দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দ্বারা ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। নবী (দঃ) বলিলেন, এক দেরহামের অধিক দিতে পারে কে? এইরূপে দুই বা তিনবার বলার পর এক ব্যক্তি বলিল, আমি বস্তু দুইটিকে দুই দেরহামে ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বস্তু দুইটি তাহার নিকট বিক্রয় করিলেন এবং মুদ্রা দুইটি ঐ ভিক্ষা প্রার্থীর হাতে দিয়া বলিলেন, একটি দেরহাম দ্বারা কিছু খাদ্যবস্তু ক্রয় করিয়া পরিবারবর্গকে দিয়া আস, দ্বিতীয় দেরহাম দ্বারা একটি কুড়াল ক্রয় করিয়া নিয়া আস; ঐ ছাহাবী তাহাই করিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিজ হস্তে কুড়ালটির হাতল লাগাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, কুড়ালটি নিয়া যাও এবং জঙ্গল হইতে জ্বালানি কাষ্ঠ কাটিয়া আনিয়া বিক্রয় করিতে থাক। পনর দিন পর্যন্ত যেন আমি তোমাকে দেখিতে না পাই; (অনবরত তুমি এই কাজেই লিপ্ত থাকিবে।) সেই ছাহাবী তাহাই করিতে লাগিলেন, এমনকি তিনি দশটি মুদ্রা উপার্জন করিলেন, উহা হইতে কতেক মুদ্রার কাপড় এবং কতেক মুদ্রার খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিলেন, এই ব্যবস্থা তোমার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি হইতে অতি উত্তম হইয়াছে। ভিক্ষাবৃত্তির দরুন কেয়ামতের দিন তোমার চেহারার উপর কাল দাগ ছাইয়া যাইত। স্মরণ রাখিও—তিন প্রকার ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য ভিক্ষা করা বৈধ ও দুরুস্ত নহে। (১) যে ব্যক্তি দরিদ্রতার দরুণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া দাঁড়াইবার শক্তিও হারাইয়া ফেলিয়াছে। (২) যে ব্যক্তি সর্বহারা হইয়া দেনার তাগাদায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। (৩) যে ব্যক্তি খুনের দায়ে পড়িয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিবার উপক্রম হইয়াছে। (জীবন-বিনিময় প্রদান করিয়া বাঁচিতে পারে, কিন্তু তাহার সেই সামর্থ নাই।)

(আবু দাউদ শরীফ)

ক্রেতাদিগকে ধোঁকা দেওয়া

১০৮৫। হাদীছঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال

نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن النجش

অর্থ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রকৃত ক্রেতাদিগকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে নকল ক্রেতা সাজিয়া পণ্যের মূল্য উর্দ্ধে উঠানোর অসদুপায় অবলম্বন করাকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

● ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বলিয়াছেন, ঐরূপ অসদুপায় অবলম্বনকারী সুদখোর তুল্য, অসৎ, ভণ্ড, প্রতারক এবং ঐ কার্য্য হারাম পরিগণিত, জঘন্য ধোঁকা ও প্রতারণা, (এরূপ প্রতারকদের প্রতি আল্লার লা'নৎ ও অভিশাপ)। নবী (দঃ) বলিয়াছেন, প্রতারণার প্রতিফল দোযখের শাস্তি ভোগ করা।

● যে ব্যক্তি স্বীয় পণ্যদ্রব্যের খরিদ-মূল্য মিথ্যারূপে অধিক প্রকাশ করিয়া থাকে সেও উল্লিখিত প্রতারক রূপের অপরাধী, পাপী ও অভিশপ্ত।

যেই বস্তু এখনও অস্তিত্বহীন উহা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ

১০৮৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, কোন পশুর বাছুরের বাছুর বিক্রি করাকে রসুলুল্লাহ (দঃ) নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আরব দেশে অন্ধকার-যুগে এরূপ প্রথা ছিল যে, কাহারও কোন ঘোড়া বা উষ্ট্র ইত্যাদি পশু উত্তম জাতের হইলে উহার প্রতি অধিক লোকের আগ্রহ থাকায় উহার বাছুর বরং বাছুরের বাছুর পর্য্যন্ত জন্ম লাভের বহু পূর্বেই বিক্রি হইয়া থাকিত। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

কোন বস্তুকে বিক্রি করিয়া উহা ক্রেতার নিকট অর্পণের দিন-তারিখ এরূপে নির্দ্ধারণ করা, যাহাতে সঠিকরূপে উহা নির্দিষ্ট হয় না, সেইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও নিষিদ্ধ পরিগণিত। যেরূপ অন্ধকার যুগের প্রথা ছিল, কোন ব্যক্তি স্বীয় উষ্ট্র বিক্রি করিত, কিন্তু উহা ক্রেতার নিকট অর্পণ করার দিন-তারিখ এইরূপে নির্দ্ধারণ করিত যে, যখন ইহার বাচ্চা জন্মলাভ করিবে বাছুরের বাছুর জন্মলাভ করিবে তখন ইহাকে তোমার নিকট অর্পণ করা হইবে এরূপ ক্রয় বিক্রয়ও নিষিদ্ধ ও অশুদ্ধ।

যেইটাকে স্পর্শ করিবে সেইটা বিক্রয় সাব্যস্ত হইবে—এই প্রথা নিষিদ্ধ

১০৮৭। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, ক্রয় বস্তু না দেখিয়া কঙ্কর, কাঠি ইত্যাদি নিক্ষেপ করিয়া কাঠি যেইটার উপর পড়িবে সেইটা বিক্রি সাব্যস্ত করা অথবা ক্রেতা কর্তৃক ক্রয়-বস্তু স্পর্শ করাকেই ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করা, এমনকি ঐ বস্তুকে দেখিয়া উহার দোষ-ত্রুটি বিবেচনা করতঃ সম্মতি-অসম্মতির সুযোগ প্রদান না করা—এরূপ ক্রয়-বিক্রয়কে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ক্রয়-বিক্রয়ের শুদ্ধতার প্রধান বিষয় হইতেছে—দোষ-ত্রুটির বিচার করতঃ উভয়ের সম্মতি দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়া। এই বিষয়ের ব্যতিক্রম হইলে সেই আদান-প্রদান জুয়া পরিগণিত। কারণ জুয়া প্রথাই এরূপ যে, উহাতে উভয়ের সম্মতির বা বিবেচনার ধার ধারা হয় না, শুধু বাজি ধরা হয়। যেমন—যে বস্তুর উপর ক্রেতার

হাত লাগিয়া গেল উহারই বিক্রয় তাহার সঙ্গে সাব্যস্ত হইয়া গেল বা ক্রয় বস্তুর উপর যাহার নিক্ষিপ্ত বস্তু পতিত হইল তাহারই সঙ্গে উহার বিক্রয় সাব্যস্ত হইল ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যবস্থা—যেখানে উভয় পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট বস্তুর উপর বিচার-বিবেচনার পর সম্মতি স্থাপনের ধার ধারা হয় না; এরূপ ব্যবস্থাসমূহ জুয়া প্রথার অন্তর্ভুক্ত নিষিদ্ধ ও অশুদ্ধ।

গরু ছাগল বিক্রির পূর্বে ওলান বড় দেখাইবার উদ্দেশ্যে ওলানে দুগ্ধ জমা রাখা

১০৮৮। **হাদীছ :—** عن ابى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم

لَا تُصَرُّوا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَاِنَّهٗ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ

اَنْ يَحْتَلِبَهَا اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ وَاِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ.

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোষণা করিয়াছেন—কোন ব্যক্তি স্বীয় উষ্ট্র বা ছাগলের (ওলান বড় দেখা যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিক্রি করার পূর্বে দুই-চার দিন দুগ্ধ দোহন না করিয়া) দুগ্ধ জমা রাখিয়া প্রতারণা করিতে পারিবে না। (এরূপ প্রতারণার ফন্দি অবলম্বন করিয়া যদি কেহ ঐরূপ পশু বিক্রয় করে, তবে এরূপ অবস্থায় ক্রেতা উহা ক্রয় করার পরও এরূপ ক্ষমতার অধিকারী থাকিবে যে, দুগ্ধ দোহন করার পর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ইচ্ছা করিলে উহা রাখিতে পারিবে এবং ইচ্ছা করিলে ফেরত দিতে পারিবে। ফেরত দেওয়া অবস্থায় (ব্যবহৃত দুগ্ধের বিনিময়ে) চার সের পরিমাণ এক ধামা খোরমা প্রদান করিবে।

১০৮৯। **হাদীছ :—**আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কৃত্রিম রূপের বড় ওলান দেখিয়া বকরি (ইত্যাদি পশু) ক্রয় করে অতঃপর উহা ফেরত দেয় তাহার কর্তব্য হইবে, বকরি ফেরত দেওয়া কালে চার সের পরিমাণ এক ধামা খোরমাও দেওয়া। নবী (দঃ) ইহাও নিষেধ করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি বাজারের বিক্রয় কেন্দ্র হইতে অগ্রগামী হইয়া কোন আগন্তুক পণ্য ক্রয় করিবে না।

গ্রাম্য ব্যক্তিদিগকে তাহাদের নিজ বস্তু শহরে বিক্রি করার সুযোগ প্রদান করা চাই

১০৯০। **হাদীছ :—** عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

অর্থ—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, গ্রাম্য লোকগণ কর্তৃক শহরে আনীত] চীজ-বস্তু স্বয়ং তাহাদিগকে বিক্রি করার সুযোগ প্রদান না করিয়া শহরস্থিত দোকানদারগণ কর্তৃক একচেটিয়া ভাবে উহা বিক্রি করার অধিকার স্থাপন করাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

১০৯১। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে নিষেধ করা হইত—শহরী লোকেরা যেন গ্রাম্য লোকদের আনীত চীজ-বস্তু নিজেদের আয়ত্বে বিক্রি করার অপকৌশল না করে।

ব্যাখ্যা ঃ—সাধারণতঃ গ্রাম্য সরল লোকগণ অপেক্ষাকৃত কম মুল্যে তাহাদের কৃষিজাত চীজ-বস্তু বিক্রি করিয়া চলিয়া যায়, ইহাতে শহরস্থিত সর্বসাধারণ লাভবান হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ঐ গ্রাম্য বিক্রেতাগণ তাহাদের চীজ-বস্তু শহরে ঢুকিয়া বিক্রি করিলে তাহারা বাজার দরে কিছু বেশী দাম পাইতে পারে। এমতাবস্থায় শহরস্থিত দোকানদারগণ এক-চেটিয়া ভাবে ঐ সব চীজ-বস্তুর বিক্রয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতঃ সর্বসাধারণকে কোণঠাসা করিয়া বাজার মূল্য উচু রাখার ফন্দি আটিতে চাহে বা গ্রাম্য লোকদিগকে শহরে নিজ হাতে পণ্য বিক্রি করার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা পূর্বক প্রতারণা সুত্রে তাহাদিগকে ন্যায্য মূল্য হইতে ঠকাইতে চাহে—সেই সুযোগ দেওয়া হইবে না।

উল্লিখিত হাদীছের নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য্য ইহাই। নতুবা যদি সর্বসাধারণের অসুবিধার সৃষ্টি করা না হয় এবং গ্রাম্য বিক্রেতাগণকে প্রতারিত করা না হয়, বরং সাধারণরূপে শহরস্থিত ব্যবসায়ী গ্রাম্য লোকদের পণ্য বিক্রি করিয়া ন্যায্য ব্যবসা করিতে চায় তবে সে ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ নাই।

১০৯২। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, অগ্রগামী হইয়া আমদানীকারকদের পণ্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করিও না। গ্রাম্য ব্যক্তির পণ্য শহরের লোকই বিক্রি করিবে তাহাও করিও না। ইহার ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, গ্রাম্য ব্যক্তির পণ্য বিক্রয়ে শহরের মানুষ দালাল বা শোষণকারী সাজিবে না।

বিভিন্ন প্রান্তের লোক নিজেদের পণ্য শহরে উপস্থিত করিয়া বিক্রি করায় বাধার সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ

১০৯৩। **হাদীছ ঃ**— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ

وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتّٰى يُهْبَطَ بِهَا اِلَى السُّوْقِ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একজনের পক্ষ হইতে একটি বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের কথা-বার্তা চলাকালীন আর একজন ঐ বস্তু ক্রয়ের প্রস্তাব করা নিষিদ্ধ এবং পণ্যদ্রব্য আমদানী হওয়া কালে বিক্রয় কেন্দ্র হইতে বহুদূরে অগ্রসর হইয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয়-কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার অন্তরায় সৃষ্টি করতঃ সেস্থানেই উহা ক্রয় করিতে সচেষ্ট হওয়া নিষিদ্ধ। পণ্যদ্রব্য বাজার-বন্দরের বিক্রয় কেন্দ্রে উপস্থিত হইলে পর উহা ক্রয় করিবে।

ব্যাখ্যাঃ—প্রথম বাক্যটির তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় বাক্যটির মধ্যে যেই বিষয়টি নিষেধ করা হইয়াছে উহা নিষিদ্ধ হওয়ার দুইটি কারণ। প্রথমতঃ বিভিন্ন লোকগণ কর্তৃক বাজারে পণ্য আমদানী হইলে বিক্রেতা অধিক হওয়ায় বাজার মূল্য নিম্ন গতিতে থাকিবে যাহা সর্বসাধারণের জন্য লাভজনক। পক্ষান্তরে সমস্ত পণ্য মুষ্টিমেয় লোকদের হাতে আবদ্ধ হইলে সর্বসাধারণের সেই লাভের সুযোগ পণ্ড হইল, এমনকি পুঁজিপতিগণ কর্তৃক পণ্য গুদামজাত করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে কৃত্রিম অভাব ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করার জঘন্য সুযোগও এই পন্থায়ই হয়। দ্বিতীয়তঃ গ্রাম্য গরীব দুঃখী কৃষক-শ্রমিক ব্যক্তিগণ ঐরূপ ব্যবস্থায় প্রতারিত হইবে। কারণ, বাজারে না আসিতে পারায় তাহারা বাজার-মূল্য অবগত হওয়ার সুযোগ পাইবে না এবং ঐরূপ ক্রেতাগণ মিছামিছি বাজার মূল্যের ভাওতা দিয়া প্রতারণার ফন্দি আটিতেই সচেষ্ট থাকে।

১০৯৪। **হাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন, অগ্রগামী হইয়া আমদানীকারকদের পণ্য ক্রয় করা হইতে এবং গ্রাম্য লোকদের পণ্য শহরের লোকই বিক্রি করিবে—এরূপ ব্যবস্থা হইতে।

আলোচ্য বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত ১০৯২ নং হাদীছে এবং আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণিত ১০৮৯ নং হাদীছেও উল্লেখ আছে।

মছআলাহঃ—উল্লিখিত ব্যবস্থায় যদি বস্তুতঃই বাজার-দর মিথ্যা বলিয়া আমদানী-কারকদেরে প্রতারিত করিয়া থাকে তবে সেই ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হইবে না; বিক্রেতার অধিকার থাকিবে উহা নাকচ করার।

মছআলাহঃ—উক্ত ব্যবস্থায় যদি একচেটিয়াভাবে পণ্য হস্তগত করিয়া বা গুদামজাত করিয়া মূল্যের উর্দ্ধগতি সৃষ্টির ইচ্ছা করা হয় বা উহাতে জনসাধারণের জীবন যাত্রায় সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি হয় তবে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হারাম হইবে এবং সরকার কর্তৃক ঐরূপ ক্রয়কে নাকচ করার শাস্তিমূলক বিধান প্রয়োগের অবকাশ আছে।

উল্লিখিত মিথ্যা ও অসদুপায়ের সহিত জড়িত না হইলে সে ক্ষেত্রে ঐরূপ ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু উহা পরিহার্য্য।

এক জাতীয় বস্তুদ্বয়ের বিনিময়ে সমতা ও উপস্থিত আদান-প্রদান আবশ্যক

১০৯৫। হাদীছ :— قال عمر رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ .

অর্থ—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণ দ্বারা হইলে কথাবার্তার স্থলেই ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের দেয় বস্তুর আদান-প্রদান করিতে হইবে, নতুবা সেই বিনিময় (হালাল ক্রয়-বিক্রয় গণ্য না হইয়া হারাম) সুদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব এবং খুরমার বিনিময়ে খুরমাও তদ্রূপই।

১০৯৬। হাদীছ :— قال ابوبكرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ .

অর্থ—আবু বকরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময় স্থলে উভয় পক্ষে ওজনে পূর্ণ সমতা ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। তদ্রূপই রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয়। অবশ্য স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য, রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ ইচ্ছানুসারে ওজনের বেশ-কমে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে।

১০৯৭। হাদীছ :— عن ابى سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ .

অর্থ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ উভয়ের সমতা ব্যতিরেকে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নহে, এক পক্ষের পরিমাণ অপর পক্ষের তুলনায় বেশ কম হইতে পারিবে না। রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয়েও তদ্রূপই সমতা ব্যতিরেকে জায়েয নহে। স্বর্ণ এবং রৌপ্যের পরস্পর ক্রয়-বিক্রয়ে এক পক্ষ নগদ অপর পক্ষ বাকি—এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও জায়েয নহে।

ব্যাখ্যা ঃ—স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, এর জন্য সমতা প্রয়োজন সেই বিষয়ে বোখারীর শরাহ্—ফতহুল বারী কিতাবে উল্লেখ আছে।

يدخل فى الذهب جميع اصنافه من مضروب ومنقوش وجيد وردئ وصحيح ومكسر وحلى وتبر وخالص ومغشوش -

অর্থাৎ ভাল ও খারাব, কারুকার্য খচিত ও সাদা, আস্ত ও গুড়া, তৈরী অলঙ্কার ও ঢাকা এবং খাটী ও অখাটী কোন প্রকার গুণাগুণের ভেদাভেদে কম-বেশ করা যাইবে না; স্বর্ণে স্বর্ণে বিনিময় হইলে সমতা রক্ষা করিতেই হইবে।

যদি গুণের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয় তবে অন্য জাতীয় দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় করিতে হইবে। রৌপ্যে রৌপ্যে বিনিময় হইলেও তদ্রূপই। এতদভিন্ন যে কোন এক জাতীয় বস্তুর মধ্যে বিনিময় করা হইলে সে স্থলে গুণাগুণের ভেদাভেদের কারণে বেশ-কম করা চলিবে না। গুণের তারতম্য করিতে হইলে ভিন্ন জাতীয় বস্তুর সঙ্গে বিনিময়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শরীয়তের আইন ও বিধান ইহাই।

মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে—কোন এক ছাহাবী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অতি উত্তম রকমের কিছু খেজুর উপস্থিত করিলেন। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এলাকার কি সব খেজুর এইরূপই হইয়া থাকে? ছাহাবী উত্তর করিলেন, না—আমি ভালমন্দ মিশান দুই টুকরি খেজুরের বিনিময়ে এই বাছা ও উত্তম খেজুর এক টুকরি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এই বিনিময় ত সুদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তুমি এরূপ কেন করিলে না যে—প্রথমে স্বীয় দুই টুকরি খারাপ খেজুর মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া অতঃপর সেই মুদ্রা দ্বারা এক টুকরী উত্তম খেজুর ক্রয় করিতে!

বোখারী শরীফের মধ্যেও একটু সম্মুখে এই হাদীছটি বর্ণিত হইবে।

স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ও রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বাকি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ

১০৭৮। হাদীছ ঃ— عن براء بن عازب وزيد بن ارقم قالا

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا

অর্থ—বরা ইবনে আযেব ও যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বাকি বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

১০৯৯। হাদীছঃ—উসামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বাকি বিক্রয় অবশ্যই সুদ গণ্য হইবে।

অর্থাৎ—স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরস্পর বিনিময়ে ওজনে বেশ-কম ত হবেই এবং তাহা জায়েযও বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তু হওয়া সত্ত্বেও বাকি বিক্রয় করিলে তাহা নিষিদ্ধ তথা হারাম হইবে।

তদ্রূপ এক জাতীয় বস্তুর পরস্পর বিনিময়ে উভয় দিকে সম পরিমাণ দিয়াও যদি বাকি বিক্রয় করা হয় তাহাও নিষিদ্ধ তথা হারাম গণ্য হইবে। অবশ্য স্বর্ণ-রৌপ্যের পরস্পর বিনিময় ছাড়া অন্য যে কোন দুই জাতীয় দুই বস্তুর পরস্পর বিনিময়ে যে কোনরূপে বাকি বিক্রয় করিলে সে ক্ষেত্রে কোন দোষ হইবে না।

বৃক্ষের ফল বা জমিনের ফসল অনুমান করিয়া সেই জাতীয় তৈরী বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করা

১১০০। হাদীছঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—"মোযাবানাহ" শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয় হইতে এবং নির্দ্ধারিত পরিমাণ উৎপন্নের উপর বর্গা দেওয়া হইতে।

১১০১। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—নির্দ্ধারিত পরিমাণ উৎপন্নের শর্তে বর্গা দেওয়া হইতে এবং "মোযাবাহান" শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয় হইতে। (২৯১ পৃঃ)

ব্যাখ্যাঃ—"মোযাহাবানাহ" ক্রয়-বিক্রয়ের সাধারণ ব্যাখ্যা উহাই করা হয় যাহা আলোচ্য পরিচ্ছদের বিষয়। অর্থাৎ গাছের ফল গাছেই রাখিয়া পরিমাণ করতঃ সেই পরিমাণ প্রস্তুত ঐ জাতীয় ফলের বিনিময়ে গাছের ফল ক্রয়-বিক্রয় করা। তদ্রূপ জমিনের ফসল না কাটিয়া উহা পরিমাণ করতঃ ঐ জাতীয় সেই পরিমাণ বস্তুর বিনিময় করা—ইহা নিষিদ্ধ।

এতদ্ভিন্ন উহার অপর একটি ব্যাখ্যাও করা হয় যে, যে ফসল গাছে নয় বরং স্তুপকৃত রহিয়াছে উহার ক্রয়-বিক্রয় ও মূল্য নির্দ্ধারিত সংখ্যক ধামা বা পরিমাণের উপর সাব্যস্ত করিয়া ধামার মাপ বা ওজন করা ব্যতিরেকে স্তুপটি এই বলিয়া গ্রহণ করা যে বেশী হইলে আমার লাভ, কম হইলেও আমারই ক্ষতি। এই ভাবের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নহে। হাঁ—প্রথম হইতেই ধামার সংখ্যা বা ওজনের পরিমাণ হিসাবে নয়, বরং স্তুপ হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই শুদ্ধ ও জায়েয। কিন্তু প্রথমে ধামা বা ওজন হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করিয়া পরে ওজন করা ব্যতিরেকে স্তুপকে ঐ ওজনের অনুমান হিসাবে মূল্য দানে ক্রয় করা জায়েয নহে।

১১০২। হাদীছ ঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ

إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ

كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ -

অর্থ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন; খেজুর গাছে খেজুর আছে, উহা শুষ্ক হইয়া কি পরিমাণ খুরমা হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া ঐ পরিমাণ শুষ্ক খুরমার বিনিময়ে ঐ গাছের খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা বা আঙ্গুর গাছে আঙ্গুর আছে, উহা শুষ্ক হইয়া কি পরিমাণ কিশমিশ হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া শুষ্ক কিশমিশের বিনিময়ে ঐ গাছের আঙ্গুর ক্রয়-বিক্রয় করা বা জমিনের মধ্যে ফসল আছে (যেমন ধান) উহা কাটিয়া আনিলে পর কি পরিমাণ খাদ্য (ধান) হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া সেই পরিমাণ প্রস্তুত খাদ্য বস্তুর (ধানের) বিনিময়ে ঐ জমিনের ফসল ক্রয়-বিক্রয় করা—এইসব রকমের ক্রয়-বিক্রয়কে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। (২৯৩ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—একই শ্রেণীর বস্তুদ্বয়ের পরস্পর বিনিময়ে যেমন—ধান-চাউল, খুরমা-খেজুর, কিশমিশ-আঙ্গুর ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয়ে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে, বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তুদ্বয়ের পরস্পর বিনিময়ে এই বিধান নহে। যেমন, কিশমিশের বিনিময়ে খেজুর ক্রয় করা। এস্থলে গাছের খেজুরকে অনুমান করিয়া সেই অনুপাতে কিশমিশের বিনিময়ে ঐ খেজুর ক্রয় করা যায়েয আছে। তদ্রূপ গাছের খেজুরকে গাছে রাখিয়া নগদ মূল্যেও ক্রয় করা জায়েয আছে। অবশ্য ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনে নির্দ্ধারিত ওজন বা পরিমাণের উল্লেখ করিতে পারিবে না—উপস্থিত সমষ্টিরূপে ক্রয় করিবে।

১১০৩। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গাছের ফল পোক্ত হইবার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং গাছের ফল গাছে রাখিয়া বিক্রি করিলে টাকা-পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করার পরামর্শ দিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ শ্রেণীর প্রস্তুত বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করিলে ত তাহা হারাম হইবে, কিন্তু অন্য শ্রেণীর বস্তুর বিনিময়ে বা টাকা পয়সার বিনিময়ে হইলে জায়েয হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গাছের ফল বা ক্ষেতের ফসল অনুমান করিয়া ঐ জাতীয় প্রস্তুত বস্তুর সহিত বিনিময় এক ক্ষেত্রে জায়েয আছে। তাহা এই যে, কোন ব্যক্তি তাহার বাগানের এক দুইটা গাছ বা খামারের এক টুকরা জমি সম্পর্কে কোন গরীব বা শ্রদ্ধেয় লোককে এই বলিয়া দিল যে, ইহার উৎপন্ন আপনাকে দিলাম ; আপনি তাহা ভোগ করিবেন।

অতঃপর সেই উৎপন্ন পূর্ণরূপে পাকিয়া কাটিবার উপযোগী হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উক্ত লোকের জন্য অসুবিধাজনক হইয়া পড়ায় গাছের বা জমির মূল মালিকের সঙ্গে সেই উৎপন্নকে অনুমান করিয়া ঐ জাতীয় প্রস্তুত বস্তুর সহিতই বিনিময় করিয়া নেয়—এই বিনিময়কে শরীয়তের পরিভাষায় "আ'রিয়্যা" বলা হয় ; ইহা জায়েয। কারণ, এক্ষেত্রে বিক্রয় ও বিনিময় ব্যবস্থা বাহ্যত দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় নহে, বরং দান বা হাদিয়ার পরিবর্তন মাত্র যাহা জায়েয।

১১০৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আ'রিয়্যা শ্রেণীর বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন যাহা পাঁচ ধামা বা উহার কম পরিমাণে হইয়া থাকে। (অর্থাৎ উক্ত বিনিময় বা পরিবর্তন সাধারণতঃ কম পরিমাণেরই হয়।

১১০৫। হাদীছ ঃ—সাহল ইবনে হাছমা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গাছের খেজুর অনুমান করিয়া খুরমার সহিত বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আ'রিয়্যা শ্রেণীর বিনিময়ে অনুমতি দিয়াছেন—যেখানে অনুমানের উপরই বিনিময় হয়।)

১১০৬। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আ'রিয়্যার ক্ষেত্রে অনুমাণের উপর ধামা হিসাবে বিনিময়ের অনুমতি দিয়াছেন।

কোন বৃক্ষের ফল ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করা

১১০৭। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—বৃক্ষস্থিত ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রি করাকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ বলিয়াছেন, বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করিয়াছেন।

● জাবের (রাঃ) হইতেও এই মর্মে হাদীছ বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গাছের ফল রং চড়িবার পূর্বে এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

১১০৮। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় লোকদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, তাহারা বাগানস্থিত ফল (ছোট ছোট থাকাবস্থায়) ক্রয় করিয়া লইত। অতঃপর যখন ফল পাকার ও

কাটায় মৌসুম উপস্থিত হইত এবং বিক্রেতার পক্ষ হইতে মূল্য আদায়ের তাগাদা আসিত তখন কোন কোন ক্রেতা এরূপ আপত্তি জানাইত যে, এই বৎসর নানা প্রকার দুর্যোগ দুর্ঘটনায় বৃক্ষের ফল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, (অতএব আমি মূল্য পরিশোধ করিব না, বিক্রেতা উহাতে সম্মত হইত না, ফলে বিবাদ সৃষ্টি হইত)। এরূপ বহু ঝগড়া-বিবাদের অভিযোগ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হইতে থাকায় তিনি এই নীতি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে বৃক্ষের ফল বিক্রি করিবে না।

১১০৯। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বৃক্ষের ফল পোক্তা হইবার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (সে মতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, পোক্তা হওয়ার অর্থ কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, (খেজুর সবুজ বর্ণ হইতে) লাল বর্ণ হওয়া। অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা চিন্তা করিয়াছ কি যে, প্রাথমিক অবস্থায় ফল বিক্রি করিলে যদি ঐ বৎসর (কোন দুর্যোগের কারণে) ঐ বৃক্ষে ফল না হয়, তবে স্বীয় মুসলমান ভাই—ক্রেতার নিকট হইতে অর্থ আদায় করা কিসের বিনিময়ে হইবে?

মছআলাহ ঃ—গাছের ফল ক্ষুদ্র ও ছোট থাকাবস্থায় এই শর্তে বিক্রি করা যে, ফল পূর্ণ বড় হওয়া ও পাকা পর্য্যন্ত গাছেই থাকিবে—ইহা নাজায়েয। এই ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হইবে না এবং ফল বিনষ্ট হইয়া গেলে বিক্রেতা মূল্যের অধিকারী হইবে না। আর যদি এই রূপ হয় যে, ফল সাধারণ ভাবে যতটুকু বড় হওয়ার তাহা হইয়া সারিয়াছে, শুধু কেবল পাকা বাকি রহিয়াছে, সে ক্ষেত্রে যদি পাকা পর্য্যন্ত গাছে থাকার শর্তেও ক্রয় করিয়া থাকে তবুও উহা শুদ্ধ ও জায়েয হইবে—ইহাই ফতওয়া। (আলমগীরি, ৩—১৪৮)

● প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ও মোহাদ্দেছ ইবনে শেহাব যুহরী (রঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি বৃক্ষের ফল ছোট থাকাবস্থায় ক্রয় করে অতঃপর কোন দুর্যোগে উহা নষ্ট হইয়া যায় তবে উহার ক্ষয়-ক্ষতি বিক্রেতার পক্ষে গণ্য করা হইবে।

ধারে ক্রয়-বিক্রয় করা

১১১০। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ইহুদীর নিকট হইতে কিছু খাদ্যবস্তু ধারে ক্রয় করিয়াছিলেন এবং মূল্যের পরিবর্তে তিনি তাহার নিকট স্বীয় লৌ-বর্ম বন্ধক রাখিয়াছিলেন।

এক জাতীয় বস্তুর ভাল-মন্দের মধ্যে বিনিময় করিতে ইচ্ছা করিলে কিরূপে করিবে?

১১১১। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন এক ছাহাবীকে 'খয়বরে' তসীলদার বানাইয়া পাঠাইলেন।

একদা ঐ ছাহাবী উত্তম রকমের কিছু খেজুর লইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, খয়বরের সব খেজুরই কি এইরূপ উত্তম হয়? ঐ ছাহাবী বলিলেন, না— ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা এই উত্তম খেজুর এক ধামা সাধারণ খেজুর দুই-তিন ধামার বিনিময়ে ক্রয় করিয়া থাকি। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলেন, (এইরূপ বিনিময় ত সুদের অন্তর্ভুক্ত!) এইরূপে ক্রয় করিও না। খারাপ খেজুর প্রথমে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি কর, অতঃপর ঐ মুদ্রার বিনিময়ে উত্তম খেজুর ক্রয় কর।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছে যে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইল এইরূপ; যথা—প্রথমে খারাপ খেজুর দুই ধামা ২০ টাকায় বিক্রি করিবে অতঃপর সেই ২০ টাকার বিনিময়ে ভাল খেজুর এক ধামা খরিদ করিবে।

প্রকাশ থাকে যে, উভয় ক্রয়-বিক্রয়ই ভাল খেজুর ও খারাপ খেজুর বিনিময়কারী দুই জনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে তাহাতে দোষ নাই। এমনকি নির্দ্ধারিত ২০ টাকা উভয়ের কাহারও লেন দেনেরও প্রয়োজন নাই। দুই জনের মধ্যে দুইবার মৌখিক বিনিময়-বন্ধন (আক্‌দ-বায়) অনুষ্ঠিত হইলেই উহা জায়েযের গণ্ডিভুক্ত হইয়া যাইবে। যথা—খারাপ খেজুরওয়ালা ভাল খেজুরওয়ালাকে বলিবে আমার দুই ধামা খেজুর আপনার নিকট ২০ টাকায় বিক্রি করিলাম—এই বলিয়া তাহার দুই ধামা খারাপ খেজুর ভাল খেজুরওয়ালাকে প্রদান করিবে। অতঃপর সে ভাল খেজুরওয়ালাকে বলিবে আমার দুই ধামা খেজুরের মূল্য ২০ টাকা আপনার নিকট প্রাপ্য রহিয়াছে উক্ত ২০ টাকা দ্বারা আমি আপনার ভাল এক ধামা খেজুর ক্রয় করিলাম—এই বলিয়া এক ধামা ভাল খেজুর হস্তগত করিবে। টাকা ২০টির লেন-দেন একবারও আবশ্যক নহে। সার কথা এই যে, দুই ধামা খারাপ খেজুরের সহিত এক ধামা ভাল খেজুরের সরাসরি বিনিময়-বন্ধন অনুষ্ঠিত হইলে তাহা সুদের অন্তর্ভুক্ত হারাম গণ্য হইবে, আর উল্লিখিত আকারে দুইটি পৃথক পৃথক বিনিময় বন্ধন দ্বারা সেই দুই ধামায়ই এক ধামা হস্তগত করিলে তাহা জায়েয হইবে। উভয় ব্যবস্থার দৃশ্য-ফল একই বটে, তথা দুই ধামা খারাপ খেজুর দ্বারা এক ধামা ভাল খেজুর সংগ্রহ করা। কিন্তু উভয় ব্যবস্থার মধ্যে বিধানগত পার্থক্য দিবা-রাত্রের ন্যায় রহিয়াছে। কারণ; প্রথম তথা হারাম সাব্যস্তের ব্যবস্থায় বিনিময়-বন্ধন শুধু একবার রহিয়াছে; পক্ষান্তরে জায়েয সাব্যস্ত ব্যবস্থায় বিনিময়-বন্ধন দুইবার হইয়াছে।

শরীয়তের প্রতি যাহারা শ্রদ্ধাহীন তাহারা উভয় ব্যবস্থার দৃশ্য-ফলে ব্যবধান না দেখিয়া হালাল-হারামের পার্থক্যের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে পারে, কিন্তু উহা তাহাদের বোকামী হইবে। কারণ, হারাম-হালাল ইহাও বিধানগত বিষয় বটে, নতুবা হারাম ব্যবস্থায় সংগৃহীত খেজুরের যেই স্বাদ হালাল ব্যবস্থায় সংগৃহীত খেজুরেরও সেই স্বাদ

উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং একটি বিধানগত বিষয় তথা হারাম-হালাল-এর ভিত্তি যদি অপর একটি বিধানগত পার্থক্যের উপর স্থাপিত হয় তবে তাহা উপেক্ষণীয় হইবে কেন?

দৃশ্যগত ব্যবধান ব্যতিরেকে (আক্দ) তথা বিধানগত বন্ধনের পার্থক্যে বৈধ-অবৈধের পার্থক্য হওয়া ইহা শুধু ইসলামী শরীয়তের বিষয়ই নহে, নিছক মানবতার বিষয়ও বটে। একজন বান্ধবী এবং নিজ স্ত্রী—উভয় মহিলার মধ্যে বিধানগত বন্ধনের পার্থক্য ছাড়া আর কি পার্থক্য আছে? কিন্তু স্ত্রীর সহিত সহবাস সকল ধর্মে সকল সমাজেই বৈধ এবং সন্তান হইবে হালাল। আর বান্ধবীর সহিত সহবাস সকল স্তরেই অবৈধ এবং সন্তানকে গণ্য করা হইবে হারামজাদা।

ফলদার বৃক্ষ বিক্রি করিলে ফলের মালিক কে হইবে?

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী নাফে' (রঃ) বলিয়াছেন, ফল বাহির হইবার পর বৃক্ষ বিক্রি হইলে ফলের মালিক সে-ই হইবে যে উহার ব্যবস্থা করিয়াছে অর্থাৎ বিক্রেতা। তদ্রূপ কোন ফসলযুক্ত জমিন বিক্রি হইলে ফসলের মালিক বিক্রেতাই হইবে।

১১১২। হাদীছ :— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا

لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ -

অর্থ—আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এরূপ খেজুর গাছ বিক্রি করে যাহার (ফল বাহির হইয়াছে এবং) ফলের উন্নতির ব্যবস্থাও সে করিয়াছে সেই বিক্রেতাই ঐ ফলের মালিক থাকিবে। অবশ্য যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এরূপ উল্লেখ করা হয় যে, ফলের মালিক ক্রেতা হইবে তবে উহার মালিক ক্রেতা হইবে।

খাদ্যোপযোগী শুষ্ক ফল বা ফসল কাঁচা ফল-ফসলের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়

মছআলাহ :—শুষ্ক কিম্বা কাঁচা ফল বা ফসল টাকা-পয়সার বিনিময়ে বা ভিন্ন জাতীয় বস্তুর বিনিময়ে যথা, খোরমার বিনিময়ে আঙ্গুর—এই ক্রয়-বিক্রি সর্বসম্মতরূপে শুদ্ধ ও জায়েয।

যে সমস্ত ফল-ফসল শুষ্ক হইলে ওজনে, বরং আকারেও কমে এবং কিছু ছোট হইয়া যায়—যেমন, খেজুর শুষ্ক হইয়া খোরমা হয়, আঙ্গুর শুষ্ক হইয়া কিশমিশ বা মনাক্কা হয়। আমাদের দেশের ধানও এইরূপই বটে।

এই শ্রেণীর ফল-ফসলের শুষ্কটা একই জাতীয় কাঁচা ও তাজাটার সহিত পরস্পর বিনিময় করা অধিকাংশ ইমামগণের মতে কোন রকমেই জায়েয নহে—বেশ-কমেও নহে, সমান সমানেও নহে; ইহাকেও তাঁহারা ১১১১ নং হাদীছের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত গণ্য করেন। এমনকি তাঁহাদের মতে ঐ শ্রেণীর ফল-ফসলের কাঁচাটা ঐ জাতীয় কাঁচাটার সহিত সমান-সমানেও বিনিময় জায়েয নহে; কারণ শুষ্ক হইলে উভয়ের পরিমাণে পূর্ণ সমতা থাকিবে না।

হানফী মজহাব মতে এক জাতীয় ফসলেরও কাঁচাটার বিনিময়ে কাঁচা সম পরিমাণ এবং উপস্থিত লেন-দেন হইলে জায়েয হইবে। এমনকি শুষ্কটার বিনিময় কাঁচাটা সম পরিমাণে এবং উপস্থিত লেন-দেন হইলে তাহাও ইমাম আবু হানিফার মতে শুদ্ধ এবং জায়েয।

অবশ্য যদি শুষ্ক ও কাঁচার পার্থক্য করিতে হয় তবে উভয়ের সরাসরি বিনিময় জায়েয হইবে না। পূর্বে বর্ণিত উপায়ে পৃথক পৃথক দুইটি বিনিময়-বন্ধন সম্পাদন করিতে হইবে এবং তাহা সর্বসম্মতরূপে জায়েয হইবে।

ক্ষেত-খামারের নির্দিষ্ট শস্য-ফসল উহার দানা পুষ্ট ও পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বিক্রি করা

১১১৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—(১) নির্দ্ধারিত পরিমাণ (যথা দশ মন) উৎপন্নের শর্তে বর্গা দেওয়া হইতে। (২) দানা পুষ্ট হওয়ার পূর্বে ফসল বিক্রি করা হইতে। (৩) ছোঁয়া বা স্পর্শ দ্বারা বিক্রয় সাব্যস্ত করার প্রথা হইতে। (৪) যাহার কঙ্কর বা কাঠি যেই বস্তুর উপর পতিত হইবে তাহার সঙ্গে ঐ বস্তুর বিক্রয় বাধ্যতামূলক ভাবে সাব্যস্ত হওয়ার প্রথা হইতে। (৫) "মোযাবানাহ" শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয় হইতে।

ব্যাখ্যা ঃ—২ নম্বরে আলোচ্য পরিচ্ছেদের বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। ৩ ও ৪ নং বিষয়দ্বয় ১০৮৭ নং হাদীছে এবং ৫ নং বিষয়টি ১১০২ নং হাদীছে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে।

অমোসলেমের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় করা

১১১৪। হাদীছ ঃ—আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ভ্রমণরত ছিলাম, আমাদের সংখ্যা একশত ত্রিশ জন ছিল। নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কাহারও নিকট খাদ্যবস্তু আছে কি? দেখা গেল, একজনের নিকট চার সের পরিমাণ হইতেও কম আটা আছে। ঐ আটাটুকু ছেনা হইল। অতঃপর দীর্ঘদেহী এক অমোসলেম মোশরেক পথিক এক দল বকরী লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। নবী (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বকরীগুলি কাহাকেও হাদিয়া দিবার জন্য আনিয়াছ, না—বিক্রি করার জন্য? সে বলিল, বিক্রির জন্য আনিয়াছি। নবী (দঃ) তাহার নিকট হইতে একটা বকরী ক্রয় করিলেন। উহাকে

জবেহ করিয়া উহার গোশত তৈয়ার করা হইল। নবী (দঃ) উহার দিল-কলিজা ভাজি করার আদেশ করিলেন। (ঐ ক্ষেত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অলৌকিক বরকতের ঘটনা এরূপ ঘটিয়াছিল যে,) আমাদের একশত ত্রিশজন লোকের মধ্যে প্রত্যেকেই ঐ দিল-কলিজার অংশ প্রাপ্ত হইল, এমনকি যাহারা ঐ সময় উপস্থিত ছিল না তাহাদের জন্য অংশ রাখিয়া দেওয়া হইল। (আরও অলৌকিক ঘটনা এই ঘটিয়াছিল যে,) এই অল্প পরিমাণ আটা ও একটি মাত্র ছাগল দ্বারা তৈরী খাদ্য দুই বর্তনে দেওয়া হইল। আমরা একশত ত্রিশজন লোক পেট পুরিয়া উহা হইতে আহার করিলাম এবং অবশিষ্ট রহিয়া গেল—উহা সঙ্গে লইয়া তথা হইতে আমরা যাত্রা করিলাম।

মৃত পশুর কাঁচা চামড়া বিক্রি করা

মছআলাহ ঃ—মৃত পশুর চামড়া কাঁচা অবস্থায় বিক্রি করা প্রচলিত মজহাব সমূহের ইমামগণের মতে জায়েয নহে। অবশ্য ইমাম জুহরী (রঃ) এবং ইমাম বোখারী (রঃ) উহার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয বলেন। (ফতহুলবারী, ৪—২৩)

১১১৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার গমন পথে একটি মৃত ছাগল দেখিয়া বলিলেন, তোমরা ইহার চামড়া দ্বারা লাভবান হইলে না কেন? সকলেই বলিল, ইহা ত মৃত। হযরত (দঃ) বলিলেন, সেজন্য উহা কেবল খাওয়া হারাম।

১১১৬। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) অবগত হইলেন, এক ব্যক্তি মদ বিক্রি করিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা অমুকের সর্বনাশ করুন; সে কি জানে না? রসুলুল্লাহ (দঃ) (বদ-দোয়া করতঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের সর্বনাশ করুন, তাহাদের উপর (আজাব স্বরূপ হালাল জীবেরও) চর্বি (কোন আকারে ব্যবহার করা) হারাম করা হইয়াছিল। তাহারা সেই চর্বি গলাইয়া তৈল করতঃ বিক্রি করিয়া থাকিত।

ব্যাখ্যা ঃ—মদ বিক্রেতা ভাবিয়াছিল, আমি ত মদ খাইলাম না; উহার পয়সা খাইলাম। ওমর (রাঃ) দেখাইলেন, ইহুদীদের জন্য চর্বি খাওয়া হারাম ছিল; তাহারা উহা সরাসরি না খাইয়া উহার পয়সা খাইত; সেই জন্য তাহাদের প্রতি হযরতের অভিশাপ হইয়াছে। এই সূত্রেই মদের ক্রয়-বিক্রয় ও উহার ব্যবসা হারাম; ১১১৯ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

১১১৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের সর্বনাশ করুন, তাহাদের উপর চর্বি হারাম করা হইয়াছিল। তাহারা চর্বি গলাইয়া তৈল করতঃ বিক্রি করিয়া উহার মূল্য ভোগ করিত।

ব্যাখ্যা ঃ—মৃত পশু-পাখির মাংস বা চর্বি ব্যবহার নিষিদ্ধ; উহার ক্রয়-বিক্রয়ও নিষিদ্ধ—উক্ত মাংস ও চর্বির যদি রূপও পরিবর্তন করা হয় তবুও নিষিদ্ধ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উপরোক্ত পরিচ্ছদত্রয়ের বিভিন্ন মছআলার ব্যাপারে মৃতের সংজ্ঞা সম্পর্কে ফেকাহ শাস্ত্রে যে সব তথ্য পাওয়া যায় সে দৃষ্টে অনেক ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণতামুক্ত হওয়ার অবকাশ লাভ হইতে পারে। যথা—

(ক) শুকর ব্যতীত অন্য যে কোন হারাম পশুও জবেহকৃত হইলে উহার চামড়া সর্বসম্মতরূপে পাক; অনেক আলেমের মতে উহার গোশত এবং চর্বি ইত্যাদিও পাক পরিগণিত হয়। (সে মতে উহা খাওয়া হালাল না হইলেও উহার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে।) অবশ্য রক্ত ত নাপাক হইবেই। (আলমগীরী, ১—২৫ পৃঃ)

(খ) খাদ্যে হালাল হইবার জন্য নয়, বরং শুধু পাক পরিগণিত হওয়ার জন্য অনেক আলেম এরূপ মত ও ফতওয়াকে ছহীহ গণ্য করিয়াছেন যে, শরীয়তী জবেহ তথা শরীয়ত কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়মের জবেহ হইতে হইবে না—অর্থাৎ জবেহকারী মোসলমান বা কেতাবী হইতে হইবে না, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে গলার রগ কাটা এবং অপর ক্ষেত্রে যে কোন অংশে ধারালো অস্ত্রে জখম করার শর্তও হইবে না। (শামী, ১—১৮৯)।

ফতওয়া শামীর উল্লেখিত উদ্ধৃতিটি অতি গুরুত্বপূর্ণ: কারণ, উক্ত মতামত অনুযায়ী অমোসলেমের হাতে জবেহ বা ঘায়েলকৃত জীব মৃত গণ্য হইবে না। সেমতে শুধু কেবল রোগে কিম্বা পতিত হওয়ার ভীষণ চোটে বা কোন কারণে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া বা লাঠি ইত্যাদির আঘাতে রক্ত প্রবাহিত হওয়া ব্যতিরেকে মৃতই এক্ষেত্রে* মৃত গণ্য হইবে।

এক্ষেত্রে ফেকাহ শাস্ত্রে আরও একটি মছআলাহ সঙ্কীর্ণতা লাঘব করিবে।

মছআলাহ ঃ—তৈলের মধ্যে মৃত জীবের চর্বির তৈল মিশ্রিত হইলে—যদি পবিত্র তৈলের অংশ বেশী হয় তবে উহার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয, আর মৃতের চর্বির তৈল বেশী হইলে ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েয হইবে। (আলমগীরী, ৩—১৬১)

ছবির ব্যবসা করা

১১১৮। হাদীছ ঃ—সায়ীদ ইবনে আবুল হাসান (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট ছিলাম; এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল, হে আবুল আব্বাস! আমি একজন দরিদ্র লোক; আমার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় হইল আমার হস্তশিল্প—আমি ছবি আঁকিয়া

---

* এক্ষেত্রে তথা হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে নয়, বরং শুধু পাক পরিগণিত হওয়ার ক্ষেত্রে। আর ইহা অবধারিত যে, ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়া শুধু পাক পরিগণিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং পাক গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে যাহা মৃত পরিগণিত ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রেও শুধু উহাই মৃত গণ্য হইবে।

থাকি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাইব যাহা আমি নিজ কানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়াছি। আমি তাঁহাকে এই বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি কোন ছবি তৈরী করিবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাকে ঐ ছবির মধ্যে আত্মা দেওয়ার আদেশ করিবেন, (এবং আত্মা দিতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি দান করিতে থাকিবেন,) কিন্তু সে উহার আত্মা দিতে কখনও সক্ষম হইবে না।

এই হাদিছ শুনিয়া ঐ ব্যক্তি শিহরিয়া উঠিল; তাহার চেহারা জরদ হইয়া গেল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, যদি অগত্যা এই কাজ করিতেই চাও তবে জীবের ছবি না আঁকিয়া বৃক্ষাদির ছবি আঁকিও।

শরাব তথা মদের ব্যবসা হারাম

জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শরাবের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করিয়াছেন।

১১১৯। হাদীছঃ— عن عائشة رضى الله تعالى عنها

لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَاتُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ اٰخِرِهَا خَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِى الْخَمْرِ ـ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন ছুরা-বাকারার মধ্যে বর্ণিত (সুদ হারাম হওয়ার) আয়াতসমূহ নাযেল হইল হযরত (দঃ) ঘর হইতে বাহির হইলেন (এবং সুদ হারাম হওয়ার ঘোষণা শুনাইলেন, তখন মদ্য পান হারাম হওয়া পুনঃ ঘোষণা করতঃ) মদের ব্যবসা হারাম হওয়ার ঘোষণাও শুনাইলেন।

কোন স্বাধীন মানুষ বিক্রি করার ভয়াবহ পরিণতি

১১২০। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اِسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهٖ اَجْرَهٗ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন—কেয়ামতের দিন স্বয়ং আমি তিন প্রকার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বাদী হইব। (:) যে ব্যক্তি আমার নামে অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা করিয়া

বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। (২) যে ব্যক্তি স্বাধীন ও মুক্ত (অর্থাৎ শরীয়ত মতে ক্রীতদাস নয় এমন) মানুষ বিক্রি করিয়া অর্থ উপার্জন করিয়াছে। (৩) যে ব্যক্তি কোন মজুর দ্বারা কাজ করাইয়া তাহার পারিশ্রমিক দেয় নাই।

মৃত প্রাণী এবং মূর্তি বিক্রি করা নিষিদ্ধ

১১২১। হাদীছঃ— عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا أَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ .

অর্থ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে মক্কা বিজয়ের বৎসর মক্কা নগরীতে এই ঘোষণা দিতে শুনিয়াছেন—তোমরা স্মরণ রাখিও ! নিশ্চয় আল্লাহ এবং আল্লার রসুল মদ বিক্রি করা, মৃত পশু-পক্ষী বিক্রি করা, শুকর বিক্রি করা এবং মূর্তি বিক্রি করা হারাম করিয়াছেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ ! মৃতের চর্বি নৌকায় লাগান হয়, (মশক ইত্যাদির) চামড়ায় লাগান হয় এবং উহা দ্বারা চেরাগ জ্বালান হয়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, উহা (বিক্রি করা) জায়েয নহে—হারাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ সময় ইহাও বলিলেন, ইহুদিদের প্রতি আল্লার গজব নাযেল হউক ; আল্লাহ তায়ালা (শাস্তি স্বরূপ) তাহাদের প্রতি (হালাল জানোয়ারেরও) চর্বি হারাম হওয়ার আদেশ জারী করিলেন, তখন তাহারা ঐ চর্বি গলাইয়া তৈল করতঃ বিক্রি করিয়া উহার মুল্যের টাকা-পয়সা খাদ্য (ইত্যাদিতে) ব্যবহার করিল। (এইরূপে ফন্দি করিয়া নিষিদ্ধ বস্তু—চর্বি ব্যবহারে লিপ্ত হইয়াছিল, তাই তাহারা অভিশপ্ত।) ২৯৮ পৃঃ

কুকুর বিক্রি করা এবং উহার অর্জিত অর্থ

১১২২। হাদীছ ঃ— عن ابى مسعود رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ -

অর্থ—আবু মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিম্নে বর্ণিত তিন প্রকারে অর্জিত আয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন—(১) কুকুর বিক্রির টাকা-পয়সা। (২) বেশ্যাবৃত্তি—যেনা ও ব্যাভিচারে অর্জিত অর্থ। (৩) গণক (গণনাকারী)কে প্রদত্ত শিন্নি ও ভেঁট।

ব্যাখ্যা ঃ—অধুনা যেরূপ সৌখিনতারূপে কুকুর পোষার হিড়িক দেখা যায় অন্ধকার যুগেও তদ্রুপ ছিল। অথচ কুকুরের সংশ্রব মানবকে আল্লাহ তায়ালার রহমত ও নূর হইতে বঞ্চিত রাখে, তাই কুকুর পোষার সৌখিনতার স্রোতকে বন্ধ করার জন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুকুরের ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছিল—যে কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষা নিষিদ্ধ ছিল, ব্যাপক ভাবে কুকুর মারিয়া ফেলার আদেশ ছিল, কুকুর ক্রয় বিক্রয় এবং উহার দ্বারা অর্থ উপার্জন কঠোরতার সহিত নিষিদ্ধ ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। মোসলমানগণ কর্তৃক অন্ধকার যুগের ঐ সৌখিনতার কু-অভ্যাস পরিত্যাক্ত হওয়ার পর বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে সুযোগ দানার্থে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃকই সেই কঠোরতা হ্রাস করা হইয়াছে। কিন্তু মোসলমানদিগকে এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কুকুর আল্লার ফেরেশতাদের নিকট এবং আল্লার রসুলের নিকট অতি জঘন্য ও অতি ঘৃণিত, তাই যথাসাধ্য উহার সংশ্রব পরিহার করিবে।

মছআলাহ ঃ—কুকুর বিক্রি করা এবং উহার মুল্য হালাল হওয়া সম্পর্কে বর্তমানে শরীয়তে বিধানগত কোন বাধা-নিষেধ নাই, তবে উহা মকরূহ বটে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● যানবাহন যথা ঘোড়া এবং গাধা ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয। অর্থাৎ হারাম পশু পক্ষীও খাওয়া ভিন্ন অন্য উপকারের জন্য ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। (২৮১ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—শূকর ভিন্ন সকল পশু-পক্ষী ও কীট পতঙ্গ যাহা কোনও উপকারে ব্যবহৃত হয়—সবেরই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। (আলমগীরী, ৩—১৫৮)

● অমোসলেমদের হাটে-বাজারে ব্যবসা করা জায়েয (২৮২ পৃঃ)। ● শান্তি অশান্তি সর্বাবস্থায়ই অস্ত্র বিক্রয় করা জায়েয। এমরান ইবনে হোছাইন (রাঃ) দেশে অশান্তি-বিশৃঙ্খলা অবস্থায় অস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ বলিয়াছেন (২৮২ পৃঃ)। যে শ্রেণীর লোকের দ্বারা অশান্তি সৃষ্টির আশঙ্কা হয় তাহাদের নিকট অস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ। মৃগনাভী বা কস্তুরী এবং সকল প্রকার সুগন্ধিই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয (২৮২ পৃঃ)। ● যে শ্রেণীর কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ কিন্তু অন্য কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে উহার ব্যবসা জায়েয (২৮২ পৃঃ) ● পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারণ মালিকেরই অধিকার (২৮৩ পৃঃ)। অবশ্য বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকার কর্তৃক মূল্য নির্দ্ধারণের তথা কন্ট্রোল করার অধিকার আছে। বিস্তারিত বিবরণ ফতওয়া আলমগীরী, ৩—২৭৭ ● ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্তের বৈঠকেই ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তুর উপর স্বীয় অধিকারের কার্য্য প্রয়োগ করিতে পারে। বিশিষ্ট তাবেয়ী তাউস (রঃ) বলিয়াছেন, ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যদি ক্রেতা উক্ত পণ্য বিক্রয় করে, তবে ক্রেতাই উহার লাভের অধিকারী হইবে (২৮৪ পৃঃ)। ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল প্রকার ধোঁকা-ফাঁকি নিষিদ্ধ (২৮৪ পৃঃ)। বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয (২৮৪ পৃঃ)। অর্থাৎ বাজার ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট স্থান বটে, কিন্তু সেজন্য তথায় ব্যবসা-বাণিজ্য নাজায়েয নহে। ● হাটে-বাজারে যাইয়া (স্বীয় গাম্ভির্য্য ও শালিনতা অবশ্যই বজায় রাখিবে ;) চেচাইয়া কথা বলা নিষিদ্ধ (২৮৫ পৃঃ)। ● পণ্য ওজন করার ব্যয় সাধারণ ভাবে বিক্রেতার উপর বর্তিবে (২৮৫ পৃঃ)। ● পণ্যের লট্ তথা সমষ্টি ক্রেতার প্রতি (প্রয়োজন বোধে) নিষেধাজ্ঞা জারী করা যাইতে পারে যে, স্বীয় দোকানে না পৌছাইয়া উহা বিক্রয় করিতে পারিবে না এবং এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনে দণ্ডের বিধানও করা যায় (২৮৬ পৃঃ)। ১০৭৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণও আছে। ● ক্রেতা তাহার ক্রয়কৃত বস্তু বিক্রেতার নিকট থাকিতে দিয়াছে—এখনও উহা হস্তগত করার কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই, এমতাবস্থায় যদি উহা বিনষ্ট হইয়া যায়—যেমন উহা কোন জীব ছিল তাহা মরিয়া গিয়াছে, কিম্বা বিক্রেতা উহা অন্যত্র বিক্রয় করিয়া ফেলে এক্ষেত্রে কি হইবে? আবদুল্লাহ- ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন জীবিত ও উপস্থিত বিদ্যমান বস্তুর ক্রয় বিক্রয় সম্পাদন করার পর উহার মৃত্যু হইলে তাহা ক্রেতারই গণ্য হইবে; অর্থাৎ তাহাকে মূল্য পরিশোধ করিতে হইবেই (২৮৭ পৃঃ)। অবশ্য এক্ষেত্রে আবু হানিফা (রঃ) শাফেয়ী (রঃ) প্রমুখ ইমামগণ বলেন, ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হইলেও ক্রেতার হস্তগত করার কার্য্য সম্পাদনের পূর্বে যাহা কিছু

হইবে সবই বিক্রেতার পক্ষে গণ্য হইবে। সুতরাং অন্যত্র বিক্রির লাভের অধিকারী সে-ই হইবে এবং মরিয়া গেলে উহার ক্ষতি তাহার উপরই বর্তিবে--উহার মূল্যের অধিকারী সে হইবে না, মূল্য উসুল করিয়া থাকিলে তাহা ফেরত দিতে হইবে। এমনকি যদি কোন রুগ্ন পশুর ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়াছে, কিন্তু ক্রেতার হস্তগত করার কার্য্য সম্পাদন ব্যতিরেকে ক্রেতা-বিক্রেতাকে বলিয়াছে, পশুটি অদ্য রাত্র আপনার গোয়ালেই থাকিবে; অতঃপর রাত্রে বিক্রেতার গোশালায় উহা মরিয়া গিয়াছে. তবে এক্ষেত্রেও উহার ক্ষতি বিক্রেতার পক্ষেই হইবে ক্রেতার পক্ষে নহে (আলমগীরী, ৩-২৭)। অবশ্য ক্রেতার হস্তগত করা সম্পন্ন হওয়ার পরে যে কোন অবস্থাতেই উহার মৃত্যু হউক, এমনকি বিক্রেতার বাড়ীতেই মৃত্যু হউক, ক্ষতি ক্রেতার পক্ষে হইবে; মূল্য আদায় না করিয়া থাকিলে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে; যেমন, পশু বিক্রয় সাব্যস্ত করার পর বিক্রেতা ক্রেতাকে বলিল, এই আপনার পশু আপনাকে নেওয়ার জন্য বলিতেছি, আপনি নিয়া যান—যেরূপ বাক্য ও শব্দাবলীর মাধ্যমেই হউক এই ব্যবস্থা ও ভাব সম্পাদনের পর* যদি ক্রেতা উক্ত পশুকে নিয়া না যায় এবং উহা বিক্রেতার বাড়ীতে মারা যায় সে ক্ষেত্রে ক্ষতি ক্রেতার পক্ষেই হইবে (ক্রীতদাস বিক্রয় দৃষ্টান্তে এই মছআলাহ বর্ণিত হইয়াছে, আলমগীরী, ৩—২২পৃঃ)

এইরূপ ক্ষেত্রে যদি বিক্রেতা উহা অন্যত্র বিক্রি করে এবং লাভ হয় তবে সেই লাভের অধিকারী ক্রেতাই হইবে—এমনকি বিক্রেতাকে সম্মত রাখিয়া যদি ক্রেতা এখনও মূল্য পরিশোধ না-ও করিয়া থাকে। অবশ্য যদি বিক্রেতা মূল্যের জন্য পশুকে আটক দিয়া থাকে তবে সেক্ষেত্রে লাভ-লোকসান উভয়ই বিক্রেতার পক্ষে হইবে। ● কোন বস্তুর ক্রয় বা বিক্রয় মহিলার দ্বারা সম্পাদিত হইলে তাহা শুদ্ধ হইবে (২৮৮ পৃঃ)। ক্রয়-বিক্রয়ে শরীয়ত বিরোধী শর্ত করা হইলে ? (২৯০ পৃঃ)। এ সম্পর্কে মছআলাহ এই যে, যদি ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনই করা হয় ঐরূপ শর্তের সহিত তবে সেই ক্রয়-বিক্রয় অশুদ্ধ হইবে; পুনরায় ঐরূপ শর্ত ছাড়িয়া বিক্রি সম্পাদন করিতে হইবে। আর যদি বিক্রি সম্পাদনকালে নয়, উহার পূর্বে সেই শর্তের আলোচনা হইয়াছিল সে ক্ষেত্রে বিক্রি শুদ্ধ হইবে, শর্ত বাতিল গণ্য হইবে। ● খেজুর গাছের মাথি বিক্রি করা এবং উহা খাওয়া (২৯৬ পৃঃ ৫৫ হা)। অর্থাৎ খেজুর গাছের মাথির মধ্যে হয়ত কিঞ্চিৎ মাদকতার ভাব থাকিতে পারে, কিন্তু সেজন্য উহা খাওয়া ও ক্রয়-বিক্রয় করা দোষণীয় নহে। ● ক্রয় বিক্রয়, লেন-দেন ইত্যাদি বিনিময়-বন্ধনে দেশ-চল এবং সচরাচর প্রচলিত অর্থ ও উদ্দেশ্য বিশেষভাবে গৃহীত হইবে (২৯৪ পৃঃ)। অর্থাৎ—ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে অনেক বিষয়েরই নির্দ্ধারণ ও ব্যাখ্যা উল্লেখ হয় না; সে ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ ও নিষ্পন্ন পরিগণিত হইবে এবং

---

* প্রকাশ থাকে যে, ক্রেতার হস্তগত করার যে অর্থ শরীয়তে উদ্দেশ্য তাহা ১০৮১ নং হাদীছের ব্যাখ্যার ফুটনোটে বর্ণিত হইয়াছে এবং সেমতে পশুটি বিক্রয়ের পর ঐরূপ কথা ও ব্যবস্থা সম্পাদনে ক্রয়কৃত পশু ক্রেতার হস্তগত করা সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে যদিও উহা স্পর্শও করে নাই।

অনুল্লেখ বিষয়ে দেশ-চল অর্থই প্রযোজ্য হইবে। যেমন, "সের"-এর পরিমাণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ—৮২৸৴০, ৮০ তোলা, ৬০ তোলা, কোন দেশে ৪০ তোলা। ক্রয়-বিক্রয়কালে সাধারণতঃ শুধু সের উল্লেখ হয়, উহার ব্যাখ্যা ও পরিমাণের নির্দ্ধারণ উল্লেখ হয় না, সে জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের সিদ্ধতায় কোন ত্রুটি হইবে না এবং প্রত্যেক দেশে দেশ-চল অর্থই প্রযোজ্য হইবে, উহার ব্যতিক্রম দাবী প্রত্যাখ্যান হইবে। তদ্রূপ জমির পরিমাপ বোধক বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ এবং বিভিন্ন বস্তুর সংখ্যা নির্দ্ধারক পারিভাষিক শব্দ সমূহের ব্যাখ্যা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম। এক্ষেত্রেও প্রত্যেক অঞ্চলে তথাকার দেশ-চল ব্যাখ্যাই প্রযোজ্য হইবে। এরূপ আরও অনেক ক্ষেত্রেই দেশ-চল এবং সচরাচর প্রচলিত অর্থ ও ব্যাখ্যা গ্রহণীয় হওয়াই সাব্যস্ত। যেমন—হাসান বছরী (রঃ) একদা এক ব্যক্তি হইতে একটি গাধা এক রোজের জন্য বিনিময় নির্দ্ধারিত করিয়া কেরায়া নিলেন; পরের দিনও পুনরায় ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, তোমার গাধাটা দাও; সে দিয়া দিল; উভয়ের মধ্যে এই বিনিময় নির্দ্ধারণে কোন কথা হইল না। এরূপ ক্ষেত্রে কেরায়া নিষ্পন্ন ও সিদ্ধ সাব্যস্ত হইবে এবং পূর্ব দিনের বিনিময় পরিমাণই প্রযোজ্য হইবে। কারণ, এরূপ লাগালাগি আদান-প্রদান ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বারে নুতন কোন কথা উল্লেখ করা না হইলে সচরাচর প্রথমবারের অনুরূপই সাব্যস্ত হইয়া থাকে। ● জমি, বাড়ী বা যে কোন বস্তুর মধ্যে নিজের অংশ ভাগ বন্টনের পূর্বে অংশীদারের নিকট বা অন্যের নিকট বিক্রি করা জায়েয আছে (২৯৪ পৃঃ)। ● কেহ অন্য কোন ব্যক্তির জিনিষ বিক্রি করিয়া দিল অতঃপর সেই মালিক ব্যক্তি উহাতে সম্মতি দান করিল—উক্ত ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইয়া যাইবে (২৯৪ পৃঃ)। কোন অমোসলেম এমনকি যদি সে বিদেশীও হয় সে তাহার মালিকানার কোন জিনিষ বিক্রয় করিলে বা দান করিলে সেই দান শুদ্ধ পরিগণিত হইবে (২৭৫ পৃঃ)। অর্থাৎ অমোসলেমদের মধ্যে মালিকানা সত্ত্ব লাভের প্রথা ও রীতি-নীতি শরীয়ত বিরোধীও রহিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্যায় ও জুলুম সূত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে; এতদসত্ত্বেও বাস্তবে উহা অন্যের হক বলিয়া প্রমাণ ও দাবী না থাকিলে সে ক্ষেত্রে তাহার সম্পাদিত লেন-দেন শুদ্ধ গণ্য হইবে।

● শুকর ক্রয়-বিক্রি মোসলমানের জন্য হারাম। কোন মোসলমানের সত্বাধিকারে শুকর থাকিলে উহা যে কেহ মারিয়া ফেলিতে পারিবে; তাহার কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। ● শাসন কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে দেশান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিলে তাহাকে তাহার জায়গা-জমি ইত্যাদি বিক্রি করায় বাধ্য করিতে পারে। নবী (দঃ) মদীনার বিভিন্ন ইহুদী গোত্রকে তাহাদের সম্পাদিত সহ-অবস্থান ও শান্তি-চুক্তি ভঙ্গ করার এবং উস্কানীমূলক কার্য্য কলাপের অপরাধে মদীনা হইতে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত তাহাদিগকে অবগত করিয়া তাহাদের মালামাল বিক্রি করার আদেশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, যাহা বাকি থাকিবে তাহা রাষ্ট্রয়াত্ব করা হইবে (২৯৭ পৃঃ)। ● পশুর বিনিময়ে পশু বিক্রয় করতঃ এক পক্ষের নগদ তথা উপস্থিত প্রদান অপর পক্ষের বাকি—ইমাম বোখারীর

মতে জায়েয (২৯৭ পৃঃ)। এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার মাজহাব এই যে, উভয় পক্ষের পশু যদি এক জাতীয় না হয় এবং বাকি পক্ষের পশুটাও নির্দিষ্টকৃত হয়—শুধু হস্তান্তর বাকি থাকে সে ক্ষেত্রে বিনিময় শুদ্ধ হইবে; আর যদি এক জাতীয় হয় কিম্বা বাকি পক্ষের পশুটা নির্দিষ্টকৃত না হয় শুধু কেবল বর্ণনার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, তবে জায়েয ও শুদ্ধ হইবে না। কারণ, পশু এমন বস্তু যাহা বর্ণিত গুণাবলীর মধ্যে থাকিয়াও মূল্যমানে পার্থক্য হইয়া থাকে, অতএব বাকিটা আদায় করার বেলায় বিবাদের সৃষ্টি হইবে। এই জন্যই টাকার বিনিময়েও অনির্দিষ্ট পশু বাকি ক্রয় করা, যেমন—নির্দ্ধারিত বিবরণের দশটি গরু বা বকরি খরিদ করিল যাহা সম্মুখে উপস্থিত নাই, বিক্রেতা সংগ্রহ করিয়া দিবে; এই ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ তথা বাধ্যতামূলক হয় না। উপস্থিত নির্দিষ্ট পশুর বিক্রয় সব রকমেই শুদ্ধ ও জায়েয হয়, এমনকি একটি ভাল গরু তিনটি মন্দ বা ছোট গরুর সহিত বিনিময় করা জায়েয আছে। উভয় দিকে একই জাতীয় পশু হওয়া সত্ত্বেও বেশ-কমরূপে বিনিময় করা জায়েয, অথচ ফল বা ফসল কিংবা ধাতব জিনিষের বিনিময়ে উভয় দিক এক জাতীয় হইলে বেশ-কমরূপে বিনিময় জায়েয হয় না—যাহার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়

অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়কে শরীয়তের পরিভাষায় "বাইয়ে-সলম" বলে। বাইয়ে-সলম তথা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত আছে যাহা বিভিন্ন সুস্পষ্ট হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইয়া ফেকাহ শাস্ত্রে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। বর্তমানে আমাদের মধ্যে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সর্বত্রই দেখা যায়, ঐ সমস্ত শর্তের লঙ্ঘন হইয়া থাকে। শর্ত লঙ্ঘন হইলে সেই ক্রয়-বিক্রয় অশুদ্ধ হয়—বাধ্যতামূলক হয় না; যে কোন পক্ষ উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে।

১১২৩। হাদীছ :— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال

قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ

فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِىْ شَيْءٍ فَفِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ ـ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) যখন হিজরত করিয়া মদীনায় পৌঁছিলেন তখন মদীনা অঞ্চলের লোকদের মধ্যে খেজুরের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় প্রচলিত ছিল, এমনকি তাহারা দুই-তিন বৎসরের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করিত।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, যে কেহ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করিবে তাহাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণ ও ওজনের মধ্যে করিতে হইবে এবং বিক্রয় বস্তু প্রদানের দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—পরিমাণ ও ওজনের নির্দিষ্টতা দুই প্রকারে হইবে—সংখ্যার দিক দিয়া, যে—কত মণ বা কত সের বা কত ধামা এবং পরিমাণের দিক দিয়া অর্থাৎ কোন অঞ্চলে যদি বিভিন্ন পরিমাণের ওজন ও পরিমাপ প্রচলিত থাকে যেমন সেরের ওজন ৮২।৷৵০, ৮২, ৬০, ৪০—তোলা সে স্থলে একটি পরিমাপ নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। অবশ্য যদি শুধু একই পরিমাণ প্রচলিত হয় তবে এই বিষয়ে নির্দিষ্ট করিতে হইবে না, প্রচলিত পরিমাণই সাব্যস্ত হইবে।

তারিখের নির্দিষ্টতা এইরূপে করিতে হইবে, যাহাতে কোন প্রকার অনির্দিষ্টতার অবকাশ না থাকে। যদি এইরূপ নির্দিষ্ট করে যে, অমুক ব্যক্তি যে দিন বাড়ী আসিবে বা যে দিন মালের পার্শ্বলে আসিবে সেদিন প্রদান করিব তবে উহা শুদ্ধ হইবে না। ক্রয় বিক্রয় চূড়ান্ত করার সময় নির্দিষ্ট দিন-তারিখ অবশ্যই নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

১১২৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যামানায় ছাহাবীগন গমের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করিতেন কি? তিনি বলিলেন, আমরা সিরিয়াস্থ এক বিশেষ শ্রেণীর লোকদের নিকট হইতে গম, যব এবং যাইতুনের তৈল নির্দিষ্ট পরিমাণে ও নির্দিষ্ট তারিখে অগ্রিম ক্রয় করিতাম।

জিজ্ঞাসাকারী পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহার নিকট হইতে সেই বস্তু অগ্রিম ক্রয়-করিতেন তাহা কি সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত বিদ্যমান ও প্রস্তুত থাকিত? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, বিক্রেতাদের নিকট আমরা সেই প্রশ্ন করিতাম না।

জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি এই বিষয়টি আবদুর রহমান ইবনে আবযা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকটও জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও ঐরূপই বলিলেন যে—(আমরা) ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে অগ্রিম ক্রয় করিতাম, কিন্তু বিক্রেতা-দের নিকট এই প্রশ্ন আমরা করিতাম না যে, এই (বিক্রিত) ফসল তোমাদের নিকট মৌজুদ আছে কি—না?

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য বাইয়ে-সলম বা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি বিশেষ শর্ত এই যে, ক্রয়কৃত বস্তুটির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা চাই। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, বিক্রেতার স্বহস্তে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। বরং সেই অঞ্চলে বা এমন স্থানে বিদ্যমান থাকা যথা হইতে আমদানী করা বিক্রেতার জন্য সম্ভব সাধ্য হয়। বিক্রেতার নিজ হস্তে বিদ্যমান থাকা যে আবশ্যক নহে তাহাই উপরোল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এমনকি যাহার জমি নাই সেও শস্য ফসল শ্রেণী বস্তু অগ্রিম বিক্রি করিতে পারে, যাহার বাগান নাই সেও ফল-শ্রেণীর বস্তু অগ্রিম বিক্রয় করিতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য বাইয়ে-সলম তথা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাতটি সর্ত আছে— (১) ক্রয় বস্তু কি জাতীয় হইবে তাহা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা।

(২) ক্রয় বস্তুর গুণাগুণ পূর্ণরূপে বর্ণনা ও নির্দ্ধারণ করা। (৩) ক্রয় বস্তুর পরিমাপ ও ওজন বা সংখ্যা পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিত করা। (৪) ক্রেতার নিকট অর্পণের দিন-তারিখ পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিত করা (৫) ক্রয় বস্তু সেই অঞ্চলে প্রাপ্তির সুযোগ থাকা। (৬) বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার নিকট ক্রয় বস্তু অর্পণের স্থান নির্দিষ্ট হওয়া—যদি উহা স্থানান্তর করা ব্যয়সাপেক্ষ হয়। (৭) অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা সাব্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা কর্তৃক মূল্যের সম্পূর্ণ অর্থ আদায় করিয়া দেওয়া।

এই সমস্ত শর্তের কোন একটি লংঘন করা হইলে সে স্থলে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে না, ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং প্রত্যেকেই স্বীয় বাক্য হইতে সরিয়া যাওয়ার অধিকারী থাকিবে; কোন পক্ষই অপর পক্ষকে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর বাধ্য করিতে পারিবে না।

একটি বিশেষ মছআলাহ ঃ—

অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রয় বস্তু শ্রেণীগত, রূপগত এবং গুণাগুণগত যথাসাধ্য নির্দ্ধারণ আবশ্যক। কিন্তু উহাকে নির্দিষ্ট করা, যেমন—এই গাছের বা এই বাগানের ফল কিম্বা এই জমিনের ধান; এইভাবে নির্দিষ্ট করিয়া অগ্রিম বিক্রয় করা; সেই ফল ও ফসলের জন্ম হইয়া থাকুক কি না হইয়া থাকুক উভয় অবস্থাতেই নাজায়েয। কারণ জন্মিয়া না থাকিলে সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বস্তু উহার অস্তিত্ব ছাড়া বিক্রয় করা হইল; আর জন্মিয়া থাকিলে অগ্রিম ক্রয়ের অর্থ এই যে, ফল বা ফসল পাকা পর্য্যন্ত গাছে বা জমিনে থাকার শর্তে ক্রয় করা হইয়াছে—উভয়টিই নাজায়েয। নিম্নের হাদীছে এই মছআলাহ বর্ণিত হইয়াছে—

১১২৫। হাদীছ ঃ—আবুল বখতারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম—নির্দিষ্ট গাছ বা বাগানের খেজুর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করা সম্পর্কে। তিনি বলিলেন, নির্দিষ্ট গাছ বা বাগানের খেজুর ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ)কেও ঐ মছআলাই জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনিও বলিলেন, নির্দিষ্ট গাছ বা বাগানের খেজুর খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করিতে নবী (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।

অর্থাৎ নির্দিষ্ট গাছ বা বাগানের খেজুর বিক্রয় উপযোগী হওয়ার ক্ষেত্রে নগদ ক্রয়-বিক্রয়ই হইতে পারে; আর উহার পূর্বে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

মছআলাহ ঃ—নির্দিষ্ট (Bill of Loading তথা) ফর্দ বা তালিকার মাল, কিম্বা নির্দিষ্ট জাহাজে বহিত মাল অথবা নির্দিষ্ট কল বা কারখানার তৈরী মাল ইত্যাদি কোন বিশেষ প্রকার নির্দ্ধারণ দ্বারা নির্দিষ্ট করা পণ্য অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েয; সেই ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হইবে না।

মছআলাহ ঃ—মূল্য নগদ পরিশোধ করিয়া অগ্রিম ক্রয় ক্ষেত্রে ক্রয় বস্তু পাইবার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য জামিন বা বন্ধক গ্রহণ করা যায়।

হক্কে-শোফার বিবরণ

(১) একটি বাড়ী বা জমিনের উপর কতিপয় অংশীদার মালিক আছে তন্মধ্যে কোন অংশীদার স্বীয় অংশ অপর ব্যক্তির নিকট বিক্রি করিলে অংশীদারগণ (কাজীর সাহায্যে) সেই ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামুলক বাতিল ও ভঙ্গ করত: ঐ পরিমাণ মূল্যে সেই অংশ তাহারা গ্রহণ করিতে পারে। (২) কতিপয় ব্যক্তির বাড়ী বা বাগান ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্নই আছে, কিন্তু ঐ বাড়ীতে বা বাগানে যাতায়াতের রাস্তা-ঘাট এক ও এজমালী, তাহাদের কোন ব্যক্তি স্বীয় বাড়ী-বাগান কোন অপর ব্যক্তির নিকট বিক্রি করিলে, ঐ এজমালী রাস্তা-ঘাট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অধিকার থাকিবে যে, (কাজীর সাহায্যে) সেই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল ও ভঙ্গ করতঃ ঐ মূল্যে তাহারা সেই বাড়ী বা বাগানকে ক্রয় করিয়া লয়। (৩) একটি বাড়ী বা জমিনের পড়শী আছে ঐ বাড়ী বা জমিন সেই পড়শী ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট বিক্রিত হইলে ঐ পড়শী (কাজীর সাহায্যে) সেই ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল ও ভঙ্গ করতঃ সম মূল্যে ঐ বাড়ী ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে।

উক্ত তিন প্রকার অধিকারকে "হক্কে-শোফা" বলা হয়। এই অধিকারত্রয় শ্রেণী পর্য্যায়ে বলবৎ হইবে। অর্থাৎ প্রথম নম্বরে বর্ণিত রকমের অধিকারী সর্বাগ্রে, অতঃপর দ্বিতীয় নম্বরে বর্ণিত রকমের অধিকারী, অতঃপর তৃতীয় নম্বরে বর্ণিত রকমের অধিকারীকে হক্কে-শোফার অধিকার দান করা হইবে।

১১২৬। হাদীছ :— عن جابر رضى الله تعالى عنه قال

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ـ

অর্থ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই হুকুম ও ফয়ছালা জারী করিয়াছেন যে, এজমালী বাড়ী বা জমিনের উপর (অংশীদারী) হক্কে-শোফার অধিকার থাকিবে যাবৎ উহা ভাগ বন্টন করা না হয়। প্রত্যেকের অংশ ভাগ-বন্টন করিয়া সীমানাযুক্ত করিয়া এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ রাস্তা-ঘাট ভিন্ন করিয়া লওয়ার পর (অংশীদার সম্বন্ধীয়) হক্কে-শোফার অধিকার বাকি থাকিবে না।

ব্যাখ্যা :—পুর্বেই বলা হইয়াছে, হক্কে-শোফার অধিকার তিন প্রকারে হইয়া থাকে। অংশীদারগণের মধ্যে ভাগ-বন্টন এবং রাস্তা-ঘাট ভিন্ন হইয়া যাওয়ার পর তাহাদের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের অধিকার বাকি থাকে না, অবশ্য তৃতীয় প্রকারের অধিকার বাকি থাকিবে।

হক্কে-শোফার অধিকারীকে প্রথম আহ্বান করা

হাকাম (রঃ) বলিয়াছেন, হক্কে-শোফার অধিকারী অন্যের নিকট বিক্রি করার অনুমতি দিলে সেক্ষেত্রে তাহার হক্কে-শোফার অধিকার থাকিবে না।

শা'বী (রঃ) বলিয়াছেন, হক্কে-শোফার অধিকারীর সম্মুখে ঐ বাড়ী বা জমিন বিক্রি হইতেছে, সে তাহাতে বাধা দেয় না, তবে তাহার হক্কে-শোফা খর্ব হইবে।

১১২৭। হাদীছঃ—আমর ইবনে শরীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সায়াদ ইবনে আবি অক্কাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত ছিলাম, মেসওয়ার (রাঃ)ও তখন ঐ স্থানে পৌছিলেন; এমতাবস্থায় আবু রাফে (রাঃ) তথায় পৌছিলেন এবং সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বলিলেন, আপনার বাড়ী সংলগ্ন আমার ঘর দুইটি আপনি ক্রয় করিয়া লউন। সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, আমি কস্মিনকালেও উহা ক্রয় করিব না। (তখন আবু রাফে (রাঃ) মেছওয়ার (রাঃ)কে এই বিষয়ে সাহায্যের অনুরোধ জানাইলেন।) সেমতে মেছওয়ার (রাঃ) সায়াদ (রাঃ)কে বলিলেন, আপনাকে খোদার কসম—আপনি অবশ্যই উহা ক্রয় করিয়া লইবেন। তখন সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, আমি কিন্তু—চার হাজার রৌপ্য মুদ্রার উর্দ্ধে উহার মূল্য দিব না—তাহাও কিস্তিতে আদায় করিব। তখন আবু রাফে' (রাঃ) বলিলেন, এই ঘরদ্বয়ের বিনিময়ে অন্য লোকে আমাকে নগদ পাচ শত স্বর্ণ মুদ্রা (যাহার মূল্য চার হাজার রৌপ্য মুদ্রা হইতে অনেক অধিক) দিতেছিল, কিন্তু আমি যদি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে না শুনিতাম যে, "পড়শী তাহার নিকটবর্তীতার হক, তথা হক্কে-শোফার মধ্যে (দূরস্থিত লোকদের তুলনায়) অগ্রগণ্য" তবে আমি পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা লাভের সুযোগ পাওয়া অবস্থায় চার হাজার রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে কখনও এই ঘর দিতাম না। এই বলিয়া তিনি সায়াদ (রাঃ)কে ঘর দিয়া দিলেন।

মছআলাহঃ—হক্কে-শোফার অধিকারী অপর ক্রেতার সমমূল্য প্রদানে রাজী না হইলে তাহার দাবী বাতিল হইয়া যায়। উল্লিখিত ঘটনায় হযরতের হাদীছের প্রতি বিশেষ অনুরুক্তি বসে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হইয়াছে—অন্যের অপেক্ষা কম মূল্যে দিয়াও প্রতিবেশীকে অগ্রগণ্য করা হইয়াছে।

মছআলাহঃ—বাড়ীর একাধিক পড়শীর ক্ষেত্রে যাহার বাড়ীর সদর দরজা অধিক নিকটবর্তী তাহাকে অগ্রগণ্য করা হইবে।

পারিশ্রমিক প্রদানে কাহারও দ্বারা কাজ নেওয়া

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে একটি ঘটনার বর্ণনা দানে বলিয়াছেন—

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"সর্বোত্তম শ্রমিক শক্তিশালী আমানতদার বিশ্বস্ত শ্রমিক" এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শ্রমিক নিয়োগ করা কালীন শ্রমিক সৎ হওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই।

মোসলমান শ্রমিক না পাইলে অমোসলেম নিয়োগ করা

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 'খয়বর' জয় করিয়া উহার ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা তথাস্থিত বাসিন্দা ইহুদীদিগকেই উৎপন্নের ভাগীরূপে কাজ করার জন্য দিয়াছিলেন। (কারণ তথায় মোসলমানদের বসবাস ছিল না)।

১১২৮। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আবু বকর (রাঃ) হিজরত করা কালীন বনী-দীল গোত্রের এক ব্যক্তিকে মজুরী দানে তাঁহাদের সঙ্গে পথ-প্রদর্শকরূপে যাওয়ার জন্য সাব্যস্ত করিলেন; ঐ ব্যক্তি অমোসলেম ছিল, উহার উপর তাঁহাদের আস্থা ছিল, তাই তাঁহারা তাঁহাদের যানবাহন ঐ ব্যক্তির হাওয়ালা করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, (আমরা অদ্যই রওয়ানা হইব,) তিন রাত্র অতিবাহিত হওয়ার পর আমাদের যানবাহন লইয়া তুমি 'ছওর' পাহাড়ের গুহার নিকট উপস্থিত হইও। ঐ ব্যক্তি তাহাই করিল—তিন রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর যানবাহন লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদিগকে লইয়া সমুদ্র-কূলের পথে মদীনা যাত্রা করিল।

শ্রমিক মজুরী না নিয়া চলিয়া গেলে উহা তাহার প্রাপ্য থাকিবে

১১২৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই ঘটনা বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি, পূর্বকালের কোন এক উম্মতের তিন ব্যক্তি একদা ভ্রমণে বাহির হইল এবং পথিমধ্যে বৃষ্টিপাত আরম্ভের দরুন তাহারা একটি পাহাড়ীয় গুহার ভিতর আশ্রয় নিল এবং তথায় তাহারা নিদ্রার ব্যবস্থাও করিল। হঠাৎ একটি বিরাট পাথর পাহাড় হইতে পিছলিয়া পড়িয়া গুহার মুখকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ করিয়া দিল এবং ঐ তিন ব্যক্তি গুহার ভিতর অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। এমতাবস্থায় তাহারা পরস্পর বলাবলি করিল যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সর্বোত্তম নেক আমল উল্লেখ পূর্বক উহার অছিলা ধরিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া কর, ইহা ব্যতিরেকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় দেখা যায় না।

অতঃপর তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি এইরূপে দোয়া করিল—হে আল্লাহ! আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা ছিলেন; আমি কখনও তাঁহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা না করিয়া আমার স্ত্রী-পুত্র, চাকর-চাকরানীকে খাইতে দিতাম না। এক দিনের ঘটনা এই যে, আমি কোন জিনিসের তালাশে বহু দূরে চলিয়া যাই, তথা হইতে আমার ফিরিতে রাত্র হইয়া যায়। আমি বাড়ী আসিয়া দুগ্ধ দোহন করতঃ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি তাঁহারা উভয়েই নিদ্রামগ্ন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আহারের পূর্বে আমার স্ত্রী-পুত্র চাকর-চাকরানীকে আহার করিতে দেওয়া আমি ভাল মনে না করিয়া দুগ্ধের পেয়ালা

হাতে লইয়া আমি তাঁহাদের নিকটবর্তী দাঁড়াইয়া থাকিলাম। আমি তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গের অপেক্ষা করিতেছিলাম; সারা রাত্র আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। এদিকে আমার ছেলেমেয়েরা ঐ দুগ্ধ পানের জন্য আমার পায়ে পড়িয়া চিৎকার করিতেছিল। এই অবস্থায় রাত্র প্রভাত হইয়া গেল। অতঃপর তাঁহারা নিদ্রোত্থিত হইলেন এবং সেই দুগ্ধ পান করিলেন। মাতা-পিতার খেদমতে এইরূপে আত্মনিয়োগ করা—হে অন্তর্য্যামী খোদা। তুমি জান যে, আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যেই করিয়াছি, তাই তুমি স্বীয় কৃপাবলে আমাদের হইতে এই পাথরের বিপদ দূর করিয়া দাও। এই দোয়া করার পর পাথরটি কিছু পরিমাণ গুহা-মুখ হইতে সরিয়া পড়িল, গুহা-মুখ অল্প পরিমান উন্মুক্ত হইল, কিন্তু মানুষ বাহির হওয়ার পরিমাণ প্রশস্ত নহে।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি এইরূপ দোয়া করিল—হে আল্লাহ! আমার চাচার সম্পর্কীয় একটি ভগ্নি ছিল; আমি তাঁহার প্রতি অত্যাধিক আসক্ত ছিলাম। আমি তাহাকে বহুবার আমার মনোবাঞ্ছা পুরণের আহ্বান করিয়াছি, কিন্তু সে কখনও আমার আহ্বানে সাড়া দেয় নাই, সর্বদা সে নিজকে পবিত্র রাখিয়াছে। অতঃপর এক ভীষণ দুর্ভিক্ষের বৎসর সে আমার নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে এক শত কুড়িটি স্বর্ণ মুদ্রা দান করিলাম এই শর্তে যে, সে নিজেকে আমার জন্য ছাড়িয়া দিবে। সে তখন অগত্যা রাজী হইল। আমি যখন দীর্ঘ দিনের কামনা পূরণের জন্য উদ্যত হইয়া তাহার মুখামুখী বসিলাম তখন সে আমাকে বলিল, হালাল ও জায়েয সূত্রে আবদ্ধ না হইয়া চিরজীবনের অস্পর্শিত বস্তুর পবিত্রতা নষ্ট করিতে আমি তোমাকে সম্মতি দেই না, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। তখন এই কার্য্যকে গোনাহ ও পাপ বলিয়া উপলব্ধি করার সুবুদ্ধি আমার উদয় হইল এবং পাপ ও গোনাহ হইতে বাঁচিবার মানসে তাহাকে স্পর্শ না করিয়া সরিয়া পড়িলাম, অথচ সে আমার অত্যাধিক আসক্তির বস্তু ছিল, এবং ঐ একশত কুড়িটি স্বর্ণ-মুদ্রা তাহাকে দিয়া দিলাম। হে অন্তর্যামী আল্লাহ! তুমি জান, একমাত্র তোমার ভয়ে এবং তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি স্বীয় বাসনা পুরণের সুযোগ পাইয়াও ছাড়িয়া দিয়াছি, তুমি স্বীয় কৃপাবলে আমাদিগকে বিপদমুক্ত কর। তখন গুহার মুখ আরও উন্মুক্ত হইল, কিন্তু এইবারও মানুষ বাহির হওয়ার পরিমাণ হইল না।

হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, তৃতীয় ব্যক্তি এইরূপ দোয়া করিল—হে আল্লাহ। আমি কতিপয় মজুরকে কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলাম। তাহাদের প্রত্যেকেই স্বীয় মজুরি লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্যে একজন তাহার মজুরি না লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার মজুরি ছিল এক ধামা ধান। আমি ঐ ধানকে বপন করিলাম এবং উহার উৎপন্নের আয় দ্বারা উট ক্রয় করিলাম এইরূপে গরু, ছাগল এবং ক্রীতদাস ক্রয় করিলাম। কিছুদিন পর ঐ মজুর আসিল এবং মজুরির দাবী জানাইল। আমি তাহাকে বলিলাম,

এই সব গরু, ছাগল, উট ও ক্রীতদাস সমস্তই তোমার। সে বলিল, আমার সঙ্গে বিদ্রূপ করিবেন না; আমি বলিলাম, বিদ্রূপ আমি মোটেই করি না (—এই বলিয়া তাহাকে বিস্তারিত ঘটনা বলিলাম।) তখন সে ঐ সব লইয়া চলিয়া গেল। হে আল্লাহ! তুমি জান, আমি একমাত্র তোমার ভয়ে এবং তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এরূপ করিয়াছিলাম; তুমি স্বীয় কৃপাবলে আমাদিগকে বিপদ মুক্ত কর। তৎক্ষণাৎ গুহার মুখ পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া গেল তাহারা গুহা হইতে বাহির হওয়ায় সক্ষম হইল।

ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি বিভিন্ন কার্য্যের বিনিময় গ্রহণ করা

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, (কোন প্রকার শরীয়ত বিরোধী মন্ত্র পড়িয়া ঝাড়-ফুঁক করার বিনিময় গ্রহণ করার তুলনায়) আল্লার কালাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করিয়া বিনিময় গ্রহণ করার অধিকার সুস্পষ্ট।

বিশিষ্ট তাবেয়ী শা'বী (রঃ) বলিয়াছেন, আল্লার কালাম শিক্ষা দানকারী বিনিময়ের শর্ত করিতে পারিবে না। শর্তহীন অবস্থায় তাঁহাকে কিছু দেওয়া হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

হাকাম (রঃ) বলিয়াছেন, শিক্ষকতার বিনিময় গ্রহণ নাজায়েয বা মকরূহ নহে।

ইবনে সীরীন (রঃ) বলিয়াছেন, ভাগ-বণ্টনকারী আমিন ইত্যাদিকে ন্যায্য পারিশ্রমিক দান করা দোষণীয় নহে; ইহাকে উৎকোচ বলা হইবে না। তিনি বলিয়াছেন—বিচার কার্য্যে বাদী বিবাদীর নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করিলে উহাকে উৎকোচ বলা হইবে—যাহা হারাম। এবং উহা সম্পর্কে হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, উৎকোচের ধন উপভোগকারীর দেহ জাহান্নামের অগ্নিরই উপযোগী।

কোন কোন আলেমের মতে জরিপ কার্য্যের দ্বারা ভাগ-বণ্টন করা বিচার বিভাগীয় কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত, তাই এই কাজের ব্যক্তিগণ সরকারীভাবে নিয়োজিত হইবে। পক্ষদ্বয়ের নিকট হইতে তাহারা কিছু গ্রহণ করিবে না।

১১৩০। **হাদীছ ঃ**—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের (ত্রিশ জন) ছাহাবীর একটি দল (জেহাদের জন্য) ভ্রমণ অবস্থায় (রাত্রিবেলা) কোন এক বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য বস্তিবাসিদের অনুগ্রহ প্রার্থী হইলেন। বস্তিবাসীগণ তাঁহাদের কোন প্রকার সহায়তা করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল।

এমতাবস্থায় বস্তির সর্দার সর্প দংশিত হইল এবং বস্তিবাসিগণ তাহার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা-তদবীর করিল; কোন ফল লাভ হইল না। তখন তাহাদের কেহ কেহ এরূপ পরামর্শ দিল যে, রাত্রিবেলা যে একদল বিদেশী পথিক আসিয়াছিল তাহাদের খোজ করিয়া দেখা যাউক; তাহাদের নিকট কোন চেষ্টা-তদবীর থাকিতে পারে। অতঃপর বস্তিবাসিদের এক প্রতিনিধি দল ছাহাবীগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ঘটনা ব্যক্ত করিল

যে, আমাদের বস্তির সর্দার সর্প দংশিত হইয়াছে এবং আমাদের সমস্ত চেষ্টা-তদবীর বিফল গিয়াছে; আপনাদের কাহারও নিকট কোন চেষ্টা-তদবীর আছে কি? ছাহাবীদের মধ্য হইতে একজন (দাঁড়াইলেন—যাহাকে আমরা ঝাড়-ফুঁককারী ধারণা করিতাম না; তিনি) বলিলেন, হাঁ—আমি ঝাড়-ফুঁক করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা আপনাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছিলাম আপনারা তাহাতে সম্মত হন নাই, এখন আমি ঝাড়-ফুঁক করিব না—যাবৎ আমাকে বিনিময় দান না করিবেন। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে এক দল (ত্রিশটি) বকরি দান করা সাব্যস্ত হইল এবং ঐ ছাহাবী সেই দংশিত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া "আলহামদু" সূরা পাঠ করতঃ তাহার উপর (সাতবার) ফুঁক দিলেন। দংশিত ব্যক্তি পূর্ণ মুক্ত ও সুস্থ হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ চলাফেরা করিতে লাগিল; সে যেন পূর্বে অসুস্থই ছিল না। তখন বস্তিবাসীগণ নির্ধারিত বিনিময় পরিশোধ করিয়া দিল। ঐ ছাহাবী ফিরিয়া আসিলে সকলেই অবাক হইলেন এবং বলিলেন, আপনি ত ঝাড়-ফুঁকের কাজে অভ্যস্ত ছিলেন না। ছাহাবীগণের কেহ কেহ প্রস্তাব করিলেন, এই সব বকরি আমাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু ঝাড়-ফুঁককারী ছাহাবী বলিলেন, এখন কিছুই করিবেন না, যাবৎ আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনা ব্যক্ত না করি এবং এই ব্যাপারে তাঁহার অভিমত না শুনি।

ছাহাবীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনা বর্ণনা করিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তুমি কিরূপে জান যে, এই সূরা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা যায়? (ছাহাবী বলিলেন, আমার মনে এরূপ জাগিয়াছিল।) নবী (দঃ) বলিলেন, তোমরা কোন অশুদ্ধ কাজ কর নাই; (সৌজন্যমূলক ভাবে) সকলে ইহা বণ্টন করিয়া লও এবং হাসিমুখে বলিলেন—আমার জন্যও এক অংশ রাখ।

রক্তমোক্ষণ কার্য্যের পারিশ্রমিক

১১৩১। **হাদীছঃ**—তাবেয়ী আমর ইবনে আমের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করাইতেন এবং (রক্তমোক্ষণকারী) কাহাকেও তাহার পারিশ্রমিক কম দিতেন না।

ব্যাখ্যাঃ—পূর্বে এক হাদীছে রক্তমোক্ষণ কার্য্যের উপার্জনকে নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। অথচ উল্লিখিত হাদীছ এবং ১০৭৬ ও ১০৭৭ নং হাদীছে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) স্বয়ং এই কার্য্যের পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছেন। রক্তমোক্ষণ সম্পর্কীয় হাদীছ দৃষ্টে দুইটি বিষয় উপলব্ধি করা যায়—প্রথম এই যে, রক্তমোক্ষণ কার্য্যের উপার্জন নিষিদ্ধ অর্থাৎ পছন্দনীয় নহে অবশ্য হারামও নহে। দ্বিতীয় এই যে, গ্রহীতার জন্য এরূপ উপার্জনে লিপ্ত না হওয়া চাই, কিন্তু দাতার কর্তব্য এই যে, কোন মানুষকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটাইবে না।

ষাড়ের পাল ও প্রজননের মজুরি

১১৩২। হাদীছ :— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ـ

অর্থ—আবতুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ষাড় দ্বারা পাল প্রজনন (Breeding) দিয়া উহার বিনিময় ও মজুরি গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা :—উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন— উক্ত কার্য্যের বিনিময় ও মজুরী গ্রহণ নিষিদ্ধ ও হারাম। ইমাম মালেক (রঃ) বলিয়াছেন— এই নিষেধাজ্ঞা সৌজন্যমূলক এবং মোসলেম জাতি ও সমাজের বৈশিষ্টতা-সুলভ নিষেধাজ্ঞা। অর্থাৎ মোসলেম জাতি মহান ও উচ্চতর জাতি; তাঁহাদের কার্য্যক্রম, ব্যবসা-বাণিজ্য, আয়-উপার্জন ও আচার-ব্যবহার উচ্চমানের হওয়া আবশ্যক। উল্লিখিত কার্য্যের দ্বারা পরোপকার করার সুযোগ কোন মোসলমানের থাকিলে বিনিময় ব্যতিরেকেই সেই কার্য্য সমাধা করিয়া দিবে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● শ্রমিকের অগ্রিম বিনিয়োগ শুদ্ধ হয়। অর্থাৎ যেমন—অদ্য বিনিয়োগ সাব্যস্ত হইল, কিন্তু কাজে যোগ দিবে তিন দিন, এক মাস বা এক বৎসর পর—এরূপ চুক্তি শুদ্ধ ও বাধ্যতামুলক হইবে। কাজে যোগদানের নির্দ্ধারিত সময় আসিলে উভয়ে চুক্তি রক্ষায় বাধ্য থাকিবে (৩০১ পৃঃ)। ● কাজের চুক্তি না করিয়া সময়ের চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করা জায়েয। (ঐ) ● সময়ের চুক্তি না করিয়া নির্দ্ধারিত কাজের চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করাও জায়েয। (ঐ)।

সময়ের চুক্তিতে সময়ের নির্দ্ধারণ আবশ্যক; যে কোন সূত্রেই নির্দ্ধারণ হউক। যেমন, অর্দ্ধ দিন বা আছরের নামায পর্যন্ত (৩০২ পৃঃ)। ● শ্রমিকের পারিশ্রমিক না দেওয়া এত বড় গোনাহ যে, কেয়ামতের দিন ঐরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বাদী হইবেন (ঐ)। ● সাধারণ্যে সময় নির্ধারণ যে সূত্রে বুঝিতে পারে উহা দ্বারাই সময়ের চুক্তি শুদ্ধ হইবে। যেমন—আছর হইতে রাত্র পর্যন্ত (ঐ)। ● কোন জিনিষ ক্রয় বা বিক্রয় করিতে দালালী করার পারিশ্রমিক লওয়া জায়েয। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি এরূপ চুক্তি করে যে, আমার এই কাপড় বিক্রি করিয়া দাও, মুল্য এত টাকার উপরে যাহা হইবে তাহা তোমার—ইহা জায়েয। ইবনে সীরীন (রঃ) বলিয়াছেন, এরূপ চুক্তি করা জায়েয যে, আমার এই জিনিয এত টাকায় বিক্রি কর; ইহাতে লভ্যাংশ আমাদের উভয়ের মধ্যে বন্টিত হইবে (৩০৩ পৃঃ)। ● কোন মোসলমান

বিশেষ প্রয়োজনে অমোসলেমদের চাকুরী করিতে পারে। (৩০৪ পৃঃ)। (অবশ্য এরূপ কাজের চাকুরী করিতে পারিবে না যে কাজ মোসলমানের জন্য করা জায়েয নহে বা যে কাজে মোসলেম জাতির ক্ষতি সাধন হয়। সকল ইমামগণেরই মজহাব এই যে, মোসলমান দেশে কোন মোসলমান অমোসলেমের এরূপ চাকুরী গ্রহণ করিবে না যাহা অতি নিম্নস্তরের কাজ; যেমন, বাড়ী-ঘরে সাধারণ কাজ-কর্মের চাকর বা ভৃত্য হওয়া।) (ফতহুলবারী, ৪—৩৫৭)।

● বেশ্যাবৃত্তির উপার্জন হারাম; তদ্রূপ যে কাজ শরীয়তে নাজায়েজ উহার উপার্জনও নাজায়েজ (ঐ)। ● কোন কিছু কেরায়ার উপর গ্রহণ করা হইলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যদি কোন পক্ষের মৃত্যু হয় তাহাতে চুক্তি ভঙ্গ হইবে না, চুক্তির মেয়াদ পর্য্যন্ত চুক্তি বলবৎ থাকিবে। মৃত্যু পক্ষের উত্তরাধিকারীগণ চুক্তি পালনে বাধ্য থাকিবে (৩০৫)। (ইহা অধিকাংশ ইমামগণের মত। হানাফী মজহাব মতে যে কোন এক পক্ষের মৃত্যুতে সাধারণতঃ চুক্তি বাতিল হইয়া যাইবে; তাহার উত্তরাধিকারীগণ চুক্তি পালনে বাধ্য হইবে না, যদিও চুক্তির মেয়াদ বাকি থাকে। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে চুক্তি বলবৎ থাকিবে। এনায়াহ্—শরহে হেদায়াহ দ্রষ্টব্য)।

এক জনের দেনা অন্য জনের উপর বরাত দেওয়া

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, একজনের ঋণ অপর জনের উপর দেওয়া তখনই শুদ্ধ হইবে যখন ভার অর্পণকালে অর্পিত ব্যক্তি উক্ত ঋণ আদায়ের সামর্থবান হয়।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, মৃত ব্যক্তির ত্যজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারীগণ পরস্পর সম্পত্তি এইরূপে বণ্টন করিয়াছে যে, একজনে নগদ মালামাল নিয়াছে এবং আর একজনে অপরের নিকটে পাওনা ঋণ বুঝিয়া নিয়াছে। সে ক্ষেত্রে যদি ঐ ঋণ উসুল না হয় সেজন্য সে নগদ মালামাল গ্রহণকারীর উপর কোন দাবী করিতে পারিবে না (৩০৫)।

১১৩৩। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَاِذَا اُتْبِعَ

اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দেনা পরিশোধের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পাওনাদারকে ঘুরানো প্রকৃত প্রস্তাবে জুলুম ও বড় অন্যায়। কাহারও পাওনা পরিশোধে দেনাদার কর্তৃক কোন সামর্থবান ব্যক্তির বরাত দেওয়া হইলে সেই বরাত গ্রহণ করা উচিত।

মৃত ব্যক্তির ঋণের ভার গছিয়া লওয়া

১১৩৪। হাদীছঃ—সালামা-ভুবনুল-আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় একটি জানাযা উপস্থিত করা হইল এবং সকলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে জানাযার নামায পড়াইবার অনুরোধ করিল। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন এই ব্যক্তির উপর ঋণ আছে কি? সকলেই উত্তর করিল—না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে কি? সকলেই উত্তর করিল—না। হযরত (দঃ) তাহার জানাযার নামায পড়াইয়া দিলেন।

অতঃপর দ্বিতীয় একটি জানাযা উপস্থিত করা হইলে সকলেই হযরত (দঃ)কে জানাযার নামায পড়াইবার জন্য অনুরোধ করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার উপর কোন ঋণ আছে কি? সকলেই উত্তর করিল—হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে কি? সকলেই উত্তর করিল—হাঁ। তিনটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) আছে। হযরত (দঃ) তাহারও জানাযার নামায পড়াইলেন।

অতঃপর তৃতীয় একটি জানাযা উপস্থিত করা হইল এবং সকলেই নবী (দঃ)কে তাহার জানাযার নামায পড়াইবার জন্য অনুরোধ করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে কি? সকলেই উত্তর করিল—না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার উপর ঋণ আছে কি? সকলেই উত্তর করিল, হাঁ—তিন দিনার। তখন নবী (দঃ) (স্বয়ং তাহার জানাযার নামায পড়াইতে অস্বীকার করতঃ) উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বলিলেন, তোমরা তাহার জানাযার নামায পড়। এই অবস্থা দৃষ্টে আবু কাতাদা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি তাহার জানাযার নামায পড়াইয়া দিন, তাহার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি গছিয়া নিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু কাতাদা (রাঃ)কে বলিলেন, এই দিনার কয়টি পরিশোধ করা তোমার জিম্মায় রহিল এবং মৃত ব্যক্তি খালাস পাইয়া গেল? আবু কাতাদা (রাঃ) বলিলেন---হাঁ। হযরত তাহার জানাযার নামায পড়াইলেন। (রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আবু কাতাদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাক্ষাৎ হইত; তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, দিনার কয়টির কি করিয়াছ? একদা আবু কাতাদা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! উহা পরিশোধ করিয়া দিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এখন মৃত ব্যক্তিকে শান্তি দান করিয়াছ।)

কোন ব্যাপারে জামিন হওয়া বা জামিন গ্রহণ করা

আমীরুল-মোমেনীন ওমর (রাঃ) হামজা ইবনে আমর (রাঃ)কে কোন এক এলাকার তশীলদার রূপে প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় এরূপ একটি ঘটনা অবগত হইলেন যে, এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সঙ্গে যেনা করিয়াছে। তিনি ঐ ব্যক্তিকে যেনার শাস্তি দান

করিতে চাহিলেন, কিন্তু স্থানীয় লোকগণ বলিল, এই ঘটনা পূর্বেই প্রকাশ পাইয়াছে এবং আমীরুল-মোমেনীন ওমর (রাঃ) ইহার শাস্তি দান করিয়াছেন। হামযা ইবনে আমর (রাঃ) আমীরুল-মোমেনীন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট হইতে উক্ত বিষয়ের সঠিক তথ্য জ্ঞাত হওয়া সাপেক্ষে আসামীর নিকট হইতে এক ব্যক্তির জামিন গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ স্থানীয় লোকগণের খবর সত্যই ছিল—ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাহাকে একশত বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন।

জ্ঞাতব্য—আসামী ব্যক্তি বিবাহিত ছিল, তাই তাহার উপর যেনার শাস্তি এই ছিল যে, তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করা হউক, কিন্তু এখানে শরীয়তের উপধারা অনুযায়ী উহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তির ধারণা এই ছিল যে, স্বামী স্ত্রী উভয়ে একে অন্যের চিজ-বস্তু ব্যবহার করিতে পারে, সেই সূত্রে সে স্ত্রীর ক্রীতদাসীকে ব্যবহার করা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গম করা জায়েয বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। এরূপ একটি স্বাভাবিক হেতুজনক ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ কার্য্য হওয়ায় তাহার প্রতি প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত হইয়া যায়, কিন্তু এরূপ আবশ্যকীয় মছআলাহ হইতে অজ্ঞ থাকায় তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় এবং খলীফা বা তাঁহার প্রতিনিধি কাজীর বিবেচনানুযায়ী তাহাকে একশত বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করা হয়।

● হারেছা ইবনে মোজাররাব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি একস্থানে প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পেছনে ফজরের নামায পড়িলাম (তিনি তখন ঐ এলাকার শাসনকর্তা)। নামাযান্তে এক ব্যক্তি তাঁহাকে এই বিষয় খবর দিল যে, আমি বনী-হানিফা গোত্রের মসজিদে গিয়াছিলাম; তথাকার (ইমাম ও সরদার) আবদুল্লাহ ইবনে নাওয়াহার মোয়াজ্জেনকে "আশহাদু আন্না মোসায়লামাতা রসুলুল্লাহ" (অর্থাৎ মোছায়লামাহ আল্লার রসুল) বলিতে শুনিয়াছি।* আবদুল্লাহ ইবনে

---

* মোছায়লামাহ নবী হওয়ার মিথ্যা দাবীদার ছিল, তাই তাহাকে মোছায়লামাহ কাজ্জাব অর্থাৎ মিথ্যাবাদী মোছায়লামাহ বলা হইত। সে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় এই মিথ্যা দাবী করিয়াছিল, কিন্তু হযরত (দঃ) তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সুযোগ পান নাই। আবু বকর (রাঃ) স্বীয় খেলাফৎ কালে তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ করেন এবং জেহাদের ময়দানে তাহাকে হত্যা করা হয়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহধাম ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল মনোবৃত্তির নামধারী মোসলমানগণের মধ্যে যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দিল তখন একদল মোসলমান নামধারী লোক ইসলামের সম্পর্ক ত্যাগ করতঃ সেই মিথ্যা দাবীদার মোছায়লামার দলভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। সেই দলই সময় সময় এক এক স্থানে মাথাচাড়া দিয়া উঠিত, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহাদের উপর কুঠারাঘাত হানা হইত। এইরূপেই ছাহাবীগণ ঐ দলকে ভু-পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেন।

মসউদ (রাঃ) বলিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে নাওয়াহাকে এবং তাহার দলবলকে ধরিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত কর। তৎক্ষণাৎ তাহাদের সকলকে উপস্থিত করা হইল। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রথমে আবদুল্লাহ ইবনে নাওয়াহাকে কতল করার আদেশ করিলেন; তাহাকে হত্যা করা হইল। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) সেই দলীয় অন্যান্য (একশত সত্তর জন) লোকদের বিষয় সকলের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। আ'দী ইবনে হাতেম (রাঃ) ছাহাবী তাহাদিগকে হত্যা করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ও আশআ'ছ ইবনে কায়েস (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন—না, না, না, তাহাদিগকে হত্যা করার প্রয়োজন নাই, বরং তাহাদিগকে কুপথ হইতে তওবা করিয়া সৎপথের প্রতি ফিরিবার সুযোগ দান করুন এবং সেই তওবা অনুযায়ী সঠিকরূপে চলিবার উপর তাহাদের গোত্রীয় সকলকে জামিন সাব্যস্ত করুন। এই পরামর্শই গ্রহণ করা হইল। তাহারা সকলে তওবা করিল এবং তাহাদের গোত্রীয় সকলে তাহাদের জামিন হইল যে, তাহারা ঐ ইসলাম বিরোধী পথে আর যাইবে না, সর্বদা সঠিক ইসলামের পথে থাকিবে।

পাঠকবর্গ! এই ঘটনা প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিবেন—একটি বিষয় এই যে, কাফেররা ইসলামের উন্নতি বিস্তারের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে প্রয়াস না পাওয়ার এবং যে কোন ব্যক্তি নির্ভীক চিত্তে ইসলামের ছায়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হওয়ার ক্ষেত্র রূপে সমগ্র বিশ্ব তৈরী হয়—এই উদ্দেশ্যে জেহাদ ইসলামের একটি অঙ্গ ও ফরজ রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে; তরবারি দ্বারা কাহাকেও ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে নয়। এই দাবীর জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই যে, বিজিত দেশের অধিবাসিগণকে মোসলেম রাষ্ট্রের প্রতি বিধান-সম্মতরূপে অনুগত হইয়া স্বীয় ধর্মমতের উপর থাকিয়া রক্ষিত অবস্থায় অজস্র সুযোগ-সুবিধা ভোগ পূর্বক শান্তি ও সুখে বসবাস করিতে দেওয়া ইসলামের একটি স্পষ্ট বিধান বিদ্যমান রহিয়াছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে—কাহাকেও তরবারি দ্বারা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হইবে না—ইহা ইসলামের বিধান, কিন্তু ইসলামত্যাগীকে তরবারি, বরং যে কোন কঠোর শাস্তি দ্বারা শায়েস্তা করাও ইসলামের একটি বিধান। ইসলাম কাহাকেও জবরদস্তিমূলক স্বীয় দলভুক্ত করিতে চায় না, কিন্তু স্বীয় দলের মর্য্যাদা ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দুর্বলতাও দেখাইবে না। তাই মোরতাদ বা ইসলাম-ত্যাগীকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার বিধান রাখা হইয়াছে। শক্তি সামর্থ্য ও মান-মর্য্যাদাধিকারী ন্যায়পরায়ণতার নীতি ইহাই।

বিশিষ্ট তাবেয়ী হাম্মাদ (রঃ) বলিয়াছেন, কেহ কোন ব্যক্তির জামিন হওয়ার পর ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে জামিনের উপর ক্ষতিপূরণ বর্তিবে না। হাকাম (রঃ) বলিয়াছেন, ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।* (নোটটি পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

১১৩৫। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা পূর্বকালের একটি ঘটনা বর্ণনা করিলেন। বনী-ইস্রায়ীলের মধ্যে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার—স্বর্ণ মুদ্রা ধার চাহিল। ধারদাতা বলিল, এমন কতেক জন লোক ডাকিয়া আন যাহাদিগকে আমি সাক্ষী করিতে পারি। ধার গ্রহীতা বলিল, আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী রাখিলাম এবং তিনিই যথেষ্ট। ধারদাতা বলিল, এমন কোন লোক আন যাহাকে জামিন বানাইতে পারি। ধার গ্রহীতা বলিল, আল্লাহ তায়ালাকে জামিন বানাইলাম এবং তিনিই যথেষ্ট। ধারদাতা বলিল, আচ্ছা—তোমার কথাই ঠিক; এই বলিয়া তাহাকে নির্দিষ্ট তারিখে ঐ দেনা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার শর্তে (এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা) ধার দিয়া দিল। ধার গ্রহীতা ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা লইয়া তথা হইতে রওয়ানা হইল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে সমুদ্রের অপর পারে চলিয়া গেল। এদিকে ঐ কর্জ পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখ নিকটবর্তী হইল; সেই তারিখ মতে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ধারদাতার নিকট পৌছার জন্য সে সমুদ্রকূলে আসিল, কিন্তু সমুদ্র পার হওয়ার জন্য নৌকার ব্যবস্থা করিতে পারিল না। তখন ঐ ব্যক্তি একটি কাষ্ঠ আনিয়া উহার মধ্যস্থলে খনন করতঃ উহার মধ্যে এক সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা এবং একখানা লিপি রাখিয়া উহা বন্ধ করিয়া দিল। (লিপিখানার বিষয়বস্তু এই ছিল—অমুকের পক্ষ হইতে অমুকের প্রতি। অতপর—আমি আপনার প্রাপ্য টাকা আমার জামিনের নিকট বুঝাইয়া দিলাম—যিনি আমাদের জামিন ছিলেন।) এই ব্যবস্থা করিয়া ঐ ব্যক্তি কাষ্ঠটি হাতে লইয়া সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইল এবং বলিল হে আল্লাহ! তুমি জ্ঞাত আছ, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে এক সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা ধার লইয়াছিলাম এবং ঐ ব্যক্তি আমার নিকট জামিনের দাবী করিলে আমি বলিয়াছিলাম, আল্লাহ তায়ালা জামিন রহিলেন, তিনিই জামিনের জন্য যথেষ্ট। ধারদাতা আমার সেই কথার উপরই সম্মত হইয়াছিল এবং সাক্ষীর প্রস্তাব করিলে আমি বলিয়াছিলাম, আল্লাহ তায়ালা সাক্ষী থাকিলেন, তিনিই যথেষ্ট। সে উহার উপরও সম্মত হইয়াছিল। আমি নৌকার সন্ধানে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছি যাহাতে আমি তাহার প্রাপ্য তাহার নিকট পৌছাইতে পারি, কিন্তু আমার কোন চেষ্টা সফল হইল না। এখন আমি তাহার প্রাপ্য এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা তোমার রক্ষণাবেক্ষণে সোপর্দ করিতেছি। এই বলিয়া সে ঐ এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা সম্বলিত কাষ্ঠখানা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দিল। কাষ্ঠখানা সমুদ্র বক্ষে পতিত হইল এবং ঐ ব্যক্তি তথা হইতে ফিরিয়া আসিল। সে কিন্তু এখনও

---

* হানাফী মজহাব মতে এই মসআলার মীমাংসা এই যে, যাহার পক্ষে জামিন গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার মৃত্যু ঘটিলে জামিনের উপর ক্ষতিপূরণ আসিবে না। কিন্তু যদি এই কথার উপর জামিন হইয়া থাকে যে, অমুক দিন তাহাকে হাজির করিব, অন্যথায় তাহার উপর প্রাপ্যের জন্য আমি দায়ী হইব। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে জামিন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য হইবে।

শান্ত হইতে পারে নাই—এখনও সে নৌকার সন্ধানে আছে; সঠিকরূপে নিজ হস্তে ঋণদাতার নিকট ঋণ প্রত্যার্পণ করার উদ্দেশ্য।

এদিকে ধারদাতা ব্যক্তিও নির্দিষ্ট তারিখে সমুদ্রকূলে আসিয়া ঘোরাফেরা করিতেছিল এবং তাকাইতে ছিল, কোন নৌকা দেখা যায় কি—না? সে কোন নৌকা দেখিতে ছিল না। হঠাৎ দেখিল, একখানা কাষ্ঠখণ্ড সমুদ্রে ভাসিতেছে; সে উহাকে তুলিয়া লইল এবং জ্বালানিরূপে ব্যবহারের জন্য বাড়ী নিয়া আসিল। উহাকে যখন খণ্ড খণ্ড করিল তখন উহার ভিতরে এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা সহ লিপিখানা পাইয়া সমুদয় বিষয় অবগত হইল।

কিছু দিনের মধ্যেই ধার গ্রহীতা ব্যক্তি নৌকার ব্যবস্থা করিতে পারিল এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ধারদাতার নিকট উপস্থিত হইল। (ধারদাতা বলিল, আমার প্রাপ্য কোথায়? আপনি বিলম্বে পৌছিয়াছেন। তখন সে তাহার নিকট) ওজর আপত্তি জানাইতে ও অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল যে, আমি আপনার নিকট আসিয়া আপনার প্রাপ্য পরিশোধ করার জন্য নৌকার ব্যবস্থা করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও এ-যাবৎ সফলকাম হইতে পারি নাই বলিয়া এই বিলম্ব ঘটিয়াছে। কিন্তু আমি আপনার প্রাপ্য আমার জামিনের হাওয়ালা করিয়া দিয়াছিলাম; এখন পুনঃ এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা আপনার হস্তে অর্পণ করিতেছি। এই বলিয়া তাহাকে এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিল। ধারদাতা বলিল, আমি ইহা গ্রহণ করিব না যাবৎ আপনি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দান না করেন। (ধারদাতা ইহাও জিজ্ঞাসা করিল,) আচ্ছা—আপনি কি কোন বস্তু পাঠাইয়া ছিলেন? তখন ঐ ব্যক্তি ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিল যে, আমি সময় মত নৌকার ব্যবস্থা করিতে পারি নাই, সেই জন্য একটি কাষ্ঠ মারফৎ আপনার প্রাপ্য ধন পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। ধারদাতা বলিলেন, কাষ্ঠ মারফৎ প্রেরিত ধন আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট পৌছাইয়া দিয়াছেন। আপনার এই অপর এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা সম্পূর্ণ ফেরৎ লইয়া যান।

মছআলাহ:—কেহ কোন মৃত ব্যক্তির ঋণের জামিন হইলে সেই ঋণ তাহাকে অবশ্যই পরিশোধ করিতে হইবে; দায়িত্ব এড়াইতে পারিবে না। (৩০৬ পৃঃ)

ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া

১১৩৬। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা হইতে মোহাজেরগণ যখন মদীনাতে পৌছিতে ছিলেন তখনকার সময় মোহাজের (মক্কা হইতে আগত) এবং আনছার (মদীনাবাসী)-এর মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়া দিতেন সেই সূত্রে উভয়ে একে অন্যের উত্তরাধিকারী গণ্য হইতেন। অতঃপর এই আয়াত নাযেল হইল, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ—প্রত্যেকের জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারিত করিয়াছি।” (সেই নির্দ্ধারিতগণের বর্ণনা ৪ পাঃ ১৩ রুঃ দ্রষ্টব্য।)

এই আয়াত দ্বারা উক্ত ব্যবস্থাকে রহিত করত: স্ববংশীয় লোককে উত্তরাধিকারী সত্ব দান করা হয় এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের লোকদের বিষয়ে এই আয়াত নাযেল হয়—

وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ

অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের লোকদের উত্তরাধিকার সত্বের বিলোপ সাধন করা হইলেও তাহাদের প্রতি সাহায্য, উপকার, মঙ্গল ও হিত কামনা ইত্যাদি সদ্ব্যবহার বিশেষরূপে চালু রাখিতে হইবে এবং তাহাদের উত্তরাধিকারের সত্ব বিলোপ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের জন্য অছিয়ত করা যাইবে।

১১৩৭। **হাদিছ ঃ**—আনাছ (রা:)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি জ্ঞাত আছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—لَا حِلْفَ فِى الْاِسْلَامِ "পরস্পর সাহায্য সমর্থনের জোট গঠনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার রীতি ইসলামে নাই" ?

আনাছ (রা:) বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার গৃহে মক্কা হইতে আগত কোরায়েশ বংশীয় মোহাজের ও মদীনাবাসী আনছারকে পরস্পর সাহায্য সমর্থন ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আনাছ (রা:) যে ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সত্য। মোহাজেরগণ স্বীয় সর্বস্ব মক্কায় ফেলিয়া নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় নূতন দেশ নূতন স্থান অপরিচিত পরিবেশ মদীনায় উপস্থিত হইলে পর এক এক জন মোহাজেরকে এক এক জন মদীনাবাসী ছাহাবীর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ব্যবস্থা হযরত (দ:) করিয়া দিতেন, যেন নূতন দেশে অপরিচিত পরিবেশে পতিত হইয়া মোহাজেরগণ অসুবিধার সম্মুখীন না হন।

অবশ্য ইহাও সত্য যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সাহায্য সমর্থন ও জোট গঠনের অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার রীতি ইসলামে নাই। এই কথার দুইটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে—প্রথম এই যে, অন্ধকার ও বর্বতার যুগে এরূপ প্রথা ছিল যে, ঐরূপ জোট গঠন ও অঙ্গীকার আবদ্ধ হওয়ার ফলে ন্যায়-অন্যায়, হক-নাহক; সৎ-অসৎ, সত্য-মিথ্যা কোন কিছুর বাছ-বিচার না করিয়া এবং জুলুম-অত্যাচার, অবিচার অনাচার কোন কিছুর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পরস্পর সাহায্য ও সমর্থন করিয়া যাওয়া হইত। ইসলামে এরূপ রীতির স্থান নাই। দ্বিতীয় এই যে স্বয়ং ইসলাম ধর্মই বন্ধুত্ব, সাহায্য ও সমর্থনের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক। ইসলামের দরুনই মোসলমানদের পরস্পর ভ্রাতৃত্বভাব, বন্ধুত্বের ব্যবহার সাহায্য ও সমর্থন করা আবশ্যক। নূতনভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই এবং উহার প্রতীক্ষায়ও থাকা চাই না। ইসলামের প্রথম যুগে মোহাজের ও আনছারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি করা হইত বটে, কিন্তু তাহা শুধু কার্য্য পরিচালনার সুবিধা ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে; নতুবা ছাহাবীগণ কখনও

অন্ধকার যুগের ন্যায় অন্ধ সমর্থনের রীতি অনুসরণ করিতেন না এবং ন্যায়রূপে পরস্পর সাহায্য ও সমর্থনে ঝাপাইয়া পড়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধের প্রতীক্ষায়ও থাকিতেন না।

উকিল তথা কার্য্যনির্বাহক মনোনীত বা নিয়োগ করা

মছআলাহ ঃ—অনুপস্থিত ব্যক্তিকেও পত্র যোগে বা লোক মারফত খবর পাঠাইয়া উকিল নিয়োগ করা যায়। (৩০৯ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—কোন ব্যক্তিকে অনুমতি দিল যে, আমার মাল হইতে দান-খয়রাত করিতে পার, কিন্তু দানের পরিমাণ উল্লেখ করিল না; সে ক্ষেত্রে সর্বদিক লক্ষ্য করিয়া যে স্থানে, যে পরিমাণ দেওয়ার অনুমতি সাধারণ জ্ঞানে বোধিত তাহাই উদ্দেশ্যরূপে সাব্যস্ত হইবে; খামখেয়ালী করিতে পারিবে না। (৩০৯ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—মালামালের রক্ষণাবেক্ষণে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইল; সে কোন অপরাধীকে ছাড়িয়া দিল বা কাহাকেও ধার দিল তাহার এইসব কাজের বৈধতা মালিকের সম্মতি সাপেক্ষ থাকিবে।

মছআলাহ ঃ—ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে কাহাকেও নিয়োগ করা হইলে সে নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় উহা হইতে গ্রহণ করিতে পারিবে— ন্যায্য পরিমাণে; তাহার অধিক নহে। (৩১১ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—বিবাহে উকিল বানানো জায়েয আছে।

কৃষি-কার্য্য সম্বন্ধীয় বিষয়াবলী

আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে বলিয়াছেন—

أَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُونَ ـ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ـ لَوْ نَشَاءُ
لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ـ

অর্থ—তোমাদের ক্ষেত-খামারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ কি? উহার চারা ও উৎপন্ন কি তোমরা সৃষ্টি করিয়া থাক, না—আমি সৃষ্টি করিয়া থাকি? (এই প্রশ্নের উত্তর অতি স্পষ্ট যে, একমাত্র আমিই ইহা জন্মাইয়া থাকি, যাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে) আমার ইচ্ছা হইলে আমি (শস্য নষ্ট করিয়া দিয়া উৎপন্ন হইতে বঞ্চিত করতঃ) শস্যকে খড়-কুটায় পরিণত করিয়া দিয়া থাকি, তখন তোমরা আক্ষেপ ও অনুতাপে জর্জরিত হইয়া যাও। (কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিবার কাহারও ক্ষমতা হয় না। ২৭ পাঃ ১৫ রুঃ)

প্রিয় পাঠক! বর্তমান যুগে মানব বিভিন্ন বিভাগীয় বিজ্ঞানে উন্নতি করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহাদের হাতড়ানি শুধু পেটের ধান্ধা তথা পশুত্ব-স্বভাব চরিতার্থের উপরে নিবদ্ধ রাখে। এই ধান্ধা অনাবশ্যক বা মন্দ নয় বটে, কিন্তু এই ধান্ধার উপরই স্বীয় চেষ্টাকে নিবদ্ধ রাখা নির্বোধ পশুর স্বভাব হইতে পারে, কারণ তাহার কাঁধে কোন দায়িত্ব চাপান

নাই, পানাহারই তাহার লক্ষ্যের শেষ সীমা, কিন্তু মানব সেরূপ নয়, পানাহার শুধু তাহার জীবন ধারনের উদ্দেশ্যে। স্মরণ রাখিবেন এবং বুঝিয়া উপলব্ধি করিয়া লইবেন যে মানবের জীবন ধারণ পানাহারের উদ্দেশ্যে নহে। তাহার কাঁধে মস্ত বড় দায়িত্ব চাপান রহিয়াছে এবং তাহার সম্মুখে সেই দায়িত্ব পালনের হিসাব-নিকাশ ও ফলাফল ভোগের জন্য এমন এক জীবন রহিয়াছে যাহার অন্ত নাই—শেষ নাই।

তাহাকে স্বীয় সৃষ্টিকর্তার, পালনকর্তার খোঁজ ও পরিচয় লাভ করিতে হইবে, তাঁহার সঙ্গে স্বীয় সম্পর্কের তথ্য জ্ঞাত হইতে হইবে এবং সেই সম্পর্ক অনুপাতে কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে। সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার খোঁজ লাভ করার এবং তাঁহার সম্পর্কের তথ্য জ্ঞাত হওয়ার অভিজ্ঞান ও নিদর্শন এবং পরিচায়ক রূপে জগৎ ও বিশ্ব চরাচরের প্রতিটি বস্তুই দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোন এক মণীষী কি সুন্দর বলিয়াছেন—

برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقے دفتریست از معرفت کردگار

"এই বিশাল ভুমণ্ডলের আচ্ছাদক সবুজ সবুজ বৃক্ষরাজি, তৃণ-লতার পাতায় পাতায় সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার পরিচয় ও খোঁজের পথ বিদ্যমান রহিয়াছে, সৃষ্টিকর্তার পরিচয় দানে প্রত্যেকটি পাতাই যেন এক একটি বড় বড় গ্রন্থ।"

আরবী ভাষায় বিশ্ব-জগৎকে عالم "আলম" বলা হয়, বরং সৃষ্ট জগতের প্রতিটি শ্রেণী বা জাতিকেও "আলম" বলা হয়। "আলম" শব্দের আভিধানিক অর্থ নিদর্শন ও পরিচায়ক। বিশ্ব-জগৎ এবং প্রতিটি সৃষ্ট জাতি সৃষ্টিকর্তার পালনকর্তার পরিচয় দানের নিদর্শন ও পরিচায়ক, তাই এসবকে "আলম" বলা হইয়া থাকে। অতএব জাগতিক চীজ-বস্তু সম্বন্ধীয় সকল প্রকার বিজ্ঞানের শেরা বিজ্ঞান হইল সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার পরিচয় দানে এবং তাঁহার সম্পর্কের জ্ঞান দানে সহায়ক ও সাহায্যকারী বিজ্ঞান।

ইমাম বোখারী (রঃ) কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় বিষয়াবলীর বর্ণনার পরিচ্ছেদে সর্বাগ্রে উক্ত আয়াতটি উল্লেখ করিয়া সতর্ক করিয়াছেন যে, কৃষি-বিজ্ঞানে অন্যান্য বিষয়াবলী ও তথ্য পর্য্যালোচনার পূর্বে ইহার দ্বারা সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ কর, তাঁহার সম্পর্ক জ্ঞাত হও এবং সে অনুপাতে স্বীয় কর্তব্য নির্দ্ধারিত কর—ইহাই হইল কৃষি-বিজ্ঞানের সর্বপ্রধান পাঠ।

বৃক্ষ রোপণের ফজিলত

১১৩৮। হাদীছঃ— عن انس قال النبى صلى الله عليه وسلم

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ

اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ـ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন মুসলমান কোন বৃক্ষ রোপণ করিল বা বপণ করিল, অতঃপর উহা হইতে কোন পশু বা মানুষ কিছু অংশ খাইল তাহাতে ঐ ব্যক্তি দান-খয়রাত করার ছওয়াব লাভ করিবে।

লাঙ্গল-জেঁায়াল লোকদের মান নিম্নস্তরে নিয়া যায়

১১৩৯। হাদীছ :— عن ابى امامة رضى الله تعالى عنه

وَرَاٰى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ اٰلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ هٰذَا بَيْتَ قَوْمٍ اِلَّا اَنْ خَلَهُ اللّٰهُ الذُّلَّ ـ

অর্থ—ছাহাবী আবু উমামা (রাঃ) কোথাও লাঙ্গল-জেঁায়াল দেখিতে পাইয়া বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, এই জিনিষ যেই সব লোকদের ঘরে প্রবেশ করিবে আল্লাহ তায়ালার সাধারণ নিয়ম অনুসারে তাহাদের উপর সম্মানের লাঘব ও নীচতা নামিয়া আসিবে।

ব্যাখ্যা :—বস্তুনিচয়ের যেরূপ সৃষ্টিগত তাছীর ও প্রতিক্রিয়া আছে তদ্রূপ কার্য্যাবলী, বৃত্তি ও পেশা সমুহেরও স্বাভাবিক তাছীর-প্রতিক্রিয়া আছে। লাঙ্গল-জেঁায়াল, গরু-বলদ দ্বারা চাষাবাদের পেশায় স্বাভাবিক রূপেই এই তাছীর ও প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে যে, ঐ পেশাদারদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং চিন্তাধারা (Mood of thought) নিম্ন পর্যায়ে চলিয়া আসে।

উহার কতিপয় বাহ্যিক কারণও রহিয়াছে, যথা—লাঙ্গল-জেঁায়ালের পেশাদারগণ সর্বদা এমন শ্রেণীর পরিশ্রমে ব্যাপৃত থাকে যাহাতে তাহাদের জ্ঞান-দর্শন উন্মেষের অবকাশ থাকে না, ফলে তাহাদের মানসিক উন্নতি হয় না। এমনকি সাধারণতঃ তাহারা নিজেদের কচি-কাঁচাদের মন-মগজও ঐ ছাচেই গড়িয়া তোলে, যদ্দরুণ জাতির একটি বিরাট অংশ পঙ্গু হইয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন লাঙ্গল-জেঁায়ালের পেশাদারদের সর্বদা গরু-বলদের সাহচর্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, ফলে তাহাদের মানসিক মানের নিম্ন গতি না আসিয়া পারে না; তদুপরি গরু বলদের সাহচর্য্যতার প্রাকৃতিক তাছীর ও প্রতিক্রিয়া ত আছেই।

মোসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও উন্মেষের পেশা অবলম্বন করুক, এমনকি কৃষি কাজ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িলে তাহাও লাঙ্গল-জেঁায়াল, গরু বলদের মাধ্যমে না করিয়া উন্নত শ্রেণীর কৃষি অবলম্বন করুক—সেই উৎসাহ দানই এই হাদীছের উদ্দেশ্য। এস্থলে লাঙ্গল-জেঁায়ালের তথা গরু-বলদের সাহচর্যের পেশার প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে; কৃষির প্রতি নহে। এতদ্ভিন্ন এই হাদীছে একটি বাস্তব সত্যের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে মাত্র; গোনাহ্-ছওয়াব, জায়েয-নাজায়েয বা আবশ্যক অনাবশ্যকের কথা বলা হয় নাই এবং ইহাও ধ্রুব সত্য যে মান-মর্য্যাদা ভিন্ন কথা, আর প্রয়োজন ভিন্ন কথা। আবশ্যক বশতঃ তিক্ত

জিনিষ খাইলে উহা তিক্তই থাকিবে উহার তিক্ততার লাঘব হইবে না। বাধ্য হইলে তিক্ত জিনিষ গলাধঃ করিতে হয় এবং তিক্ততা ভোগও করিতে হয়।

বৃক্ষাদি বা বাগানের সেবার বিনিময়ে উৎপন্নের অংশে দেওয়া

১১৪০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মদীনাবাসী ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পূর্বে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মদীনায় আগত মোহাজেরগণকে সাহায্য সহায়তা করিবেন। সেই পূর্ব প্রতিজ্ঞা পালনার্থে) মদীনাবাসী ছাহাবীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমাদের সম্পত্তি খেজুর বাগান এবং জায়গা-জমিসমুহ আমাদের ও মোহাজের ভ্রাতাগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। নবী (দঃ) বলিলেন, বণ্টন করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তখন তাঁহারা বলিলেন, মোহাজেরগণ আমাদের বাগানের সেবা-শুশ্রষা করিবেন তৎপরিবর্তে তাঁহারা উৎপন্নের অংশীদার হইবেন—এই ব্যবস্থার উপর সকলে সম্মত হইলেন।

বর্গা প্রথা জায়েয

ছাহাবী ও তাবেয়ীগণ গরীবদেরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ও নীতির উপর ভিত্তি করিয়া বর্গা প্রথা অবলম্বন করিতেন।

১১৪১। হাদীছ ঃ—তাবেয়ী আমর (রঃ) তাউস (রঃ) তাবেয়ীকে বলিলেন, আপনি স্বীয় জমিন বর্গা প্রথায় দিয়া থাকেন, ইহা পরিত্যাগ করিলে উত্তম হইত; লোক-মুখে জানা যায়, নবী (দঃ) বর্গা-ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এতশ্রবণে তাউস (রঃ) বলিলেন, বর্গা ব্যবস্থায় জমিন দানে আমার উদ্দেশ্য লোকদিগকে সাহায্য করা। আপনি যে নিষিদ্ধতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেই বিষয় আমি অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে এই বলিতে শুনিয়াছি যে, নবী (দঃ) বর্গা-ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করেন নাই। তাঁহার (যেই বাক্যের দ্বারা ঐরূপ ধারণা হয় সেই বাক্যের মুল) উদ্দেশ্য এই যে, স্বীয় (অভাবগ্রস্ত) মোসলমান ভ্রাতাকে নিজের জমিন চাষ করার জন্য দিলে বিনিময় প্রথা অপেক্ষা বিনিময় ব্যতিরেকে সাহায্য স্বরূপ দেওয়া উত্তম ও শ্রেয়।

● তাউস (রাঃ) ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ইয়ামান দেশে রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রেরিত শাসনকর্তা ছাহাবী মোয়াজ ইবনে-জাবাল (রাঃ) প্রজাদের মধ্যে বর্গা ব্যবস্থা বলবৎ ও চালু রাখিয়াছিলেন। (ফতহুল বারী)

১১৪২। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বর দেশ জয় করার পর (তথাকার ভূমি ও জায়গা জমি নিজেদের মধ্যে ভাগ বণ্টন করিয়া লইলেন বটে, কিন্তু তথাকার বাসিন্দা ইহুদীদিগকে

শেষ পর্যন্ত উচ্ছেদ করেন নাই।) তথাকার বাসিন্দা ইহুদীদিগকে তথা হইতে তাড়াইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাহাদের অনুরোধ ও অভিপ্রায় অনুযায়ী তথায় তাহাদিগকে বসবাস করিতে দিলেন এবং জায়গা জমি বর্গা প্রথায় চাষাবাদ করার জন্য তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। হযরতের জীবনকাল এবং আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই বলবৎ রহিল। (কিন্তু ইহুদীরা ইসলাম ও মোসলমানদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্য্যাবলী হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারিল না, এমনকি সুযোগ প্রাপ্তে মুসলমানকে হত্যার চেষ্টা এবং গোপনে হত্যা করার বহু ঘটনাও তাহাদের দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকিত। ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালেও তাহাদের এই তৎপরতার ঘটনা প্রমাণিত হয় এবং তখন তিনি তাহাদিগকে তথা হইতে উচ্ছেদ করিয়া দেন)।

১১৪৩। **হাদীছঃ**—রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার চাচা যোহাইর (রাঃ) একদা আমাকে বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এমন একটি ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যাহা আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূল ছিল না। (কিন্তু শরীয়তের বিধান অনুসারে আমরা বিনা দ্বিধায় ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়াছি।) আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ-নিষেধ অলঙ্ঘনীয়।

অতঃপর ঘটনা ব্যক্ত করতঃ বলিলেন, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা স্বীয় জায়গা-জমির ব্যবস্থা কিরূপ করিয়া থাক? আমি আরজ করিলাম, জমিনের (উত্তম ও ভাল অংশ যেমন) পানি প্রবাহিত হওয়ার নালার কিনারাবর্তী অংশের শস্য নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া বা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য নিজেদের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া বাকি শস্যের বিনিময়ে চাষাবাদের জন্য অন্যকে জমি দিয়া থাকি। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যবস্থা নিষিদ্ধ, তোমরা এরূপ করিও না। হয়ত তোমরা নিজেরাই চাষাবাদ কর, কিংবা (শুদ্ধ ব্যবস্থায়) অন্যকে চাষাবাদ করিতে দাও; না হয় জমিকে চাষহীন রাখিয়া দাও। (কিন্তু শরীয়ত বিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন করিও না। "জমিকে চাষহীন রাখিয়া দাও" বাক্যটি শুধু রাগ প্রকাশার্থে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ উল্লিখিত পন্থাদ্বয় ছাড়া একমাত্র এই পন্থাই আছে, যাহা বস্তুতঃ নিতান্ত নিন্দনীয়।)

ইমাম বোখারী (রঃ) বরং তাঁহার পরবর্তী হাদীছ ও শরীয়ত বিশারদগণ উল্লিখিত হাদীছের নির্দেশিত বিধানের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—যেইরূপ ব্যবস্থায় কোন এক পক্ষের বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয় উহা নিষিদ্ধ। যেমন এক পক্ষ নির্দিষ্ট করিয়া লইল, আমাকে দশ মণ দিতে হইবে, অথচ সম্পূর্ণ জমির মোট উৎপন্ন ঐ দশ মণই হইতে পারে; এমতাবস্থায় অপরপক্ষ বঞ্চিত থাকিবে। কিম্বা এক পক্ষ নির্দিষ্ট অংশের উৎপন্নের শর্ত করিল, অথচ এরূপও হইতে পারে যে, অপরাপর অংশ সমুহের শস্য নষ্ট হইয়া যায় কিম্বা শুধু এই অংশের শস্য নষ্ট হইয়া যায়; এমতাবস্থায়ও এক পক্ষ বঞ্চিত থাকিবে, তাই এরূপ ব্যবস্থা সমুহ নিষিদ্ধ। কিন্তু মূল বর্গা-ব্যবস্থা নিষিদ্ধ নহে।

১১৪৪। **হাদীছ** :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলমানগণ তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ ও অর্দ্ধাংশের বিনিময়-ব্যবস্থায় বর্গা দান করিয়া থাকিত। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

অর্থ—যাহার জমি আছে সে উহা নিজে চাষ করিবে কিম্বা অন্যকে সহায়তা স্বরূপ উহা চাষ করিতে দিবে। যদি তাহা করিতে না চায় তবে সে যেন স্বীয় জমি উঠাইয়া রাখে। (জমি কেহ অনাবাদ ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না।)

১১৪৫। **হাদীছ** :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا

أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ۔

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির জমি আছে সে উহা নিজে চাষ করিবে কিম্বা স্বীয় মোসলমান ভাইকে সহায়তা স্বরূপ চাষ করিতে দিবে। যদি সে উহাতে রাজি না হয় তবে সে যেন স্বীয় জমি উঠাইয়া রাখে।

ব্যাখ্যা :—ইমাম বোখারী (রঃ) এই শ্রেণীর হাদীছ সমূহের ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, সহায়তা স্বরূপ অন্যকে জমি চাষ করিতে দেওয়ার পরামর্শ দান শুধুমাত্র সৌজন্যমূলক; বাধ্যতামূলক নহে এবং শরীয়ত সম্মতরূপে বর্গা দেওয়া নিষিদ্ধ নহে। ইমাম বোখারী (রঃ) এই ব্যাখার প্রমাণও উল্লেখ করিয়াছেন—

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلٰكِنْ

قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُوْمًا ۔

অর্থাৎ—বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ঐ আকারের হাদীছ সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উদ্দেশ্য বর্গা-ব্যবস্থাকে নাজায়েয ও নিষিদ্ধ করা নহে, বরং তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, স্বীয় মোসলমান ভ্রাতাকে জমি চাষ করিতে দিয়া তাহার নিকট হইতে নির্দ্ধারিত অংশ উসুল করা অপেক্ষা সহায়তা স্বরূপ তাহাকে চাষ করিতে দেওয়া অধিক উত্তম। (৩১৫ পৃঃ)

● ছাহাবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম অনেকেই বর্গা ব্যবস্থায় জমি দান করিয়া থাকিতেন (৩১৩ ও ৩১৪ পৃঃ)। এমনকি জাতীয় কোষাগার বাইতুল-মালের স্বত্ব সরকারী

ও রাষ্ট্রীয় দখলের জমিও খলীফা—রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বর্গা-ব্যবস্থায় দান করা হইত। দ্বিতীয় খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতকালে যখন সিরিয়া দেশ জয় করা হইল তখন ওমর (রাঃ) ঐ বস্তিসমুহ গণিমতের মালরূপে জেহাদকারী গাজিগণের মধ্যে বণ্টন করিলেন না, বরং ঐ সব বস্তিসমুহ জাতীয়করণ করিয়া রাষ্ট্রিয় ও জাতীয় সম্পদরূপে রাখিয়া দিলেন (এবং উহা বস্তিবাসীদিগকে বর্গা-ব্যবস্থারূপে দান করিলেন।) অতঃপর বলিলেন, ভবিষ্যৎ মোসলেম সমাজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করার প্রয়োজন না থাকিলে প্রত্যেক বিজিত দেশের সমুদয় এলাকা আমি গাজিদের মধ্যে গণিমতের মালের ন্যায় বণ্টন করিয়া দিতাম। (৩১৪ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—জেহাদের ময়দানে যে সব অবস্থাবর ধন-সম্পদ হস্তগত হয় উহা গণিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গণ্য হয়। উহার চার পঞ্চমাংশ গাজিদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হয়, এক অংশ বাইতুল মালে তথা সরকারী ধন-ভাণ্ডারে রক্ষিত রাখিতে হয়। কিন্তু বিজিত দেশের স্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ ভুমি ও জায়গা জমি গণিমত গণ্য হয় না। উহা খলীফাতুল-মোসলেমীনের বিবেচনাধীন থাকে জাতীয় সম্পদরূপে রাষ্ট্রায়ত্ব করিয়া, এমনকি ওয়াকফরূপেও রাখিতে পারেন এবং প্রয়োজন বোধে গাজিদের মধ্যে বণ্টনও করিতে পারেন; ইহা খলীফার এখতিয়ার, কিন্তু খলীফার ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে নয়, জাতীয় আমানতরূপে।

১১৪৬। হাদীছ ঃ—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে, খলীফা ওসমানের আমলে এবং মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাসন আমলের প্রথম দিক পর্যন্ত বর্গা-প্রথায় জমি দিয়া থাকিতেন। অতঃপর রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) ছাহাবীর নামে এরূপ বর্ণনা শুনা গেল যে, নবী (দঃ) বর্গা প্রদানে নিষেধ করিয়াছেন। তাই আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) ছাহাবীর নিকট গেলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে গেলাম। রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) বর্গা-প্রথায় জমি দানে নিষেধ করিয়াছেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি নিশ্চয় জানেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্ল.মের আমলের প্রথম দিকে আমরা নালার কিনারা (তথা নির্দ্ধারিত) স্থানের ফসল এবং খরের নির্দ্ধারিত অংশের বিনিময়ে বর্গা দিয়া থাকিতাম। অর্থাৎ হযরতের নিষেধাজ্ঞা সেই রীতির প্রতিই।

১১৪৭। হাদীছ ঃ—সালেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি ভালভাবেই জ্ঞাত ছিলাম যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে অবশ্যই জমি বর্গায় দেওয়া হইত। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এই আশঙ্কা বোধ করিলেন যে, হয়ত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই ব্যাপারে কোন নূতন নির্দেশ দিয়াছিলেন যাহা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জানিতে পারেন নাই। এতটুকু মাত্র আশঙ্কা বোধে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জমি বর্গা দেওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা :—বর্গা-প্রথা জায়েয হওয়া সম্পর্কে ফতওয়া এবং অধিকাংশ ইমামগণের মত, স্বপক্ষেই রহিয়াছে। অবশ্য সতর্কতামূলকভাবে তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন করা উত্তমই হইবে; যেরূপ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) করিয়াছেন। ইমাম আবু হানীফা (রঃ)ও বর্গা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করিতেন।

টাকা-পয়সার বিনিময়ে জমি কেরায়া দেওয়া

১১৪৮। **হাদীছ :**—হান্‌জালা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার দুই চাচা আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় জমির নির্দিষ্ট অংশের শস্য বা ঐ জমির উৎপন্নের নির্দিষ্ট পরিমাণ (যেমন—দশ মণ) শস্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দিয়া থাকিতেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ব্যবস্থাকে নিষেধ করিয়া দিলেন। *

হান্‌জালা (রাঃ) বলেন, তখন আমি রাফে রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, টাকা-পয়সার বিনিময়ে জমি চাষ করিতে দেওয়া কিরূপ? তিনি বলিলেন, টাকা-পয়সার বিনিময়ে জমি চাষ করিতে দেওয়া দোষণীয় নহে।

জমিনের নির্দিষ্ট স্থানের শস্যের শর্তে বর্গা শুদ্ধ নহে

১১৪৯। **হাদীছ :**—রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসীদের মধ্যে আমরা সর্বাধিক জমিনের মালিক ছিলাম। আমরা বহু জমি বর্গা দিয়া থাকিতাম। আমাদের বর্গার নিয়ম এই ছিল যে, জমিনের নির্দিষ্ট অংশের শস্য জমিনের মালিক পাইবে, বাকি অংশের শস্য বর্গাদার পাইবে। কোন সময় সেই নির্দিষ্ট অংশে শস্য হইত, বাকি অংশের শস্য নষ্ট হইয়া যাইত, আবার কোন সময় নির্দিষ্ট অংশের শস্য নষ্ট হইয়া যাইত, বাকি অংশের শস্য ভাল থাকিত! (তাই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তরফ হইতে) আমাদিগকে ঐ প্রথার বর্গা নিষেধ করা হইল। স্বর্ণ-রৌপ্যের (মুদ্রার) বিনিময়ে জমিন কেরায়া দেওয়া (জায়েয বটে, কিন্তু) সেই যমানায় ঐরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল না। (৩২৩ পৃঃ)

উৎপন্নের অংশের বিনিময়ে বর্গা বা ক্ষেতের কাজ করা

● কায়েস ইবনে মোসলেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাস্থিত প্রত্যেক মোহাজের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের উপর বর্গা লইয়া থাকিতেন। ● ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বিভিন্ন ব্যক্তিকে এই ব্যবস্থায় বর্গা দিয়া থাকিতেন যে, তিনি বীজ দান করিলে শস্যের অর্দ্ধাংশ লইবেন এবং বর্গাদার বীজ দান করিলে (অর্দ্ধ হইতে কম) এত অংশ

* যদি কোন বস্তু, এমনকি ধান, পাট, গম, যব ইত্যাদি শস্য-জাতীয় জিনিস নির্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে জমি চাষ করিতে দেওয়া হয়, কিন্তু ঐ জমির উৎপন্ন হিসাবে নহে, বরং টাকা-পয়সার ন্যায় জমির কেরায়া হিসাবে নির্দ্ধারিত করা হয়, তবে উহা জায়েয হইবে। (মোছাওয়া শরহে মোয়াত্তা)

লইবেন। ● বিশিষ্ট তাবেয়ী হাসান বছরী (রঃ) ও ইমাম যুহরী (রঃ) বলিয়াছেন, কাহারও জমি অন্যকে এই শর্তে দেওয়া যে, সমুদয় খরচ উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হইবে—ইহা জায়েয। ● হাসান বছরী (রঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, অর্ধাংশের বিনিময়ে গাছের তুলা চয়ন ও সংগ্রহ করা জায়েয আছে। ● ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ), ইবনে সীরীন (রঃ), আতা (রঃ), হাকাম (রঃ), যুহরী (রঃ), কাতাদাহ (রঃ) প্রমুখ তাবেয়ীগণ বলিয়াছেন, তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের বিনিময়ে নিজ তুলা অন্যকে কাপড় বুননের জন্য দেওয়া জায়েয আছে। ● বিশিষ্ট ইমাম মা'মার ইবনে রাশেদ (রঃ) বলিয়াছেন, স্বীয় শস্য ইত্যাদি স্থানান্তরিত করার জন্য উহার তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের বিনিময়ে অপরের পশু কেরায়া করা জায়েয আছে।

ব্যাখ্যাঃ—উল্লিখিত শেষ তিনটি বিষয় একটি প্রসিদ্ধ মছআলাহ অন্তর্ভুক্ত—উহা এই যে, কোন বস্তু সম্পর্কীয় কার্য্যে এইরূপে মজুর নিয়োগ করা যে, প্রত্যেক মজুর ঐ বস্তুর হইতেই স্বীয় শ্রমে আহরিত পরিমাণের নির্দিষ্ট অংশ মজুরীরূপে পাইবে, যাহার মোট পরিমাণ মজুর নিয়োগের কথাবার্তায় নির্দিষ্ট হয় না। যেরূপ বর্তমানে ধান কাটা, মরিচ তোলা ইত্যাদি কার্য্যে এই ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে।

মজুরের মজুরী পূর্বাহ্নে নির্দিষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক, অথচ উল্লিখিত ব্যবস্থায় অংশ নির্দ্ধারিত আছে; সর্বমোট পরিমাণ নিয়োগকালে নির্দ্ধারিত হয় নাই, তাই ঐরূপ ব্যবস্থা শরীয়ত মতে শুদ্ধ, না—অশুদ্ধ সে বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ইমাম মালেক (রঃ) প্রমুখ ইমামগণ ঐ ব্যবস্থাকে অশুদ্ধ বলেন। ইমাম আহমদ (রঃ) এবং উপরোল্লিখিত তাবেয়ীগণ এই ব্যবস্থাকে শুদ্ধ বলিয়াছেন।

যত দিন আল্লাহ রাখেন তত দিনের জন্য বর্গা

অর্থাৎ যদি বর্গা সম্পাদনে নির্দ্ধারিত সময়ের চুক্তি করা না হয়, বরং বলা হয়, যত দিন আল্লাহ রাখেন তত দিন তোমাকে রাখিব; তবে এক বৎসরের অধিক বাধ্যতামূলক হইবে না, উভয়ের সম্মতি সাপেক্ষ হইবে। যেরূপ—যদি বলে, যখন আমার ইচ্ছা উচ্ছেদ করিয়া দিব। বস্তুতঃ প্রথম বাক্যের অর্থও ইহাই।

১১৫০। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কে খয়বরবাসীদের কেহ গৃহের ছাদ হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল যাহাতে তাঁহার পায়ের জোড়া স্খলিত হইয়া গিয়াছিল। তখন খলীফা ওমর (রাঃ) বিশেষ ভাষণ দানে বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বরের ইহুদীদিগকে তাহাদের জায়গা-জমির উপর বর্গাদাররূপে অবস্থিত রাখিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, যত দিন আল্লাহ রাখেন ততদিনই আমরা তোমদিগকে রাখিব। এখন একটি ঘটনা ঘটিয়াছে যে, ওমরের পুত্র আবদুল্লাহ খয়বরস্থিত তাহার বাগান ও জমি দেখার জন্য তথায় গিয়াছিল, রাত্রিবেলা সে গৃহের ছাদের উপর শুইয়াছিল; ঘুমন্ত অবস্থায় তাহাকে কেহ ছাদের উপর হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়াছে যাহাতে তাহার উভয় হাত ও পা-এর জোড়া স্খলিত হইয়া গিয়াছে। খয়বরের ইহুদী সম্প্রদায়

ছাড়া তথায় কেহ আমাদের শত্রু নাই; তাহাদের উপরই আমাদের দাবী ও সন্দেহ। আমি সিদ্ধান্ত নিয়াছি ইহুদীদেরকে খয়বর হইতে বহিষ্কৃত করার।

খলীফা ওমর (রা:) যখন এই সিদ্ধান্তের উপর দৃঢ় হইয়া গেলেন তখন এক বিশিষ্ট ইহুদী ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আমীরুল-মোমেনীন! আমাদেরে বহিস্কার কিরূপে করিতে পারেন? আমাদেরকে ত স্বয়ং মোহাম্মদ (দঃ) আমাদের জায়গা জমির উপর আমাদের সঙ্গে বর্গা সম্পাদন করিয়াছেন! খলীফা ওমর (রা:) উত্তরে তাহাকে বলিলেন, তুমি মনে কর, আমি ভুলিয়া গিয়াছি ঐ কথা যাহা তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া নবী (দঃ) বলিয়াছিলেন—"কি অবস্থা হইবে তোমার যখন তুমি খয়বর হইতে বহিষ্কৃত হইবে; তোমার উট তোমাকে বহন করিয়া রাত্রির পর রাত্রি চলিতে থাকিবে।" ইহুদী ব্যক্তি বলিল, ইহা ত তাঁহার কৌতুকরূপী কথা ছিল। খলীফা ওমর (রা:) বলিলেন, তুমি মিথ্যাবাদী খোদার দুশমন! (ইহা তোমাদের বহিষ্কারের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল—যাহা আমি বাস্তবায়িত করিব।) শেষ পর্যন্ত খলীফা ওমর (রা:) ইহুদীদেরকে খয়বর হইতে বহিস্কৃত করিলেন। জায়গা-জমি বাগ-বাগিচার বর্গা হিসাবে উহার উৎপন্নে তাহাদের প্রাপ্য যে অংশ ছিল উহার বিনিময়ে নগদ টাকা, উট, উটের পিঠে বিছাইবার গদী এবং উহা বাঁধিবার দড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস দিয়া দিলেন যাহা দ্বারা তাহারা খয়বর হইতে সিরিয়ায় পৌছিতে পারে। (৩৭৭ পৃঃ)

ব্যাখ্যা:—মদীনায় ইহুদী সম্প্রদায় প্রবল ছিল; নবী (দঃ) তাহাদের সঙ্গে সহ-অবস্থানের শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিয়া তাহাদের প্রতি সর্ব প্রকারে সৌজন্যের হস্ত সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা ইহার মর্য্যাদা মোটেই রক্ষা করে নাই। মোসলমানদের প্রতি ইহুদীদের সেই ঘোর শত্রুতার খবর স্বয়ং আলেমুল-গায়েব আল্লাহ তায়ালা দিয়াছেন (পবিত্র কোরআন ৬ পারা শেষ আয়াত দ্রষ্টব্য)। বনু-নজীর ও বনু-কোরায়জার ইতিহাস এবং কায়াব ইবনে আশরাফ ও আবু রাফে ইত্যাদি ব্যক্তিদের ঘটনাবলী সেই শত্রুতা বাস্তবায়নের অত্যন্ত হৃদয়বিদারক বৃত্তান্ত (তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

মদীনায় সর্বপ্রথম যাহাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালাইতে হয় তাহারা ছিল ইহুদীদের বনু-নজীর গোত্র। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের প্রতি অভিযান চালাইয়া তাহাদেরে পরাজিত করিলেন। ঐ অবস্থায়ও এবং তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করা সত্বেও নবী (দঃ) তাহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিলেন যে, একটি লোককেও প্রাণে মারিলেন না; অবশ্য মোসলমানদের কেন্দ্রীয় শহর মদীনা হইতে এই শ্রেণীর বিদ্রোহীদের অপসারণ জরুরী হওয়ায় মদীনা হইতে প্রায় ২০০ মাইল দূরে খয়বর এলাকায় তাহাদেরে স্থানান্তরিত করিলেন। ইহা হিজরী দ্বিতীয় সনের ঘটনা।

মদীনা হইতে বহিষ্কৃত ইহুদীরা খয়বরে থাকিয়াও অন্তর হইতে মোসলেম-বিদ্বেষী স্বভাব দূর করিল না। তাহারা তথায় তাহাদের স্বজাতিদের মিলনে অধিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া খয়বরকে মোসলমানদের শত্রুতার দুর্গরূপে গড়িল। সপ্তম হিজরীতে হযরত (দঃ)

খয়বরের প্রতি অভিযান চালাইতে বাধ্য হইলেন। খয়বরের পতন হইল। এইবারও হযরত (দঃ) তাহাদিগকে তথা হইতে বহিষ্কার করার ইচ্ছা করিলেন। তথাকার ইহুদীরা হযরত (দঃ)-এর নিকট দরখাস্ত করিল, আমাদিগকে বহিষ্কার করিবেন না; আমাদের জায়গা-জমি, বাগ-বাগিচা সবই আপনাদের মালিকানাভুক্ত থাকিবে; আমরা বর্গাভাগী হিসাবে উহার চাষাবাদ করিয়া যাইব। হযরত (দঃ) তাহাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন; হযরত (দঃ) ভাবিলেন, তাহাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিলে তাহাদের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটিবে। কিন্তু কয়লা শতবার দুধ দ্বারা ধুইলেও উহার কালিমা দুর হইবার নয়; তদ্রূপ ইহুদীদের সর্বরকম বিপর্য্যয়েও মোসলেম-বিদ্বেষের কালিমা তাহাদের অন্তর হইতে দুর হইল না। খয়বর যুদ্ধে পর্যুদস্ত ইহুদীরাই রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রাণে বধ করার ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা হযরত (দঃ)কে দাওয়াত করিল; হযরত (দঃ) তাহাদের প্রতি উদারতা প্রকাশার্থে তাহাদের দাওয়াত গ্রহণ করিলেন। সেই দাওয়াতের খাদ্যে তাহারা বিষ মিশ্রিত করিয়া দিল এবং ধরাও পড়িল; হযরত (দঃ) তাহাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলেন। তারপরও তাহাদের শত্রুতা দস্তুর মতে চলিতেই লাগিল। এখন তাহারা গুপ্ত হত্যা চালাইল। তাহাদের এলাকায় কোন মোসলমানকে একা পাইলেই তাঁহাকে হত্যা করিত। হযরতের সময়েই বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সাহল (রাঃ)কে একা পাইয়া তাঁহাকে জবাই করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাদের এই গুপ্ত হত্যার কাজ সুদীর্ঘকাল চলিল, এমনকি খলীফা ওমরের শাসন আমলে স্বয়ং খলীফা তথা প্রেসিডেন্ট ওমরের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) একদা স্বীয় জায়গা জমি দেখার জন্য খয়বরে গেলেন। গরমের দিন রাত্রিবেলা তিনি এক গৃহছাদের উপর শুইয়াছিলেন। ইহুদীরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলার জন্য ঘুমন্ত অবস্থায় ধাক্কা দিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। তিনি অস্বাভাবিকরূপে প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাহার হাত পা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

খয়বরের ইহুদীদের দুঃসাহস এইরূপে চরমে পৌছিয়া গেলে খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাদেরে আরও দুরে দেশান্তরিত করার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় স্থানান্তরিত করিলেন।

ইহুদী সম্প্রদায় বনু-নজীরকে প্রথমবার স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনা হইতে বহিস্কৃত করিয়াছিলেন। তখন পবিত্র কোরআন নাযেল হওয়ার আমল ছিল। উক্ত ঘটনার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে স্থান লাভ করিয়াছে (২৮ পারা ছুরা হাশর দ্রষ্টব্য)। সেই ইহুদী সম্প্রদায়কেই দ্বিতীয়বার খলীফা ওমর (রাঃ) খয়বর হইতে বহিস্কৃত করিয়াছিলেন; তখন কোরআন নাযেল হওয়া বন্ধ; তাই উহার উল্লেখ কোরআনে স্পষ্টরূপে নাই বটে, কিন্তু প্রথমবারের ঘটনার উল্লেখে উহাকে "প্রথম বহিষ্কার" বলিয়া পরবর্তী বহিষ্কারের ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে—যাহার বাস্তবায়ন ওমর (রাঃ) করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন হযরত (দঃ)ও এই পরবর্তী বহিষ্কারের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—যাহার বর্ণনা ওমর (রাঃ) দিয়াছেন।

বেহেশতে যাইয়া জমি চাষ করার ঘটনা

১১৫১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) একদা বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করিতেছিলেন, তাঁহার নিকট এক বেদুঈন উপস্থিত ছিল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, বেহেশতবাসী এক ব্যক্তি একদা স্বীয় পরওয়ারদেগার সমীপে কৃষিকার্য্যের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি স্বীয় সমুদয় ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্খাকে উপস্থিত পাইতেছ নয় কি? (এমতাবস্থায় তোমার কৃষিকার্য্যের আবশ্যক কি?) সেই ব্যক্তি বলিবে, আমি সব কিছুই পাইতেছি বটে, কিন্তু কৃষিকার্য্য করার অভিলাষ আমার জন্মিয়াছে। সেই ব্যক্তি জমিনে বীজ বপন করিবে। চোখের পলক অপেক্ষা দ্রুত বীজ হইতে চারা জন্মিয়া, গাছ বড় হইয়া শস্য পাকিয়া ও প্রস্তুত হইয়া পাহাড় পরিমাণ স্তূপ হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, হে আদমজাত! এই লও—তোমার অভিলাষ! তোমার আকাঙ্খার সমাপ্তি হয় না।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটস্থ বেদুঈনটি বলিয়া উঠিল—ঐ ব্যক্তি মক্কা হইতে আগত (কৃষিকার্য্যে লিপ্ত) মোহাজের বা মদীনাবাসী হইবেন; তাঁহারাই কৃষিকার্য্যে অভ্যস্ত। বেদুঈনরা কৃষিকর্মে অভ্যস্ত নয়। এতচ্ছ্রবণে নবী (দঃ) হাসিলেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● শস্য-ফসলের হেফাজতে কুকুরকে কাজে লাগান জায়েয আছে (৩১২ পৃঃ)।

● বর্গার চুক্তি কত বৎসরের জন্য করা যাইতেছে তাহা নির্দ্ধারিত না করিলেও বর্গা শুদ্ধ হয়, (কিন্তু উহা শুধু এক বৎসরের জন্য বাধ্যতামূলক হয়, তারপর উভয়ের সম্মতি সাপেক্ষ (৩১৩ পৃঃ)।

● অমোসলেমকে বর্গা দেওয়া জায়েয (ঐ)। ● কোন ব্যক্তি অন্যের বীজ তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে তাহারই উপকারার্থে বপন করিয়াছে, সে ক্ষেত্রে লাভ হইলে তাহা বীজের মালিকের হইবে (৩১৩ পৃঃ। অবশ্য জমিওয়ালা জমির কেরায়া রাখিতে পারিবে।) আর যদি বীজের ক্ষতি হইয়া যায় তবে ঐ বপনকারী ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য থাকিবে।

অনাবাদ ভূমিকে যে আবাদ করিবে

মছআলাহ ঃ—যে ভূমি কাহারও মালিকানাভুক্ত নহে এবং উহাতে পানির কোন প্রকার ব্যবস্থা না থাকায় বা অতিরিক্ত পানির কারণে বা যে কোন কারণে অনাবাদ পড়িয়া আছে, কোন ব্যক্তি উহা আবাদ করিলে সেই ব্যক্তি উহার মালিক সাব্যস্ত হইবে। কিন্তু এই বিষয়ে দুইটি শর্ত আছে, প্রথম—ঐ ভূমি এমন স্থানে অবস্থিত না হয় যাহার সঙ্গে সর্বসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে, দ্বিতীয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির অনুমতি প্রাপ্তে আবাদ করিতে হইবে।

● আলী (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে তাঁহার রাজধানী কুফা নগরী হইতে দূরে অবস্থিত অনাবাদ ভুমিসমূহে ঐরূপ ব্যবস্থার স্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন।

● ওমর (রাঃ) ও স্বীয় খেলাফতকালে ঐ ব্যবস্থার স্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন।

● আমর ইবনে আউফ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অনাবাদ জমি আবাদ করিবে যদি পূর্ব হইতে ঐ জমির উপর কাহারও কোন স্বত্ব না থাকে তবে ঐ আবাদকারীই উহার মালিক হইবে, অন্য ব্যক্তি ঐ জমি দখল করিতে চাহিলে তাহাকে অত্যাচারী ও অন্যায়কারী সাব্যস্ত করা হইবে; তাহাকে সেই স্থানে হক দেওয়া হইবে না।

● জাবের (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদ জমিকে আবাদ করিবে সেই জমিতে তাহারই স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেই ব্যক্তি এই কার্য্যের ছওয়াবও লাভ করিবে। উহা আবাদ করতঃ উহাতে রোপিত বৃক্ষাদির ফল যাহা পশু-পক্ষী ভক্ষণ করিবে তাহা ঐ ব্যক্তির পক্ষে ছদকা—দান খয়রাত গণ্য হইবে।

১১৫২। হাদীছঃ— عن عائشة (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ مَنْ اَعْمَرَ اَرْضًا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ فَهُوَ اَحَقُّ ـ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অনাবাদ ভূমি আবাদ করিবে যাহা কাহারও মালিকানায় নহে, সেই ব্যক্তি ঐ ভূমির হকদার—মালিক সাব্যস্ত হইবে। (৩১৪ পৃঃ)

সেচ ও পানি সম্পর্কীয় বিষয়ের বিবরণ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

যাহারা কাফের—যাহারা সঠিকরূপে আল্লাহ তায়ালার একত্ব প্রভুত্ব অবলম্বন করে না তাহাদের প্রতি তিরস্কার করতঃ তাহাদের চোখে অঙ্গুলি দিয়া আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অসীম কুদরতের নিদর্শন দেখাইয়া বলেন—"(বিশ্ব জগতের অগণিত) জীবন্ত বস্তুসমূহের প্রতিটি বস্তুকে আমি পানির দ্বারা সৃষ্টি ও উহার অস্তিত্ব বজায় থাকার ব্যবস্থা করিয়াছি। (আমার অবিমিশ্র একনায়কত্ব অসীম কুদরতের এরূপ নিদর্শনসমূহ তাহারা স্বচক্ষে দেখিতেছে,) তবে কেন তাহারা (আমার একত্বের স্বীকারোক্তি এবং আমার প্রভুত্ব ও আনুগত্য গ্রহণ পূর্বক) ঈমান আনিতেছে না"? (১৭ পাঃ ৩ রুঃ)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ـ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ……

অর্থ—তোমরা পানি সম্পর্কে লক্ষ্য করিয়াছ কি? যে পানি তোমরা (জীবন ধারণের জন্য) পান করিয়া থাক (এবং যেই পানির বারিপাতের উপর সৃষ্ট জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে—) মেঘমালা হইতে সেই পানি তোমরা বর্ষণ করিয়া থাক, না—আমি বর্ষণ করি? (এই প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্ট যে, আমিই উহা বর্ষণ করিয়া থাকি। অতঃপর ইহাও লক্ষ্য কর যে, আমি ঐ পানিকে তোমাদের ব্যবহারোপযোগী মিষ্টি পানিরূপে বর্ষণ করি;) আমি যদি ইচ্ছা করি তবে ঐ পানিকে ব্যবহারে অনুপযোগী লোনা পানিতে পরিণত করিয়া দিতে পারি। (বাধা দেয়ার সাধ্য কাহারও নাই, যেরূপ সমুদ্রের সমুদয় পানিকে আমি লোনা করিয়া রাখিয়াছি। আমার এ সমস্ত নেয়ামতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া খাঁটি ও পূর্ণরূপে) আমার প্রতি কেন কৃতজ্ঞ হও না? (২৭ পাঃ ১৫ রুঃ)

ব্যাখ্যাঃ—বৈজ্ঞানিকগণ পানি সম্পর্কে কত গবেষণাই না করিয়া থাকে! কিন্তু যাহারা উল্লিখিত বিষয় সমূহে গবেষণা করিয়া স্বীয় সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালার খোঁজ ও পরিচয় লাভ করতঃ অসীম অতুলনীয় কৃপা ও করুণা জ্ঞাত হইয়া স্বীয় কর্তব্য নির্দ্ধারণ ও পালন না করে বস্তুতঃ তাহারা পানি সম্পর্কীয় বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ হইতেই অজ্ঞ ও অন্ধ।

পানির সত্বাধিকারী স্বীয় প্রয়োজনে অগ্রগণ্য

ব্যাখ্যাঃ—ব্যক্তিগত সত্বাধিকারের পানি দুই প্রকার।

প্রথম—যে পানি কোন বড় বা ছোট পাত্র ইত্যাদিতে ব্যক্তিগত পরিশ্রম বা ব্যয় বহনে সংরক্ষিত হইয়াছে; এইরূপ পানির মালিক ও স্বত্বাধিকারী একমাত্র সংরক্ষণকারীই সাব্যস্ত হইবে, উহাতে অন্য কাহারও স্বত্ব থাকিবে না।

দ্বিতীয়—যে পানি ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও ব্যয়-বহনে পাত্র ইত্যাদিতে সংরক্ষিত হয় নাই, বরং প্রাকৃতিকরূপে এক স্থানে জমা হয়, কিন্তু পানির সেই স্থান ব্যক্তিগত স্বত্ব এবং মালিকানাভুক্ত—কূপ, পুকুর, দীঘি ইত্যাদি। এইরূপ পানির উপর মালিকের এমন অধিকার নাই যে, সে মানুষকে বা পশুপালকে সেই পানি পান করা হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারে। এমনকি—যদি মালিক স্বীয় এই অধিকার খাটাইতে চায় যে, পানি হইতে কাহাকেও নিষেধ করি না, কিন্তু আমার এলাকায় ও জমিনে অন্যকে যাতায়াত করিতে দিব না। এমতাবস্থায় যদি নিকটবর্তী এলাকার মধ্যে ঐ কূপ বা পুকুর ভিন্ন পানি পানের অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকে তবে মালিককে বলা হইবে যে, এই পানি তোমার এলাকার বাহিরে পৌছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা কর, নতুবা ঐ ব্যক্তিকে পানি নিয়া যাওয়ার অনুমতি দাও। অবশ্য যাতায়াতের দ্বারা কূপ বা পুকুরের ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না, নতুবা মালিক বাধাদান করিতে পারিবে। মোট কথা এই যে, কূপ, পুকুর ইত্যাদি যদিও মালিকানাভুক্ত হয় তবুও উহার পানি পান করার অধিকার অন্য সকলের থাকিবে। হাঁ—নদী-নালার পানির ন্যায় ঐ পানির দ্বারা ক্ষেত-খোলা, বাগ-বাগিচা সেচনের অধিকার মালিক ভিন্ন অন্য কাহারও থাকিবে না।

এই দ্বিতীয় প্রকারের পানি সম্পর্কেই বলা হইতেছে যে, মালিক অগ্রাধিকারী গণ্য হইবে। অর্থাৎ অন্য লোকের পশুপালের পানি পান করার অধিকার ঐ পানির উপর আছে বটে, কিন্তু মালিকের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর যে পানি থাকিবে সেই পানির মধ্যে অন্য লোকের পান করার অধিকার থাকিবে। মালিকের প্রয়োজন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অন্যের অধিকার স্থাপিত হইবে না। এমনকি, যদি অন্য লোক বা অন্যের পশুপালের এত ভিড় হয় যে, কূপ বা পুকুর শুষ্ক হইয়া যাওয়ার আশংকা হয় তবে মালিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

পশুপালের খাদ্য ঘাস-পাতার মছআলাও পানির মছআলার অনুরূপ—উহাও তিন প্রকার। (১) মালিকানা স্বত্বহীন জমির উপর স্বয়ং উদ্ভিদজাত ঘাস নদী-নালা সমুদ্র ইত্যাদির পানির ন্যায়; উহার উপর সকলের সমান অধিকার থাকে—কেহ কাহাকে বাধা দিতে পারে না। (২) মালিকানাধীন জমির উপর স্বয়ং উদ্ভিদজাত ঘাস-পাতা—ইহা কূপ, পুকুর দীঘি ইত্যাদির পানির ন্যায়; জমির মালিকের প্রয়োজনাতিরিক্ত যাহা থাকিবে উহার উপর অন্য লোকের অধিকার থাকে, অবশ্য তাহার জমিনের কোন প্রকার ক্ষতি সাধনে সে বাধা দান করিতে পারে। (৩) স্বীয় জমিনে বপনকৃত বা স্বীয় পরিশ্রমে বা ব্যয়-বহনে সংগৃহীত ঘাস-পাতা, ইহা পাত্রে সংরক্ষিত পানির ন্যায়; ইহাতে কাহারও অধিকার নাই।

মছআলাহ্ঃ—পানির কূপ, পুকুর ইত্যাদি যদিও সাধারণতঃ বিপদ সঙ্কুল বটে, কিন্তু নিজ স্বত্বের ভূমিতে উহা খননের অধিকার আছে, এমনকি যদি উহাতে পতিত হইয়া কেহ মারা যায় তাহার জন্য মালিক দায়ী হইবে না। (৩১৭ পৃঃ)

১১৫৩। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (যেই ঘাসের উপর অন্য লোকের অধিকার থাকে সেই ঘাসের নিকটবর্তী স্থানে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কূপ বা পুকুর থাকিলে সেই) ঘাস হইতে বঞ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে পানির স্বীয় প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশকে নিষিদ্ধ করার অধিকার নাই।

আবশ্যকাতিরিক্ত পানি হইতে পথিককে বঞ্চিত করা

১১৫৪। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তিন প্রকার মানুষ আছে যাহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের ভীষণ কঠিন দিনে দৃষ্টিপাত (অনুগ্রহ) করিবেন না, (তাহাদের গোনাহ মাফ করিয়া) তাহাদিগকে পাক পবিত্র (করতঃ বেহেশত লাভের সুযোগ দান) করিবেন না এবং ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (১) ঐ ব্যক্তি যাহার

মালিকানায় পথিমধ্যে তাহার নিজ আবশ্যকাতিরিক্ত পানির ব্যবস্থা আছে, সে পথিকদিগকে ঐ পানি ব্যবহার করিতে দেয় না। (কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যেই পানি তুমি সৃষ্টি করিয়াছিলে না—সেই পানির অতিরিক্ত অংশ হইতে তুমি অন্যকে বঞ্চিত রাখিয়াছিলে ; তদ্রূপ আজ তুমি আমার কৃপা হইতে বঞ্চিত থাকিবে)। ঐ ব্যক্তি—যে কোন নেতা বা শাসনকর্তার আনুগত্য বা সমর্থন (নিঃস্বার্থরূপে আদর্শ ভিত্তিক না করিয়া) দুনিয়ার অর্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে, পরে যদি সেই স্বার্থ সিদ্ধ হয় তবে সমর্থন বহাল রাখে, নতুবা বিদ্রোহী হইয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। (৩) ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় বিক্রয় বস্তু বিক্রি করার জন্য উপস্থিত করিয়াছে, (সে এত বড় দুরাচার যে,) আছরের নামাজের পর (—যে সময়টি বিশেষ ফজিলতের সময় ; সেই মোবারক সময়ের মধ্যে বিনা দ্বিধায়) এরূপ মিথ্যা শপথ করে যে, যেই আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই তাঁহার কসম খাইয়া বলিতেছি, এই বস্তুটির এত টাকা মূল্য বলা হইয়াছে ; (বস্তুতঃ তাহার ঐ বস্তুর তত টাকা মূল্য বলা হয় নাই, সে অন্যকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এরূপ মিথ্যা বলিয়াছে ;) অন্য এক ব্যক্তি তাহার কথা বিশ্বাস করিয়াছে এবং ধোঁকায় পড়িয়া বেশী মূল্য দান করিয়াছে।

তৃতীয় রকম ব্যক্তির কুফল বর্ণনায় হযরত (দঃ) নিম্নের আয়াতটিও তেলাওয়াত করিলেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

অর্থ—যাহারা আল্লার নামে (মিথ্যা) ওয়াদা বা (মিথ্যা) শপথ করিয়া উহার বিনিময় হাসিল করে যাহা জাগতিক নগণ্য বস্তু, (অর্থাৎ সাধারণভাবে সে যে পরিমাণ বিনিময় হাসিল করিতে পারিত না মিথ্যা কসম ও শপথ বা আল্লার নামে ওয়াদা করিয়া উহা হাসিল করে।) তাহাদের জন্য আখেরাতে সুখ ভোগের কোন সুযোগই থাকিবে না। (৩ পাঃ ১৬ রুঃ)

নদী-নালার গতি রোধ করিয়া উর্দ্ধ প্রান্তের জমি সেচের প্রয়োজনান্তে নিম্নপ্রান্তের জমি সেচনের জন্য পানি ছাড়িয়া দিতে হইবে

অর্থাৎ প্রাকৃতিক নদী-নালার মধ্যে অপর্যাপ্ত পানি হইলে ; যেরূপ বর্ষাহীন শুষ্ক অঞ্চলের পাহাড় পর্বতের ঝর্ণা হইতে প্রবাহমান নদী নালা—এ সবের পানি ব্যবহারে উর্দ্ধ প্রান্তের জমিওয়ালাদের হক অগ্রগণ্য বটে, কিন্তু উহাকে সর্বদার জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়ার হক কাহারও নাই, বরং সাধারণ নিয়ম ও পরিমাণ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সেচন পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন প্রান্তের জমি সেচনের জন্য পানি ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। অবশ্য উর্দ্ধপ্রান্তের লোকদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় হক হাসিল করার জন্য সাময়িকরূপে উহার গতিরোধ করার অনুমতি আছে।

১১৫৫। হাদীছঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ফুফাত ভাই—বিশিষ্ট ছাহাবী যোবাবের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে প্রবাহমান পানির গতিরোধ নিয়া মদীনাবাসী একজন লোকের বিবাদ ঘটিল। প্রাবাহিত নালার উর্দ্ধপ্রান্তে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু

তায়ালা আনহুর খেজুর বাগান ছিল, তিনি উহা সেচনের জন্য ঐ প্রবাহমান পানির গতিরোধ করিয়া থাকিতেন। অপর পক্ষ মদীনাবাসী লোকটির জমি ঐ নালার নিম্ন প্রান্তে অবস্থিত সে যোবায়ের (রাঃ) কর্তৃক পানির গতিরোধে বাধা দিত ; এইরূপে তাহাদের বিবাদ ঘটে এবং উভয়ই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে এই বিবাদের মীমাংসা প্রার্থনা করেন।

নবী (দঃ) যোবায়ের (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি তোমার আবশ্যক পরিমাণ পানি সেচনের পর স্বীয় পড়শীর জন্য পানি ছাড়িয়া দিও। মদীনাবাসী ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, সে রাগান্বিত হইয়া বলিল, যোবায়ের আপনার ফুফাত ভাই কি না! (তাই আপনি তাহার পক্ষে মীমাংসা করিলেন।) তাহার এই কটাক্ষ পূর্ণ উক্তিতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ হইয়া গেল। তিনি যোবায়ের (রাঃ)কে পুনঃ ডাকিয়া বলিলেন, যাবৎ তোমার বাগানের বাঁধ ও বেষ্টনী পরিমাণ পানি না হয় তাবৎ নালার গতি রোধ করিয়া রাখার অধিকার তোমার থাকিবে। (প্রথমে হযরত (দঃ) উভয়ের মধ্যে মীমাংসামূলক ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়াছিলেন যাহাতে মদীনাবাসী ব্যক্তিরই মঙ্গল ছিল, কিন্তু সে তাহা লক্ষ্য না করিয়া উল্টা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি কটাক্ষ করিল। পরে নবী (দঃ) তাহার দুর্বুদ্ধিকে শায়েস্তা করার জন্য এবং বস্তুতঃ তিনি কাহার মঙ্গল করিয়া ছিলেন তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ঐ পরামর্শাকারের আদেশ বাতিল করিয়া দিয়া দ্বিতীয়বার আইন সম্মত হক যাহা বস্তুতঃ উর্দ্ধ প্রান্তওয়ালা ব্যক্তি পাইবার অধিকারী, যোবায়েরকে সেই অধিকার পূর্ণরূপে প্রদান করিলেন।)

যোবায়ের (রাঃ) বলেন, এই ঘটনানুরূপ বিষয়েই এই আয়াতটি নাযেল হয়—

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ......

অর্থ—আপনার প্রভুর শপথের সহিত ঘোষণা করা হইতেছে, কোন ব্যক্তি মোমেন গণ্য হইবে না যাবৎ আপনাকে স্বীয় সমুদয় বিবাদ-বিরোধ নিষ্পত্তির পূর্ণ অধিকারীরূপে গ্রহণ না করিবে, অতঃপর আপনার আদেশ ও রায়কে বিনা দ্বিধায় সংশয়হীনরূপে মানিয়া ও গ্রহণ করিয়া না লইবে। (৫ পাঃ ৬ রুঃ)

তৃষ্ণাতুরকে পানি দান করার ফযীলত

প্রথম খণ্ডে অনুদিত ১৩৪ নং হাদীছখানা এস্থানে বিশেষ লক্ষণীয়।

১১৫৬। হাদীছ :— قال عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتْ اِمْرَأَةٌ فِىْ هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ لَا اَنْتِ اَطْعَمْتِيْهَا حِيْنَ حَبَسْتِيْهَا وَلَا اَنْتِ اَرْسَلْتِيْهَا فَاَكَلَتْ مِنْ خُشَاشِ الْاَرْضِ۔

অর্থ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একটি বিড়াল সম্পর্কে একজন নারীর প্রতি শাস্তি ও আজাবের আদেশ হইয়াছে। ঐ নারী একটি বিড়ালকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং ঐ অবস্থায় সে উহাকে পানাহার প্রদান করে নাই, ফলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বিড়ালটি মরিয়া যায়। সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা তাহার শাস্তিবিধানে বলিলেন, তুমি উহাকে আবদ্ধ রাখাবস্থায় পানাহারের ব্যবস্থা করিয়া দেও নাই এবং ছাড়িয়াও দেও নাই; যে, মাটিতে পড়া বস্তু হইতে সে তাহার আহার জোটাইতে পারে।

পতিত জমির গোচরণ ভুমির কোন অংশ ব্যক্তিগতরূপে নির্দিষ্ট করিয়া নেওয়ার অধিকার নাই

১১৫৭। হাদীছ ঃ—ছায়াব ইবনে জাচ্ছামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পতিত জমির গোচরণ ভুমির কোন অংশ নির্দিষ্ট করিয়া নেওয়ার অধিকার কাহারও নাই; শুধুমাত্র আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের সেই অধিকার আছে।

ব্যাখ্যা ঃ—যে জমি কাহারও ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারে নহে এবং উহার অবস্থান এমন প্রান্তে যে, ঐ এলাকার জনসাধারণ নিজেদের পশুপাল চারণ ইত্যাদি প্রয়োজনে উহার উপর নির্ভরশীল—এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত জমির কোন অংশ কেহ নিজের জন্য—যেমন, নিজের পশুপাল চরাইবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লইবে; অন্যের পশুকে তথায় চরিতে দিবে না এই অধিকার কাহারও নাই, এমনকি বাদশা, খলীফা বা রাষ্ট্র-প্রধানেরও এই অধিকার নাই।

আল্লাহ ও আল্লার রসুলের জন্য উক্ত অধিকার থাকার অর্থ এরূপ ক্ষেত্রে কোরআন-হাদীছের ব্যবহারিক ভাষায়—দেশের ও দেশবাসী সমগ্র জনগণের সর্বময় কল্যাণ-কেন্দ্র সরকারী বাইতুল-মালের অধিকারকে বুঝাইয়া থাকে।

বাইতুল-মাল কাহারও ব্যক্তিগত ধন-ভাণ্ডারে পরিণত হইতে পারে না; উহা সমগ্র জনগণের সকল প্রকার কল্যাণ ও প্রয়োজনে সাহায্য সহায়তা দানের ভাণ্ডার। রাষ্ট্র-প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া কোন ব্যক্তি দুনিয়ার বুকে উহার মালিক নহে, তাই উহার মালিকানাকে আল্লার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়; রসুল আল্লার প্রতিনিধি, তাই রসুল ঐ বাইতুল-মালের পরিচালক। তদ্রূপ রসুলের স্থলাভিষিক্ত খলীফা তথা তাঁহার সরকার সেই বাইতুল মালের পরিচালক।

বাইতুল মালে জনগণের কল্যাণের জন্য সব রকম জিনিসই স্থায়ীভাবেও থাকে এবং সরবরাহের জন্য আমদানী হইয়া বন্টন সাপেক্ষে অস্থায়ীভাবেও থাকে। বাইতুল-মালের সম্পদের মধ্যে বিভিন্ন পশুপালও হয়; সেই সব পশুপালের জন্য যদি উক্ত ভুমির কোন এলাকা নির্দিষ্ট করা হয় তবে তাহা বিধেয় এবং সেই অধিকার সরকারের আছে। আলোচ্য হাদীছের শেষ বাক্যের মর্ম ইহাই। ইহারই দৃষ্টান্ত পেশ করিতে যাইয়া ইমাম

বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন, হাদীছের মাধ্যমে আমরা দেখিতে পাই—নবী (দঃ) বাইতুল-মালের উক্ত প্রয়োজনে "নকী" নামক মদীনার উপকণ্ঠে এক এলাকাকে নির্দিষ্ট করিয়া নিয়াছিলেন এবং খলীফা ওমর (রাঃ) "শারাফ" ও "রাবাজাহ" নামক বিশেষ এলাকাদ্বয়কে নির্দিষ্ট করিয়া নিয়াছিলেন (৩১৯ পৃঃ)।

● উল্লিখিত শ্রেণীর ভূমি যাহার উদ্ভিদ কাহারও জন্য নির্দিষ্ট নহে উহার ঘাস বা খড়ি কেহ কাটিয়া আনিলে উহা তাহার সত্ব হইবে; সে উহা বিক্রি করিতে পারে (৩১৯ পৃঃ)। ● ঐরূপ আকারেই নদ-নদী, খাল-বিলও সমভাবে জনগণের থাকিবে; যে কোন মানুষ বা জীব উহার পানি পান করিতে পারিবে, মাছ ধরিতে পারিবে।

পতিত জমি কাহাকেও দেওয়া

পতিত জমি যদি বস্তি এলাকার জনসাধারণের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্নরূপে থাকে তবে সরকার উহা পাইবার প্রকৃত পাত্র ব্যক্তিদেরকে উক্ত জমি প্রদান করিতে পারে এবং উহা লিখিতরূপে দেওয়া চাই।

১১৫৮। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বাহ্‌রাইন এলাকা মোসলমানদের অধীনস্থ হইলে পর) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনাবাসী মোসলমানগণকে ডাকিলেন; বাহ্‌রাইন এলাকার পতিত জমি তাহাদের নামে লিখিয়া দেওয়ার জন্য। মদীনাবাসীগণ বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি আপনি আমাদেরকে জমি লিখিয়া দিতে চান তবে প্রথমে আমাদের কোরায়শী মোহাজের ভাইদের জন্য ঐ পরিমাণ জমি লিখিয়া দিয়া তারপরে আমাদিগকে দিবেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই পরিমাণ জমি ছিল না যে, তিনি তাহা করিতে পারেন।

নবী (দঃ) (মদীনাবাসীদের এই উদারতা ও মহামতির প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, অচিরেই আমার পরে তোমরা নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রবর্তীতা দেখিবে; (তখনও এরূপ উদারতার সহিত) তোমরা ধৈর্য্যধারণ করিও।

মছআলাহ্‌ঃ—কাহারও পানি ব্যবহারের অধিকার অন্য ব্যক্তির মালিকানা সত্বাধিকারভুক্ত কূপ বা পুকুরে থাকিলে, তদ্রূপ কাহারও পথ চলিবার অধিকার অন্য ব্যক্তির মালিকানা সত্বের জমিতে থাকিলে তাহা অক্ষুন্ন থাকিবে (৩২০ পৃঃ)। এমনকি উক্ত অধিকারী ব্যক্তি যেই বাড়ী বা জমির দরুণ উক্ত অধিকার লাভ করিয়াছে সেই বাড়ী বা জমির সহিত উক্ত অধিকারও সর্বসম্মতরূপে হস্তান্তর ও উহার মূল্য গ্রহণ করিতে পারে। আর ঐ বাড়ী বা জমি ব্যতিরেকে শুধু উক্ত অধিকার হস্তান্তর ও উহার বিনিময় গ্রহণও কিছু সংখ্যক আলেমগণের মতে শুদ্ধ ও বৈধ বটে। এতদ্ভিন্ন পুকুর বা পথের মূল মালিক এবং উক্ত অধিকারী উভয়ে যদি সম্মত হইয়া সেই পুকুর বা পথ উক্ত অধিকার সহ বিক্রি করে সে ক্ষেত্রে সর্বসম্মতরূপে উক্ত অধিকারী মূল্যের অংশীদার হইবে যদিও পুকুর এবং পথে তাহার মালিকানা স্বত্ব না থাকে। (ফতহুল কাদীর ৫—২০৫)

ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের বয়ান

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.........

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন, তোমরা আমানতসমূহ তথা অন্যের হক, সত্ব ও প্রাপ্যকে প্রাপকের নিকট অর্পণ করিবে এবং যখন লোকদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা কর তখন ইনছাফের সহিত বিচার-মীমাংসা করিবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে যে সব নছীহত করিতেছেন তাহা কতই না উত্তম ও ভাল। আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শুনেন ও দেখেন।

১১৫৯। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ

أَدَاءَهَا أَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللّٰهُ.

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরিশোধ করার দৃঢ় ইচ্ছার সহিত মানুষের ধন ঋণরূপে গ্রহণ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সেই ঋণ পরিশোধে সাহায্য করিবেন। আর যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করিবে আল্লাহ তাহাকে ধ্বংস করিবেন।

১১৬০। হাদীছ ঃ—আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি দূর হইতে ওহোদ পাহাড়টি দেখিতে পাইয়া বলিলেন, এই পর্বতটি যদি আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত করিয়া দেওয়া হয় তবে (আমি তিন দিনেই উহা সম্পূর্ণ দান-খয়রাত করিয়া দিব), তিন দিনের অতিরিক্ত একটি মুদ্রা পরিমাণও আমার নিকট অবশিষ্ট থাকাকে আমি পছন্দ করিব না। হাঁ—যদি আমার ঋণ থাকে তবে উহা পরিশোধ করা পরিমাণ রাখিব বটে। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, যাহারা (দুনিয়াতে) অধিক বিত্তশালী তাহারাই (কেয়ামতের দিন) অধিক অভাবগ্রস্ত হইবে। হাঁ—যে বিত্তশালী আল্লার রাস্তায় সৎকাজে চতুর্দিকে ধন-সম্পদ ব্যয় করে (তাহারা ব্যতীত।) কিন্তু এরূপ বিত্তশালীর সংখ্যা অতি নগণ্য।

অতঃপর নবী (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি এখানেই অবস্থান কর এবং তিনি কিছু দূর অগ্রসর হইয়া অনতিদূরেই আমার দৃষ্টি হইতে লুপ্ত হইয়া গেলেন। হযরত (দঃ) যেই দিকে গিয়াছিলেন সেই দিক হইতে আমি (কথাবার্তার) শব্দ শুনিতে পাইলাম। তাই আমি তাঁহার উপর কোন বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার নিকটে আসিতে ইচ্ছা করিলাম।

কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার আদেশ ছিল যে, আমি প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তুমি এই স্থানে অবস্থান করিবে, এই আদেশ স্মরণ করিয়া আমি নিবৃত্ত রহিলাম। হযরত (দঃ) ফিরিয়া আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! কিসের শব্দ শুনিতে পাইলাম? তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; তুমি শব্দ শুনিয়াছ? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, জিব্রাঈল (আঃ) আমার নিকট এই সুসংবাদ নিয়া আসিয়াছিলেন যে, আপনার উম্মতের যেই ব্যক্তি আল্লার সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করা হইতে পবিত্র থাকিয়া মৃত্যু বরণ করিবে সে বেহেশত লাভ করিতে সক্ষম হইবে। আমি আরজ করিলাম, (ইয়া রসুলাল্লাহ!) যদিও সে এই এই গোনাহ করিয়া থাকে? (—যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, চুরি করিয়া থাকে?) হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—যদিও সে যেনা করিয়াছে, চুরি করিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ— ইহাতে সন্দেহ নাই যে, খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি গোনাহগার হইলেও বেহেশত লাভে সক্ষম হইবে, অবশ্য তাহার গোনাহ ক্ষমা না হইলে সেই গোনাহের শাস্তি ভোগান্তে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। পক্ষান্তরে ঈমান না থাকিলে বেহেশত লাভ হইবে না, যদিও বাহ্যিক সৎকার্য করিয়া থাকে। কারণ, ঈমান না থাকিলে কোন সৎকার্যই আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণীয় নয়।

মহাজন বা প্রাপকের তাগাদায় ক্ষুব্ধ হইবে না

১১৬১। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا وأعطوه إياه قالوا لا نجد إلا أفضل من سنه قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء.

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি উট (বাইতুল-মালের জন্য) ধার লইয়াছিলেন। একদা ঐ ব্যক্তি নবী (দঃ)কে তাগাদা করিল এবং অতি কঠোর ভাষায় তাগাদা করিল। ছাহাবীগণ তাহার আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। নবী (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিলেন, তোমরা তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিও না, প্রাপকের অধিকার আছে তাগাদা করার। নবী (দঃ) তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, একটি উট ক্রয় করিয়া তাহার প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া দাও। (এমতাবস্থায় বাইতুল-মালের মধ্যে কয়েকটি উট ওয়াসিল হইয়া আসিল, তখন সেই উট হইতেই পরিশোধের আদেশ করিলেন।) তাঁহারা বলিলেন, এই ব্যক্তির প্রাপ্য উট অপেক্ষা

উত্তম ব্যতীত সমপরিমাণ উট পাওয়া যাইতেছে না। নবী (দঃ) বলিলেন, তাহার প্রাপ্য অপেক্ষা উত্তমই তাহাকে প্রদান কর। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে ঋণ পরিশোধে উত্তম হয়।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লিখিত ঘটনায় হযরত (দঃ) উক্ত ধার বা কর্জ নিজের জন্য করিয়াছিলেন না, বরং জাতীয় ধন-ভাণ্ডার বাইতুল-মালের জন্য করিয়াছিলেন। কোন গরীব অসহায়কে বাইতুল-মাল হইতে একটি উট দ্বারা সাহায্য করার উপস্থিত প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু বাইতুল-মালে তখন উট ছিল না, তাই এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি উট ধার আনিয়া অসহায় লোকটিকে দিয়াছিলেন। পরে বাইতুল-মালে উট আমদানী হইলে যে ব্যক্তির নিকট হইতে উট আনিয়াছিলেন তাহাকে তাহার উট অপেক্ষা বড় একটি উট দিয়া দিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ বাইতুল-মালের জন্য লেন-দেন একটির স্থলে একাধিক দিলেও জায়েয হয়। কারণ, বাইতুল-মাল একক বা গ্রুপ বিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা নহে। উহার ধন-সম্পদ সকল মোসলমানের জন্য।

সাধারণভাবে গরু-বকরী, হাঁস-মোরগ ইত্যাদি জীব ধার-কর্জরূপে লওয়া বিভিন্ন ইমাম-গণের নিকট জায়েয আছে, কিন্তু হানাফী মজহাবে কোন জীব ধার-কর্জরূপে লওয়া জায়েয নহে। প্রয়োজন হইলে বাকি মূল্যে ক্রয় করিয়া লইবে।

দেনার কিছু অংশ পরিশোধ করিয়া বাকি অংশ মাফ লইতে পারিলে রেহাই পাওয়া যাইবে

১১৬২। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) ওহোদের জেহাদে শহীদ হইলেন। তিনি (একা আমার উপর) ছয়টি মেয়ে এবং (১৭০ মণ খেজুরের) ঋণ রাখিয়া গেলেন।

আমাদের যে খেজুর বাগান ছিল তাহা ঋণদাতাগণকে দেখাইয়া তাহাদিগকে অনুরোধ করিলাম যে, তাহারা যেন আমার পিতার ঋণের পরিশোধে বাগানের এই মৌসুমের সমুদয় ফল নিয়া নেয় এবং পিতাকে ঋণমুক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু তাহারা ইহাতে সম্মত হইল না; তাহারা ভাবিতেছিল, ইহা ঋণের পরিমাণ হইবে না। এমনকি তাহারা কঠোরতা অবলম্বন করিলে পর আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার দ্বারা সুপারিশ করাইলাম। নবী (দঃ) মহাজনকে ঐরূপই বলিলেন যে, বাগানের সমুদয় ফল গ্রহণ করিয়া আমার পিতাকে যেন ঋণ হইতে মুক্তি দান করে, কিন্তু তাহারা সম্মত হইল না। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। নবী (দঃ) আমাকে বলিয়া দিলেন যে, ফলসমূহ কাটিয়া আনিয়া স্থান বিশেষে স্তূপকৃত কর; এক এক শ্রেণীর খেজুর এক এক স্তূপে রাখিও। তারপর আমাকে খবর দিও। আমি তাহাই করিলাম। নবী (দঃ) আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া তথায় তশরীফ আনিলেন। মহাজনগণ হযরত (দঃ)কে দেখিয়া আমার প্রতি

যেন বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। নবী (দঃ) সর্ব বড় বা মধ্যম শ্রেণীর একটি খেজুর স্তূপের উপর বসিয়া বরকতের জন্য দোয়া করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, মহাজনগণকে ডাকিয়া তাহাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য পূর্ণ মাপিয়া দিতে থাক। আমি তাঁহার নির্দেশ অনুসারে কার্য করিলাম, এমনকি আমার পিতার উপর আর কাহারও ঋণ বাকি থাকিল না। সকলের ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়ার পরও প্রায় ৪০ মণ উত্তম ও ৩৩ মণ ভাল-মন্দ মিশাল মোট প্রায় ৭৩ মণ খেজুর উদবৃত্ত থাকিল। অথচ আমি এই ঋণ পরিশোধের জন্য বাগানের সমুদয় খেজুর প্রদানে রাজি ছিলাম, কিন্তু ঋণের পরিমাণ অপেক্ষা উহা কম হইবে বলিয়া মহাজনগণ তাহাতে সম্মত হইয়াছিল না। অতঃপর আমি মগরেবের নামায নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে তাঁহার সঙ্গে পড়িলাম এবং নামাযান্তে সমুদয় ঘটনা তাঁহাকে অবগত করিলাম। হযরত (দঃ) হাস্যমুখে বলিলেন, আবু বকর ও ওমরকে এই ঘটনা জ্ঞাত কর। আমি তাঁহাদিগকে ঘটনা জ্ঞাত করিলাম। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন এই বিষয়ে স্বীয় কার্যকলাপ (খেজুর স্তূপের উপর বসিয়া বরকতের দোয়া) করিয়াছিলেন তখনই আমরা একীন করিয়াছিলাম যে, কোন অলৌকিক ঘটনা নিশ্চয় ঘটিবে।

ঋণ হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করা

১১৬৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযের মধ্যে (সালাম ফিরাইবার পূর্বক্ষণে দোয়া-মাছুরা স্বরূপ যেই) দোয়া পড়িতেন (উহাতে ইহাও উল্লেখ থাকিত)।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ٥

"হে আল্লাহ! সর্বপ্রকারের গোনাহ ও ঋণ হইতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"*

সামর্থ্য সত্বেও ঋণ পরিশোধে টালবাহানা বড় অন্যায়

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে, ঋণ পরিশোধে সামর্থ্যবান ব্যক্তি টালবাহানা করিলে তাহার প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা এবং (বিচার বিভাগ কর্তৃক) তাহাকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় সঙ্গত গণ্য হইবে।

মছআলাহ ঃ—শুধু এক-দুই দিনের অবকাশ নেওয়াকে টালবাহানা গণ্য করা হইবে না। অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা সমীচীন নহে।

১১৬৪। হাদীছ ঃ— يقول ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ ـ

---

* উল্লিখিত দোয়াটি ৪৭৮ নং হাদীছে বর্ণিত পূর্ণ দোয়ার অংশবিশেষ।

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঋণ পরিশোধে সামর্থ্যবান ব্যক্তির টালবাহানা করা অতি বড় অন্যায়।

দেওলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির নিকট কাহারও মাল থাকিলে?

১১৬৫। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দেউলিয়া ব্যক্তির নিকট কেহ স্বীয় মালিকানা স্বত্বের বস্তু নির্দিষ্টরূপে পাইলে ঐ বস্তু একমাত্র সেই মালিকেরই গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যাঃ—বিভিন্ন লোকের ঋণে ঋণগ্রস্ত থাকাবস্থায় ধন-সম্পদের লাঘব ঘটার দরুন সরকারীভাবে কোন ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত হইলে তাহার জীবিকা নির্বাহাতিরিক্ত যে পরিমাণ ধন-সম্পদ থাকে সরকার কর্তৃক উহা মহাজনগণের মধ্যে তাহাদের ঋণের পরিমাণ অনুপাতে বন্টনের ব্যবস্থা করার বিধান রহিয়াছে। কিন্তু এমতাবস্থায় সেই দেউলিয়ার নিকট ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা সত্বের কোন বস্তু নির্দিষ্টরূপে বিদ্যমান থাকিলে সেই বস্তুটি একমাত্র ঐ মালিকেরই স্বত্ব বলিয়া গণ্য হইবে, অন্যান্য মহাজনগণ এই বস্তু-বিশেষের উপর কোন দাবী করিতে পারিবে না। আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য ইহাই, কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের মালিকানা সত্ব বলিতে কি বুঝায় তাহার প্রতি ইমাম বোখারী (রঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আমানতরূপে গচ্ছিত বস্তু বা আ'রিয়ত তথা সাময়িক কার্য্য উদ্ধারের জন্য ফেরত দেওয়ার বাধ্যবাধকতায় কাহারও নিকট হইতে গৃহীত বস্তু ইত্যাদি। তদ্রূপ দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পূর্বে তাহার নিকট কাহারও বিক্রিত বস্তু যাহার মূল্য এখনও সে পরিশোধ করে নাই এবং ঐ বস্তুর কোন পরিবর্তনও সে সাধন করে নাই—এই বস্তুটিও ঐ বিক্রেতার ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের আওতাভুক্ত পরিগণিত, সুতরাং ঐ বস্তুটি একমাত্র তাহারই প্রাপ্য হইবে।

হানাফী মজহাব মতে আমানত ও আ'রিয়ত ইত্যাদি রকমের বস্তুসমূহ ব্যক্তিগত মালিকানা সত্ব বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু কাহারও বিক্রিত বস্তু কোন অবস্থাতেই ঐরূপ গণ্য হইবে না। বরং বিক্রিত বস্তু দেউলিয়া ব্যক্তির স্বত্ব গণ্য হইবে এবং বিক্রেতা উহার মুল্যের পাওনাদার হিসাবে অন্যান্য মহাজনগণের ন্যায় একজন মহাজন গণ্য হইবে। বস্তুতঃ এই বক্তব্যই যুক্তিযুক্ত, কারণ ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হইয়া ক্রেতা কর্তৃক বিক্রিত বস্তু গৃহীত হওয়ার পর উহার উপর ক্রেতার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, যদিও ধারে বিক্রি হইয়া থাকে। বিক্রেতার স্বত্ব উহার উপর বাকী থাকে না, বরং সে ঋণ-মুল্যের পাওনাদার থাকে।

মছআলাহঃ—কোন ব্যক্তির উপর ঋণ এই পরিমাণ যে, তাহা আদায় করিতে তাহার ধন-সম্পদের সম্পূর্ণই প্রয়োজন; তাহার ঋণ আদায় করিলে সে নিঃস্ব; তাহার ধন-সম্পদের কিছুই থাকে না। সে ক্ষেত্রে পাওনাদারদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কাজী তথা ইসলামী আইনের বিচারক ঐ ব্যক্তির হস্তক্ষেপ তাহার ধন-সম্পদের উপর নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন। এমনকি ঐ ব্যক্তি নিজে ঋণ পরিশোধার্থে ধন-সম্পদ বিক্রি করায় সম্মত

না হইলে কাজী ঐ ব্যক্তির ধন-সম্পদ বিক্রি করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবেন। যদি উহা সমুদয় ঋণের জন্য যথেষ্ট না হয় তবে যে পরিমাণই হয় উহা সকল পাওনাদারদের উপর প্রত্যেকের পাওনা অনুপাতে বন্টন করিয়া দিবেন।

মছআলাহ :—কোন ব্যক্তি নিতান্তই নির্বোধ; ধন-সম্পদ বিনষ্ট করিয়া নিঃস্ব হওয়ার পথে; এইরূপ ব্যক্তির উপরও কাজী তাহার ধন-সম্পদে তাহার হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব তথা তাঁহার নিজের, তাহার স্ত্রীর, তাহার নাবালেগ সন্তানাদির ও যে সব লোকের ভরণ-পোষণ শরীয়ত মতে তাহার দায়িত্ব, সেই সবের জীবিকা নির্বাহের ব্যয় বহনে কাজী ঐ ব্যক্তির ধন-সম্পদ বিক্রিও করিতে পারেন। (৩২৩ পৃঃ)

ধন-সম্পদের অনিষ্ট সাধন নিষিদ্ধ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, والله لا يحب الفساد "অনিষ্ট সাধন আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়।"

ভ্রষ্ট বা বোকা মানুষ অনেক সময় এরূপ ধারণা করে যে, আমার ধন-সম্পদের মালিক আমি, সুতরাং আমি আমার ইচ্ছানুযায়ী সেই ধন-সম্পদের মধ্যে স্বীয় অধিকার খাটাইব; যথায়-তথায় যদ্রূপ ইচ্ছা তদ্রূপ খরচ ও ব্যয় করিব।

এই ধারণা নিতান্তই বোকামি, কারণ ধন-সম্পদ আল্লাহ প্রদত্ত, সুতরাং উহা ব্যয় করিতে আল্লাহ ও আল্লার প্রতিনিধি রসুলের বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতে হইবে, স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরাচারিতার অধিকার কাহারও নাই।

হযরত শোয়া'য়েব (আঃ)-এর ভ্রষ্ট উম্মতদের ঐরূপ একটি কু-উক্তি ও কু-যুক্তির সমালোচনা কোরআন শরীফেও উল্লেখ রহিয়াছে। তাহারা কুফর ও শিরকের সহিত এই কু-অভ্যাস ও কু-কর্মেও লিপ্ত ছিল যে, পরস্পর লেন-দেনের মধ্যে মাপ ও ওজনে কম দিয়া থাকিত। শোয়া'য়েব (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন—

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ........

অর্থ—হে আমার জাতি! তোমরা আল্লার একত্ববাদ ও তাঁহার গোলামীর বন্ধনে আবদ্ধ হও; তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নাই এবং ওজন ও মাপে কম দেওয়ার কু-অভ্যাস বর্জন কর; আমি দেখিতেছি, তোমরা স্বচ্ছল অবস্থায় আছ; (এমতাবস্থায় তোমাদের অসদুপায় অবলম্বন করা দ্বিগুণ দোষণীয়, তাই) আমার আশঙ্কা হয়, কোন দিন সর্বগ্রাসী আজাব তোমাদিগকে গ্রাস করিয়া না লয়।

হে আমার জাতি! মাপ ও ওজন সূক্ষ্মরূপে পূর্ণ করিতে ত্রুটি করিও না এবং মানুষকে তাহার প্রাপ্যে ঠকাইও না এবং দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটাইও না। আল্লার বিধান মতে তথা সদুপায়ে যে লভাংশ হাসিল হয় তাহাই তোমাদের জন্য উত্তম ও

মঙ্গলজনক। তোমরা যদি খাটি মোমেন হও (নিজেই তোমরা ইহার বাস্তবতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।) (১২ পাঃ ৮ রুঃ)

ভ্রষ্ট উম্মতগণ হযরত শোয়া'য়েব আলাইহেচ্ছালামের এই হৃদয়গ্রাহী আহ্বানের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া কু-যুক্তির ও কু-উক্তির অবতারণা করিল। আল্লার একত্ববাদ অবলম্বনের বিরুদ্ধে এই উক্তি করিল যে, বাপ-দাদা পূর্বপুরুষের রীতি আমরা ত্যাগ করিতে পারি না। মাপ ও ওজনে কম দেওয়ার বিষয়ে এই যুক্তির উল্লেখ করিল যে, আমাদের মালিকানা স্বত্বের ধন-সম্পদে আমরা নিজ ইচ্ছাধীন স্বীয় অধিকার খাটাইব—যাহা ইচ্ছা তাহা করিব যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ করিব, তাহাতে কাহারও বাধা দানের কি অধিকার থাকিতে পারে?

এসব কু-উক্তি ও কু-যুক্তির ধ্বজাধারীরা শোয়া'য়েব (আঃ)কে বলিল—

يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ ...... اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ـ

"হে শোয়া'য়েব। আপনার সাধুতা—আপনার নামায কি আপনাকে এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা স্বীয় পূর্বপুরুষদের মাবুদকে ত্যাগ করি বা আমরা স্বীয় ধন-সম্পদে অধিকার প্রয়োগ ত্যাগ করি?" (১২ পাঃ ৮ রুঃ)

শোয়া'য়েব (আঃ) তাহাদিগকে বুঝ-প্রবোধ দানে সতর্ক করিলেন যে—

يٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ ......

"হে আমার জাতি! আমার বিরোধীতায় উন্মত্ত হইয়া তোমরা স্বীয় ধ্বংসের পথ অবলম্বন করিও না। সতর্ক থাকিও—পূর্ববর্তী নুহ (আলাইহেচ্ছালাম) এর উম্মত, হুদ (আলাইহেচ্ছালাম) এর উম্মত, ছালেহ (আলাইহেচ্ছালাম) এর উম্মতের উপর যেরূপ ধ্বংস নামিয়া আসিয়াছিল তোমাদের উপরও যেন সেইরূপ ধ্বংস নামিয়া না আসে; আর এক দল দুষ্কৃতিকারী—লুত (আলাইহেচ্ছালাম)এর উম্মতের ঘটনা তোমাদের নিকটবর্তীই ঘটিয়াছে; এই সব লক্ষ্য করিয়া সময় থাকিতে সতর্ক ও সংযত হও।" (১২ পাঃ ৮ রুঃ)

এইরূপ হৃদয় বিদারক বক্তৃতাও তাহাদের পাষাণ হৃদয়ের উপর কোন ক্রিয়া করিল না, তাহারা স্বীয় দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির উপর অটল রহিল এবং বলিল—

يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا

"হে শোয়া'য়েব! তোমার এসব কথা আমাদের যুক্তিতে আসে না এবং আমাদের মধ্যে তুমি ত দুর্বল, আমাদের উপর তোমার কোন প্রভাব নাই।"

অতঃপর তাহারা শোয়া'য়েব (আঃ)কে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। পরিণামে তাহাদের ভাগ্যে উহাই ঘটিল যাহার সতর্কবাণী শোয়া'য়েব (আঃ) করিয়াছিলেন—

وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جٰثِمِينَ ـ

"দুষ্কৃতিকারীদের উপর ধ্বংসের করাল ছায়া নামিয়া আসিল, তাহারা নিজ নিজ বস্তিতে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হইয়া রহিল এবং তাহাদের অস্তিত্ব ভূপৃষ্ঠ হইতে এরূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল যেন তাহারা এই ধরা-পৃষ্ঠে কখনও অবস্থান করে নাই। পূর্ববর্তী দুষ্কৃতিকারী ছামুদ বংশের দুর্ভাগ্যই মাদয়ানস্থিত হযরত শোয়া'য়েব আলাইহেচ্ছালামের দুষ্কৃতিকারী উম্মতগণও বরণ করিল এবং ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। (১২ পাঃ ৮ রুঃ)

এস্থানে ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লিখিত ঘটনার আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত দানে প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ধন-সম্পদের উপর মালিকানা স্বত্বের যুক্তির অবতারণা করিয়া স্বেচ্ছাচারীতার দাবী করা ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের কারণ। যাহারা মালিকানা স্বত্বের গর্বে অপব্যয় ও ধন-সম্পদের অনিষ্ট করে তাহারা ভ্রষ্ট এবং ধবংসের সম্মুখীন।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন— وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ

"যাহারা বুদ্ধিহীন বোকা তাহাদের হাতে ধন-সম্পদ দিও না"। (৪ পাঃ ১২ রুঃ)

কোরআন শরীফের এই আদেশেরও তাৎপর্য্য ইহাই যে, ধন-সম্পদকে অনিষ্টতা হইতে রক্ষা করা অবশ্যক, তাই উল্লিখিত আদেশ বলবৎ করা হইয়াছে। এমনকি ধন-সম্পদকে অনিষ্টতার হাত হইতে রক্ষা করার প্রয়োজন বোধে শরীয়তে একটি বিশেষ বিধান রাখা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি বুদ্ধিহীনতা বা কু-বুদ্ধির দরুন ধন-সম্পদের অপব্যয়ী ও অনিষ্টকারী প্রমাণিত হইলে সে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক তাহার নিজ ধন সম্পদের উপর ইচ্ছাধীন ক্ষমতা খর্ব করিয়া তাহার উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হইবে। এমনকি যদি কোন ব্যক্তি ঐ পর্য্যায়ের অনিষ্টকারী না হয়, বরং ক্রয়-বিক্রয়ে ঠকিয়া যাওয়ার মত জ্ঞান-বুদ্ধির অভাবী হয় তাহার জন্যও কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে। যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদীছের ঘটনা।

১১৬৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট নিজের বিষয়ে এই অভিযোগ করিল যে, সে (লেন-দেনে ও কাজ-কারবারে) ঠকিয়া যায়। (কারণ, তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা ও অভিজ্ঞতা খুবই কম, এমনকি তাহার আত্মীয়-স্বজনগণও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট তাহার প্রতি ক্রয়-বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তনের সুপারিশ জানাইল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে ডাকিয়া ক্রয়-বিক্রয় হইতে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেন; সে আরজ করিল, আমি ক্রয়-বিক্রয় হইতে ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।) তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে এই ব্যবস্থা শিক্ষা দিলেন যে, যখন তুমি কোন ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা বলিবে, তখন ইহাও বলিয়া দিও—"ঠকাইবার কার্য্য করিবেন না" (আমার অধিকার থাকিবে এই

ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করার)। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি এই বলিয়া দিলে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্তের পরও তিন দিন পর্য্যন্ত তোমার অধিকার বাকি থাকিবে। (তুমি এই ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিতে পারিবে।) সেমতে ঐ ব্যক্তি এইরূপ বলিয়া থাকিত।

ব্যাখ্যা ঃ—নিজের ধনেরও অপচয় বা ক্ষতি সাধন শরীয়তে নিষিদ্ধ। অনিচ্ছাকৃত ঠকের ক্ষতি হইতেও বাঁচিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ঠকের ক্ষতি হইতে রক্ষার জন্য সরকার বুদ্ধিহীন ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা রহিত করিতে পারে।

১১৫৭। হাদীছ ঃ— عن المغيرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

أَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ

وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ -

অর্থ—মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা ভালরূপে জ্ঞাত থাকিও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর তিনটি কার্য্য হারাম করিয়া দিয়াছেন—(১) মাতার না-ফরমানি করা, (২) মেয়ে হইলে উহাকে জীবিতাবস্থায় মাটিতে পুতিয়া দেওয়া, (৩) (কৃপণতা, ও লালসা বশে) নিজে (কর্ত্তব্য কাজে ব্যয় করা বা দান করা হইতে) বিরত থাকিয়া অন্য লোকদের নিকট হইতে ওয়াসিল করায় তৎপর থাকা। এতদ্ভিন্ন তিনটি কার্য্যকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পক্ষে নাপছন্দ করিয়াছেন—(১) অযথা তর্ক-বিতর্ক বা ভিত্তিহীন কথায় লিপ্ত হওয়া (২) বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে অন্যের নিকট হাত পাতা ও ভিক্ষায় লিপ্ত হওয়া বা অধিক প্রশ্নের অবতারণা করা (৩) ধনের অপচয় করা।

ব্যাখ্যা ঃ—মাতা-পিতা উভয়ের নাফরমানিই আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কারণ। নারী জাতির দুর্বলতা দৃষ্টে মাতা সম্পর্কে সতর্ক করার আবশ্যকতা অধিক। এতদ্ভিন্ন মাতা সন্তানের উপর অধিক হকদার। এক হাদীছে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, আমার সদ্ব্যবহারের সর্বাধিক হকদার ও অধিকারী কে? হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমার মা। প্রশ্নকারী পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর? হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবারও বলিলেন, তোমার মা। প্রশ্নকারী পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর? এইবারও হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমার মা। প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর? এইবার হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, অতঃপর তোমার পিতা এবং অতঃপর তোমার আত্মীয়-স্বজন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● ক্রেতার নিকট ক্রয়ের মূল্য নাই বা উপস্থিত নাই সে ক্ষেত্রেও (বাকি মূল্যে) ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে (৩২১ পৃঃ)। অর্থাৎ বিক্রেতার নিকট বিক্রয় বস্তু না থাকিলে তাহার জন্য উহা বিক্রি করা জায়েয নহে—পূর্বে বলা হইয়াছে; ক্রেতার ক্ষেত্রে সেরূপ নহে। ● খাতককে তাগাদা করিতে শালীনতা ও কোমলতা রক্ষা করিবে (ঐ)। ● ধার বা কর্জ পরিশোধ করিতে ধারে গৃহিত বস্তু অপেক্ষা উত্তম বস্তু দেওয়া জায়েয (৩২২পৃঃ)। কিন্তু ধার গ্রহণে উত্তমটি দ্বারা পরিশোধের শর্ত করা হারাম এবং সেই শর্ত পালনীয় হইবে না। তদ্রূপ সংখ্যায় বা মাপে ধারের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী দেওয়া-লওয়াও জায়েয নহে, যদিও শর্ত ব্যতিরেকে হয়। ধারে গৃহিত বস্তু জাতীয় বস্তুর দ্বারা ধার পরিশোধ করিতে নির্দ্ধারিত সংখ্যা বা পরিমাপে না দিয়া আন্দাজ ও অনুমানের উপর দেওয়া হইলে তাহাও জায়েয হইবে না; কারণ, সে ক্ষেত্রে বেশী হওয়ার আশঙ্কা আছে এবং এরূপ ক্ষেত্রে কিছুমাত্র পরিমাণ বেশী হইলে পরিশোধকারীর স্বেচ্ছায় হইলেও তাহা সুদরূপে হারাম গণ্য হইবে। অবশ্য যদি পরিশোধীয় বস্তুর পরিমাণ নিশ্চিতরূপে মূল ঋণের পরিমাণ অপেক্ষা কম হয় এবং পাওনাদার ব্যক্তি ঐ পরিমাণ গ্রহণ করিয়া বাকিটা মাফ করিয়া দেওয়ারূপে গ্রহণ করে তবে তাহা জায়েয হইবে। (৩২২ পৃঃ। ফতহুলবারী, ৫—২৬)। ● ঋণ পরিশোধ বা উহার ব্যবস্থা ব্যতিরেকে মৃত্যু হইলে তাহার জানাযার নামায পড়া কিরূপ? (৩২৩ পৃঃ)। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাইতুল-মালের ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে এরূপ ব্যক্তির জানাযার নামায নবী (দঃ) নিজে পড়িতে চাহিতেন না; অন্য লোকদেরকে পড়ার আদেশ করিতেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ঐরূপ অভাবী ব্যক্তি যে হৃতহস্ত অবস্থায় ঋণ রাখিয়া মারা যাইবে তাহার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং নবী (দঃ) ঐরূপ ব্যক্তির জানাযা নিজেও পড়েন। উক্ত সূত্রেই বর্তমানে যখন ইসলামী রাষ্ট্রের উক্ত ব্যবস্থা প্রচলিত নাই সে ক্ষেত্রে অপরিশোধীয় ঋণী ব্যক্তির জানাযার নামায গণ্যমান্য বিশিষ্ট আলেম ব্যক্তিকে না পড়ার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, যেন ঋণের প্রতি লোকের ভয় থাকে। ● বিলম্বিত নির্দিষ্ট তারিখে আদায়ের কথার উপর ধার-কর্জ গ্রহণ করা জায়েয। অর্থাৎ উভয় পক্ষের একই জাতীয় বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় সাধারণ বিনিময় ক্ষেত্রে উভয় দিকে সমপরিমাণ হইয়াও একদিক বাকি থাকিলে সেই বিনিময় অশুদ্ধ হারাম গণ্য হয়। ধার-কর্জের ক্ষেত্রেও এক প্রকার বিনিময়ই হয় এবং উভয় পক্ষে একই জাতীয় বস্তু হইয়া থাকে এতদসত্বেও একদিকে নগদ অপরদিকে বাকি—ইহা জায়েয। ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, ধার-কর্জে একই জাতীয় বস্তুর বিনিময় হয় এবং কর্জ দেওয়ার দিকে নগদ আর পরিশোধের দিকে বিলম্বে দেওয়া সাব্যস্ত হয়—ইহা শুধু ধার-কর্জে জায়েয। এমনকি পরিশোধের পক্ষ হইতে যদি গৃহিত বস্তু অপেক্ষা উত্তম বস্তু দেওয়া হয় তাহাও জায়েয,

যদি উত্তম দেওয়ার শর্ত না থাকে। প্রকাশ থাকে যে, সংখ্যায় বা মাপে সমান রাখিয়া শুধু গুণের হিসাবে উত্তম হওয়ায় দোষ নাই, কিন্তু একই জাতীয় বস্তুর দ্বারা কর্জ পরিশোধে সংখ্যায় বা মাপে বেশী দিলে শর্ত ছাড়াও তাহা জায়েয হইবে না।

মছআলাহ ঃ—ধার-কর্জের মধ্যে পরিশোধের নির্দ্ধারিত তারিখ অধিকাংশ ইমামগণের মতে উভয়ের জন্য আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক। হানাফী মজহাব মতে ধারদাতার স্বীকৃতির সহিত হইলেও পরিশোধের নির্দ্ধারিত তারিখ ধারদাতার জন্য বাধ্যতামূলক হয় না। অর্থাৎ ধারদাতা ঐ তারিখের পূর্বেও আইনগতরূপে পরিশোধের দাবী করিতে পারে। অবশ্য তাহার স্বীকৃতিতে তারিখ নির্দ্ধারিত হইলে উহা তাহার ওয়াদা ও অঙ্গীকারভুক্ত হইবে এবং ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে তাহার গোনাহ হইবে, কিন্তু ওয়াদা-অঙ্গীকার আইনের আওতায় আসে না; যেমন এক ব্যক্তি কাহারও নিকট অঙ্গীকার করিয়াছে, আমি তোমাকে একশত টাকা দ্বারা সাহায্য করিব; পরে যদি সে তাহার অঙ্গীকার রক্ষা না করে সেই জন্য তাহার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেওয়া চলিবে না। পক্ষান্তরে যদি কেহ কোন বস্তু বাকি ক্রয় করে; ক্রয়-বিক্রয় উভয়ের সম্মতিতে এইরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, মূল্য দশ দিন পরে আদায় করা হইবে—সে ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত সময় উভয় পক্ষের উপর বাধ্যতামূলক হইবে। অর্থাৎ বিক্রেতা সেই নির্দ্ধারিত দিন আসিবার পূর্বে মূল্যের দাবী করিলে তাহার দাবী আইনতঃও অগ্রাহ্য হইবে (৩২৪ পৃঃ)। ● ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অসমর্থ হয় সে ক্ষেত্রে ঋণের অংশবিশেষ ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য ঋণদাতার নিকট সুপারিশ করা সুন্নত। (৩২৪ পৃঃ)।

মামলা-মকদ্দমা সম্পর্কে

কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইলে বিচারক তাহার উপস্থিতি-আদেশ জারি করিতে পারেন। কোন অমোসলেম কোন মোসলমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিলে সে ক্ষেত্রেও একই রূপে বিচার-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১১৬৮। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একজন মোসলমান ও একজন ইহুদীর মধ্যে বিতর্ক ও বাক-বিতণ্ডায় মোসলমান ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর এইরূপ শপথ করিল, ঐ আল্লার শপথ যিনি মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)কে সমস্ত সৃষ্ট জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। ইহুদী ব্যক্তিও তাহার কসমের ক্ষেত্রে বলিয়া উঠিল—"ঐ আল্লার শপথ যিনি মুছা (আলাইহেচ্ছালাম)কে সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। এতশ্রবণে মোসলমান ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হইয়া ইহুদী ব্যক্তিকে চপেটাঘাত করিলেন। ইহুদী ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনা ব্যক্ত করতঃ মোসলমান ব্যক্তির নামে অভিযোগ দায়ের করিল—সে সত্য ঘটনাই বয়ান করিল।

নবী (দঃ) (অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনিলেন এবং) বলিলেন, তোমরা আমাকে মুছা (আঃ) বা অন্য কোন নবীর উপর (এইরূপ) প্রাধান্য দিও না। (যাহাতে অন্য নবীর প্রতি অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা ও তাছিল্যের ভাব বা ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন নবী কোন কোন বিশেষত্বের অধিকারী থাকেন। যেমন ইস্রাফিল (আঃ) ফেরেশতার সিঙ্গার প্রথম ফুঁকে) সমস্ত (জীবিত মৃত ও সমস্ত মৃতের রুহ—আত্মা) বেহুঁশ অচৈতন্য হইয়া যাওয়ার পর (দ্বিতীয় ফুঁকের দ্বারা আত্মা সমুহ চৈতন্য লাভ করতঃ আত্মা ও দেহের সংযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে) যখন সকলে চেতনা লাভ করিবে, তখন আমি হইব সর্বপ্রথম সচেতন ব্যক্তি। কিন্তু প্রথম সচেতন হইয়া আমি দেখিতে পাইব, মুছা (আঃ) সচেতন অবস্থায় মহান আরশের কিনারা ও পায়া ধরিয়া রহিয়াছেন। জানি না, তিনি আমার পূর্বেই সচেতন হইয়াছেন, কিম্বা (সিঙ্গার প্রথম ফুঁকের) অচৈতন্যতা হইতে রক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—বিভিন্ন নবীগণের পরস্পর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যবধান একটি অবধারিত বিষয়। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন—تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض "রসুলগণের মধ্যে আমি কাউকে কারুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি।" অতঃপর ইহাও নিশ্চিত ও অবধারিত যে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত নবীগণের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইলেন, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম। এমনকি সর্বসম্মতরূপে তিনি سيد الانبياء সাইয়ে-দুল আম্বিয়া "সমস্ত নবীগণের সরদার ও প্রধান" سيد المرسلين সাইয়ে-দুল মোরসালীন "সমস্ত রসুলগণের সরদার বা প্রধান" উপাধিতে ভুষিত। তাই অন্যান্য যে কোন নবীর উপর তাঁহাকে প্রাধান্য দান করায় কোনরূপ বাধা বিঘ্নের অবকাশ থাকিতে পারে না। তবে আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে, কোন নবী আলাইহেচ্ছালামের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করাকে শরীয়ত অনুমোদন করে না। উল্লিখিত ঘটনায় রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত ছাহাবীকে এই বিষয়েই সতর্ক করিয়াছিলেন যে, তোমার ভাবভঙ্গি ও ব্যবহারে মুছা আলাইহে-চ্ছালামের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাব পরিলক্ষিত হয়, ইহা নিষিদ্ধ।

সমুদয় সৃষ্ট জগতের ধ্বংস সাধনকালে ইস্রাফিল (আঃ) ফেরেস্তার সিঙ্গার প্রথম ফুঁকে অচৈতন্যতা সম্পর্কে কোরআন শরীফে এইরূপ উল্লেখ আছে—

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ

"সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে, যদ্দরুন আকাশ সমুহে অবস্থিত এবং ভুপৃষ্ঠের সকল প্রাণী অচৈতন্য হইয়া পড়িবে, অবশ্য যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইবে তাঁহারা ঐ অচৈতন্যতা হইতে রক্ষা পাইবেন।" (২৪ পাঃ ৪ রুঃ)

এই রক্ষা প্রাপ্তগণ হইলেন মহান আরশের বাহক ফেরেশতাগণ। মুছা আলাইহে-চ্ছালামও তাঁহাদের ন্যায় রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন না-কি উহার সম্ভাবনা সম্পর্কেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এখানে উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে উল্লিখিত সম্ভাবনার কারণও বর্ণিত হইয়াছে যে, মুছা (আঃ) যখন আল্লাহ তায়ালার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ কামনা করিয়াছিলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা ঐরূপ সাক্ষাতকে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া অভিহিত করতঃ মুছা (আঃ)কে নিকটবর্তী একটি পর্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত করার আদেশ করিলেন এবং সেই পর্বতের উপর আল্লাহ তায়ালার নূরের জ্যোতি ও ঝলকের কিঞ্চিৎ উদ্ভব হইলে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ পর্বত ভস্মীভূত চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া গেল এবং মুছা (আঃ) অচৈতন্য হইয়া ভুপাতিত হইয়া গেছেন। এই ঘটনার বিবরণ কোরআন শরীফের বর্ণিত আছে। (৬ পাঃ ৭ রুঃ দ্রষ্টব্য)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, উক্ত ঘটনায় মুছা (আঃ)-এর অচৈতন্য হওয়ার বিনিময়ে হয়ত আল্লাহ তাঁহাকে সিঙ্গা-ফুঁকের অচৈতন্যতা মুক্ত রাখিবেন। ঐ সময় তাঁহাকে আরশবাহী ফেরেশতা-গণের সাথেই রাখিবেন। হাদীছেও উল্লেখ রহিয়াছে, তিনি আরশের পায়া ধরিয়া আছেন।

১১৬৯। হাদীছঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বসিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় এক ইহুদী ব্যক্তি এই অভিযোগ নিয়া উপস্থিত হইল যে, আপনার এক ছাহাবী আমার মুখের উপর চপেটাঘাত করিয়াছে। নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ব্যক্তি? সে বলিল, মদীনাবাসী অমুক ছাহাবী। নবী (দঃ) সেই ছাহাবীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তাহাকে মারিয়াছ? ছাহাবী (স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, আমি বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে ছিলাম; তখন শুনিতে পাইলাম এই ইহুদী ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর (এইরূপে কসম খাইতেছে "ঐ আল্লার কসম যিনি মুছা (আঃ)কে বিশ্ব-মানবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন।" তখন আমি তাহাকে বলিলাম, হে খবীস! মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপরও কি (মুছা (আঃ)কে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে)? এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি ক্রোধে বেশামাল হইয়া তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছি। এতচ্ছ্রবণে নবী (দঃ) বলিলেন, নবীগণের মধ্যে কাউকে কাউর উপর (এই ধরণের) প্রাধান্য দিও না (যাহাতে কোন নবীর প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পরিলক্ষিত হয়)।

স্মরণ রাখিও—কেয়ামত তথা মহা প্রলয়ের সময় (সিঙ্গার প্রথম ফুঁকে সকল প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং) আত্মাসমূহ অচৈতন্য হইয়া পড়িবে। সিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁকে সকলে সচেতন হওয়াকালে সর্বাগ্রে আমিই সচেতন হইব, কিন্তু চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখিতে পাইব, মুছা (আঃ) মহান আরশের একটি থাম জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। জানি না—তিনি আমার পূর্বেই সচেতন হইয়াছেন, কিম্বা তাঁহার পূর্বেকার অচৈতন্যতাকে তখনকার অচৈতন্যতার পরিবর্তে গণ্য করিয়া লওয়ায় তখন তিনি অচৈতন্য হইবেন না।

বিচারকের নিকট অভিযুক্তের দোষ বলা

১১৭০। হাদীছ:— عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ....

অর্থ—আবছুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মোসলমানের কোন বস্তু গ্রাস করার জন্য মিথ্যা কসম খাইবে সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি ভয়ানক ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত থাকিবেন।

আশয়াছ (রাঃ) ছাহাবী এই হাদীছ-বর্ণনা শুনিয়া বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই সতর্কবাণী আমারই এক ঘটনা উপলক্ষে ছিল।

আমার এবং এক ইহুদী ব্যক্তির মালিকানায় একটি জমিন ছিল। ইহুদী ব্যক্তি পরে আমার স্বত্বের অস্বীকার করিল। আমি এই বিষয়ে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অভিযোগ পেশ করিলাম। নবী (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সাক্ষী আছে কি? তোমাকে দুই জন সাক্ষী পেশ করিতে হইবে, নতুবা অপর পক্ষকে কসম খাইতে বলা হইবে। আমি আরজ করিলাম, আমার সাক্ষী নাই। তখন তিনি ইহুদী ব্যক্তিকে স্বীয় অস্বীকারুক্তির উপর কসম খাইতে আদেশ করিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! তাহাকে এই সুযোগ দেওয়া হইলে সে নির্ভয়ে (মিথ্যা কসম খাইয়া বসিবে এবং আমার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবে। আমাদের এই ঘটনা উপলক্ষেই হযরত নবী (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খাইয়া পরের সম্পত্তি অধিকার করিবে, সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর ভয়ঙ্কর রাগান্বিত হইবেন।

হযরতের উক্তির সমর্থনে কোরআন শরীফের এই আয়াতটি নাযেল হইল—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولٰئِكَ ....

অর্থ—যাহারা আল্লার নামে মিথ্যা কসম ও অঙ্গীকার করিয়া মূল্যহীন দুনিয়ার কোন ধন-সম্পদ হাসিল করিবে পরকালে সুখ-শান্তির লেশমাত্রও তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে না। (তাহাদের প্রতি ক্রোধের দরুণ) আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাদের সঙ্গে কোন মেহেরবানীর কথাই বলিবেন না, তিনি তাহাদের প্রতি নেক দৃষ্টিও করিবেন না, তাহাদের ক্ষমাও করিবেন না। তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব রহিয়াছে। (৩ পাঃ ১৬ রুঃ)

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● মৃত্যুর পূর্বে কাহাকেও স্বীয় প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া গেলে সেই প্রতিনিধি মৃত ব্যক্তির পক্ষে দাবী-দাওয়া ইত্যাদি করিতে পারে (৩২৬ পৃঃ)। ● কোন অভিযুক্ত বা অপরাধী সম্পর্কে পলায়ন বা দুষ্কৃতির আশঙ্কা করা হইলে তাহাকে আবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা যায়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার শাগের্দ একরেমাকে কোরআন শরীফ ও শরীয়তের এলম শিক্ষা দানের জন্য পায়ে বেড়ি লাগাইয়া দিতেন। ● যাহারা কোন গোনাহের কাজে লিপ্ত হয় বা বিবাদ সৃষ্টি করে এরূপ লোককে মুরব্বি ঘর হইতে বহিষ্কার করিতে পারেন। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মৃত্যুতে তাঁহার ভগ্নি নাজায়েযরূপে বিলাপ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলে খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন (৩২৬ পৃঃ)। ইমাম বোখারীর উদ্দেশ্য এই ইঙ্গিত করা হইতে পারে যে, কোন এলাকায় কোন ব্যক্তি বা দল দ্বারা শরীয়ত বিরোধী কার্য্যের তৎপরতা সৃষ্টি হইলে বা ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হইলে শাসন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধে ঐ ব্যক্তি বা দলের প্রতি ঐ অঞ্চল হইতে দেশান্তরের আদেশ প্রবর্তন করিতে পারে। ● অভিযুক্ত অপরাধীকে আবদ্ধ করার জন্য সরকার হাজতখানা তৈরী করিতে পারে। এমনকি মক্কা শরীফ যেখানে জংলী পশু-পক্ষি পর্য্যন্ত আবদ্ধ করা জায়েয নহে, সেখানেও হাজতখানা তৈয়ার করা যায়। খলীফা ওমরের নির্দেশে মক্কা শরীফে হাজতখানার জন্য একটি বাড়ী ক্রয় করা হইয়াছিল। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তাঁহার খেলাফত কালে মক্কা শরীফে হাজতখানা বানাইয়াছিলেন (৩২৭ পৃঃ)।

স্বীয় প্রাপ্য ওয়াসিলের তাগাদা করা

১১৭১। হাদীছঃ—খাব্বাব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে আমি একজন কর্মকার ছিলাম। আমার সেই পূর্ব ব্যবসা সূত্রে আছ ইবনে ওয়ায়েল নামক এক ব্যক্তির নিকট আমার কিছু প্রাপ্য ছিল। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর আমি ঐ ব্যক্তির নিকট স্বীয় প্রাপ্যের তাগাদা করিতে উপস্থিত হইলাম। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলিল, যাবৎ আপনি মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)-এর প্রতি স্বীয় স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতঃ তাঁহার দল ও ধর্ম ত্যাগ না করিবেন আমি আপনার ঋণ পরিশোধ করিব না। আমি ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলাম, (কেয়ামত পর্য্যন্ত তথা) তুমি মৃত্যুর পর পুনঃ জীবিত হইয়া হাশরের মাঠে উপস্থিত হওয়া পর্যন্তও আমি মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর হইতে ঈমান প্রত্যাহার করিব না। এতচ্ছ্রবণে সে বলিল, আমার পুনঃ জীবিত হওয়া সত্য হইলে আপনি অপেক্ষা করুন—মৃত্যুর পর জীবিত হইয়া আমি ধন-জন লাভ করিয়া আপনার ঋণ পরিশোধ করিব। তাহার এইরূপ দম্ভ ও দুরাশাপূর্ণ উক্তির প্রতি তিরস্কারে এই আয়াত নাযেল হয়—

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا ...... وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا

অর্থ—তোমরা ঐ ব্যক্তির দুরাশা, দম্ভোক্তি ও আস্ফালনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ কি? (তাহার আশা ও উক্তি কি আশ্চর্য্যজনক!) সে আমার (কোরআনের) আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে উপরন্তু সে এই আশা ও আস্ফালন প্রকাশ করে যে, (পুনঃ জীবিত হওয়ার পর কেয়ামতের দিন) আমাকে ধন-জন দান করা হইবে। সে কি এই সব বিষয় অগ্রিম জানিয়া ফেলিয়াছে বা আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে এই বিষয়ের কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছে? (তাহার আশায় ছাই, তাহার দম্ভোক্তি ও আস্ফালন সব ভিত্তিহীন।) তাহার এই সব দম্ভোক্তি আমি লিখিয়া রাখিতেছি এবং তাহার আশার বিপরীত আমি তাহার জন্য আজাব ও শাস্তি বর্দ্ধিত করিব। (পুনর্জীবনের পর নূতন ধন-জন লাভ করা ত দূরের কথা, তাহার বর্তমান ধন-জনও তাহার থাকিবে না।) তাহার ধন-সম্পদ ত আমার (বিধি-বিধানের) আওতায় আসিয়া যাইবে এবং সে নিঃসঙ্গ একা আমার দরবারে হাজির হইতে বাধ্য হইবে। (১৬ পাঃ ৮ রুঃ)

পথে পাওয়া বস্তু সম্পর্কে

১১৭২। হাদীছঃ—উবাই ইবনে কায়া'ব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি একটি থলিয়া পাইলাম, উহাতে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা ছিল। উহার কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিলাম। নবী (দঃ) আমাকে উহার সম্পর্কে এক বৎসর পর্যন্ত ঢোল-শোহরতে প্রচার করার আদেশ করিলেন। আমি তাহা করিলাম, কিন্তু মালিকের কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। হযরত (দঃ) আমাকে পুনরায় ঐরূপ আদেশ করিলেন। আমি তাহাই করিলাম, কিন্তু প্রকৃত মালিকের কোন খোঁজ পাইলাম না। তৃতীয় বার আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিলাম। এইবার নবী (দঃ) বলিলেন, স্বর্ণ-মুদ্রাগুলির সংখ্যা ইত্যাদি সঠিকরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া রাখ এবং থলিয়াটির সমুদয় গুণাগুণ, এমনকি মুখ বাঁধিবার রজ্জুটি পর্য্যন্ত পূর্ণরূপে স্মরণ রাখ। যদি মালিক উপস্থিত হয় (অর্থাৎ কোন দাবীদার যদি প্রাপ্ত বস্তুর সঠিক বিবরণ দেয়) তবে উহা তাহাকে দিয়া দিবে। নতুবা তুমি উহা খরচ করিতে পার।

ব্যাখ্যাঃ—প্রাপ্ত বস্তুর গুরুত্ব ও মূল্যমান অনুপাতে কম বেশী সময় শোহরত করা আবশ্যক এবং শোহরত করার স্থান—হাট-বাজার, সভা-সমিতি, মসজিদের সম্মুখ ইত্যাদি জন-সমাবেশের স্থান সমূহ। মালিক সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ আবশ্যক। অবশ্য তাহার বিবরণ দৃষ্টে যদি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, সে-ই প্রকৃত মালিক তবে তাহাকে দেওয়া যাইবে। মালিকের খোঁজ না পাওয়া অবস্থায় যদি প্রাপক স্বয়ং দরিদ্র হয় তবে সে-ই মালিকের পক্ষ হইতে ছদকা স্বরূপ উহা ভোগ করিতে পারে। যদি প্রাপক দরিদ্র না

হয় তবে মালিকের পক্ষে ছদকার নিয়্যত করিয়া দরিদ্রকে দান করিবে। ধনী প্রাপক উহা নিজেও খরচ করিতে পারে, কিন্তু ধার বা কর্জরূপে এবং তাহা কাজী তথা ইসলামী আইনের জজের অনুমতি গ্রহণে হইতে হইবে (আলমগীরী, ২—৩১৬)। প্রত্যেক অবস্থাতেই ঐ বস্তু খরচ হইয়া যাওয়ার পর মালিক উপস্থিত হইলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এমনকি ছদকা করার ক্ষেত্রে মালিক ছদকায় সম্মত না হইলে মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং নিজে ছদকার ছওয়াব পাইবে।

১১৭৩। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল এবং পথে-ঘাটে প্রাপ্ত বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। নবী (দঃ) বলিলেন, বৎসরকাল উহার ঢোল-শোহরত কর, অতঃপর উহার সমুদয় নিদর্শন ভালরূপে স্মরণ রাখ। যদি দাবীদার উপস্থিত হয় (এবং তাহার দাবী প্রমাণিত হয়) তবে তাহাকে উহা প্রদান করিবে। নতুবা তুমি স্বয়ং উহা ভোগ করিতে পারিবে।

ঐ ব্যক্তি হারানো ছাগল-বকরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, উহাকে তুমি রক্ষা করিবে বা অন্য কেহ রক্ষা করিবে, নতুবা বাঘের খোরাক হইবে। (অর্থাৎ উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা তোমার কর্তব্য। কারণ উহা ছোট জানোয়ার, উহার হেফাজত না করিলে ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা আছে।)

অতঃপর ঐ ব্যক্তি হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন, এমনকি তাঁহার মুখ মণ্ডলের উপর অসন্তুষ্টির নিদর্শন ফুটিয়া উঠিল। নবী (দঃ) বলিলেন, তোমার সহিত উটের (ন্যায় এত বড় হারানো জন্তুর) সম্পর্ক কি? (সে তোমার প্রত্যাশী নহে;) সে নিরাপদে হাটিয়া বেড়াইতে সক্ষম এবং সে নিজেই পানি পান করিতে, এমনকি কতেক দিনের পানি স্বীয় অভ্যন্তরে রক্ষিত রাখিতে ও গাছের লতা-পাতা খাইয়া বেড়াইতে সক্ষম। তুমি উহাকে আবদ্ধ না রাখিলে সে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিবে এবং তাহার মালিক সহজেই উহার খোঁজ পাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সোনালী যুগের পরে গরু-ঘোড়া, উট, ইত্যাদি বড় জানোয়ারের ব্যাপারেও দুষ্কৃতিকারী মানুষের দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা বিদ্যমান থাকায় ইমাম আবু হানীফার মজহাবে মালিকের নিখোঁজ বড় জানোয়ারকেও হেফাজত করার আদেশ করা হইয়াছে।

১১৭৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) এর বর্ণনা, একদা নবী (দঃ) পথ চলাকালীন মাটিতে পতিত একটি খুরমা দেখিতে পাইয়া বলিলেন, যদি এই খুরমাটি ছদকা-খয়রাতের মাল হওয়ার আশঙ্কা না থাকিত তবে আমি নিজেই উহা খাইতাম।

১১৭৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন সময় আমি বাড়ী আসিয়া বিছানায় এক দুইটি খুরমা পতিত দেখি। আমি উহা খাইবার ইচ্ছায় উঠাইয়া লই, কিন্তু পরে উহা ছদকার বস্তু বলিয়া আশঙ্কা হয়, তাই উহা রাখিয়া দেই।

ব্যাখ্যা ঃ—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য নফল ছদকা-খয়রাতের বস্তু খাওয়াও হারাম ছিল। তাই নবী (দঃ) অধিক সতর্কতা অবলম্বত করিতেন। অন্য লোক ধনী হইলেও তাহার জন্য নফল দান-খয়রাতের বস্তু হারাম নহে, তাই সকলের জন্য এই সতর্কতা প্রয়োজনীয় নহে।

প্রতিটি বস্তু উহা যত ছোটই হউক না কেন আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত হিসাবে অতি বড় এবং আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের কদর করা আশু কর্তব্য। যে কোন নেয়ামতের বে-কদরী করা দুর্ভাগ্যের কারণ। কোন বস্তু নষ্ট হওয়ার উপক্রম অবস্থায় দেখিলে যাহাতে উহার অপচয় না হয় সেই ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

উল্লিখিত হাদীছ দুইটি দ্বারা বোখারী (রঃ) এই মছআলাহ ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন যে, পথে ঘাটে এক দুইটি খেজুর ইত্যাদি অতি সামান্য বস্তু পতিতাবস্থায় পাওয়া গেলে উহা কি করা হইবে? বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ ফতহুল-বারী কিতাবে উল্লেখ আছে যে, ঐরূপ সামান্য বস্তু পথে-ঘাটে পাওয়া গেলে অপচয় হইতে রক্ষা করার জন্য উহা উঠাইয়া লইবে; স্বয়ং উহা খাইতেও পারিবে। অতঃপর নিম্নে বর্ণিত হাদীছখানাও উল্লেখ করিয়াছেন।

হাদীছ শরীফে আছে—নবী পত্নী মাইমুনা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা একদা একটি খেজুর পতিতাবস্থায় দেখিতে পাইয়া উহা উঠাইয়া খাইলেন এবং বলিলেন, কোন বস্তুর অপচয়কে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না।

মছআলাহ ঃ—পথে ঘাটে যদি এরূপ সামান্য বস্তু পাওয়া যায় যাহার প্রতি সাধারণতঃ মালিকের অপেক্ষা ও দাবী থাকে না—এইরূপ বস্তু পাইলে উহার ঢোল-শোহরত করার প্রয়োজন নাই এবং প্রাপক নিজেই উহা ব্যবহার করিতে পারে (হেদায়াহ, ফতহুল-কাদীর)।

মছআলাহ ঃ—নদী-খালে খড়ি ইত্যাদি নগণ্য মূল্যের কাষ্ঠ শ্রেণীর বস্তু পাওয়া গেলে তাহা প্রত্যেক প্রাপকের জন্যই হালাল গণ্য হইবে, সে উহা বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করিতে পারিবে। আর যদি উহা এরূপ মূল্যের হয় যাহার প্রতি মালিকের অপেক্ষা ও দাবী থাকিতে পারে তবে পথে পাওয়া মূল্যমানের বস্তুর মছআলাহভুক্ত হইবে (শামী, ৩—৪৪৬)। অবশ্য যদি উহা মালিকবিহীন হওয়া সাব্যস্ত হয়—যেমন, প্রবল বন্যায় ভাসমান পাহাড়ী অঞ্চল বা বন-জঙ্গলের বস্তু বলিয়া সাব্যস্ত হয় তবে অধিক মূল্যমানের হইলেও প্রত্যেক প্রাপকই উহা ব্যবহার করিতে পারিবে (আলমগীরী ২—৩১৫)।

মছআলাহ্ঃ—যে স্থানে সাময়িক জনসমাবেশ হয় এবং দুর দুরান্ত হইতে লোকের সমাগম হয়—যেমন, মক্কা শরীফে হজ্জের মৌসুম বা কোন মেলা ইত্যাদি এইরূপ স্থানেও যদি সমাবেশ সমাপ্তির পর কোন বস্তু পাওয়া যায় উহারও পূর্ণ ঢোল-শোহরত এবং প্রচার অবশ্যই করিতে হইবে (৩২৯)।

মছআলাহ্ঃ—পূর্ণ ঢোল-শোহরত করার পর দীর্ঘ দিন এমনকি বৎসরেরও অধিককাল পর মালিক উপস্থিত হইলে (মূল্যবান) পাওয়া বস্তু তাহাকে প্রত্যার্পণ করিতে হইবে; ব্যয় করা হইয়া থাকিলে ক্ষতিপূরণ দান করিতে হইবে। (৩২৯ পৃঃ)

মছআলাহ্ঃ—পাওয়া বস্তু সম্পর্কে যদি দৃঢ় আশঙ্কা হয় যে, উহার হেফাজত না করা হইলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে বা আত্মসাতকারীর হাতে পড়িবে সে ক্ষেত্রে উহার হেফাজত করা ফরজ হইবে (৩২৯ পৃঃ, আলমগীরী, ২—৩১৪)।

অনুমতি ব্যতিরেকে অপরের পশুর দুগ্ধ দোহাইবে না।

১১৭৬। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এরূপ নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন যে, অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ কাহারও পশুর দুগ্ধ দোহাইয়া আনিবে না। হযরত (দঃ) (এই নিষেধাজ্ঞার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ ইহা ভালবাসিতে পারে কি যে—অন্য কেহ তোমার গৃহে রক্ষিত গোলাজাত ধান-চাউল খাদ্যবস্তু গোলা ভাঙ্গিয়া হরফ করিয়া নেয়? (তাহা কখনও নহে) তদ্রূপ মানুষের পশুসমূহের স্তন তাহাদের দুগ্ধ-ভাণ্ডার স্বরূপ। তাই তাহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে উহা হইতে দুগ্ধ বাহির করিয়া আনিলে না।

মছআলাহ্ঃ—যদি কোন দেশে এরূপ মহানুভবতা প্রচলিত থাকে যে, তাহাদের পশু-পাল হইতে পথিকের জন্য প্রয়োজনে দুধ দোহাইবার অনুমতি আছে—সে ক্ষেত্রে পথিক সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে (৩২৯ পৃঃ)।

অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের পরিণতি

সর্বাধিক বড় অন্যায় ও অবিচার হইল স্বীয় প্রভু সৃষ্টিকর্তা বা তাঁহার প্রতিনিধি রসুল ও তাঁহার বাণী ও আহ্বানকে অবজ্ঞা করা। তাই উহার পরিণতিও ভয়াবহ।

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۔ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ

فِيْهِ الْاَبْصَارُ ...... وَلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۔

অর্থ—তোমরা কখনও এই ধারণা করিও না যে, আল্লাহ তায়ালা পাপিষ্ঠ অন্যায়কারীদের কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। (তিনি তাহাদের সমুদয় কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া

থাকেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি বিধান না করিয়া) তাহাদের পুর্ণ শাস্তি একমাত্র ঐ দিন পর্য্যন্ত মুলতবী রাখিয়া থাকেন যেই দিন (ভয়ঙ্কর অবস্থা দৃষ্টে) সকলের চক্ষু উলটিয়া যাইবে। সকলেই (আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া) মাথা উঁচু করিয়া তাকাইয়া থাকিবে ; কেহই চোখের পাতা মারিবে না এবং সকলেই ভীত, নিরাশ এবং হুঁশ-হারা হইবে। (হে আমার রসুল !) আপনি বিশ্ববাসীকে ভীষণ আজাব হইতে সতর্ক করিয়া দিন। যেই দিন ঐ আজাব উপস্থিত হইবে সেই দিন পাপিষ্ঠ অন্যায়কারীরা এই বলিয়া আর্তনাদ করিবে, হে পরওয়ারদেগার ! আমাদিগকে পুনঃ কিছু সময়ের সুযোগ দান করুন ; এইবার আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং আপনার প্রেরিত রসুলগণের অনুসারী হইব।

(আল্লাহ তায়ালা তিরস্কার পুর্বক তাহাদিগকে বলিবেন,) তোমরা শপথ করিয়া বলিয়া থাকিতে নয় কি যে, তোমাদের ইহজগৎ ত্যাগ করিতে হইবে না ? অথচ তোমরা পুর্ববর্তী পাপিষ্ঠ অন্যায়কারীদের পরিত্যক্ত জগতে বসবাস করিয়াছ এবং ইহাও ভালরূপে জ্ঞাত ছিলে যে, আমি সেই সব অন্যায়কারীদের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলাম। তোমাদের সম্মুখে দৃষ্টান্তকারে সেই সব পাপিষ্ঠদের বহু ঘটনার উল্লেখও করা হইয়াছিল। সেই সব পাপিষ্ঠ অন্যায়কারীরা (আল্লার দিনের বিরুদ্ধে) কত রকমের ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি করিয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাদের দুরভিসন্ধিগুলি পাহাড় পর্বত নিশ্চিহ্নকারী তুল্য ছিল, (কিন্তু তাহাদের সে সব দুরভিসন্ধি আল্লাহ তায়ালার অজ্ঞাত ছিল না ; তিনি ঐ সবকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া ছিলেন।) তোমরা ভাবিও না, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলগণকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন না, (নিশ্চয় তিনি অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন।) আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

সকলে ঐ দিনকে স্মরণ কর, যেই দিন এই আসমান-জমিন ধ্বংস হইয়া উহার স্থলে ভিন্ন আসমান-জমিন সৃষ্টি হইবে এবং সকলেই হিসাব-নিকাশের জন্য পরাক্রমশালী এক আল্লার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। সেই দিন পাপিষ্ঠ অপরাধীদের পা লৌহ বন্ধনীতে আবদ্ধ দেখিতে পাইবে। আলকাতরার ন্যায় পেট্রোল জাতীয় বস্তু দ্বারা তাহাদের সর্ব শরীর আবৃত করা হইবে এবং তাহারা আপাদমস্তক জাহান্নামের অগ্নিতে বেষ্টিত হইবে। সেই দিনের অনুষ্ঠান এই উদ্দেশ্যেই হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককে তাহার কর্মফল দান করিবেন। আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক হিসাব নিকাশ সম্পন্ন করিতে বিলম্ব হইবে না।

বিশ্ববাসীর প্রতি আমার এই ঘোষণা—তাহাদিগকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং তাহারা যেন মনে-প্রাণে দৃঢ়তার সহিত বুঝিয়া ও গ্রহণ করিয়া নেয় যে, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাই মাবুদ ও উপাস্য এবং বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানব যেন এই সতর্কবাণীকে উপদেশরূপে গ্রহণ করিয়া নেয়। (১৩ পাঃ ১৯ রুঃ)

বেহেশত লাভকারীদের পরস্পর অন্যায়-অবিচার সমূহের কর্তন ও পরিশোধের ব্যবস্থা করা হইবে

১১৭৭। হাদিছ ঃ—আবু সায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মোমেনগণ দোযখের (উপরস্থ পুল-ছেরাত অতিক্রম করিয়া) শেষ প্রান্তে পৌছিলে পর অবতরণের পুর্বে তাহাদিগকে অপেক্ষমান রাখা হইবে। জাগতিক জীবনে তাঁহাদের পরস্পরের অন্যায়-অবিচারগুলি কর্তন ও পরিশোধের ব্যবস্থা করা হইবে। পরস্পর কর্তনের দ্বারা যখন প্রত্যেকেই পরিছন্ন হইয়া যাইবে তখন তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন, আমি ঐ আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহার হস্তে মোহাম্মদের প্রাণ—মোমেনগণের প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিকট বেহেশতস্থিত স্বীয় বাড়ী-ঘর জাগতিক বাড়ী-ঘর অপেক্ষা অধিক পরিচিত হইবে।

মোসলমান পরস্পর জুলুম ও অত্যাচার করিতে পারে না

১১৭৮। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। এক মোসলমান অন্য মোসলমানের উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে পারে না, সে তাহাকে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত ও অত্যাচারিত অবস্থায় রক্ষা করার চেষ্টা না করিয়া পারে না। যে ব্যক্তি স্বীয় মোসলমান ভ্রাতার প্রয়োজন মিটানোর চেষ্টায় রত হয় আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রয়োজন মিটাইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি মোসলমানের সম্মানহানিকর বিষয়বস্তু গোপন রাখিয়া তাহার সম্মান রক্ষা করে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার সম্মান রক্ষা করিবেন।

মোসলমান ভ্রাতার সাহায্য করা

১১৭৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বীয় মোসলমান ভ্রাতার সাহায্য কর—সে অত্যাচারী হউক বা অত্যাচারিত হউক। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! তাহাকে অত্যাচারিত

হওয়া অবস্থায় ত সাহায্য করিব, কিন্তু অত্যাচারী হওয়া অবস্থায় কিরূপে সাহায্য করিব? নবী(দঃ) বলিলেন, অত্যাচার করা হইতে বিরত রাখা এবং বাধা দেওয়াই তাহাকে সাহায্য করা।

১১৮০। **হাদীছ :**—আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মোমেনগণের পরস্পর সম্পর্ক এইরূপ হওয়া চাই যেরূপ একটি দেয়ালের ইটসমূহ; তাহারা একে অন্যের দ্বারা শক্তিশালী হইবে। অতঃপর নবী (দঃ) এক হাতের অঙ্গুলিসমূহ অপর হাতের অঙ্গুলির ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখাইলেন, (মোসলমানগণ এইরূপে একতার সহিত একে অন্যের বলবর্দ্ধক হইয়া থাকিবে।)

অত্যাচারী হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন— لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ

অর্থাৎ খারাব বিষয় (এমনকি কাহারও কোন দোষের কথা যদিও উহা বাস্তব সত্য হয়) প্রকাশ করাতে আল্লাহ তায়ালা নারাজ ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, অবশ্য যদি কেহ কাহারও দ্বারা অত্যাচারিত হয়—(এমতাবস্থায় অত্যাচারীর অত্যাচারকে প্রকাশ করার অনুমতি আছে।)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ -

অর্থাৎ—মোসলমানদের স্বভাব এই যে, তাহারা নিস্পেষিত ও পদদলিত হওয়া অবস্থায় বসিয়া থাকে না; অত্যাচারীকে তাহারা সমুচিত জবাব দিয়া থাকে।

ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন, মোসলমানগণ অপমান অবলম্বন পূর্বক বসিয়া থাকে না; হাঁ—ক্ষমতা, শক্তি ও সামর্থ্যের ক্ষেত্রে ক্ষমাকারী ও বিনয়ী হয়।

অত্যাচারিত হইয়াও ক্ষমা করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا

অর্থাৎ তোমরা যে কোন নেক্‌কাজ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কর (আল্লাহ তায়ালা উহার প্রতিফল দান করিবেন।) কিম্বা (প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে) কাহারও কোন ত্রুটি, অন্যায়, অত্যাচার ও অপরাধ ক্ষমা কর (উহারও প্রতিদান তোমরা পাইবে। ক্ষমা করা কর্তব্য, কারণ) আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান হইয়াও ক্ষমাকারী।

এক হাদীছে আছে—এক ব্যক্তি তাহার ক্রীতদাসকে মারিতেছিল, পেছন হইতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, الله اقدر عليك منك عليه। স্মরণ রাখিও—ক্রীতদাসের উপর তোমার ক্ষমতা অপেক্ষা তোমার উপর আল্লার ক্ষমতা অধিক।

এক হাদীছে আছে-- ارْحَمُوا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ

"আল্লার বান্দাদের প্রতি তুমি দয়ালু হও; আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রতি দয়াল হইবেন।"

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন--

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ـ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللهِ ......

অর্থ—অন্যায়ের প্রতিশোধ সমপরিমাণ গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রদর্শন করিবে এবং তিক্ততা পরিত্যাগ করতঃ উত্তম সম্পর্ক সৃষ্টি করিবে তাহার এই কার্য্যের প্রতিদান ও প্রতিফল আল্লাহ তায়ালার নিকট সে অনিবার্য্যতঃ লাভ করিবে। আল্লাহ তায়ালা অন্যায়কারী অত্যাচারীর প্রতি সন্তুষ্ট নহেন। যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হইয়া (সমপরিমাণ) প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহার উপর অভিযোগ প্রবর্তিত হইবে না। অভিযুক্ত অপরাধী সাব্যস্ত হইবে ঐরূপ ব্যক্তিরা যাহারা মানুষের প্রতি অত্যাচার করে এবং জগতের বুকে সীমা অতিক্রম করিয়া বেড়ায়—যাহা করিবার অধিকার তাহার মোটেও নাই; এরূপ ব্যক্তিদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ধৈর্য্যধারণ করিবে এবং অপরের ত্রুটি, অপরাধ মার্জনা ও ক্ষমা করিবে বস্তুতঃ তাহার এই কার্য্য বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ পরিগণিত হইবে। (৫ পাঃ ৫ রুঃ)

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে—হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি অত্যাচারিত হইয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সম্মানিত করিবেন ও সাহায্য দান করিবেন। (ফতহুল-বারী)

অত্যাচারের বিষময় ফল

১১৮১। হাদীছ:— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

অর্থ--আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, (তোমরা জুলুম অত্যাচার হইতে সংযমী হও;) জুলুম-অত্যাচার কেয়ামতের দিন অত্যাচারী ব্যক্তিকে নানা রকম (কঠিন বিপদের) অন্ধকারে পতিত করিবে।

মজলুমের বদ-দোয়াকে ভয় করা

১১৮২। হাদীছ:—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোয়াজ (রাঃ)কে ইয়ামান দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন যে, মজলুমের বদ-দোয়া ও অভিশাপকে ভয় ও পরিহার করিয়া চলিবে। (অর্থাৎ কাহারও প্রতি জুলুম করিবে না; কাহারও প্রতি জুলুম করিলে নিশ্চয় সে বদ-দোয়া ও অভিশাপ করিবে।) মজলুমের বদ-দোয়া সরাসরি আল্লার দরবারে পৌছিয়া থাকে। কোন কিছুই উহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না।

অন্যের হক মাফ করাইয়া লওয়া

১১৮৩। **হাদীছ :**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির উপর তাহার অন্য মোসলমান ভাইয়ের মানহানি বা অন্য কোন বস্তু সম্পর্কীয় হক থাকে তাহার কর্তব্য হইবে—ইহজীবনেই উহা হইতে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করা। তাহার সম্মুখে এমন এক দিন আসিবে যেই দিন কাহারও নিকট কোন প্রকার ধন-দৌলত থাকিবে না। যদি তাহার নিকট নেক আমল থাকে তবে ঐ হক অনুপাতে তাহার নেক আমল ছিনাইয়া লওয়া হইবে। আর যদি তাহার নিকট নেক আমল না থাকে তবে হকদারের গোনাহের বোঝা তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে।

ব্যাখ্যা :—মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) প্রকৃত গরীব ও দরিদ্রের ব্যাখ্যা দান করতঃ বলিয়াছেন—আমার উম্মতগণের মধ্যে প্রকৃত গরীব ও দরিদ্র ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাৎ ইত্যাদির নানারকম এবাদত-বন্দেগী লইয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু সে স্বয়ং উহার ফলাফল ভোগ করার সুযোগ মোটেই পাইবে না। বিভিন্ন ব্যক্তি তাহার এবাদৎ ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। কাহাকেও সে গালি গালাজ করিয়াছিল, কাহাকেও অন্যায়রূপে খুন করিয়াছিল, কাহারও ধন-সম্পদ সে আত্মসাৎ করিয়াছিল; এইসব লোক কেয়ামতের দিন নিজ নিজ হকের ক্ষতিপূরণ ওয়াসিল করিতে উপস্থিত হইবে, তখন তাহার নেক আমলসমূহ হইতে তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দান করা হইবে। যদি সকলের ক্ষতিপূরণ পরিশোধের পূর্বেই তাহার নেক আমল সমূহ নিঃশেষ হইয়া যায় তবে অতঃপর হকদারগণের গোনাহের বোঝা তাহার উপর চাপান হইবে। এইরূপে সে সমুদয় নেক আমল হারাইয়া রিক্তহস্তে গোনাহের বোঝা লইয়া জাহান্নামে পতিত হইবে।

মছআলাহ :—কাহারও উপর অন্যের গীবৎ-শেকায়েত বা নিন্দা ও অপবাদ সম্পর্কীয় হক থাকিলে তাহা মাফ করাইবার জন্য হকদারের নিকট অবপাদের বিবরণ দানে ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যক নহে; বিবরণ ব্যতিরেকে অনির্দিষ্টরূপে সাধারণভাবে ক্ষমা করানো যথেষ্ট হইবে।

মছআলাহ :—এক ব্যক্তির উপর অপর ব্যক্তির ধন-সম্পদের হক তথা প্রাপ্য আছে। প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল, আমার উপর আপনার যত রকম হক বা প্রাপ্য তাহা আমাকে মাফ করিয়া দেন—ছাড়িয়া দেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, আপনার উপর আমার যত হক বা প্রাপ্য আছে সব আমি ছাড়িয়া দিলাম। দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তাঁহার প্রাপ্য ধন-সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞাত ও সচেতন থাকিয়া এরূপ বলিয়া থাকে তবে সর্বসম্মতরূপে দুনিয়া-আখেরাতে প্রথম ব্যক্তি উক্ত হক হইতে রেহায়ী পাইয়া যাইবে। আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি উহা সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকে, তবে শুধু দুনিয়ার বিচারে প্রথম ব্যক্তি রেহায়ী পাইবে, আখেরাতের রেহায়ী সম্পর্কে মতভেদ আছে।

ইমাম আবু ইউসুফের মতে সে আখেরাতেও রেহায়ী পাইবে—এই মতের উপরই ফতওয়া: কিন্তু ইমাম মোহাম্মদের মতে আখেরাতে রেহায়ী পাইবে না। (আলমগীরী ৪—৩৮৬, কাজীখান)

মছআলাহ:—এক ব্যক্তির উপর অপর ব্যক্তির ধন দৌলতের হক বা প্রাপ্য রহিয়াছে দ্বিতীয় ব্যক্তি সে সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আছে, কিন্তু পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জ্ঞাত নহে। এমতাবস্থায় প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিয়াছে, আমার নিকট আপনার যাহাই প্রাপ্য রহিয়াছে উহা হইতে আমাকে আপনি রেহায়ী দান করুন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিয়াছে, দুনিয়া আখেরাতে তোমাকে রেহায়ী দিয়া দিলাম। এ ক্ষেত্রে দুনিয়ার বিচারে সে সম্পূর্ণ ঋণ হইতেই মুক্তি পাইবে, কিন্তু আখেরাতে শুধু ঐ পরিমাণ ঋণ হইতে সে মুক্তি পাইবে যে পরিমাণ রেহায়ীদাতার ধারণায় প্রাপ্য ছিল; প্রকৃত প্রস্তাবে যদি তাহার ধারণা অপেক্ষা প্রাপ্যের পরিমাণ অনেক বেশী হয় তবে উহা প্রকাশ করতঃ মুক্তি লাভ না করিলে ঐ বেশী পরিমাণ হইতে রেহায়ী লাভ হইবে না (আলমগীরী ৪—৩৮)।

মছআলাহ:—এক ব্যক্তির কোন বস্তু জবরদস্তি মুলক বা গোপন ভাবে অন্যে হস্তগত করিয়াছে; অতঃপর ঐ মালিক ব্যক্তি তাহার সমুদয় হক বা প্রাপ্য হইতে কিম্বা বিশেষ ভাবে ঐ বস্তু হইতেই হস্তগতকারীকে রেহায়ী দান করিয়াছে—এক্ষেত্রে যদি ঐ বস্তু পূর্বেই ব্যয় বা বিনষ্ট হইয়া গিয়া থাকে তবে উহার ক্ষতিপূরণ দান হইতে সে মুক্তি পাইবে। যদি ঐ বস্তু এখনও বিদ্যমান থাকে তবে উহা মালিককে ফেরত দিতে হইবে; ফেতর না দেওয়া পর্য্যন্ত উহা তাহার হাতে আমানত পরিগণিত হইবে (আলমগীরী ৪—২৮৭)। অবশ্য যদি বিদ্যমান আছে জানিয়াও মালিক দাবী ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

মছআলাহ:—যে কোন শ্রেণীর পাওনাদার তাহার প্রাপ্য হইতে ঋণী ব্যক্তিকে মুক্তিদান করিলে সেই মুক্তিদান নাকচ করার ক্ষমতা তাহার থাকে না; সে আর এই প্রাপ্যের দাবী করিতে পারিবে না (৩৩১ পৃঃ এবং কাজীখান)।

● কেহ তাহার নিজের জিনিষ অপরকে ভোগ করিতে দিল বা উহা তাহার জন্য হালাল বলিয়া দিল, কিন্তু কোন বিবরণ উল্লেখ করিল না—এরূপ ক্ষেত্রে উপস্থিত কথাবার্তা ও আলোচনা ইত্যাদি দৃষ্টে কোন বিবরণ ও পরিমাণ উদ্দেশ্য বলিয়া সাব্যস্ত হইলে তাহাই গৃহিত হইবে। ঐরূপ কোন কিছু সাব্যস্ত করার সূত্র বিদ্যমান না থাকিলে সচরাচর এরূপ ক্ষেত্রে যাহা উদ্দেশ্য হয় তাহাই গৃহিত হইবে। ফেকার কেতাব হইতে এরূপ কতিপয় নজির—

মছআলাহ:—এক ব্যক্তি বলিল, আমার মাল তোমার জন্য হালাল। এই ক্ষেত্রে শুধু টাকা-পয়সার ব্যাপারে অনুমতি হইবে; অন্য বিষয়-সম্পদ—যেমন, ফল-ফসল ও পশুপাল ইত্যাদির জন্য অনুমতি হইবে না (ফতওয়া বজ্জাযিয়া)।

মছআলাহ্ঃ—এক ব্যক্তি বলিল, তোমার জন্য আমার মাল হইতে খাওয়া, নেওয়া এবং দান করা হালাল করিয়া দিলাম এই ক্ষেত্রে তাহার নিজে খাওয়াত সর্বসম্মতরূপে হালাল ; আর নেওয়া ও দান করার অনুমতি সম্পর্কে দ্বিমত রহিয়াছে—ফতওয়া বজ্জাযিয়ায় ইহা এবং কাজীখানে না রহিয়াছে।

মছআলাহ্ঃ—এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে অনুমতি দিল, তুমি আমার বাগানে যাইয়া আঙ্গুর নিতে পার। এক্ষেত্রে অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার পেট ভরা পরিমাণ নিতে পারিবে ; (কাজীখান)

জায়গা-জমি অন্যায়রূপে দখল করা

১১৮৪। হাদীছঃ—ছায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি (অন্যের) ভূমির কিছু অংশও অন্যায় রূপে গ্রাস করিবে (কেয়ামতের দিন) সাত তবক জমি হইতে সেই পরিমাণ জমিন তাহার গলায় ফাঁদরূপে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

ব্যাখ্যাঃ—অন্যান্য হাদীছে আছে, পরকালে শাস্তিভোগী ব্যক্তিদেরকে বিরাট আকারে গঠিত করা হইবে ; তাহাদের এক একটি দাঁত পর্বত সমতুল্য হইবে।

১১৮৫। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়রূপে কাহারও জায়গা-জমিনের কোন অংশ দখল করিবে সে কেয়ামতের দিন সাত তবক জমিনের নীচ পর্য্যন্ত ধ্বসিত হওয়ার শাস্তি ভোগ করিবে।

অনুমতি লইয়া অন্যের হক ভোগ করা

১১৮৬। হাদীছঃ—জাবালা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময়ে আমরা ইরাকবাসী কয়েকজন লোক মদীনা শরীফে অবস্থানরত ছিলাম। তখন তথায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) আমাদের জন্য সরকারী সাহায্য ভাণ্ডার হইতে খুরমা প্রদান করিয়া থাকিতেন।

তদাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবী যখনই আমাদের নিকটবর্তী যাতায়াত করিতেন তখনই আমাদের নিকট এই হাদীছখানা বর্ণনা করিতেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন, দুই ব্যক্তি একত্রে খুরমা (ইত্যাদি) খাইতে বসিলে একজন একত্রে দুই দুইটি খুরমার গ্রাস লইবে না। হাঁ—যদি অপর ব্যক্তি হইতে অনুমতি লয় তবে ঐরূপ করিতে পারিবে।

১১৮৭। হাদীছঃ—আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসী এক ছাহাবীর একটি ক্রীতদাস ছিল ; সে খানা পাকাইতে খুব পটু ছিল। একদা তাহার মনিব তাহাকে বলিলেন, তুমি পাঁচজন লোকের উপযোগী খানা তৈয়ার কর। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অন্য চার জন সঙ্গী সহ দাওয়াত করিতে চাই ; আমি তাঁহার ক্ষুধার্ত

রূপ অনুধাবন করিয়াছি। অতঃপর ঐ ছাহাবী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তাঁহার সঙ্গে আরও চারজন সঙ্গী সহ দাওয়াত করিলেন। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত একজন তাঁহাদের সঙ্গী হইল--যাহার দাওয়াত ছিল না। নবী (দঃ) দাওয়াতকারীকে বলিলেন, এই ব্যক্তি অতিরিক্ত আমাদের সঙ্গে আসিয়াছে, তাহার জন্য দাওয়াতে শরীক হওয়ার অনুমতি আছে কি? ঐ ছাহাবী বলিলেন, হাঁ—অনুমতি আছে।

ঝগড়া-বিবাদকারী ব্যক্তির পরিণতি

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে মোনাফেকদের নিদর্শন উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা অধিক ঝগড়া-বিবাদকারী হইয়া থাকে।

১১৮৮। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ঐ ব্যক্তি যে অধিক ঝগড়া-বিবাদকারী হয়।

মিথ্যা মোকদ্দমা করার পরিণতি

১১৮৯। হাদীছঃ—উম্মে-ছালমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় গৃহ-দ্বারের নিকট বাদী-বিবাদীর তর্ক-বিতর্কের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাহাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসার জন্য) হযরত (দঃ) গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া তাহাদের উভয়কে বলিলেন, স্মরণ রাখিও—আমি একজন মানুষ (আমি আল্লাহ তায়ালার ন্যায় অন্তর্যামী বা সর্বজ্ঞ নহি)। বাদী-বিবাদীর নালিশ আমার নিকট উপস্থিত করা হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কোন এক পক্ষ (তাহার দাবী মিথ্যা হওয়া সত্বেও সে) বাগ্মী এবং বাক-পটু হওয়ার দরুণ হয় ত আমি তাহার পক্ষেই রায় দান করিতে পারি।

তোমরা জানিয়া রাখিও, আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমি যদি ঐরূপে কাহাকেও অপরের কোন হক ও স্বত্ব প্রদান করি তবে তাহাকে বুঝিতে হইবে—আমি যেন তাহাকে জাহান্নামের অগ্নিখণ্ড প্রদান করিলাম। এই বিষয় উপলব্ধি করিয়া সে ঐ জাহান্নামের অগ্নিখণ্ড গ্রহণ করিবে বা পরিত্যাগ করিবে।

অন্যায়রূপে আত্মসাৎকারীর ধন হইতে স্বীয় হক ওয়াসিল করার সুযোগ পাইলে?

১১৯০। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আবু সুফিয়ান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্ত্রী হেন্দা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরম্ভ করিলেন, আমি সন্দেহাতীত রূপে বলিতেছি, আমার স্বামী আবু সুফিয়ান কৃপণ স্বভাবের লোক। তিনি উদারতার সহিত পরিবারবর্গের প্রতি খরচ করেন না। এমতাবস্থায় তাঁহার অজ্ঞাতে আমি তাঁহার ধন হইতে ছেলে-মেয়েদের জন্য ব্যয় করিলে তাহাতে আমার গোনাহ হইবে কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজন পরিমাণ খরচ করিলে তাহাতে তোমার গোনাহ হইবে না।

১১৯১। হাদীছ ঃ—ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই অভিযোগ জানাইলাম যে, আপনি আমাদিগকে দুর দেশে পাঠাইয়া থাকেন, আমরা পরদেশে নিরাশ্রয়রূপে স্থানীয় লোকদের অতিথি স্বরূপ তাহাদের নিকট উপস্থিত হই, কিন্তু তাহারা এমতাবস্থায় আতিথেয়তার কর্তব্য পালন করে না। রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এমতাবস্থায় স্থানীয় লোকগণ তোমাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করিলে তোমরা তুষ্ট থাক, যদি তাহারা তোমাদের সহায়তা করিতে অস্বীকৃত হয় তবে তাহাদের নিকট হইতে আতিথেয়তার হক আদায় করিতে পার।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লিখিত ব্যবস্থা এই সুত্রে প্রবর্তিত হইত যে কোন দেশ বা কোন জাতির সঙ্গে চুক্তি বা সন্ধি করাকালীন এইরূপ শর্ত আরোপ করা হইয়া থাকিত যে, মোসলমান মোজাহেদগণকে প্রয়োজন ক্ষেত্রে সহায়তা করিতে হইবে। তাই ইহা একটি আইনগত ও ন্যায় সঙ্গত প্রাপ্য হক ছিল। প্রয়োজন স্থলে উহা প্রদানে সকলকে প্রস্তুত রাখার উদ্দেশ্যে হুমকি স্বরূপ এই অনুমতি প্রচার করা হইয়াছিল যে, ঐ আইনগত প্রাপ্য প্রদানে গড়িমসি করা হইলে তাহা বাধ্যতামুলক উসুল করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

উল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত ব্যবস্থা প্রয়োগের আরও একটি স্থান আছে—কোন ব্যক্তি পরদেশে এরূপ নিঃসহায় ও নিরুপায় হইয়া পড়ে যে, স্থানীয় লোকদের সহায়তা ব্যতিরেকে উপস্থিত তাহার জীবন বাঁচান অসম্ভব হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ পার্বত্য এলাকার কঠিন পথে বিচ্ছিন্ন বস্তি সমুহে যাতায়াতে এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়।

এতদ্ভিন্ন ইসলামের দৃষ্টিতে আতিথেয়তা বিশেষ জরুরী কার্য্য, এমনকি কোন কোন আলেম উহাকে ওয়াজেব বলিয়াছেন। অন্যান্য ইমামগণের মতে সাধারণতঃ উহা ওয়াজেব না হইলেও উহা বিশেষ একটি ছুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ। তাই উহার প্রতি বিশেষ তাকিদ প্রয়োগ উদ্দেশ্যে এইরূপ বলা হইয়াছে।

এক হাদীছে বর্ণিত আছে রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তাহার কর্তব্য হইবে অতিথির সেবা করা।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তির গৃহে তাহার অতিথি অনাহারে রাত্রি যাপন করিলে অন্য মোসলমানগণের কর্তব্য হইবে ঐ ব্যক্তির ধন-সম্পদ হইতে অতিথির হক ওয়াসিল করিয়া দেওয়া।

অবশ্য কতিপয় হাদীছ দ্বারা ইহাও প্রমাণিত আছে যে, অতিথির হক—শুধু মাত্র এক দিন এক রাত্র বিশেষরূপে তাহার সেবা করা। আর অতিরিক্ত দুই দিন সাধারণ রূপে আহার যোগান। অতঃপর আতিথেয়তা থাকিবে না, বরং দান-খয়রাত ও ছদকা প্রদান স্বরূপ গণ্য হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য পরিচ্ছেদের মছআলাহ সম্পর্কে হানাফী মজহাব মতে (বিশেষ সতর্কতাবলম্বন স্বরূপ) সাধারণতঃ শর্ত আরোপ করা হইয়াছে যে, স্বীয় প্রাপ্য

বস্তু জাতীয় কোন বস্তু যদি হস্তগত হয় তবেই উহা হইতে স্বীয় হক উসুল করিতে পারিবে। কিন্তু যদি অন্য জাতীয় বস্তু হস্তগত হয় তবে সে স্থলে মালিকের সম্মতি ব্যতিরেকে স্বীয় হক্কের বিনিময় রাখিয়া লওয়া জায়েয হইবে না। কারণ, এই ক্ষেত্রে হস্তগত বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারণ আবশ্যক হয়, অথচ প্রাপকের এই অধিকার নাই যে, সে অন্য মালিকের বস্তুর মূল্য নিজ ইচ্ছামতে নির্দ্ধারণ করে। পক্ষান্তরে হস্তগত বস্তু, প্রাপ্য বস্তু জাতীয় হইলে সেই ক্ষেত্রে মূল্য নির্দ্ধারণের প্রশ্ন আসে না, তাই উহা হইতে স্বীয় প্রাপ্য পরিমাণ রাখিতে পারিবে। অবশ্য অন্যান্য ইমামগণ এবং হানাফী মজহাবের পরবর্তী আলেমদের মতে (মূল্য নির্দ্ধারণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনে) সব রকম হস্তগত বস্তু হইতেই স্বীয় প্রাপ্যের পরিমাণ উসুল করিতে পারিবে। (ফয়জুলবারী দ্রষ্টব্য)

প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন

১১৯২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর দেওয়ালের উপর আবশ্যক বোধে আরকাঠ বা কড়িকাঠ ইত্যাদি রাখিতে চাহিলে উহাতে বাধা দেওয়া চাই না।

আবু হোরায়রা (রাঃ) এই হাদীছখানা বর্ণনা করিয়া উপস্থিত শ্রোতাগণের মধ্যে একটু বিরূপভাব লক্ষ্য করিতে পারায় তাহাদিগকে তিরস্কার করতঃ বলিলেন, আমি তোমাদের সম্মুখে নিশ্চয় এই হাদীছখানা বর্ণনা করিবই।

রাস্তা-ঘাটে বসা

চলাচল পথের ধারে নিজের জায়গায় বা নিজ বাড়ীর আঙ্গিনায় বসিতেও অনেক দায়িত্ব বহন করিতে হইবে।

১১৯৩। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা রাস্তার কিনারায় বসিও না। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন (দরিদ্রতার দরুন আমাদের বাড়ী-ঘরে কোন সুব্যবস্থা না থাকায়) রাস্তার কিনারায় বসা পরিত্যাগ করিতে আমরা অপরাগ; আমরা পরস্পর প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ঐরূপ স্থানে বসিয়াই বলিয়া থাকি। এতচ্ছ্রবনে নবী (দঃ) বলিলেন, এমতাবস্থায় যখন তোমরা বস তখন রাস্তা ও পথের হক আদায় করিও। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, পথের হক কি কি? তদুত্তরে নবী (দঃ) বলিলেন, পথের হক এই—(১) স্বীয় দৃষ্টি নিম্নমুখী ও সংযত রাখা, (পথিক নারীদের প্রতি দৃষ্টি দিবে না।) (২) অপরের কষ্ট হয় এইরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকা, (৩) সালামের উত্তর দেওয়া, (৪) সৎ উপদেশ দান করা ও কু-কার্য্যে বাধা দেওয়া।

[এতদ্ভিন্ন (৫) পথিককে পথ প্রদর্শন করা, (৬) হাঁচিদাতার "আলহামদু লিল্লাহে" শুনিলে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা, (৭) বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা, (৮) পথহারাকে পথ বাতলাইয়া দেওয়া, (৯) মজলুমের সাহায্য করা, (১০) বোঝা বহনকারীর সাহায্য করা (১১) আল্লার জেকের অধিক পরিমাণে করা। (ফতহুল-বারী)]

পথ হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা

আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, পথ হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা দান-খয়রাত সমতুল্য।

১১৯৪। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ

غُصْنَ شَوْكٍ فَاَخَذَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ٥

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি পথিমধ্যে চলিতেছিল; সে কাঁটাযুক্ত গাছের ডালা পথিমধ্যে দেখিয়া উহা অপসারণ করিয়া দিল। আল্লাহ তায়ালা তাহার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিলেন।

পথের পরিমাপ

মছআলাহঃ—কোথাও একটি প্রশস্ত ভু-খণ্ড বসতি বিহীন রহিয়াছে যাহার উপর সর্বসাধারণ লোকদের চলাচলের পথও আছে, কিন্তু সেই পথের চিহ্নিত পরিমাপ বিদ্যমান নাই। উক্ত ভুখণ্ডের উপর উহার মালিকগণ ঘর-বাড়ী তৈরী করিতে চায়। সে ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সাত হাত প্রশস্ত পথ রাখিতে হইবে।

১১৯৫। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, (কোন পথের সংস্কার বা আবিষ্কারে বা নূতন বস্তি আবাদকালে পথ প্রতিষ্ঠায় ঐ পথের পার্শ্বস্থিত লোকদের বিরোধ মীমাংসায় স্মরণ রাখিবে,) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মতবিরোধের ক্ষেত্রে পথের পরিমাপ সাত হাত ধার্য্য করিয়াছেন।

কাহারও মাল লুট করিয়া বা ছিনাইয়া নেওয়া

নবী (দঃ) বিশেষভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করিতেন লুট না করা সম্পর্কে। এক হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি অন্যের মাল লুট করে সে ঈমানশূন্য হইয়া যায়।

১১৯৬। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে য়্যাযীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন, লুটপাট করা হইতে এবং কোন জীবকে উহার অঙ্গহানী করিয়া শাস্তি দেওয়া হইতে।

মদের পাত্র ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলা

মদের মটকা ভাঙ্গিয়া ফেলা, মদের মশক ছিড়িয়া ফেলা, মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলা, (শেরেক-বেদআত কার্য্যের বস্তু যেমন) ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলা, (গান বাদ্যের যন্ত্র) দোতারা,

ছেতারা ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলা—এই সব বিষয় ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়া উহার মছআলাহ সম্পর্কে ইঙ্গিত করিতেছেন—

ছাহাবীগণের যুগের খ্যাতনামা কাজী বা বিচারপতি শোরায়হ্ রহমতুল্লাহ আলাইহের একটি রায় এখানে উল্লেখ হইয়াছে যে, দোতারা বা ছেতারা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার একটি মোকদ্দমায় তিনি আসামীকে বে-কসুর খালাস দিয়াছিলেন।

বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ "ফতহুল বারী" নামক কিতাবে লিখিয়াছেন যে, এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) দুইটি হাদীছের প্রতিও ইঙ্গিত করিয়াছেন।

প্রথম হাদীছটি এই— মদ হারাম ঘোষিত হইলে পর আবু তালহা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, আমি কতিপয় এতিমের পক্ষে ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদ ক্রয় করিয়াছিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, মদ ফেলিয়া দাও এবং মদের মটকা ভাঙ্গিয়া ফেল।

দ্বিতীয় হাদীছটি এই— মদ হারাম ঘোষিত হইলে একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছুরি হাতে লইয়া বাজারে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় সিরিয়া হইতে আমদানী কৃত মদের মশকসমূহ বিদীর্ণ করিয়া দিলেন।

১১৯৭। হাদীছ ঃ—ছালামতবনুল-আক্‌ওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বরের যুদ্ধের সময় একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রজ্জলিত অগ্নি দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করতঃ জানিতে পারিলেন যে, গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না করা হইতেছে। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, গোশত ফেলিয়া দাও এবং পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেল। এক ব্যক্তি আরজ করিল, পাত্র ধৌত করিয়া লইলে চলিবে কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, আচ্ছা ধৌত করিয়া লও।

১১৯৮। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি স্বীয় ঘরে মাচাংএর সম্মুখে লটকাইবার একটি পর্দার ব্যবস্থা করিলাম, উহা ছবিযুক্ত ছিল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহা দেখিয়া উহাকে ফাড়িয়া ফেলিলেন; উহার খণ্ড সমূহ দ্বারা আয়েশা (রাঃ) দুইটি বসিবার গদী তৈয়ার করিলেন।

স্বীয় ধন রক্ষার্থে নিহত হইলে?

১১৯৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ধন রক্ষায় খুন হইবে সে শহীদ গণ্য হইবে।

অপরের কোন বর্তন পেয়ালা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে?

১২০০। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা কোন এক পত্নীর ঘরে ছিলেন, অপর এক পত্নী তাঁহার ভৃত্যের হাতে তথায় কিছু খাদ্যবস্তু পাঠাইলেন। যেই পত্নীর ঘরে নবী (দঃ) ছিলেন সেই পত্নী রাগান্বিত হইয়া ভৃত্যের হাতে আঘাত করিলেন; খাদ্যবস্তুর পাত্রটি তাহার হাত হইতে পতিত

হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। নবী (দঃ) ভগ্ন পাত্রটির খণ্ডগুলি একত্রিত করিয়া উহার মধ্যে পতিত খাদ্যবস্তু উঠাইলেন এবং উপস্থিত সকলকে খাইতে বলিলেন এবং ভৃত্যকে অপেক্ষা করার আদেশ করিলেন। পানাহার শেষ করিয়া ভগ্নকারিণী পত্নীর নিকট হইতে একটি ভাল পাত্র লইয়া ভৃত্যের হাতে দিলেন এবং ভগ্ন পাত্রটি সেই ঘরে রাখিয়া দিলেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● কাহারও সঙ্গে বিতর্কে ফাহেশা কথা ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা মোনাফেকের পরিচয় (৩৩২ পৃঃ)। ● ব্যক্তিবিশেষের বা সমাজবিশেষের তৈরী বাংলো, বারান্দা বা চাতাল ইত্যাদি যাহা সাধারণতঃ লোকজনের বৈঠকখানারূপে তৈরী হয় তথায় মালিকের অনুমতি ছাড়া বসা যায়। (৩৩৩ পৃঃ)। ● পথে-ঘাটে এমন কোন বস্তু ফেলা যাহাতে পথের কোন ক্ষতি না হয় এবং চলাচলকারীদের জন্য কোন প্রকার কষ্টের বা বিঘ্নের কারণ না হয়—তাহা জায়েয (ঐ)। ● সাধারণ পথের পার্শে কূপ করা জায়েয যদি যাতায়াতকারীদের কষ্ট ও ক্ষতির কারণ না হয় (ঐ)। পথে কষ্টদায়ক জিনিষ থাকিলে উহা যাহারই হউক অপসারণ করা যায় (৩৩৪ পৃঃ)। উচু বা দ্বিতলে ত্রিতলে কক্ষ বা বারান্দা বহির্মুখী বা অবহির্মুখী তৈরী করা (৩৩৪ পৃঃ)। অর্থাৎ নিজ জমিতে এইরূপ গৃহ তৈরীর অধিকার আছে, কিন্তু পড়শীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যথা— নিজ বাড়ীর ছাদে চড়িলে যদি পরশীর আন্দরবাড়ী দৃষ্টিগোচর হয় সে ক্ষেত্রে পড়শীর অধিকার আছে ছাদে চড়িতে নিষেধ করার—যাবৎ না ছাদে পর্দার বেষ্টনী দেওয়া হয়। আর যদি ছাদ হইতে অপরের আন্দরবাড়ী দৃষ্টিগোচর না হয়, কিন্তু অপর ছাদে মানুষ উঠিলে তাহা উচু ছাদ হইতে দেখা যায় সে ক্ষেত্রে উচু ছাদে চড়িতে নিষেধ করার অধিকার নাই (আলমগীরী, ৫—৪০৮) ● মসজিদের সম্মুখে মসজিদের সীমার বাহিরে যাতায়াত ও সাধারণ ব্যবহারের জায়গায় মসজিদে আগমনকারী স্বীয় যানবাহন বাঁধিতে পারে (৩৩৫ পৃঃ)। ● কাহারও দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ঐরূপ দেওয়াল বানাইয়া দিতে হইবে (৩৩৭ পৃঃ)। অর্থাৎ কাহারও কোন বস্তু বিনষ্ট করিলে সে ক্ষেত্রে অন্য বস্তুর দ্বারা ভরতক দেওয়া দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কথা; প্রথমতঃ ঐ বস্তুর স্থান পূরণ করার চেষ্টাই করিতে হইবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

